নারায়ণ পত্রিকার গল্প-সংকলন

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

❑ পরিবেশক ❑

নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

NARAYAN PATRIKAR GALPA-SANKALAN
Edited by : Baridbaran Ghosh

❑ *Published by* ❑
Sanghamitra Nath
Shree Publishing House
26B, Panditia Place
Kolkata 700 029

❑ প্রকাশিকা ❑
সঙ্ঘমিত্রা নাথ
শ্রী পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০ ০২৯

❑ প্রথম প্রকাশ ❑
জানুয়ারী ২০০০

❑ প্রচ্ছদ ❑
রঞ্জন দত্ত

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ❑
সুধীর দে
অজন্তা প্রিণ্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

রূপতাপস দিলীপ,

তুমি আমাকে এবং আমার কাজকে ভালবাস

—তোমাকেই

বারিদ

॥ নারায়ণী-কথা ॥

বাংলা ১৩২১ সনে ঠাকুরবাড়ির জামাই প্রমথ চৌধুরি একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন—'সবুজপত্র'। প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখ ২৫ বৈশাখ। কেন এই তারিখ—তা ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন দেখি না। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা—একটি কবিতা—'সবুজের অভিযান', একটি প্রবন্ধ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' এবং একটি ছোটো গল্প 'হালদার গোষ্ঠী'।

বাংলা ১৩২১ সনে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় একটি মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল—নাম 'নারায়ণ'। 'সবুজপত্র' প্রকাশের প্রায় ৮ মাস পরে—অগ্রহায়ণ মাসে। এর প্রথম সংখ্যায় যে-সব লেখা ছিল—তার মধ্যে একটি গল্পের নাম পাচ্ছি—'মৃণালের কথা' (এই সংকলনে গ্রন্থিত)। লেখকের নাম—বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছেন এই সংখ্যায়—'নূতনে পুরাতনে'! আর প্রথম দুটি রচনা—'স্তব' এবং 'অন্তর্যামী' —লেখক চিত্তরঞ্জন দাস।

এই চিত্তরঞ্জন দাস এসময়ে একজন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং কবি হিসেবেও পরিচিত হচ্ছেন, এখনও তিনি 'দেশবন্ধু' হয়ে ওঠেন নি। তিনিই 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্মদাতা এবং এর পালক-পিতা বিপিনচন্দ্র পাল। পত্রিকার 'নারায়ণ' নামকরণও বিপিনচন্দ্রের করা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই 'নারায়ণ'-এর সর্বস্ব। এসময়ে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের লেখনির স্পর্শ কোনও-না কোনওভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 'নারায়ণ'-এ রবীন্দ্রনাথ অচ্ছুৎ। অচ্ছুৎ শুধু নয়—এক এক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করার জন্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার। রবীন্দ্রস্নেহধন্য 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে 'আড়ি' করেই যেন এর জন্ম। নইলে প্রথম সংখ্যাতেই বিপিনচন্দ্র পাল (তৃতীয় সংখ্যাতেও তিনি গল্প লিখেছেন, কিন্তু স্বনামে নয়—'হরিদাস ভারতী' ছদ্মনামে) 'মৃণালের কথা' লিখবেন কেন? 'মৃণালের কথা' আসলে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্রতিক্রিয়া। আমরা 'নারায়ণ' -রবীন্দ্রবিবাদ কাহিনি নিয়ে এখানে মুখরোচক কোনও গল্প লিখতে চাইছি না (কৌতূহলীদের বলি, এই পর্ব সবিশেষ যাঁরা জানতে চান—তাঁরা মৎ-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : বিপিনচন্দ্রপাল' বইটি উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন)। কিন্তু পত্রিকার চরিত্র-দর্শন বিষয়ে এই সংবাদটি জরুরি বলে ধরে নিতেই পারি।

'নারায়ণ' পত্রিকা, আগেই বলেছি, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট (এখন বিধান সরণি) থেকে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায়। পরে অবশ্য বহুবার এই কার্যালয়ের ঠিকানার পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পাদক বদলও ঘটেছে। এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনকালে পূর্ণমাত্রায় রাজনীতিতে যোগদান কালে বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের প্রবল

মনান্তর-মতান্তর ঘটেছে—ফলে ১৩২৯ সালের আশ্বিন-কার্তিক, ৮ম বর্ষের ১১-১২ সংখ্যা প্রকাশের পর 'নারায়ণ' এর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটেছে।

একটা কথা স্পষ্ট করে এই সূত্রে বলে নেওয়া ভাল যে, রবীন্দ্রবিরোধিতা এই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য হলেও পত্রিকাটি রবীন্দ্র-বিরোধিতা-সর্বস্ব ছিল বলে ভাবলে অনুচিত হবে। এই পত্রিকায় এমন অনেক লেখক লিখেছেন যাঁরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন অথবা এ-সব 'দলাদলি'-র ঊর্ধ্বে ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামোল্লেখ করতে পারি। এমনকি গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। যে-রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে নিয়ে 'নারায়ণ' একটি বিশেষ 'বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা' (বৈশাখ, ১৩২২) প্রকাশ করে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য খবর হল 'নারায়ণ' পত্রিকাই প্রথম মাসিক পত্রিকা—যাঁরা বাংলাতে প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে।

স্বভাবতই শুধু দলাদলির কাগজ হলে পত্রিকার এমনতর উদারচরিত্র বিধান সম্ভবপর হয় না। নারায়ণের স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যা ছিল সাড়ে চারশো-র মতো। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের মতে, ৭৫০। এর গ্রহণযোগ্য চরিত্রের জন্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দু'হাজার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সংখ্যা ধরে রাখা সম্ভবপর হয়নি নানা কারণে—প্রচার সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় এক হাজার একশো পঁচিশে।

এই যে সাড়ে সাতশো থেকে দু'হাজারে ওঠা—এর পিছনে অন্যান্য রচনার সঙ্গে এতে প্রকাশিত গল্পগুলির একটা ভূমিকা ছিল অবশ্যই। প্রতিষ্ঠিত গল্প লেখকেরা যেমন এতে গল্প লিখেছেন, তেমনি সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রমুখ নবীন লেখকেরাও এখানে গল্প লিখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এই পত্রিকাতেই গল্প-লেখক চিত্তরঞ্জন দাসের আবির্ভাব। একেবারে সূচনায় তিনি দুটি গল্প লেখেন—'ডালিম' ও 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' (পৌষ ১৩২১, অগ্রহায়ণ ১৩২২)। কিন্তু তারপরে আর লিখলেন না। ফলে গল্পকার চিত্তরঞ্জন সম্ভাবনাকালেই নিজেকে নির্বাসিত করেছেন। অথচ 'ডালিম' গল্পটি একসময়ে প্রবল আলোড়নে সৃষ্টি করেছিল—এতে বর্ণিত বারবণিতা চরিত্রের কারণে। চল্লিশোত্তীর্ণ এক ধনী নায়ক সুরা আর বাঈজি নাচের আসরে ডালিমকে আবিষ্কার করে। এই ডালিম ছোট বেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে মামার বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আশ্রয়হীন হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার সেরা বারবণিতায় পরিণত হয়। এই করুণ পরিণামের পাশে ভালবাসার জন্যে ডালিমের প্রার্থনা, নায়ককে ভালবেসে তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই ভালবাসার যন্ত্রণা আপন বুকে বহন করে ডালিম সর্বহারার জীবনকে বেছে নিয়ে চিরবিরহকে বরণ করেছে। এই 'নারায়ণে'ই ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' নিবন্ধ লিখে ডালিমকে যতই তিরস্কার করুন—'ডালিম' একটি রসোত্তীর্ণ গল্পের পরিণাম পেয়েছিল।

আমরা এতে প্রকাশিত সব গল্পের আলোচনা করার চেষ্টা করবো না। পাঠকই সেই দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি 'নারায়ণ'-এর গল্প-লেখকদের মধ্যে দু'জন —নারায়ণ ভট্টাচার্য ও সরোজনাথ ঘোষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথমজনের আবির্ভাব তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৩)। শেষ গল্প লিখেছেন জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬-এ—গল্প সংখ্যা ১৪; সরোজনাথ ঘোষ লিখতে শুরু করেন আশ্বিন ১৩২৫ থেকে, লেখেন চৈত্র ১৩২৬ অবধি—গল্পসংখ্যা মোট ১৫। এঁরা এসেছেন, কিছুকাল চুটিয়ে লিখেছেন এবং তারপরে যেন হঠাৎ করে এঁদের গল্প আর ছাপা হয়নি। সুভাষচন্দ্র বসুর কিশোরবেলার বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এখানেই দারুণ একাধিক গল্প লিখেছেন—'ভিখারি' গল্পটি তাদের মধ্যে সেরা। মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গিরিবালা দেবী—'রায়বাড়ি'র সেই বিখ্যাত লেখিকা। খুব ভাল লাগে যখন দেখি দুজন মহিলা একত্রে গাঁটবেঁধে গল্প লেখেন—বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী। বীণাপাণি অবশ্য এককভাবে গল্পও লিখেছেন। যোগেশচন্দ্র মজুমদার সেকালের একজন জাঁদরেল গল্পকার ছিলেন 'ভাগলপুর গোষ্ঠীর'। সুনীতি দেবী—'কল্লোলে'র সুনীতি দেবী কিনা জোর করে বলতে পারিনা। তবে ভাগলপুর গোষ্ঠীর আর এক লেখক 'সহজিয়া' উপন্যাস-খ্যাত এবং নিরুপমা দেবীর অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্ট গল্পটি ভাল লিখতেন। 'শুভা'খ্যাত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'ঠানদিদি' বাংলা সাহিত্যের একটি সেরা গল্প। গল্প প্রায় 'নষ্টনীড়'-এর মতই। বোধকরি 'নষ্টনীড়'-এর পালটা জবাব। বিধবা ঠান্‌দি 'পিসতুতো দেওর' শচীকান্তের প্রতি প্রণয়-দুর্বলতা পোষণ করেন—সেকালের পক্ষে এইভাবে একটা গল্প লেখা বিদ্রোহমূলক সন্দেহ নেই। 'ঠান্‌দি'র মুখের ভাব ও ভাষা শুনুন—'মিথ্যা কহিব না। শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তাহার উপর রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার হৃদয়ের পিপাসা বাড়াইয়া দিলাম, হয়তো বা আশাও দিলাম।'

আসলে এখানের গল্পগুলোর নানান বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেই এই সংকলন প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। চিরকালই আমরা বিমাতা সম্পর্কে বিমাতৃসুলভ মনোভাব প্রকাশ করে এসেছি। যখন দেখি এখানে বিমাতা ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে আবির্ভূর্তা তখনই মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। 'কাহার দোষ' গল্পটি পড়ে একে এতো আধুনিক মনে হয়েছে যে উদ্যোগী কেউ এটিকে দূরদর্শনের পর্দায় চিত্রায়িত করতে পারেন। 'মায়া' শুধু একটি নায়িকার নাম নয়, একটি বন্ধনেরও নাম—তা 'মায়া' গল্পে ধরা পড়ে। ডায়েরি আকারের গল্প 'ঠিকে ভুল'-এ যেন আধার ও আধেয়ের একটা অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটে গেছে। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে একটি গল্প যে কত দুর্লভ হতে পারে তা 'এক ঢেবুয়া' গল্পের থ' মেরে যাওয়া দুঃখের শিরশিরানি অনুভব করতে করতে বুঝতে পারি। দু'জনে মিলে লেখার চল হয়েছে 'সন্ত-মার' প্রমুখ গল্পে। 'পথের পাঁচালী'র অনেক আগেই 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' গানটি পেয়ে গেলাম 'খেয়ালী'

গল্পে। মডার্ন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ আর শাশ্বত সময়ের নমুনা 'মৃন্ময়ী' গল্পটি। একটি ভূতের গল্পও পাঠক পড়তে পাবেন 'স্নেহের টান'। গল্পে লেখকের নাম পেয়েছি 'শ্রীঃ'— কিন্তু সূচিপত্রে পাই যোগেশচন্দ্র মজুমদারের নাম। 'চিত্র' একটি 'অণু' গল্পের নমুনা। লেখকের নামের শেষ 'ব'-এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি। 'দ্বিদল কমল' একটি রূপকথা। পত্র গল্প 'চিঠির গুচ্ছ' নারীবাদী ভাবনা জারিত। অনন্তানন্দের পত্র (এই নামে একাধিক রচনা আছে, তাদের মধ্যে এটিকে গল্পলক্ষণাক্রান্ত দেখে বেছে নিয়েছি)—একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা—রক্ষণশীলতা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বে। সামাজিক অধিকার একটি সৎমানুষকে কোথায় নিয়ে যায়—তার করুণ সর্বনাশের কাহিনি 'জেলফেরৎ'। একটিমাত্র অনুবাদ গল্প, নমুনা হিসেবে, আমরা এখানে সংকলন করেছি 'জেরাল্ড জয়ী'—ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার পটভূমিকায় এ এক আশ্চর্য গল্প।

'নারায়ণ' পত্রিকা তার অষ্টাধিক বর্ষ আয়ুষ্কালে অনেক গল্প প্রকাশ করেছে। পৃথিবীর কোনও পত্রিকাতেই প্রকাশিত সব রচনাই (গল্প-সমেত) সেরা হতে পারে না। সেজন্যেই আমরা এতে প্রকাশিত সবগল্পই নির্বিচারে না নিয়ে একটা নির্বাচিত গল্প-চয়ন প্রকাশ করলাম। আরও একটা সর্বৈব সত্য যে কোনও একজনের নির্বাচিত সব গল্পই সব পাঠককে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 'বহুজন সুখায়' নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে—সবাইকে খুশি করা যায় না একথা জেনেই।

'নারায়ণ' পত্রিকা আমাদের দেশের-সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং জলবায়ুর গুণে ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং কয়েকটি গ্রন্থাগারের আনুকূল্যে এই গল্পগুলি অতি আয়াসে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ-সব কাজে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, বেলুড় গ্রন্থাগার ছাড়া দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গার্গী প্রমুখের সহযোগিতা সানন্দে গ্রহণ করেছি। নাথ পাবলিশিং-এর প্রীতিভাজন সমীরকুমার নাথ মহাশয় সানন্দে কঠিনতর কাজগুলি আমাকে সমর্পণ করে স্বস্তি বোধ করেন। তাঁর ইচ্ছাপালন করে আমিও স্বস্তি পাই। তাঁর সহযোগিদ্বয় আমাকেও সহযোগিতা করেন। দুষ্প্রাপ্য চিরতরে অপ্রাপ্য হয়ে যাবার আগে এই কাজটি করা গেল বলে ভাল লাগছে। বেশি ভাল লাগবে—যাঁদের জন্যে এই আয়োজন—তাঁদের ভাল লাগলে।

মূল পত্রিকার রসাস্বাদন ঘটবে—এই ভরসায় বানানে কোনও পরিবর্তন আনিনি কয়েকটি অনিবার্য সংশোধন ছাড়া। ভূমিকা রচনায় প্রিয়ভাজন শ্রীসুনীল দাসের গবেষণার সহায়তা পেয়েছি—বস্তুত 'নারায়ণ' আলোচনার তিনিই প্রথম ও অদ্বিতীয় শালগ্রাম।

বিনত

বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

সানায়ে	১১	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
কণ্টক	১৮	অতুলচন্দ্র মুখটী
বিমাতা	২৭	অপর্ণা দেবী
সারেঙী	৩২	অবনীকুমার দে
বিন্দীর সাঙা	৩৮	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাবাজী	৪৯	শ্রীঃ...
ঠানদিদি	৫৪	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বন্ধ দরজায়	৬৬	সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
ব্রহ্মশাপ	৭৭	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
কাহার দোষ	৮৬	সরোজনাথ ঘোষ
কৃতজ্ঞতা	৯৯	সরোজনাথ ঘোষ
ভাগ্যহীনা	১০৯	গিরিবালা দেবী
মায়া	১১৮	সুষমা সিংহ
গৌরী	১২৩	গিরিবালা দেবী
গিরিবালা দেবী	১২৯	ঠিকে ভুল
জেরাগু-জয়ী	১৩৫	সৌরিন্দ্রনাথ বসু
সঙ্গম-তীর্থে	১৪২	শিবরাণী দেবী
নন্‌-কো-অপারেশন	১৪৭	প্রফুল্লময়ী দেবী
এক ঢেবুয়া	১৫০	বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সঙ-সার	১৫৫	বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী
খেয়ানী	১৫৮	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মৃন্ময়ী	১৭১	হেমন্তকুমার সরকার
নারীর ভাগ্য	১৭৩	প্রফুল্লময়ী দেবী
সৈনিক-সীমন্তিনী	১৮২	বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায়
কি দেখা	১৮৮	চিত্তরঞ্জন দাস
গানের কথা	১৯১	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রেমে কত প্রেম	১৯৬	
স্নেহের টান	২০৭	শ্রী...
ভিখারী	২১০	হেমন্তকুমার সরকার
হাত দু'খানি	২১২	বিভূতিভূষণ ভট্ট
গুরুদেব	২১৭	বীণাপাণি দেবী
চিত্র	২১৯	অনাথনাথ ব।

সূচীপত্র

ডালিম	২২১	চিত্তরঞ্জন দাস
স্মৃতি	২২৮	বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী
কোমল মনের বল	২৩৪	বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী
চাক্‌রের ছুটি	২৩৮	উমাচরণ মুখোপাধ্যায়
দ্বিদল কমল	২৪৩	বিভূতিভূষণ ভট্ট
চিঠির গুচ্ছ	২৪৬	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব	২৫৩	নলিনীকান্ত সরকার
কেরাণীবাবু	২৫৮	হেমন্তকুমার সরকার
অনন্তানন্দের পত্র	২৬০	‘অনন্তানন্দ’
চোর	২৬৪	নারায়ণ ভট্টাচার্য
জেল-ফেরৎ	২৭২	নারায়ণ ভট্টাচার্য
গদা চাঁড়াল	২৭৯	নারায়ণ ভট্টাচার্য
পাগলের কাণ্ড	২৮৫	নারায়ণ ভট্টাচার্য
মৃণালের কথা	২৯৪	বিপিনচন্দ্র পাল
কল্যাণী	৩১৩	হরিপদ ভারতী

সানায়ে

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[১]

রসিক হাড়ীর সময়টা একটু অতিরিক্ত মন্দ পড়িয়াছিল। জীবনে তাহার ভাল সময় বড় একটা আসে নাই। একবার আসিয়াছিল, কিন্তু রসিক তাহাকে উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর সে কত স্তব্ধ নিশীথে আপনার বিনিদ্র নয়নের অশ্রুধারা ঢালিয়া সেই দূর অতীতকে আহ্বান করিয়াছে, সানাইয়ে বেহাগের করুণ উচ্ছ্বাস তুলিয়া তাহার চরণে হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে সময় আর আসে নাই; আসিবার সম্ভাবনাও নাই।

প্রসিদ্ধ সানাইওয়ালা যুধিষ্ঠির হাড়ীর পুত্র ও শিষ্য রসিক হাড়ীও যে একজন নামজাদা সানাইদার, এ কথা সকলেই স্বীকার করিত। অনেকে এমনও বলিত, সে সানাইয়ে পিতাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। রসিক কিন্তু একথা স্বীকার করিত না। সে বলিত, তাহার পিতা যেমন ভরা রাত্রে দরবারী কানাড়ার গমকের উপর গমক তুলিত—মূর্চ্ছনা ঢেউয়ের মত উঠিত, ভৈরবীর কোমল ধৈবত ও নিখাদের মধ্যে যে মূর্চ্ছনা দিয়া মধ্যমে আনিয়া মিলাইত, সেটুকু রসিক এতদিনেও আয়ত্ত করিতে পারে নাই; কখনও পারিবে কি না সন্দেহ। সুরজ্ঞ শ্রোতারা বলিত, "এটা রসিকের বিনয়।" অপরে বলিত, "হবেও বা, যুধিষ্ঠির একজন ক্ষণজন্মা সানাইদার ছিল।"

পিতার মৃত্যুর পর রসিক যখন পিতার লায়েক বাড়ীর বাঁধা সানাইদার হইল, যখন অর্থ ও সম্মান কিছুরই অভাব রহিল না, তখন পাঁচ কুটুম্বে ও ভাই ব্রাদারে অনুরোধ করিল, "রসিক, এবার একটা বিয়ে কর্।" রসিকেরও ইহাতে আপত্তি ছিল না, তবে একটু বাধা ছিল।

যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতেই পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিল। পাত্রীও স্থির হইয়াছিল। পাত্রী প্রতিবেশী সদা হাড়ীর মেয়ে বসুমতী বা বসী। এক কম তিন গণ্ডা টাকা পণও ঠিক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিয়ের কিছু আগে বসীর মা যখন শুনিল যে, রসিক যুধিষ্ঠিরের বিয়ালী (বিবাহিতা) স্ত্রীর সন্তান নহে, সাঙ্গালী (বিধবা বিবাহকরা) স্ত্রীর সন্তান, তখন সে রসিককে মেয়ে দিয়া আপনার কুলগৌরব নষ্ট করিতে চাহিল না। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, বসীর অন্যত্র বিবাহ হইল। যুধিষ্ঠির অন্য সম্বন্ধ দেখিবার পূর্ব্বেই মহাকালের আহ্বানে আকুল হইয়া উঠিল, অনাহত সুরের ডাক শুনিতে শুনিতে কালের সুরের খেলা ভাঙিয়া কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল।

রসিকের মা অনেক আগেই মারা গিয়াছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে রসিক সংসারে সম্পূর্ণ একা হইয়া পড়িল। সানাইটীকেই একমাত্র সঙ্গী করিয়া রসিক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিল। সে সানাই বাজাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার মনের কোন সুখই ছিল না। সর্ব্বদাই মনের ভিতর একটা বিচিত্র অভাবের তাড়না ভোগ করিত। এই তাড়নার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সে অর্জ্জিত অর্থ প্রায় সমস্তই তাড়ী ও মদের আড্ডায় ঢালিয়া দিত। তাহাতেও যখন স্বস্তি পাইত না, তখন সে আপনার নির্জ্জন কুটীরদ্বারে বসিয়া অন্ধকার মাঠের দিকে চাহিয়া সানাইয়ে ফুঁ দিত; সে ফুৎকারে সানাইয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে করুণ উচ্ছ্বাস স্তব্ধ নিশীথিনীর বক্ষ কম্পিত করিত, সেই উচ্ছ্বাস আরও একটি

নারীহৃদয় আলোড়িত করিত—সে হৃদয়ের অধিকারিণী সদা হাড়ীর মেয়ে—জাগরণ ও সুপ্তি-বিমূঢ়া—বসী!

[২]

কথায় বলে, "হাতের কাছ পায়ের মোছ, কপাল মুছবার নয়।" বসীর সম্বন্ধেও কথাটা ঠিক খাটিয়া গেল। বসীর মা অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া ভাল ঘর ভাল বর দেখিয়া, বসীর বিবাহ দিল, কিন্তু যেটারা পূজার রাত্রে বিধাতা তাহার কপালের ভিতর যে আঁচড় কাটিয়া দিয়াছিল, তাহা মুছিতে পারিল না। বিবাহের বছর না ঘুরিতেই বসী বিধবা হইল। পনর বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ষোল বৎসরে ভরাগঙ্গা-বসী তরঙ্গিত যৌবনের পূর্ণ উচ্ছ্বাস লইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

লোকে বলিল, "বসীর মা, বসীর সাঙ্গা দে।"

বসীর মাও বুঝিল, তাহা ছাড়া আর উপায় নাই। তখন সে প্রত্যাখ্যাত রসিকের সঙ্গে ঘণিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। রসিক তখন লায়েক বাড়ী হইতে মুঠা মুঠা টাকা, ঘড়া গাড়ু শাল দোশালা লইয়া আসিতেছে। বসীর মা আত্মীয়তা জানাইয়া তাহার কতক কতক ঘরে আনিতে লাগিল। রসিক ইহাতে আপত্তি দেখাইল না বটে, কিন্তু বিবাহের বিষয়ে সে একটুও আমল দিল না। বোধ হয় তাহার মন হইতে পূর্ব্ব প্রত্যাখ্যানের অপমানের ভাব তখনও যায় নাই। মায়ে ঝিয়ে দিনকয়েক আনাগোনা করিয়া, যখন রসিকের মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা নিরস্ত হইল।

বসী রূপবতী নয়, কিন্তু সুন্দরী। ইহার উপর যৌবনের স্নিগ্ধ মধুর নবীন রাগে তাহার সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকু আরও একটু সমুজ্জ্বল, আরও একটু মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রসিক ছাড়া পাড়ার অনেক অবিবাহিত যুবকই বসীদের বাড়ীর মাটি চষিয়া ফেলিল। বসীর মা কিন্তু সহজে কাহাকেও আমল দিল না। অগত্যা আঙ্গুর-টকের-খ্যাঁকশেয়ালীর দল একে একে সরিয়া পড়িল। কেবল একজন সরিল না, সে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুনের বাপ হাড়ীপাড়ার মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। অর্জ্জুনও সানাইয়ে সুদক্ষ। দ্রোণের কাছে কর্ণ ও পার্থের মত যুধিষ্ঠিরের কাছে রসিক ও অর্জ্জুনের শিক্ষা। দুইজনের মধ্যে কত প্রণয়ও ছিল। এখন বসী আসিয়া সে প্রণয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অর্জ্জুন ও রসিক এখন প্রতিদ্বন্দ্বী। রসিক কুমার, অর্জ্জুন বিপত্নীক। তাহার বাপ তখনও জীবিত। বাপ ছেলেকে পুনরায় সংসারী করিবার ইচ্ছায় ভাল মেয়ে ও যোগ্য কুটুম্ব খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। অর্জ্জুন কিন্তু বসীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং পিতার সম্পূর্ণ মত না থাকিলেও বসীকে ও বসীর মাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

অর্জ্জুন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সানাই হাতে বসীর মার কুটীরে উপস্থিত হইত, এবং বসীর মার সঙ্গে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের গল্প করিয়া বসীকে সানাই শুনাইত। সে বাছিয়া বাছিয়া ভাল সুর বাজাইত। সুরের মাঝে মাঝে ফাঁক ধরিয়া তাহাতে যত রকম কায়দা দেখান যাইতে পারে তাহা দেখাইত। তাহার ফুৎকারে ও অঙ্গুলী সঞ্চালনের কৌশলে নির্জ্জীব সানাই সজীব মানুষের মত কখন হাসিত, কখন কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত, কখন বা বিরহের আকুল তান তুলিয়া করুণ স্বরতরঙ্গে সমস্ত আকাশ প্লাবিত করিত। কিন্তু তাহার এই প্রাণঢালা সঙ্গীতের সব রেসটুকু যে বসীর কাণে যাইত এমন বোধ হইত না। সে আপন মনে চাটাই বুনিত, পাতা গুছাইত! শেষে রাত বেশী হইলে, হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত। অর্জ্জুন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সানাই বন্ধ করিয়া ঘরে যাইত।

তারপর গভীর নিশীথে যখন পল্লীর অপর প্রান্ত হইতে আর একটি সানাইয়ের করুণ সুর

উত্থিত হইত, তখন বসী তন্দ্রাঘোরে চমকিয়া উঠিত, এবং বংশীধ্বনিমুগ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইত, যেন কোন্ অতৃপ্তহৃদয় আবেশময়ী তৃষিত প্রাণের করুণ বেদনা এই সুরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহারই উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র কুটীরপ্রান্তে পাঠাইয়া দিতেছে। এই আকুল কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে, ভাবিতে ভাবিতে সে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, কখন যে সে মোহন সুরের তরঙ্গ নৈশাকাশে বিলীন হইয়া যাইত, তাহা সে জানিতেও পারিত না।

কিন্তু সকালে বসী চাটাই মাথায় লইয়া হাটে যাইবার সময় যখন দেখিত, রসিক তাড়ীর নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া কুটীরের রোয়াকে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে, বমিতে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে, রাস্তায় পর্য্যন্ত বমির বিশ্রী দুর্গন্ধ ছুটিয়াছে, তখন তাহার রজনীর ভ্রম ঘুচিয়া যাইত; ঘৃণার সহিত ভাবিত, "ছি ছি, এই কি সেই সানাইদার? এই কি প্রতি নিশীথে সুর-মন্দাকিনী বহায় এবং প্রতিদিনই এই বীভৎস কাণ্ড করে! এ যে বদ্ধ মাতাল! অর্জ্জুন এত মিষ্ট বাজাইতে পারে না বটে, কিন্তু সে তো এমন মাতাল নয়। ও সে মানুষ, আর এ ভূত!" তবুও বসীকে ভূতেই পাইয়াছিল; ভবিষ্যতের জন্য সে কোনও দিন মাথা ঘামায় নাই, এবং বর্ত্তমানের কুহেলিকা সে ভেদ করিতে প্রয়াস পায় নাই।

আর রসিক তাহার শূন্য কুটীরদ্বারে বসিয়া যখন দেখিত, পূর্ণ যৌবনভারাবনত দেহ লইয়া বসুমুখী ধীর মন্থর পদক্ষেপে লাবণ্যের মধুর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে, অধীর কটাক্ষে বিদ্যুতের তীব্রশিখা বিকীরণ করিতে করিতে, স্তব্ধ মধ্যাহ্নে, অলস সন্ধ্যায় তাহার কুটীরপার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন রসিকের বুকের ভিতর একটা তীব্র আকুলতা আসিয়া চাপিয়া বসিত, একটা তীব্র লাবণ্যের ছায়ায় সংসারটা যেন অন্ধকার হইয়া আসিত, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনমৃত্যু, সকলই একটা নির্ম্মম ব্যর্থতার মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইত। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিত, "হায়, বসুমতীকে যদি পাইতাম!" ভাবিত বটে, কিন্তু পাইবার চেষ্টা রসিক একবারও করিত না।

বড় বড় বাড়ীতে বিবাহে, পূজায় রসিকের বায়না হইত। বাজনায় সন্তুষ্ট করিয়া সে কত টাকা, কাপড়, শাল দোশালা, ঘড়া, গাড়ু বকসিস্ পাইত। রসিক কতক নিজে লইত, কতক সঙ্গীদের বিলাইয়া দিত। বিবাহবাড়ীতে যখন নবদম্পতী বাসরঘরে বসিয়া স্বপ্নলোকে বিচরণ করিত, তখন রসিক দ্বার-প্রান্তে বসিয়া, সানাইয়ে সাহানার মধুময় মিলনের উচ্ছ্বাস তুলিয়া গাহিত—"এসো এসো বঁধু এসো বসো হে হৃদয়-মন্দিরে।" তাহার সে আকাঙ্ক্ষাভরা স্নিগ্ধমধুর সুরের মূর্চ্ছনা আসিয়া যেন নবদম্পতীকে জড়াইয়া ধরিত।

লোকে বলিত, "রসিক তুই বিয়ে কর।"

রসিক হাসিয়া বলিত, "এইবার করবো।"

তাহার সে ফুটন্ত হাসিটুকুর ভিতর যে দীর্ঘনিশ্বাস চাপা থাকিত, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না, রসিকও বিবাহের কোন চেষ্টা করিত না।

[৩]

"বলি তোর জ্বালায় কি মানুষ একটু নিশ্চিন্তি হ'য়ে ঘুমুতেও পাবে না?" কথাটা বসুমতী খুব রাগিয়াই বলিল, বলিয়াই রসিকের বোধ হইল। সে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি তো কাউকে ঘুমুতে বারণ করি না।"

বসুমতী পূর্ব্বের ভাবেই চোখমুখ ঘুরাইয়া বলিল, "বারণ তো করিস্নে। দুপুর রেতে বসে বসে সানাই ফুঁকিস্ কিসের লেগে বল তো?"

রসিক। আমার এই স্বোভাব।
বসু। অমন স্বোভাবের মুখে ঝাড়ু মারি।
রসিক হাসিও ছাড়িল না, কোন উত্তরও করিল না। বসুমতী বলিল, "ফের যদি দুপুর রাতে জ্বালাতন করবি, তা হলে তোর ও সানাইকে লাল দীঘীর জলসই করবো, তা বলে রাখছি।"
রসিক। তা সানাইখানা তোর কি করেছে রে?
বসু। সে রাত দুপুরে কাণের গোড়ায় পোঁ পোঁ করে কেন?
রসিক চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই তোরে ভালবাসে ব'লে।"
বসুমতী রাগিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তার ভালবাসার মুখে আগুন, আর তোরও—"
কথা শেষ না করিয়াই বসী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। রসিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেই দিন হ'তে সে রাত্রে আর সানাই বাজাইত না।
বসী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার জন্য রসিককে সানাই বাজাইতে বারণ করিয়া আসিল বটে, কিন্তু বসী আর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিল না। সেই চিরপরিচিতি সুরটী শুনিবার উৎকণ্ঠায়, সে সমস্ত রাত্রি উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কই সানাই ত আর বাজে না, ঘুম আসিলে চোখ বুজিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চমকিয়া জাগিয়া উঠিত, ঐ বুঝি সানাই বাজিতেছে। কিন্তু সানাই বাজিল না; দুই দিন গেল, চারিদিন গেল, সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু সানাই আর বাজিল না। বসীর বুকের ভিতর জমাট হইয়া উঠিল।
বসুমতী গিয়া রসিককে বলিল, "তুই যে আর বড় সানাই বাজাস্ নে?"
রসিক তাহার ভাব দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল; তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাজালে যে লোকের ঘুম হয় না, কষ্ট হয়।"
বসু। লোকের কষ্ট হয় তাতে তোর কি?
রসিক। লোককে কষ্ট দেওয়া কি ভাল?
বসুমতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ইঃ, তুই যে একেবারে ধর্ম্মিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছিস্। ওসব বাজে কথা রাখ; আসল কথাটা কি বল দেখি?'
"আসল কথাটা—তুই যে বারণ করেছিস্ বসি, তাই তো বাজাই না—কথাটা রসিকের ঠোঁটের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা চাপিয়া বলিল, "এর আর আসল নকল কি?"
বসু। আছে বৈকি।
রসিক। কি আছে?
বসু। আসল কথা, তাড়ীর ঝোঁকে এখন আর বাজাবার সময় হয় না।
রসিক। তাড়ী আমি ছেড়ে দিয়েছি।
স্বরে শ্লেষের একটু তীব্রতা আনিয়া বসুমতী বলিল, "সত্যি নাকি? কবে হ'তে ছাড়্লি?"
একটা ছোট চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া রসিক বলিল, "যেদিন হতে সানাই ছেড়েছি।"
বসী। দু'টোই ছাড়্লি! কেন, কি দুঃখে?
রসিক। দুঃখে কি সুখে বল্‌তে পারি না, তবে বলেছি তো লোকের কষ্ট হয়।
বসী। তোর মাথা হয়। তুই বাজাবি; বলছি আমি বাজাবি।
রসিক। বাজাব।
বসুমতী একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে তুই আমার কথাতেই সানাই ছেড়েছিলি?"
রসিক বলিল, "তাই যদি ছেড়েই থাকি, তাতে দোষ কি?"
বসুমতী মুখ ঘুরাইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "দোষ কি? কেন ছাড়বি? আমি তোর কে?" কথা বলিতে বসুমতীর চোখের পাতা কিন্তু কেমন ভারি হইয়া আসিল।

রসিক ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "সন্ধ্যা হইয়া এল বসি, ঘরে যা।"

বসুমতী কণ্ঠটাকে আরও একটু উচ্চে তুলিয়া বলিল, "তোর হুকুমে নাকি? তুই আমার কথা শুনিস্ ব'লে মনে করেছিস্ বুঝি আমিও তোর কথা শুনব? আমি এই তোর দোরে চেপে বসলুম।"

পিঁড়েখানা টানিয়া লইয়া বসুমতী বসিয়া পড়িল; তার পর রসিকের দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তাড়িয়ে দিতে পারবি?"

রসিক বলিল, "তা পারব না, কিন্তু না—বসি তুই ঘরে যা।"

দৃঢ়স্বরে বসুমতী বলিল, "আমি যাব না।"

রসিক আর কিছু বলিল না। তেঁতুল গাছের পাশ দিয়া দুই চারিটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল, রসিক নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বসুমতী উঠিল, "আচ্ছা।"

বসুমতী বলিল, "তুই রাগ করিস্‌নে রসিক।"

রসিক বলিল, "না। দাঁড়িয়ে আসব?"

গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বসুমতী বলিল, "ইস, আমাকে কি বামুন কায়েতের ঘরের মেয়ে পেলি? আমার ভূতের ভয় নেই।"

"না, তুই সত্যিই হাড়ীর মেয়ে।"

বসুমতী ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, অর্জ্জুন। বসুমতী তাহার দিকে শুধু একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। রসিক স্তব্ধ জড়ের ন্যায় যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। দূরে নীলাকাশে অগণ্য তারকা দীপ্ত হীরকের মত জ্বলিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রসিকের বুকের ভিতর ঝড় বহিতেছিল।

বসুমতীর ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বিদ্ধ অর্জ্জুন সহজে রসিককে ছাড়িল না, সে পাড়ায় প্রচার করিয়া দিল, 'রসিক সদা হাড়ীর মেয়েকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছে, রসিক সে দিন সন্ধ্যাবেলা বসীকে নিজের ঘরে ডাকিয়া নানা প্রলোভন দিতেছে।' সেই অশিক্ষিত অসভ্য হাড়ীর সমাজে ইহা লইয়া একটা গুরুতর আন্দোলন চলিল, এবং মাতব্বরেরা একযোট হইয়া সিদ্ধান্ত করিল, হয় রসিক উপযুক্ত দণ্ড দিয়া বসীকে সাঙ্গা করুক, নয় তাহার হুঁকা বন্ধ হইবে।

রসিক কিন্তু মিথ্যা অপবাদের দণ্ড স্বরূপ বসীকে সাঙ্গা করিতে রাজী হইল না। সুতরাং সমাজে তাহার হুঁকা বন্ধ হইয়া গেল, মোড়লেরা তাহার 'ডাক' বন্ধ করিয়া দিল। এই অবসরে অর্জ্জুন বসীর মাকে অর্থের প্রলোভনে বাধ্য করিয়া বসীর পাণিগ্রহণ করিল। বিবাহে অর্জ্জুন বেশ দু'পয়সা খরচ করিল। পাঁচ গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বের খোঁজ লইল, চারি পাঁচদিন ধরিয়া ভোজ চলিল। আধ মণ তিরিশ সের ধান্যেশ্বরী আসিল, তিনটা শূকর মারা হইল। পাড়ার ছেলে বুড়া সকলেই আমোদে মাতিয়া উঠিল। মাতিল না কেবল রসিক। সে আপনার উলু খড়ে ছাওয়া কুঁড়ের ভিতর বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল; কেবল সন্ধ্যাকালে একবার বাহির হইয়া হাটপাড়ার বাজার হইতে দুই এক ঝাঁপি তাড়ী লইয়া আসিত।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর হইতে সে সানাইয়ে যে তান ধরিল, সে তান সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও থামিল না। সে রাত্রিতে সে তান যাহারি কানে গেল, তাহাকেই বলিতে হইল, "এমন করুণ সুর রসিকের সানাই হইতে আর কখনও বাহির হয় নাই।" ভোরের সময় যখন অবশ হস্ত হইতে সানাইটা পড়িয়া গেল, তখন রসিক পাশ হইতে তাড়ীর ভাঁড়টা টানিয়া তাহাতে চুমুক দিল।

মাঘের শেষে বেড়বাড়ীর ঘোষেদের বাড়ীতে বিবাহ। সেটা অর্জ্জুনের লায়েক বাড়ী হইলেও, বাবুরা রসিকের সানাইয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া তাহাকেও বায়না করিলেন। রসিক আপনার সানাইটী লইয়া যথাসময়ে ঘোষেদের বাড়ী উপস্থিত হইল।

কিন্তু একটা বড় গোল বাধিল। কোন ঢুলীই রসিকের সঙ্গে সঙ্গত করিতে রাজী হইল না, চারি আনা রোজের কোন সানাইদারও তাহার পোঁ ধরিল না। বাবুরা হুকুম দিলেন, ধমকাইলেন; বাদকেরা হাতযোড় করিয়া বলিল, "আমরা হুজুরের চাকর, কিন্তু একঘরের সঙ্গে বাজিয়ে পরগণার কাছে দায়ী হ'তে পারব না।"

কর্ত্তা হুকুম দিলেন, "রসিক, ভাই আজ খাওয়া-দাওয়া কর, আজ বিয়েটা চুকে যাক্, কাল সকালে তোর সানাই শুনব। যদি তোর বাজনা ভাল হয়, তবে তোকেই বাহাল করব।"

রসিক দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া কর্ত্তাকে অভিবাদন করিল, অর্জ্জুনের মুখ শুকাইয়া গেল।

বিবাহের পরদিন প্রভাতে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদিগের সম্মুখে রসিক ও অর্জ্জুনের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সানাই শুনিবার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়া সকলে ছুটিয়া আসিল। দান লইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে হাড়ী বাগ্‌দীর মেয়েরা আসিয়াছিল; তাহারাও এক পাশে চাপিয়া বসিল। তাহাদের ভিতর বসীও ছিল; সে একটু আগাইয়া বসিল।

প্রথমে অর্জ্জুন বাজাইল। একজন প্রসিদ্ধ ঢুলী তাহার সহিত সঙ্গত করিল। প্রায় এক ঘণ্টা গান চলিল। সকলেই তাহাকে বাহবা দিতে লাগিল।

তার পর রসিক উঠিল। সে দুইহাত জুড়িয়া বাবুদের অভিবাদন করিয়া করুণনেত্রে ঢুলীদের দিকে চাহিল। ঢুলীরা মুখ্ ফিরাইয়া লইল। তখন কর্ত্তা হুকুম দিলেন, "অমনি বাজাও।" রসিক একবার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে হীন প্রতিহিংসাপরায়ণ দলস্থ লোকদের দিকে চাহিয়া সানাইয়ে ফুৎকার দিল। সে ফুৎকারের ধ্বনি শূন্যে না মিলাইতেই অর্জ্জুন একটা ঢোল টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি সঙ্গত করব।" ঢুলীরা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিল।

তখন উপযুক্ত সঙ্গতের সহিত উপযুক্ত গান চলিল। রসিকের ক্ষুদ্র সানাইয়ের ভিতর হইতে সঙ্গীতের সুধাস্রোত বহিতে লাগিল; সুরের পর সুরের তরঙ্গ উঠিয়া আকাশ বাতাস প্লাবিত করিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের গানের সময়ে কত উল্লাসসূচক ধ্বনি উঠিয়াছিল, কত বাহবা পড়িয়াছিল; কিন্তু এখন আর একটিও বাহবা পড়িল না, কেহ ঠোঁট পর্য্যন্ত নাড়িতে সাহস করিল না। যেন একটু শব্দ করিলেই এই সুরের সূক্ষ্ম তরঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে রসিকের প্রেরণাস্ফীত আবেগ-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই স্তব্ধ; মন্ত্র-মুগ্ধ।

বাজাইতে বাজাইতে রসিক এক একবার অদূরে উপবিষ্টা বসীর দিকে চাহিতেছিল, আর সানাইয়ের প্রতি রন্ধ্র হইতে মধুর হইতে মধুরতর স্বরবৃষ্টি করিতেছিল। সহসা রসিকের ভাবান্তর হইল। সে দেখিল, বসীর মুখখানা ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতেছে, সে মুখে একটা ভারী আশঙ্কার ছায়া যেন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। রসিকের তাল কাটিয়া গেল, ঢুলী তাহা সংশোধন করিয়া যাইল। আবার তাল কাটিল, আবার ঢুলী তাহা সংশোধন করিল। এবার একটা মস্ত তাল কাটিয়া গেল। সাবধান করিয়া দিবার জন্য অর্জ্জুন অন্যের অশ্রাব্য স্বরে ডাকিল, "রসিক!"

রসিক একবার অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিল, বারবার বসীর প্রফুল্ল মুখখানার দিকে চাহিল। তার পর সানাইটা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

অর্জ্জুন হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল; ভূনিক্ষিপ্ত সানাইটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "বাজা।"

রসিক কিন্তু বাজাইল না। সে একবার আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; দেখিল, সকলেরই উৎসুক নেত্র তাহার মুখের উপর নিহিত। রসিকের বুকের ভিতরটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কোমলকণ্ঠে অর্জ্জুন ডাকিল, "রসিক! ভাই! কি হয়েছে তোর?"

রসিক করুণদৃষ্টিতে অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিল। অর্জ্জুন ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "মনিবের সামনে কি করিস্? বাজা, তোরই জিত হইবে।"

রসিক হাতের সানাইটাকে সজোরে মাটির উপর আছড়াইয়া দিল; সানাইটা দুই খণ্ড হইয়া গেল। সেই ভগ্ন খণ্ডদ্বয়কে কুড়াইয়া লইয়া রসিক ছুটিয়া সভাস্থল হইতে পলায়ন করিল। লোকে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "বাজাতে বাজাতে পাগল হয়ে গেছে।" কেহ বলিল, "বেজায় মদ খেয়েছে।" একজন হাড়ীর মেয়ে বলিল, "উপদেবতার দিষ্টি লেগেছে।"

বিবাহবাড়ী হইতে বিদায় লইয়া অর্জ্জুন রসিকের অনুসন্ধানে তাহার কুটীরে গেল। গিয়া দেখিল, রসিক তাহার ভগ্ন কুটীরখানির ভিতর মাটির উপর পড়িয়া আছে। তাহার পাশে মদের বোতল, তাড়ীর ভাঁড়; আর বুকের উপর সেই ভাঙা সানাইয়ের খণ্ডগুলি।

অর্জ্জুন ডাকিল, "রসিক! ভাই!"

কিন্তু রসিক উত্তর দিল না। বসুমতীও স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। সেও তখন উন্মাদিনী; বলিল, "ওমা, মরে গেছে যে! কে খুন করলে বল্! বল্ কে? তুই।"

অর্জ্জুন তীব্র দৃষ্টিতে বাষ্পাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "থাম্ হারামজাদী, তোর জন্যে আজ আমার দাদা গেল।"

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

কণ্টক

অতুলচন্দ্র মুখটী

গ্রীষ্মকাল; সন্ধ্যা তখন রক্তরাগ ছড়াইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। নাসিকো শিবিরের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। অদূরে সৈনিকেরা কুচ-কাওয়াজ করিতেছে। তিনি এই দলের সেনাপতি।

একটি অপরিচিত যুবক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সৈনিক-প্রথায় অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। নাসিকো তাহাকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

"আমি আপনার অধীনে সৈনিকের পদ চাই।"

যুবকের সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব; তাহার সবল সরল দীর্ঘ দেহ; তাহার চোখে মুখে এক উজ্জ্বলভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। কৌতূহলী হইয়া নাসিকো জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

"ওয়াম্বা।"

"তোমার মা বাপ আছেন?"

"না।"

"তোমার আর কেউ নেই?"

"কেউ নেই।"—নাসিকোর মন কেমন গলিয়া গেল।

"সৈন্যদলে কিরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য কর্‌তে হয়, তাহা তুমি জান?"

"হাঁ, শুনেছি।"

"তবে তুমি একেবারে তৈরী হয়ে এসেছ?"

"হাঁ।"

"আজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আজ তোমাকে ভর্ত্তি করা যায় না। তোমাকে ভর্ত্তি করতে হ'লে আমার উপরিওয়ালা কর্ম্মচারীর অনুমতি চাই। কাল সকালে তুমি এসো।"

"আচ্ছা।"

"তুমি তা হ'লে আজ কোথায় থাক্‌বে?"

"তা যা হয় ক'রে নেব।"

"হোটেলে যাও না কেন? তোমার সঙ্গে পয়সা আছে?"

"না।"

সেনাপতি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই টাকা নিয়ে আজ রাত্রে—"

ওয়াম্বা সম্মানের সঙ্গে সেনাপতিকে সেলাম করিয়া কহিল,—"আমার টাকার দরকার হবে না।"

নাসিকো একটু বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, কি রকম!

পরদিন ভোরের বেলায়—সবুজ মাঠ যখন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, ওয়াম্বা আসিল, তাহার মুখে প্রভাত-অরুণশ্রী। নাসিকো তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—তোমার ভবিষ্যৎ যেন এমনি উজ্জ্বল হয়।"—ওয়াম্বা শুধু একটু হাসিল।

সেনাপতি কহিলেন,—"আমার উপরিওয়ালার নাম সেমুর। এই কাগজখানায় আমি তোমার সম্বন্ধে সেমুরের কাছে লিখে দিলাম।"

"কখন্ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?"

"এখনই তুমি তাঁর কাছে যাও।"

ওয়াম্বা তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল।

সেনাপতি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"আর শোন, দেখো, সেমুরের সাম্‌নে খুব বিবেচনা ক'রে কথা বোল। তিনি বড় রাগী মানুষ। আর দাঁড়াও, রোস"—সেনাপতি তাড়াতাড়ি আর একখানি কাগজে কি লিখিলেন। তারপর চিঠি বন্ধ করিয়া মোম লাগাইয়া তাহার উপর নিজের অঙ্গুরীয়ের ছাপ দিয়া দিলেন। চিঠির উপরে লিখিলেন, 'হানাসি।'

সেনাপতি বলিলেন,—"এই চিঠিখানি চাকরের হাতে দিয়ে ব'ল যে, এ সেনাপতির চিঠি, তা হলেই সে বুঝ্‌বে।"

ওয়াম্বা সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

আশা ও নিরাশায় দোল খাইতে খাইতে ওয়াম্বা সেমুরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সেমুর বাড়ী আছেন?—আমি সেনাপতি নাসিকোর কাছ থেকে এসেছি।"

"তিনি তো নেই—তবে এখনই ফিরে আস্‌বেন। আপনি উপরে চলুন; বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বস্‌বেন।"

প্রহরী উপরের বৈঠকখানায় ওয়াম্বাকে লইয়া গেল। একটি সুন্দর কক্ষ; সেখানে আসবাবের আতিশয্য নাই অথচ সুন্দর সাজান—খানকয়েক ছবি;—প্রকৃতির জীবনের সাড়া যেন প্রতি চিত্রেই ফুটিয়া রহিয়াছে। একখানি চিত্রে অঙ্কিত—সমুদ্রে ঝড় আসিতেছে, আসন্ন ঝটিকা মাথায় করিয়া নীলাঞ্জন পিঙ্গলবরণ মেঘ সব ছাইয়াছে। গৃহকোণে একটি স্বচ্ছ কাচের জলাধার পাত্রে সদ্যফোটা পদ্ম দুলিতেছে। ওয়াম্বা একবার করিয়া সেই তুষার শুভ্র পদ্মের পানে, আর একবার সেই ঘোর ঝোড়ো মেঘের ছবির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল।—প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণ সেই ফুলের উপর পড়িয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে হানাসি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। ওয়াম্বা ফিরিয়া দেখিল, এক সুন্দরী তরুণী, হাজার পদ্ম নিঙড়িয়া কে যেন সেই রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। হানাসিও ওয়াম্বার মুখের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, ওয়াম্বাও একবার তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল। হানাসিও বিস্মিত! তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের চাহনিতে কি যেন দেখিল।

ওয়াম্বা কহিল,—"মার্জ্জনা করুন, আপনার নাম কি হানাসি?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"সেনাপতি আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।"

হানাসির মুখ আবার রাঙা হইয়া উঠিল। সে ওয়াম্বার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

"প্রিয়তমে!

আজ কয়দিন তোমার চিঠি পাইনি কেন? তোমার একখানি চিঠি যে আমার কাছে কত, তা কি জান না। আজ এই যে যুবককে তোমার কাছে পাঠালাম, এর নাম ওয়াম্বা। আমি এর কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি ও বিশ্বাসী ব'লে মনে করি। আমি এই সঙ্গে তোমার পিতাকেও একখানি চিঠি লিখ্‌লাম, তুমিও চেষ্টা ক'রো যাতে তোমার পিতা ওয়াম্বাকে আমার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'তে সম্মতি দান করেন, ব'লো, আমায় ভুল না।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া হানাসি পত্রখানা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ওয়াম্বা?"

"হাঁ।"

"আপনি সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'তে চান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; যদি আপনার পিতার অনুমতি পাই।"

"আপনি আমার পিতার অনুমতি নিশ্চয়ই পাবেন, আমি সে জন্যে নিশ্চয়ই বল্‌ব।"

"ধন্যবাদ।"

"আপনাকে কি চা দেব?"

"না—ওই—"

"পিতার আস্‌তে বোধ হয় দেরী হবে।"

ঠিক এই সময়ে নাসিকো সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি ওয়াম্বাকে সেমুরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে কতকগুলি জরুরী কাগজ লইয়া সেমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

তিনি একবার সন্দিগ্ধচিত্তে হানাসির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! হানাসি একটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঠিক বন্ধুর মত আলাপ করিতেছে, ইহা তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিল না। পরমুহূর্ত্তেই ওয়াম্বার দিকে তাকাইবামাত্র ওয়াম্বা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। তিনি তাহার দিকে না তাকাইয়া হানাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেনাপতি কোথায়?"

"তিনি এখন বাড়ীতে নাই; একটু পরে এলে তাঁর দেখা পাবে।"

নাসিকো একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি তবে যাই।"

হানাসি তাঁহার কণ্ঠস্বরের সে বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। সে কহিল,—"হ্যাঁ, আধঘণ্টা পরেই কিন্তু এসো।"

নাসিকো আর একবার উগ্রদৃষ্টিতে ওয়াম্বার দিকে তাকাইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিন্তু, আবার ফিরিয়া আসিয়া দ্বারের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন।

ওয়াম্বা নাসিকোর উগ্রদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তাহার অর্থও অনেকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। একাকী বসিয়া এখন হানাসির সঙ্গে গল্প করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে বলিল,—"আমিও তা হ'লে একটু পরে আস্‌ছি।"

"কেন, বসুন না? আপনার তো বাইরে কোন কাজ নেই। বাবা এই এলেন ব'লে।"

এই সময়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নাসিকো সকল কথা শুনিলেন; ঈর্ষ্যায় তাঁহার বুকের রক্ত নৃত্য করিতেছিল, তাঁহার বক্ষের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিতেছিল। তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমার বাবা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমিও এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি।"

হানাসি হাস্যোৎফুল্ল হইয়া কহিল,—"বেশ তো।"

হানাসির চেষ্টায় ওয়াম্বা নাসিকোর সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইল।

ওয়াম্বার খ্যাতি শীঘ্রই বিস্তৃত হইতে লাগিল; এমন কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ও সাহসী সৈনিক শতকরা একটি দেখা যায়। শীঘ্রই সে হাবিলদারের পদে উন্নীত হইল।

যে দিন হানাসি ওয়াম্বার হাবিলদারী পদে উন্নতির সংবাদ পাইল, সে দিন নাসিকোর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বলিতেছিল,—"আমি প্রথমেই ওয়াম্বাকে দেখে মনে করেছিলাম, শীঘ্রই সে উন্নতি লাভ করবে।"

নাসিকো তাহার কথায় একটু ঝাঁজ মিশাইয়া কহিলেন,—"তোমার এ রকম মনে হবার কারণ?"

"ওর চেহারাটি এমন সুন্দর, এমন বলিষ্ঠ, এমন বিশ্বাসের—"

"যে সহজেই এর প্রতি একটা টান হয়—না?"

"হাঁ।"

"মেয়ে মানুষের পক্ষে এ সমস্ত আকর্ষণ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।"

হানাসি বিরক্ত হইয়া নাসিকোর দিকে তাকাইল। নাসিকো হাসিয়া বলিলেন,—"উপহাসও কি সহ্য হয় না?"

"ঐ সমস্ত নিয়ে উপহাস করা আমি ভাল মনে করিনে।"

সমস্ত দিন হানাসির কথা লইয়া নাসিকো মনে ওলট-পালট করিতে লাগিলেন। হানাসি যদি নির্দ্দোষ হয়, তবে ওয়াম্বা সম্বন্ধে সে সামান্য একটু উপহাসও সহ্য করিতে পারে না কেন? একবার মনে করিলেন,—যাক্, সমস্ত কথা ভুলে যাই। শীঘ্রই যখন আমাদের বিয়ে হবে, তখন আর এত ভাব্‌ছি কেন?

সহসা সেই দিন নাসিকো ওয়াম্বাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ওয়াম্বা আসিলে তাহাকে বলিলেন,—ওয়াম্বা! তোমাকে ঐ চাক্‌রী দিয়েছে কে?"

"আপনি।"

"সে কথা যেন ভুলে যেয়ো না।"

"আমি সে কথা ভুল্‌ব! আমার কি কোন অকৃতজ্ঞতা দেখেছেন?"

"না, তাই বল্‌ছি, কখনো অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"

সেই রাত্রে ওয়াম্বার নিদ্রা হয় নাই। সে নাসিকোর এই কথাগুলি লইয়া ভাবিতেছিল।

বসন্তকাল, প্রকৃতি যেন শ্যামলশ্রী ও মধুর রাগে নূতন হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে সমুদ্র নীলাব্জ-নীলিম—প্রশান্ত মহাসাগর।

ওয়াম্বা একাকী সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছিল। শূন্য হৃদয় যেন কাহার জন্য ভিতরে কাঁদিয়া মরিতেছে, ওয়াম্বা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

অকস্মাৎ হানাসির সেই মুখশতদল লীলাকমলের মত তাহার হৃদয়-সরোবরে বিকসিত হইয়া উঠিল।

সমুদ্রের অনতিদূরেই সেনাপতি সেমুরের দ্বিতল প্রাসাদ। গৃহ হইতে সন্ধ্যা প্রদীপের আলো সার্সি দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিল। বাগান হইতে হেনার গন্ধ মৃদু হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুখের আবেশ ঢালিয়া দিতেছিল।

ওয়াম্বা সমুদ্রের পানে চাহিয়া দেখিল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফেন-মুখ, দূর-দিগন্তে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। এমন সময়ে তাহার সম্মুখে শ্বেতাশ্ববাহিত একখানি সুন্দর জুড়ী গাড়ী আসিয়া থামিল। ওয়াম্বা কৌতূহলের সঙ্গে গাড়ীখানি লক্ষ্য করিতেছিল, এমন সময়ে হানাসি গাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, "এ কি! ওয়াম্বা, আপনি এখানে?"

"হাঁ, সমুদ্র দেখ্‌ছিলাম। কি সুন্দর!"

তখন একটি একটি করিয়া তারা সমুদ্রের স্বচ্ছ জলে প্রদীপের মত ফুটিতেছিল। চারিকোণ কাচের লণ্ঠনের মধ্যে যেমন একটি প্রদীপের শিখাকে সাত আটটি প্রদীপের শিখা বলিয়া বোধ হয়, প্রত্যেকটি তারা তরঙ্গের মৃদু হিল্লোলে তাহাই বোধ হইতেছিল।

হানাসি কহিল,—"সত্যি ওয়াম্বা, আমাদের দেশ কি সুন্দর! এ যেন পরীর রাজ্য; এখানে কেবল ফুল ও পাতার খেলা, শ্যামল তরুর ঝিলিমিলি। আমাদের কবিরা বলেন যে, আগে এই সমুদ্রের ঢেউয়ে পরীরা মাথার খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে অমল-ধবল চাঁদের আলোর মত ধবধবে কাপড় প'রে নাইতে আস্‌তেন। ওই দূরে ফুজিয়ামা—কি সুন্দর—সত্যি কি সুন্দর!"

ওয়াম্বা শুধু সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

"চলুন, আজ একবার চিত্রশালায় যাই; সেখানে ওসামাসুর একখানি নূতন চিত্র আনা হয়েছে।"

ওয়াম্বা জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের চিত্র?"

"জাপানের রাণী, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন। ছবিখানার নাম--'আশীর্ব্বাদ।' এই ছবিই নাকি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।"

"তবে তো ছবিখানা দেখ্‌বার জিনিষ।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই; বিশেষতঃ যখন ছবিখানি ওসামাসুর আঁকা, তখন ইহা নিশ্চয়ই দেখ্‌বার জিনিষ হয়েছে। তবে আসুন।"

ওয়াম্বা ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরেই সমুদ্রের ধার দিয়া গাড়ীখানি একটি প্রকাণ্ড ফটকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হয়কিরির এই চিত্রশালা বড়ই সুন্দর। সম্মুখ ও পার্শ্বে লতা-পাতার বুনানী, জালের মতো বোনান ছোট ছোট ফুল-গাছ, পাতায় পাতার আলোর ঝিলিমিলি এবং আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ।

সুবৃহৎ চিত্রশালার মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, বিস্তর লোক ওসামাসুর 'আশীর্ব্বাদ' ছবিখানি দেখিতে আসিয়াছে। তাহারা ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল।

ওসামাসুর ছবিখানি দেখিতে দেখিতে হানাসি বলিয়া উঠিল,—"চিত্রকর ঠিক জাপানের আসল মূর্ত্তিটি এঁকেছেন। কি সুন্দর ভাব ও কল্পনার সমাবেশ। আর ঐ মৃতদেহগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রয়েছে—"

হানাসি পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর একটি হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখিল—নাসিকো।

নাসিকোর চোখ দুটি বাঘের মত জ্বলিতেছিল। হানাসি ও ওয়াম্বা পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইতেই তাহার চোখের পাতা নামিয়া আসিল, দুটি চোখের পাতা নরম হইয়া আসিল।

হানাসি কহিল,—"বা, তুমিও যে এসেছ দেখ্‌চি; তুমি তো নাকি কোনদিন ছবি দেখ্‌তে ভালবাস্‌তে না। ওসামাসুর ছবিখানি দেখে নিশ্চয়ই তোমার মত বোদ্‌লেছে।"

নাসিকো তাহার কথার মধ্যে বিষ মিশাইয়া কহিলেন,—"চিত্র আলোচনা কর্‌বার আমার সময় নাই; ওয়াম্বা আমার চেয়ে চিত্র অনেক ভাল বুঝেন। তাঁর কাছে তুমি ঐ বিষয়ে আলোচনা কর্‌তে পার; আমি আস্‌চি।"

নাসিকো একটু কঠিন হাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। মৌমাছির হুল যেমন থাকিয়া থাকিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটিতে থাকে, ভিতরে ভিতরে আগুনের মত জ্বলে। এই কথার প্রচ্ছন্ন আঘাতও ওয়াম্বাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু হানাসির সদাপ্রফুল্ল হৃদয়ে সে কথা কোন প্রকার আঘাতই করিতে পারিল না।

ইহার কিছু দিন পরে একদিন হানাসি ও নাসিকো সেনাপতির বৈঠকখানাতে বসিয়া গল্প করিতেছিল। হানাসি বলিল,—"আমরা একখানা বজরা কিনেছি।"

"কৈ, সে কথা তো আমাকে জানাও নি।"

"কেন? তুমি জান না? ওয়াম্বাও তো জানে।"

"ওয়াম্বা যা জান্‌তে পারে, তা সব সময়ে আমার জান্‌বার বোধ হয় অধিকার নেই।"

"সত্যই ওয়াম্বা বেশ মানুষ; কেমন? নয়? তার কথা বল্‌বার এমন ধারা, এমন মিষ্ট ব্যবহার যে, সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই পরকে আপন ক'রে নিতে পারে।"

"এ পর্য্যন্ত তার এমন কোন গুণ দেখি নি।"

"দেখ নি? তুমিই তো প্রথমে আমাকে তার চাক্‌রীর জন্যে অনুরোধ করেছিলে। তাকে দেখ্‌লে আমার আগেকার জাপান দেশের সর্দ্দারদের কথা মনে পড়ে।"

নাসিকো কোন কথা বলিলেন না। হানাসি কহিল—"কাল রবিবার আমরা বজরায় ক'রে বেড়াতে যাব। ওয়াম্বাকে আমি আগেই ব'লে রেখেছি। সে স্বীকৃত হয়েছে। সে খুব ভাল দাঁড় টান্‌তে পারে।"

"এ সমস্তই দেখ্‌ছি আগেই তুমি ওয়াম্বাকে নিয়ে পরামর্শ ক'রে স্থির করে রেখেছ।"

"হাঁ, সবই ঠিক; তুমি যাবে না?"

"আমার মতের চেয়ে ওয়াম্বার মতের মূল্য ঢের বেশী।"

"তবে তুমি যাবে কি না বল?"

"তোমার ইচ্ছে কি?"

"তুমি গেলে তো খুব ভালই হয়; কিন্তু, তোমার এত কাজ হাতে থাকে যে, অনুরোধ কর্‌তে সাহস হয় না।"

"ওয়াম্বার হাতে যে কাজ থাকে না, তা তোমাকে কে বল্‌লে?"

হানাসি উত্তেজিত হইয়া করিল,—"তোমার কথার অর্থ কি, আমি বুঝ্‌তে পারছিনে। তুমি বারবার ওয়াম্বার কথা তুলে আমাকে খেপাচ্ছ কেন?"

নাসিকো হানাসিকে স্তম্ভিত করিয়া কহিল,—"বটে? এত দূর? তুমি সেনাপতির কন্যা, আমাকে অপমান কর্‌তে পার। আজ আমি অপমানিত হয়ে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করলুম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

হানাসি ক্ষোভে, দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। চেয়ার ছাড়িয়া নাসিকোর পথ আটকাইয়া বলিল,—"যেতে দেব না। আগে আমার অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে যাও।"

নাসিকো কিছু বলিলেন না, মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার চেয়ারে গিয়া বসিল।

হানাসির নির্ম্মল হৃদয় সহজেই এই রাগারাগির কথা ভুলিয়া গেল; কিন্তু, হানাসির এই ব্যবহার নাসিকো কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

সপ্তাহ পরে বজরায় যাইবার দিন-স্থির হইল। ওয়াম্বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই হানাসিদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। নাসিকো লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমি বজরায় যাব না।"

হানাসি অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল,—"ওয়াম্বা, তাঁর না আস্‌বার কারণ কিছু নির্ণয় কর্‌তে পার?"

"আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"তাঁর হাতে কি কোন কাজ আছে জান?"

"যত দূর জানি, তাতে তার হাতে কোন আছে ব'লে বোধ হয় না।"

একটা ক্ষীণ সংশয় থাকিয়া থাকিয়া হানাসিকে পীড়া দিতে লাগিল। সে দিন ওয়াম্বাকে লইয়া হানাসির সঙ্গে নাসিকোর ঝগড়া হইয়াছে। বোধ হয়, নাসিকো ওয়াম্বাকে ঘৃণা করেন। বোধ হয়, তিনি সন্দেহ করেন যে, হানাসির সঙ্গে ওয়াম্বার বন্ধুত্ব খাঁটী নাও হইতে পারে। হানাসি আভ্যন্তরিক লজ্জা গোপন করিতে পারিল না। ওয়াম্বার দিকে তাকাইতে ও কথা বলিতে তাহার বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হানাসি বলিল,—"চল, তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়েই আমরা বজরা নিয়ে যাব। তাঁকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। আমাদের অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই ঠেলতে পার্‌বেন না।"

বজরা সেনাপতির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাসিকো নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতেছিলেন। হানাসি নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল,—"চল।"

কিন্তু কাহারও অনুরোধে নাসিকো বিচলিত হইলেন না। হানাসি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, —"ওয়াম্বা! আমাদের বজরায় আজ বেড়াবার আবশ্যক নেই।" মাঝিদের আদেশ করিল, —"বজরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

হানাসির সংশয় দৃঢ়তর হইতেছিল। কিন্তু সে তেজস্বী মেয়ে। সে বোধহয় তাহার পিতার সৈনিকের ধাত অনেকটা পাইয়াছিল। ওয়াম্বাকে সে বলিল,—"ওয়াম্বা, চল আমরা গোলাপ বাগানে বেড়িয়ে আসি। আজকের বিকাল-বেলাটা বেশ কেটে যাবে।"—সে বেশ জানিত যে, ইহাতে সেনাপতির রাগ তপ্ত তেলের মত জ্বলিয়া উঠিবে।

উভয়ে গোলাপ বাগানের দিকে চলিল! তাহারা অদৃশ্য হইলে সেনাপতি দন্তে দন্ত দংশন করিয়া চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাতের চুরুটটা মাটীতে ফেলিয়া বার বার জুতা দিয়া তাহা মেজের উপর ঘষিতে লাগিলেন। ঘরের দেওয়ালে হানাসির একখানি ফটোগ্রাফ ছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

হানাসি ও ওয়াম্বা একত্রে পথ চলিতেছিল বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই একটা ক্ষুদ্র সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের দুই জনের মাঝখানটা জুড়িয়া রহিল। কতকক্ষণ নিঃশব্দে চলিবার পর হানাসি আপনাকে এই স্তব্ধতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বলিয়া উঠিল,—'সেনাপতির মত এমন সাংঘাতিক মানুয আমি আর দেখিনি।'

ওয়াম্বা কিছুই বলিল না।

আবার কতকক্ষণ নিঃশব্দে যাইবার পর হানাসি কহিল,—"আজ আর বাগানে যেতে পাচ্ছি না; আমার শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হচ্ছে।"

ওয়াম্বা কহিল,—"তবে তোমার বাড়ী যাওয়াই ভাল।"

তখন উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ওয়াম্বা তিলে তিলে হানাসির রূপে আকৃষ্ট হইতেছিল। সে স্থির জানিত যে, হানাসির সহিত নাসিকোর বিবাহ হইবে। আরও জানিত যে, হানাসি তাহার সহিত যতই বন্ধু-ব্যবহার করুক না কেন, সেনাপতির সঙ্গে তাহার হৃদয়ে যেরূপ সম্বন্ধ, ওয়াম্বার সঙ্গে হানাসির সেরূপ সম্বন্ধ নয়। তথাপি লুব্ধ ভ্রমর যেমন কাঁটার খোঁচা খাইয়াও মানস-সরোবরের পদ্মের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, সেও সেইরূপ হানাসির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল।

একদিন ওয়াম্বা হানাসিদের বাড়ীর অদূরে একটি গ্যাসপোষ্টে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তার মাঝখান দিয়া গাড়ী-ঘোড়া চলিতেছিল, তাহার সেই দিকে যে লক্ষ্য ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। এমন সময়ে সে তাহার স্কন্ধের উপর একখানি শক্ত ও কর্কশ হাতের স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল,—স্বয়ং সেনাপতি।

"নাসিকো কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার সঙ্গে এস।"

ওয়াম্বা আর কখনও নাসিকোকে এত গম্ভীর দেখে নাই। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

কিছু দূর নিঃশব্দে চলিয়া নাসিকো ওয়াম্বাকে একটা খোলা মাঠের কাছে নিয়া আসিলেন। তাহার পরে একটা জায়গায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া কতকগুলি ঘাসের চাপড়া তুলিয়া ফেলিলেন; ওয়াম্বাকে বলিলেন,—"তাকিয়ে দেখ।"

ওয়াম্বা দেখিল, একটা কবর! সে বলিল,—"এতে কি হবে?"

সয়তানের মত পৈশাচিক উল্লাসে নাসিকো হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখে যে আগুনের হল্কা খেলা করিতেছিল, বলিলেন,—"বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, এখানে তোমার কবর তৈরী হয়েছে।"

ওয়াম্বা একটু হাসিল।

"ওখানে দাঁড়াও।"

ওয়াম্বা নীরবে আদেশ প্রতিপালন করিল।

নাসিকো বন্দুক তুলিয়া ধরিলেন।

ওয়াম্বা মৃত্যুকে এইরূপ আকস্মিক দেখিয়া প্রথমে একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পরে সে সৈনিক পুরুষের মতই নির্ভীকভাবে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নাসিকো সেই অচল অটল দৃশ্য দেখিয়া বন্দুক তুলিতে পারিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বহু ব্যক্তিকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর সম্মুখে এইরূপ নির্ভীক উদাসীন বীরের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সমস্ত শরীরকে একটা ঝাঁকী

দিয়া তিনি সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া ওয়াম্বার লালট লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিলেন। হাত তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল। হাত হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

তিনি বন্দুক কুড়াইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিলেন। ওয়াম্বা নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

ইহার পর হইতে নাসিকো ওয়াম্বার নিকটে একেবারে ছোট হইয়া গেলেন। ক্ষণিক উত্তেজনায় তিনি যে কাজ করিতে যাইতেছিলেন, সেই কথা স্মরণ হইলে এখনও তিনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন। ওয়াম্বাকে তিনি এখন কোন কাজের জন্য আদেশ করেন না। উভয়ের দেখা হইলে মনে হয় যেন, ওয়াম্বাই প্রভু, নাসিকো তাহার অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন।

ইতিমধ্যে হানাসির পিতা অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ওয়াম্বার সেবায়, নৈপুণ্যে হানাসি ও তাহার পিতা উভয়েই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু, নাসিকোর বুকের ভিতর একটা প্রজ্বলিত হিংসা তাঁহার মনকে দগ্ধ করিতে লাগিল। বালক যেমন একখানা কাগজ হাতে পাইলে তাহাকে ডলিয়া মুচড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দেয়, নাসিকোর অন্তঃকরণটাকেও ধরিয়া কেহ সেইরূপ মোচড় দিতেছিল। ওয়াম্বা এমন সেবা করিতে পারে বলিয়াই তো সে আজ হানাসির প্রশংসা লাভ করিতেছে।

সেমুর সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার স্থান-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। স্থির হইল হানাসি, ওয়াম্বা ও নাসিকোও সঙ্গে যাইবেন।

জাহাজ দক্ষিণদিক্ ধরিয়া চলিল।

আজ রাত্রিতে ওয়াম্বা একাকী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। চারিদিকের জল নিস্তব্ধ, বিন্দুমাত্রও ঢেউ নাই। জাহাজের চোঙ হইতে আগুনের রাঙা শিখার ছায়া জলে পড়িয়াছে। কেবল ইঞ্জিন এবং কয়লা ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুরই শব্দ নাই।

উপরে আকাশে কে যেন একখানি ধোঁয়ার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। জলের নীচে তারাগুলি সোনার আংটীর মত ঝক্ঝক্ করিতেছে। জাহাজের চাকাগুলি চারিদিকের প্রচুর জল আন্দোলিত করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখের সার্চ্চলাইট বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছে।

সহসা জাহাজে একটা প্রবল ধাক্কা লাগিল। নীচে পাহাড়ে লাগিয়া জাহাজের তল ফাটিয়া গিয়াছে। খালাসীরা নগ্নপদে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। আরোহীরা সকলেই চোখ কচলাইতে কচলাইতে ডেকের উপর ছুটিয়া আসিয়াছে। এখনো তাহাদের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সকলেরই মুখ বিবর্ণ; অস্থির হইয়া তাহারা কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের ভাবী শুভাশুভ যেন কাপ্তেনের মুখের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু কাপ্তেনের মুখে এমন কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না—যাহাতে তাহারা আশান্বিত বা ভীত হইতে পারে। কাপ্তেন সমস্ত খালাসীদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেনের আদেশ প্রচারিত হইল—"লাইফ-বোট নামাও!"

সমস্ত লোকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান হইল। প্রথমে স্ত্রীলোক এবং পরে বৃদ্ধেরা স্থান পাইল। অবশেষে সৈনিক এবং সেনানায়কেরা; তৎপরে যে কয়েকজন বোটে ধরিল। আহার্য্য এবং পানীয় উত্তমরূপে সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল।

বহুলোক জাহাজের এবং মাস্তুলের উপর ঝুলিতে লাগিল—শেষ আশা এখনও তাহারা পরিত্যাগ করে নাই; মৃত্যুর শোণিতসিক্ত লেলিহান জিহ্বা তাহাদের চক্ষের উপর নাগিনীর মত নৃত্য করিতেছিল। কেহ ভগ্ন কাষ্ঠ, কেহ জাহাজের হাল, কেহ জাহাজের বয়া, যে যাহা পাইতেছে, তাহাই লইয়া ভাসিতেছে। এত শীঘ্র মৃত্যু হইবে, এ কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? এখনও কে বলিতেছে, আশা আছে, আশা আছে। শুধু থাকিয়া থাকিয়া কতক্ষণ পরে

বক্ষ নৃত্য করিয়া উঠিতেছে—নাই নাই, আশা নাই। তখনই তাহারা ভয়ে শিকল, ভগ্ন কাষ্ঠ বা মাস্তুল ছাড়িয়া দিতেছে, মৃত্যু তাও ভাল, মৃত্যুর বিভীষিকা আরও ভয়ঙ্কর।

সেই ভীষণ দিনের পরে আরও এক পক্ষ কাল চলিয়া গিয়াছে। অকূল সমুদ্রে জল থৈ থৈ করিতেছে। সেই নৌকা ক্ষীণ আশা ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যদি চড়া পাওয়া যায়, যদি জাহাজের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় বা তট, কোথায় বা জাহাজ, কেবল জল, কেবল জল, জলে জলময়।

এদিকে আহার্য্য পানীয় ক্রমশই নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে একদিন কাপ্তেন বলিলেন,—"এরূপ ভাবে চল্‌লে সকলেই মারা যাব! এস, লটারীতে যার নাম উঠ্‌বে, তাকেই এই নৌকা ত্যাগ কর্‌তে হবে।" সকলেই এই ভীষণ আদেশ শুনিল; কিন্তু কাপ্তেনের আদেশ অমান্য করে কাহার ক্ষমতা।

লটারী খেলা হইল; খেলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোকের প্রাণ বুদ্বুদের মত অনন্ত সলিলে মিশাইয়া গেল।

কি ভয়ঙ্কর! পরদিন আর একটী; তার পরদিন অপর একজন। চোখের সম্মুখে যাহারা এই নিশ্চয় মৃত্যু দেখিতেছিল, তাহাদের বুকের রক্ত আরব্যোপন্যাসের রাজপুত্রের মত হিম হইয়া যাইতেছিল।

আজ নাসিকোর পালা। নাসিকো বীরপুরুষ; মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না। অনেকবার তিনি গুলির কাছে বুক পাতিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, এ যে স্থির হয়ে মৃত্যু। উৎসাহ নাই, উত্তাপ নাই, ঐ মৃত্যু-যন্ত্রণা যে অসহ্য।

এই যে ক্ষুদ্র নৌকা, তাহার মধ্যে এক বিঘত পরিমিত স্থান এ'যেন আমাদের আশ্রয়স্থান, আমাদের সুশীতল কুলায়; আর ওই যে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র, দিক্ নাই, পাশ নাই, এ আমাদের কেউ নয়; এ আমাদের বিমাতা '-সে তার গুপ্ত কক্ষে আমাদের চিরকালের জন্য চাবী দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

নাসিকো একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন। শরতের আকাশে একবিন্দুও মেঘ নাই; এরবার সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—যদি একখণ্ড মৃত্তিকাও দেখা যায়। একবার হানাসির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। হানাসি কহিল,—"ভয় নাই, আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।"

নাসিকোর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল;—'তবে আর আমি মৃত্যুকে ভয় করি নি।'

অদূরে ওয়াম্বা সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল—এই আমার জীবন দেবার সুবর্ণ-সুযোগ। আমি হানাসির কেহই নই। তবে নাসিকোই সুখী হউন। হানাসি তো একবারও আমার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই! আজ আমাকেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে।

'সেনাপতি।'

নাসিকো ফিরিয়া দেখিলেন, ওয়াম্বা।

"ওয়াম্বা! মৃত্যুর সময়ে আমার কাছে তোমার কি অনুরোধ আছে? ওঃ! বুঝেছি। সব কথা ভুলে যাও তুমি ওয়াম্বা! আজ আমি ভগবানের কাছেই সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছি।"

"তা আমি অনেক দিনেই ভুলে গিয়েছি সেনাপতি! একদিন যে যুবককে আপনি অনুগ্রহ ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই যুবকের আজ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।"

নাসিকো আশ্চর্য্য হইলেন, হানাসি চমকিয়া উঠিল, নৌকায় সমস্ত লোক দেখিল, ওয়াম্বা সমুদ্রের জলে একখণ্ড বিদ্যুতের মত ঝলক তুলিয়া ডুবিয়া গেল।

নাসিকো ও হানাসি একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন এবং নৌকা পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল।

মাঘ, ১৩২৩

বিমাতা

অপর্ণা দেবী

জানি না, কোন্ পাপে তাঁহাকে হারাইলাম। না হইলে তিনি তো ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তবে আবার চলিয়া গেলেন কেন? হায়! মা হারাইয়াও মা তো পাইয়াছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কৈ!

সে অনেক দিনের কথা! আজিও যখন তাহা মনে পড়ে, গা কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে। আমার যখন আট বছর বয়স, আমার ভাই শঙ্কর তখন ছয় বছরের। মা আমাদের দুটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝিলাম না, সকলের কান্না দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শুধু বাড়ীর বুড়ো ঝি আমাদের বুঝাইল যে, আর মা আসিবেন না, আর আমরা দুষ্টামী করিলে বকিবেন না, আমরা কাঁদিলে বুকে করিয়া আদর করিবেন না, আর আমরা মাকে দেখিতে পাইব না। বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, শঙ্করের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ভাবিলাম, কোথায় গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন। আর যে ফিরিবেন না, তা বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু হায়, মা আর ফিরিলেন না।

দিনে অনেক বদল হয়, সবারি যা হয়, আমাদেরও তাহাই হইল। বাবার ভালবাসায়, ঠাকুরমার আদরে ও পিসিমার যত্নে, আমরা যেন সব ভুলিতে লাগিলাম, মার অভাব বড় মনে পড়িত না, কেবল শঙ্কর যখন এক একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—"দিদি! মা কোথায়?" তখন কোন উত্তর দিতে পারিতাম না, কাঁদিয়া ফেলিতাম।

তারপর ঠাকুরমা জোর করিয়া বাবার বিবাহ দিলেন।

সে দিন আমার বেশ মনে আছে। সেই সন্ধ্যাবেলা ঢাক-ঢোল বাজিতেছে, সানাইয়ের সুর আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে, সন্ধ্যার আলো আর শাঁকের আওয়াজের সঙ্গে আমার নূতন মা আমাদের ঘরে আসিলেন। এমন শান্ত চেহারা—দেখিলেই যেন তাঁহার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে। আগে কেন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না? বুঝিলে বুঝি বা এত বছর পরেও আমাকে এমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এ স্মৃতি, এ কাহিনীকে বাঁধিয়া রাখিতে হইত না।

কপালে যাহার যা না থাকে, তা তাহাদের সহিবে কেন? নতুন মার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আঁচোল ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইতাম। তিনি আমাদের কত আদর করিতেন, কত গল্প বলিতেন, কত পুতুল দিতেন, কিন্তু আমাদের কপালে তাহা সহিল না। বুড়ো ঝি ও পড়সীরা ঠাকুরমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল, মার কাছে আমাদের যেন যাইতে না দেওয়া হয়।—"বাবা! সৎমা কি কখন আপনার হয়, ও মিট্‌মিটে ডান্, ছেলে খাবার রাক্ষস—ওই প্যারীদিদির বোনপোকে তার সৎমা বিষ দিয়ে মারলে, সেও অমনি কত যত্ন আদর দেখাত।" পাড়ার রাঙা পিসী বলিল, "ও দিদি, তুমি জান না, ওই আমাদের তরীকে ভাতের ভেতর কিসের শেকড় দিয়েছিল"—এই রকম কত দৃষ্টান্তই তাঁরা দেখাইয়া দিলেন—মা আমাদের আদর-যত্ন করিলে হইবে কি তাঁর মন ত বিষে ভরা। শেষে কি জানি যদি বিষ দেয়! ঠাকুরমা এই সব শুনিয়া আমাদের মার কাছে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আমাদের বড় মন কেমন করিত, মার কাছে যাইবার জন্য কান্নাকাটি করিতাম। তখন পিসীমা আমাদের বুঝাইলেন—"পর কি কখন আপনার হয়; ও ত আমাদের মা নয়, এখন নতুন নতুন ব'লে তাই অমন আদর করছে, এর পর কোন্ দিন শেষে কি কাণ্ড করবে তখন"—এমনি করিয়া কত রকম ভয় দেখাইলেন। যখন পিসীমা, ঠাকুরমা, বুড়ো ঝি এই সব ভয় দেখাইত, তখন প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত, সত্যি না মনে করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু তবু কেমন তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত!

এমনি করিয়া আস্তে আস্তে আমরা তাঁর কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। দিনে দিনে আমাদের এমন হইল যে, ভয়ে আমরা তাঁর ত্রিসীমানা মাড়াইতাম না, কি জানি যদি মারে, যদি সত্যিই ঠাকুরমা যা বলে—তা যদি সত্যি হয়—যদি বিষ খাওয়ায়!

হায়! তাঁর সেই ছল্‌ছল্ দৃষ্টি আমি কখনও ভুলিব না। যেন চোরের মত বেড়াইতেন, সর্ব্বদাই যেন কি চুরি করিয়া মহা অপরাধী হইয়াছেন, সদাই যেন ধরা পড়িবার ভয়। আমাদের সঙ্গে লুকাইয়া কথা বলিতে কত চেষ্টা করিতেন, কত আদর করিতেন, দুর্ভাগা আমরা তখন তাহা বুঝি নাই। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসিতেন, অমনি আমরা ঠাকুরমাকে বলিয়া দিতাম। ঠাকুরমা ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেন, 'রাক্ষুসী ডাইনী'—মা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। একদিন শঙ্কর ও আমি সিঁড়ির ধারে খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ শঙ্কর আমাকে দৌড়িয়া ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মা তখন বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, শঙ্কর পড়িয়া যাইতেই, তিনি "ষাট ষাট" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া লইলেন। শঙ্কর তাঁহার কোলে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করের কান্না শুনিয়া ঠাকুরমা দৌড়িয়া আসিয়া মার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন, মাকে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বৌ, না হয় আছই সৎমা, তাই ব'লে কি দুধের ছেলের উপর একটু মায়া হয় না! ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আবার এখন লোক-দেখান সোহাগ করা হচ্চে।—ফের যদি তুমি ওদের সাম্‌নে এস, তবে ভাল হবে না বল্‌ছি!—আহা!—দাদুর আমার কপালটা একেবারে গেছে, ও মা! এমন ডাইনী ঘরে এনেছিলাম গো!"—মা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের ঘরে গেলেন। রাঙা পিসী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, "ও মা! আবার কান্না হচ্ছে—সতীন-পুতের জন্য দরদ তো কত, ওরে আমার দরদী রে, বলে—

'বেয়ানের মার আদরে,
সেজে পাটীতে না ধরে'—

কালে কালে কতই দেখ্‌ব।' রাঙা পিসি মুখ ঘুরাইয়া ঠাকুরমার পিছনে পিছনে চলিলেন।

আর একদিন মার বাপের বাড়ী হইতে মিষ্টি আসিয়াছিল, মা লুকাইয়া আমাদের তাহা দিতে গেলেন। মিষ্টির লোভে আর তাঁর কাছে যাইতে একটুও দেরী করিলাম না। তিনি আমাদের হাতে দুটি সন্দেশ সবে তুলিয়া দিয়েছেন, আমরাও যেমনি তা মুখে দিতে যাইব, অমনি কোথা হইতে বামাদাসী আসিয়া বলিলেন, "বৌ-ঠাকরুণ, বড় যে সন্দেশ দিচ্ছ! আমি এখুনি ঠাকরুণকে ব'লে দিচ্ছি!" আর কোথা যায়, ঠাকুরমা সেই সন্দেশের কথা শুনিয়া, বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাকে বলিলেন, "হুঁ—সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ওরে আমার সন্দেশ দিয়োনি রে!" বামাকে বলিলেন,—"ভাগ্যিস্ বামা তুই দেখ্‌তে পেয়েছিলি, নইলে আজ কি সর্ব্বনাশই হ'ত।" মাকে বলিলেন, "ফের যদি তুমি বউ আবার এই সব কর, তো ভাল হবে না বল্‌ছি।" মা

মুখে কাপড় দিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদেরও কিন্তু সন্দেশ না পাইয়া ঠাকুরমার উপর বড় রাগ হইয়াছিল।

এখন কত কথাই মনে আসিতেছে। তিনি বাড়ীর বউ হইয়াও কেউ না হইয়াই থাকিতেন। কখন কাহার সঙ্গে এ সব লইয়া একটা কথাও কন নাই, মুখ বুজিয়া শুধু কাজ করিয়া যাইতেন। বাবার কাছেও কোন দিন এসব কথা বলেন নাই; চুপ করিয়া থাকিতে আসিয়াছিলেন, চুপ করিয়াই গেলেন।

সময় কাহার জন্য বসিয়া থাকে না, সুখে দুঃখে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটিয়া যায়, আমাদেরও কাটিল। আমি বার বছরে পড়িলাম। আমার বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক কথা-কাটাকাটি ও হাঁটাহাটি গোলমালের পর একজন ডাক্তারের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল।

পাকা দেখার দিন আমার এক সই আসিয়া আমাকে সাজাইয়া দিল, মা একবারও কাছে আসিলেন না। রাঙাপিসী তাহা দেখিয়া, ইচ্ছা করিয়াই মাকে শুনাইয়া একজনকে বলিলেন, "কৈ গো, কনের মা কোথায়? তাঁর যে আজ দেখাই নেই। ও মা, মেয়ের বিয়ে!" আর একজন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ও মা, জান না, সতীন-ঝি চ'লে যাচ্ছে, সেই দুঃখে সে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।' কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। পাকা দেখা হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল।

সেই দিন রাত্রে মা আমাকে ডাকিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। কত ভাল কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন। অমন মিষ্টি কথা আর কার মুখে কখন শুনি নাই। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর কাছে থাকিতে হইল না। কোথা হইতে ঠাকুরমা আসিয়া মাকে খামকা বকিয়া উঠিলেন,—"আর তিনটে দিন তো ও আমাদের কাছে আছে, এইটুকুর জন্যে আর ওকে অমন করা কেন? একরত্তি মেয়ে, তাকে আর ও সব কুমৎলব শেখান কেন? পরের ঘরে গিয়ে বাঁচ্‌বে, তাও প্রাণে সইছে না?" এই কথায় আমি আর সেখানে থাকিলাম না, ঠাকুরমার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।

তারপর যথাসময়ে গায়ে হলুদ হইয়া গেল। সে সময়ও মা আমার কাছে আসিলেন না। কিন্তু দেখলাম যে, তিনি খিড়কির জানালার ভিতর দিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখিতেছেন।

তার পরদিন আমার বিবাহ। সানাইয়ের মিষ্ট আলাপ, কর্ম্মবাড়ীর সোরগোল, ছেলেমেয়েদের কলকল, পাড়ার লোকের হাঁকডাক, সব মিলাইয়া সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সন্ধ্যার পর যখন আমাকে সাজাইয়া তুলিল, লগ্নের তখন অনেক দেরী। রাঙাপিসী, পাড়ার মেয়েরা আর আর সবাই গহনা দেখিবার জন্য আমাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কে কোন্‌টা দিয়াছে, এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা সব দেখাইয়া বলিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ একজন বলিল,—"কনের মা কি দিল গো?" ঠাকুরমা মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন,—"সে আবার কি দেবে?" রাঙাপিসী বলিলেন, "সত্যিই তো, আহা! আজ যদি ওদের মা বেঁচে থাক্‌ত, মা নেই ব'লে তো—বাছারা আমার বেঁচে আছে, এই ঢের, 'যাট যাট' ওরা আমার বেঁচেবর্ত্তে থাকুক, শ্বশুরঘর আলো করুক।" স্ত্রী-আচারের সময় মা আসিলেন, দেখিলাম, কাঁদিয়া তাঁহার চোখ লাল হইয়াছে, তিনি কান্না চাপিতে পারিতেছেন না।

পরদিন সকালে আমি শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, আমাকে দেখিবার জন্য যে যেখানে ছিল সকলেই আসিল। যাইবার সময় মা আসিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন্। রাঙাপিসী বলিয়া উঠিলেন, 'শুভ যাত্রার সময় আর চোখের জল ফেলে অমঙ্গল কর কেন?' মা উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় তিনি আমার হাতে একটি ছোট

টীনের বাক্স দিলেন। ঠাকুরমা বারান্দা হইতে তাহা দেখিলেন! তখনই বামা দাসী দৌড়াইয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, "দিদিমণি, ও পান খেয়ো না, ঠাকুরমা মানা করেছেন।" তার পরই আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম যে, মা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখে জল ধরে না, তবু যেন তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। বাবা ষ্টেসনে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িলে তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে সেই টীনের বাক্স খুলিলাম, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহার ভিতর এক ছড়া মুক্তার মালা। মালা ছড়াটা বাবা মাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। সকলের সামনে না দিয়া কেন যে তিনি চুপি চুপি দিলেন, তা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

তার পর অনেক দিন বাপের বাড়ী যাওয়া হইয়া উঠে নাই। বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেন।

একদিন সকালে উঠিয়া শ্বাশুড়ীর সঙ্গে তরকারী কুটিতেছিলাম। উনি সেখানে আসিলেন, তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলাম। উনি মাকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া কি বলিলেন, আমার বুকটা যেন কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, কার তো কিছু হয়নি। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, বেয়াই তার করেছেন, তোমার ভায়ের বড্ড বাড়াবাড়ি ব্যাম, তোমায় যেতে হবে।"

সে দিন রাত্রেই ওঁর সঙ্গে আসিলাম। শঙ্করকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাকে যেন চেনা যায় না। বিছানার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। বিছানার কাছে বসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম, 'শঙ্কর!' শঙ্কর একবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার তখনি চোখ বুজিল। রাঙাপিসী কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি তো খুব রক্ষা পেয়েছ, এখন ওই রাক্ষুসীর চোখ পড়েছে এর ওপর, কি যে হবে, জানিনে মা—মা কালী করুন, এখন ভাল হয়ে ওঠে, তবে তো।'

রাক্ষসীটি যে কে, তা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। শুনিয়া আমারও যত রাগ পড়িল সেই রাক্ষসীর উপর। মনে হইল, ভাল করিয়া গোটা কতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। মার ঘরের দিকে চলিলাম। যাইবার সময় আঁচলটা পায়ে বাঁধিয়া পড়িয়া গেলাম। ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে নাই,' সকল জায়গায় খুঁজিলাম। বাকি হইল ঠাকুরবাড়ী। বাড়ীর ভিতরে পুকুরের সাম্‌নে নারিকেল গাছ ঘেরা মন্দির। সেইখানে খুঁজিতে চলিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখি, দরজা ভেজান। একবার মনে হইল, রাক্ষুসী আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসে নাই তো? শুনিতে পাইলাম, কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না। রাক্ষুসী নিশ্চয়ই আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসিয়াছে। কথাগুলো একবার ভাল করিয়া শুনিবার জন্য দরজায় কান পাতিয়া দম বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, মা হাঁটু গাড়িয়া গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—"মা, আমার খোকাকে ভাল ক'রে দাও মা, আমি বুক চিরে রক্ত দেব।" আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল! এই কি না রাক্ষুসী! আমার কান্না আসিতে লাগিল। এত দিন পরে যে মাকে চিনিতে পারিলাম বলিয়া কি জানি কার উদ্দেশ্যে মাথা সেই দরজার চৌকাঠে আপনি নুইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া শঙ্করের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রাণের

ভিতর হইতে কে যেন বলিল—"হবে হবে, ভাল হবে" কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—'ভাল ক'রে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব।'

আশ্চর্য্য! তার পর হইতেই শঙ্কর ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। মা তাহাকে দেখিতে একবারও ঘরের মধ্যে আসিতেন না, বাহির হইতে দেখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেন।

ক্রমে শঙ্কর সারিয়া উঠিল। ঠাকুরমা আজ এর পূজা, কাল তার পূজা দিতে লাগিলেন, আমি বুঝলাম যে, এ পূজা সত্যিই কার!

ক্রমে ছ'মাস পরে শঙ্কর একেবারে ভাল হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা সে দিন তাহার আরোগ্য উপলক্ষ্যে কাঙ্গালী খাওয়াইতেছিলেন, আমরা তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ আমার কানে সেই কথা বাজিয়া উঠিল—"ভাল ক'রে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব"—তাই তো! কি করিয়াছি। এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন? ছুটিয়া মন্দিরে গেলাম—গিয়া দেখিলাম, ছিন্ন লতিকার ন্যায় মা আমার সিংহবাহিনীর পদতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা—পার্শ্বের ছোট একটি বাটীতে ভরা রক্ত!

চৈত্র, ১৩২৩

সারেঙ্গী

অবনীকুমার দে

[১]

অসময়ে জয়া তাহার শুক্‌না হাতের পরশ আমার সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইতেছিল; কিন্তু লোকে তখনও আমায় সুন্দরী বলিত। আমিও আর্‌শির ভিতর নিজের রূপ অহরহঃ দেখিতাম। হাঁ, সুন্দরী বৈকি! দেখিতাম, কাল মেঘের মত আঁধার কেশজাল তেমনি ঘোর করিয়া আমার রূপকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া ছাইয়া আছে, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে যেন সমস্ত রস শুকাইয়া লইয়া, শুধু মাদকতার অগ্নি-রেখাটুকু ক্ষীণ জিহ্বার মত লক্‌লক্ করিতেছে, সে মেঘে বরিষার বর্ষণের কোন আভাস নেই। তবু রূপ নিভিবার পূর্ব্বে তৈলহীন দীপের মত থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সুন্দরী তো বটেই। যদি সুন্দরীই না হইব তবে এরূপের কি এত দর হয়?

ছিল—সমস্তই ছিল। এই রূপ—এই ঐশ্বর্য্য—বিলাস-বাসনার লক্ষ বাহু-ফাঁস তখনও এই শ্লথচর্ম্ম শিথিল পেশীর বিজড়িত শিরার বাসনাসিক্ত প্রবাহের মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া ছিল। এত ভোগ করিয়া ও তো নিবৃত্তি হইতেছিল না। তাই এই রূপের বিপণিতে রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা সমস্তই বিক্রয় করিতে বসিয়াছিলাম। আমি ক্রেতা বুঝিয়া দর করিতাম। উচ্চমূল্যে—হাজার হাজার আস্‌রফির বিনিময়ে নিশায় নিশায় আত্মবিক্রয় করিতাম। সে বেচার-কেনার সুখ ছিল না। ছিল জ্বালা—কিন্তু তবু লালসার বহ্নি নিভিত না।

দিল্লী বড় বড় ওমরাহ—বড় বড় রাজা মহারাজা—আমার দ্বারে দ্বারী। বোধ হয়, তাহারা আমার সুকোমল হস্ত হইতে এক পেয়ালা সিরাজীর পরিবর্ত্তে আপনার তৃষাতুর বক্ষের এক পেয়ালা উত্তপ্ত রক্ত মাপিয়া দিতে কোনই কুণ্ঠা তাহাদের ছিল না, দ্বিধাও করিত না। এমন কি, আমার বহ্নিজ্বালা-দীপ্ত বিলোল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ সায়কে বিদ্ধ ও আত্মহারা হইয়া তাহাদের গৌরবান্বিত উষ্ণীষ আমার পদতলে লুটাইয়া দিতে পারিলে পরম কৃতকৃতার্থ মানিত।

কিন্তু এত করিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারি নাই। বাসনার ভরপুর পরিবেশন করিতাম, বুভুক্ষ হৃদয়ে ক্ষুধা মিটিত না। প্রাণের ভিতর প্রত্যহই কি যেন কিসের অভাব গুমরিয়া মরিত। এত বিলাস-সম্ভোগের মধ্যেও যেন সময়ে সময়ে হৃদয়ের কোন অজানা তারের মধ্যে সহসা কে আসিয়া ঝনাৎ করিয়া তারের ভিতর হইতে একটা ঘা দিয়া ঝনন্ করিয়া আপনা আপনিই বাজিয়া উঠত। সে ঝঙ্কার মর্ম্মের প্রত্যেক রাগিণীর সহিত তীব্র মর্ম্মভেদী মূর্চ্ছনায় আলাপ করিতে করিতে আমাকে তন্দ্রাহত ও অবশ করিয়া ফেলিত! গৃহভিত্তি হইতে অন্তর, বাহির, আকাশ ও বাতাস হাহা করিয়া ফাটিয়া যাইত।

[২]

আমার স্বামী মোগল রাজদরবারের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। পুরুষোচিত পৌরুষ ও রূপ এবং কণ্ঠভরা ও মেঘগম্ভীর স্বর ছিল বলিয়া রাজ-দরবারে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এই রূপ এবং সুরই তাঁহার কাল হইয়াছিল! এই সুর আর রূপ উভয়ে মিলিয়া তাঁহার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া-দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার এই অসামান্য রূপ ও সুরের প্রভাবে অনেকেই তাঁহাকে প্রাণমন পর্য্যন্ত সঁপিয়া দিতে পারিত, আবার কেহ

বা নিতে পারিলেও ছাড়িত না! কিন্তু জানি না—কেন—হতভাগিনী আমি—তাঁহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারি নাই। আমি চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাঁহার সেই ভালবাসায় কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতাম না, তৃষা মিটিত না। সহস্রমুখী তৃষা অন্তরে অন্তরে লোলরসনা লক্‌লকি জ্বলিয়া মরিত। স্বামী অহর্নিশি আমার কর্ণে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় গ্রামে-গ্রামে সঙ্গীতে মদিরা ঢালিয়া দিতেন, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রামে যে অভাব অহরহঃ জ্বলিয়া মরিত তাহার তৃষা মিটিত না, তাহাকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিত।

আমরা তখন আগ্রায় থাকিতাম। অদূরে সুনীল গগন-চুম্বী শুভ্র তাজমহলের উন্নতশীর্ষ মিনারগুলি আমাদের বাতায়নপথ দিয়া বেশ পরিষ্কাররূপে দেখা যাইত। বসন্তের শ্যাম সন্ধ্যালোকে চন্দ্রচ্ছায়া-উদ্ভাসিত যমুনার অশ্রান্ত উৎফুল্ল তরঙ্গগুলি যখন আবেগভরে নাচিয়া নাচিয়া নিদ্রিতা তাজ-বিবির পদতল ধৌত করিয়া দিত, আমি তখন ছাদের আলিসায় ঠেসান দিয়া বসিয়া স্বামীর নিকট সারঙ্গ শিক্ষা করিতাম। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই সঙ্গীত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বড়ই নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন। বহির্জ্জগতের কোলাহল তাঁহাকে বড় একটা উত্যক্ত করিতে পারিত না। অশ্রু-টলটল উদাস আঁখি দূর আকাশও জলরেখার পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেন, কখনও আমাকে কিছু বলিতেন না।

দিন গেল সহসা একদিন স্বামী বাড়ী ফিরিলেন না। রাত্রি গেল, প্রভাত হইল, ভাবনায় আকুল হইলাম। সখী গুলসানার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। গুল্ শুনিয়া আসিল, দিল্লীর তক্তের বিরুদ্ধে এক ভীষণ রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সরকার তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার মত মানুষ যে কখনও কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ও জড়িত থাকিতে পারে, এ কথা আমার প্রথম একেবারেই বিশ্বাস হইল না।

রাজাজ্ঞায় স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারের বাজেয়াপ্ত হইল। পিতা আমাকে লইয়া দিল্লী আসিলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজাদেশ প্রত্যাহৃত হইল না।

তারপর বৎসরেক কেহই স্বামীর কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন নাই। একবার লোকমুখে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বন্দী নন; পলাইয়াছেন, পারস্যের শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দিন পরে অকস্মাৎ খবর আসিল, জনরব মিথ্যা—কাশ্মীরের রাজপথে তাঁহার বজ্রাহত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া পিতা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অনাহারে দুশ্চিন্তায়, অপমানে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনিও আমায় কাঁদাইয়া ফেলিয়া পলাইলেন।

আমি তখন একা। আশ্রয়হীন, অর্থহীন, সহায়হীন। সব গেল—কেবল গুল্ যায় নাই। দিন যায়, মাথা রাখিবার আশ্রয়, আর পেটের ক্ষুধার খাদ্য—তাহাও রহিল না। তাহার উপর সরকারের তাড়না। গুল্ আশ্বাস দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতাম,—মনে করিলাম, সঙ্গীত অনুশীলন করিয়া নিজের দিন গুজরাণ করিব। কিন্তু পারিলাম না। লূতার ন্যায় আপনার লালায় জড়িত জালে আপনি জড়াইয়া মরিলাম! ভিতরের, —প্রাণের ভিতরের জ্বালাময়ী সঙ্গীতের সুর আমাকে বাহিরে টানিয়া আনিল!

[৩]

রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া সারেঙ্গী গাইতেছিল—

"চল চল রে ভঁবরা কঁবল পাস।
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত বহ বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার॥"

শুভ্র জ্যোৎস্না। তাহার করুণ-সঙ্গীত দখিণা হাওয়ায় বাতায়নপথে আসিতেছিল। সে দিন বাদ্‌শাহের প্রধান অমাত্য আমার অতিথি। আমি কি তখন জানিতাম যে, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় আমার স্বামী ষড়্‌যন্ত্র অপরাধে অপরাধী স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন—তিনিই আমার স্বামীকে সরাইয়া নিজে তাঁহারি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমি তাঁহারই মুখে সিরাজী তুলিয়া ধরিয়া দিলাম! প্রাণে কি যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ হইতেছিল! রমণীর সমস্ত কঠিনতম রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলা সে দিন উত্তমরূপেই আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। অজ্ঞাতে প্রাণের ভিতরে তীব্র জ্বালাময়ী সাপিনীর গরল ঢালিবার জন্য প্রাণ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে আমিও যেন তার বশীভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অমাত্য আমায় জানিতেন কিনা, তাহা আমি জানিতাম না। আমি দিল্লীতে ছদ্মনামেই পরিচিতা ছিলাম।

সারঙ্গী পুনরায় গাহিল—

"খোজ করত বহ বার বার
তন বন ফুল্যৌ ডার ডার"

অকস্মাৎ কেন যে আমার হস্তস্থিত পানপাত্র কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না! ডাকিলাম,—"গুল্! গুল্!"

আমার পরিচারিকা আসিল। আমি তাহার হাতে একটি 'আঠ্-আন্নী' দিয়া বলিলাম, —"যা, সারেঙীকে দিয়ে আয়।"

সারেঙী তখনও তন্ময় হইয়া বাজাইতেছিল। কি সুরের দোল—কি ঝঞ্ঝনা—রুদ্ধ-যাতনার রুদ্ধ-নিশ্বাস হা হা করিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। একবার মনে হইল—ডাকি। পরক্ষণেই ভাবিলাম, অমাত্য কি মনে করিবেন। আত্মহারা হইয়া তাহার তন্ত্রীর প্রত্যেক মীড়্ শুনিতে লাগিলাম। আমার প্রাণের ভিতরও একটা অব্যক্ত সুর খেলা করিতেছিল! সেও যেন, —বহুদিন ধরিয়া সেই কাহাকে

"খোজ করত বহ বার বার"

কিন্তু তনুবনে এখন আর সে ফুলের সৌরভ তো নাই। আমি অমাত্যের মুখে পানপাত্র তুলিতে ভুলিয়া গেলাম।

তিনি গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"রুমিয়া!"

পরিচারিকা সারেঙীর হস্তে 'আঠ্-আন্নীটি' দিল। সারেঙী খোদাতাল্লার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমি দূর হইতে তখনও তাহার রাগিণী শুনিতে পাইতেছিলাম। নির্নিমেষ-নেত্রে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সুর শূন্যে মিলাইয়া গেল।

গুল্ ফিরিয়া আসিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—গুল্ আমার বাল্য-সঙ্গিনী। স্বামী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু সে আজও আমায় ছাড়িতে পারে নাই। বোধ হয়, এই পাপিষ্ঠার জীবন-ইতিহাসের পূর্ব্বপৃষ্ঠার সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য বিধাতা কেবল এই গুল্‌কে এখনও কালের ঝঞ্ঝায় ঝরিয়া পড়িতে দেন নাই।

[৪]

সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গিয়াছে—সারেঙী আসিল না। কেন জানি না, অহর্নিশি প্রাণের ভিতর কেন সেই রাগিণী আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিত! একদিন সন্ধ্যায় জানালার পাশে একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।—কত কথাই না মনে হইতেছিল! বোধ হয় জীবনের পরিণাম ভাবিতেছিলাম!—সব অন্ধকার!

নাঃ—চিন্তা মোটেই ভাল লাগে না। চিন্তা অসহ্য। চিন্তা করিয়া করিব কি? সারঙ্গ লইয়া

গাহিতে বসিলাম। ভাল লাগিল না। গলাটা কাঁপিয়া উঠিল। কি এক অজানা আকর্ষণ কণ্ঠ চাপিয়া বসিল। সারঙ্ বেসুরা বলিতে লাগিল, গাহিতে পারিলাম না। আমার মনের অলক্ষ্যে কেবল অস্ফুটস্বরে গাহিলাম—

"খোঁজ করত বহ বার বার
তনবন ফুলৌ ডার ডার"

বার বার সেই কলিটা গাহিতেছিলাম। এমন সময় হাসিতে হাসিতে গুল্ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমার মুখে তখনও সেই কলিটা লাগিয়া হইয়াছিল।

গুল্ বলিল—"কই—সে সারেঙী তো আর আসে না?"

আমি বলিলাম,—"না, সে তো অনেক দিন হয়ে গেল। কেন—তার কি হয়েছে বল্ দেখি?"

"ভিখিরী মানুষ, হয় তো বা কোথায়ও গিয়ে থাক্‌বে।" পাঁচ বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হয় তো!"

তার পর আবার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না—নক্ষত্রখচিত বিভাবরী। আমার পাশে অমাত্য বসিয়াছিলেন। একদিকে প্রাণের ক্ষুধা, অন্যদিকে সেই সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রতিহিংসা অহরহ আমায় জ্বালাইয়া পোড়াইতে লাগিল।

সহসা দূরে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া সারেঙী গাহিল ঃ—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক্ তুঝ্‌কো আপনা পায়য়া
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।।"

আমি স্তব্ধ হইয়া গানটি শুনিলাম। তাহার সমগ্র প্রাণের বেদনাপ্লুত মূকভাষা যেন সঙ্গীতের প্রত্যেক রাগ ভঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম—"গুল্! গুল্!"

গুল্ আসিল। আমি সেদিনকার মত আজও তাহার হাতে একটি 'আঠ্-আন্‌নী' দিয়া বলিলাম,—"যা, সারেঙীকে দিয়ে আয়।"

গুল্ চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলাম,—"তা'কে বল্‌বি, সে এতদিন আসে নি কেন? আমি তা'র গান শুন্‌তে বড় ভালবাসি—সে যেন আসে।"

গুল্ চলিয়া গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ পুনরায় তাহার মনোরম সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে শুনিলাম, সারেঙী বলিতেছে,—তুমার দাতা মুনিবকে বলিও, আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই—এবার আসিব।"

এই বলিয়া পুনরায় গান করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া জানালার পার্শ্বে গেলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। 'শুধু দূর হইতে শুনিতে পাইলাম,—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগায়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।"

[৫]

আর এক কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গেল—সে আসিল না। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, আমি কান পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম, তবু সে আসিল না। আমার প্রাণের সমস্ত রুদ্ধ সুর যেন জমাট বাঁধিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল—তবু সে আসিল না!

আমি পীড়িতা হইয়া পড়িলাম। দুর্ব্বল—বেদনাপ্লুত দেহভার লইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। তবু কেবল তাহারই কথা মনে হইত—কই সে তো আসিল না!

এই বিশ্বসংসারে একাকিনী আমি—আমার আপনার বলিতে তো কেহ ছিল না। একাকিনী শুইয়া শুইয়া কত কথাই মনে পড়িত, কিছুই ভাল লাগিত না। কিন্তু কেন জানিনা, সর্ব্বদাই সারেঙ্গীর কথা মনে পড়িত। সন্ধ্যা আগত হইলেই প্রাণটা যেন কেমন সাড়া দিয়া উঠিত! বুঝিতে পারি নাই কেন—কেমন করিয়া—কোথা হইতে এই দরিদ্র ভিখারী উদ্‌ভ্রান্ত গায়ক আমার নিভৃত চিত্তের অন্তরালে গিয়া কিসের যবনিকা সরাইয়া দিতেছিল। অথচ আমি তখন ভাবিতেছিলাম, কেমন করিয়া এ জ্বালা আমার মিটিবে।

দেখিতে দেখিতে আবার শুক্লপক্ষের আবির্ভাব হইল—আবার চন্দ্রোদ্ভাসিত রজনী পৃথিবীর বিশুষ্ক বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। আমি উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে গালিচা পাতিয়া বসিয়া ছিলাম।

গুল্ ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বহিনী! সেই সারেঙী এসেছে।"

আমি শুনিলাম—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

গুল্ সারেঙীর হাতে তাহার যথারীতি প্রাপ্য দিয়া বলিল,—"আবার এসো। মনিবের বড় অসুখ করেছিল,—তিনি সর্ব্বদাই তোমার গান শুন্‌তে চাইতেন।"

"তিনি এখন কেমন আছেন?"

"একটু ভাল।"

"খোদা তাঁকে আরোগ্য করুন। আমি আবার আসিয়া গান শুনাইব।"

আমি অতিকষ্টে জানালার শিক্ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দূর হইতে গৌরবর্ণ অতি দীর্ঘকায় শ্মশ্রু-বিলম্বিত বৃদ্ধ সারেঙীকে দেখিতে পাইলাম। সে তখনও গাহিতেছিল ঃ—

"ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা—"

[৬]

বৈশাখী পূর্ণিমা। দূরে পশ্চিমাকাশে মেঘ দেখা যাইতেছিল। আমি তখন সারিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তবু যেন আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুরন্ত হাওয়া চারিদিকে হা-হুতাশ করিতেছিল। সে দিনও অমাত্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন। আমি মেঘমল্লার গাহিতেছিলাম—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেরা হো।
চন্দ্রসুধাংশু মেরা, রস রঙ্গিলা
অব্ বাদেরা হো।।"

নীলাঞ্জন পিঙ্গলবরণ নভে আরও ঘোর করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অমাত্য স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন সময় গুল্ আসিয়া আমার কানের কাছে কহিল,—"সারেঙী।"

নিমেষে আমার সমগ্র চিন্তা জানালার পথ দিয়া রাজপথের দিকে ধাবিত হইল। আমি শুনিতে লাগিলাম। সারেঙী শুধু বাজাইতেছিল—তাহার কণ্ঠে আজ গান নাই! তাহার যন্ত্র আমার গানের সহিত সুর মিলাইয়া বাজিতেছিল! আমি তখনও গাহিতেছিলাম--

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—
পৃথিবীয়ান্ অব্ বাদেরা হো।।"

সঙ্গীত থামিল, কিন্তু তাহার সারঙ্গ থামিল না! অমাত্য নির্ব্বাক্ হইয়া ঐ দূরাগত তারধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।

আমি উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলিকাবৎ ঐ ধ্বনির অনুসরণ করিলাম। উন্মুক্ত জানালা দিয়া একবার দূরে ঐ রাজপথের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নিম্নে বসিয়া নতমস্তকে বৃদ্ধ তন্ময় হইয়া সারঙ্গ বাজাইতেছে।

আমার পার্শ্বে গুল্ দাঁড়াইয়াছিল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ডাকিয়া আনিব?"

আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম—"হুঁ"। গুল্ দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। সারেঙী তখনও বাজাইতেছিল—

"এ মেঘে, বরিখন্ আওয়ে দে রে পানি—"

গুল্ সারেঙীকে নীচের ঘরে উপবেশন করিতে বলিয়া আমায় আসিয়া সংবাদ দিল।

আমি নীচে গেলাম। আমার পদশব্দ শুমিয়া সে চমকিয়া উঠিল। আমাকে কুর্নিস করিয়া অতি বিনীতস্বরে কহিল—"বিবিসাহেবা! আপনি আমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহা আপনার বিশেষ মেহেরবাণী! আমি আশা করি, আপনি ভাল—"

কি কণ্ঠস্বর। তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহার চক্ষের দিকে চাহিলাম। কি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চক্ষু! সে চাহনি যেন আমার চোখের ভিতর দিয়া আমার প্রাণের শেষ রেখার লেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল।

আবার সারেঙী আমার দিকে চাহিল। সহসা তাহার দৃষ্টি আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে বিস্ফারিত নয়নে আবার আমার প্রতি চাহিল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! সে চাহনি, সে কম্পন দেখিয়া আমি ভীত ও বিস্মিত হইলাম!

এমন সময় অমাত্য আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের চারিচক্ষুতে মিলন হইল। অমনি সারেঙীর চক্ষু যেন আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল! অমাত্য সে রক্তবর্ণ আঁখি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সারেঙী অকস্মাৎ হিংস্র ব্যাঘ্রের মত অমাত্যের স্কন্ধদেশে লাফাইয়া পড়িল।

নিমেযে অমাত্যের ছিন্নবক্ষ প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! শুধু অস্ফুটস্বরে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। সারেঙী গম্ভীরস্বরে ডাকিল—"রোশেনা!"

আমার চমক ভাঙ্গিল! সেই ত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে শুধু বলিলাম,—"তু—মি!"

তিনি আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তস্থিত সারঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়িল। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আমি ছুটিয়া গিয়া আমার ক্রোড়দেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলাম। আমার হস্ত লাগিয়া তাঁহার কৃত্রিম পক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রু খসিয়া পড়িল!

আমি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"গুল্!"

গুল্ ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তার বহুপূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত আকাশে উড়িয়া গিয়াছিল!

আমার কিছু মনে ছিল না। ঘোর কাটিলে দেখি, আকাশ ঘন ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন; ঝর ঝর ধারা অবিরাম বর্ষণে ঘননিশার আঁধারকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। বিজলীর তীব্র কশাঘাতে দীর্ণ আকাশের চকিত-চঞ্চল আলোকে হেরিলাম, দুই মৃতদেহের মাঝে ছিন্নতন্ত্রী রক্তাক্ত সারঙ্গটি ধূলায় পড়িয়া আছে। সে তখন মৌন, কিন্তু বিশ্বব্যাপিয়া সেই জলধারার সঙ্গে সঙ্গে মেঘমল্লারের সুরধারায় "অব বাদেরা হো! অব্ বাদেরা হো!"

আমি সেই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

বিন্দীর সাঙ্গা

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

[১]

দুলের মেয়ে বিন্দী আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বছরখানেক পরে যখন যোধপুরের রামু ঘোড়ুইকে সাঙ্গা করিল, তখন সে একবারও ভাবে নাই যে, তাহাকে শেষে মাছ ধরিয়া, মাছ বেচিয়া দিন চালাইতে হইবে। বাপ বেচু মাহার জাতিতে দুলে হইলেও মাছ ধরা তাহার ব্যবসায় ছিল না। তাহার চাষবাস ছিল, ঘরে সংবৎসরের খোরাকী ধান মরাই বাঁধা থাকিত। তা ছাড়া পাল্কীর সর্দ্দারীও ছিল, সুতরাং পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতকে উপেক্ষা করিয়া, পুকুরের জলে নামিয়া বিন্দীকে কখনও মাছ ধরিতে হয় নাই। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, শ্রাবণের অবিরল বারিধারার মধ্যে হাটে বাজারে বা পাড়ায় মাছ বেচিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না। বিবাহও হইয়াছিল সমান ঘরে; সেখানেও বিন্দীকে ভাত-কাপড়ের জন্য কখনও ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু বাপ-খুড়ার অমতে সাঙ্গা করিয়া, নূতন স্বামীর ঘরে আসিয়া যখন তাহাকে এ সকলই করিতে হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, গুরুজনের কথা না শুনিয়া কাজটা ভাল করে নাই।

জাতীয় সমাজে সাঙ্গা প্রচলিত থাকিলেও বাপের ইচ্ছা ছিল না যে, মেয়ের সাঙ্গা দেয়। মায়েরও তেমন মত ছিল না। বিন্দী কিন্তু বারুণীর মেলা দেখিতে গিয়া রামুর মুখের মিষ্ট কথায় যে একটা ভালবাসার স্বপ্ন লইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, সে স্বপ্নের ঘোরটা সে কিছুতেই কাটাইতে পারিল না। সুতরাং মা-বাপের অমতেও সে রামুকে সাঙ্গা করিতে উদ্যত হইল। কন্যার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া বেচু বলিল, "যদি সাঙ্গা কত্তেই হয়, তবে গাংপুরের নিমু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা কর্। রেমো ছোঁড়ার চাল নাই, চুলো নাই, ওকে সাঙ্গা ক'রে শেষে কি এক মুঠো ভাতের তরে কেঁদে বেড়াবি?"

বিন্দীর মনে কিন্তু তখন ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা একবারও আসিল না। সে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রামু ঘোড়ুইকেই সাঙ্গা করিল। বাপ প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর মেয়ের মুখ দেখিবে না। বিন্দীও আর বাপকে মুখ দেখাইল না, রামুর হাত ধরিয়া তাহার ঘর করিতে আসিল। রামুর কুঁড়ে-ঘর, তালপাতার ছাউনী; দরজায় কবাট নাই, ছেঁচা বাঁশের আগড়। বিন্দী সেই আগড় দেওয়া, তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়েটিকেই স্বর্গ বলিয়া মানিয়া লইল।

কিন্তু দিন কতক পরে বিন্দীকে যখন ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়া, জাল ঘাড়ে পুকুরে পুকুরে ঘুরিতে হইল এবং মাছ বেচার পয়সায় চাল কিনিয়া আনিয়া দিন চালাইতে হইল, সেই দিন তাহার সাধের স্বর্গটা সহসা যেন কঠোর মর্ত্ত্যে পরিণত হইয়া আসিল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিন্দী সেই ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর মধ্যে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। স্বর্গই হউক বা মর্ত্ত্যই হউক, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েটুকুকেই আপনার সুখের কেন্দ্র করিয়া লইয়া বিন্দী দিন কাটাইতে লাগিল।

তা রামুও যে অক্ষম ছিল, পয়সা উপায় করিতে পারিত না, এমন নয়। সে পাল্কী বহিত, পাল্কীর ভাড়া না জুটিলে মজুর খাটিত। কিন্তু তাহার উপার্জ্জনের একটি পয়সাও ঘরে আসিত না। যে দিন যাহা পাইত, তাহা বাজারের সিদ্ধেশ্বর শাহার মদের দোকানে, অথবা

করিমদ্দি চাচার তাড়ির আড্ডায় দিয়া টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিত্। ঘরে আসিয়া বিন্দীকে গালাগালি দিত, তাহার মা-বাপের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিত। বিন্দী কোন দিন মুখ বুজিয়া থাকিত, কোন দিন গালাগালির উত্তরে দুই একটা গালাগালি দিত। যে দিন উত্তর করিত, সে দিন বিন্দী স্বামীর নিকট দুই চারি ঘা মার খাইত। মার খাইয়া বিন্দী কাঁদিতে বসিত, আর রামু টলিতে টলিতে গিয়া দাবার উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া পড়িত।

তারপর বমিতে যখন চাটাই ভাসিতে থাকিত, সংজ্ঞাহীন রামুর মুখের ভিতর মাছি ঢুকিত, তখন বিন্দী আসিয়া সে সকল পরিষ্কার করিয়া দিত, ঘটী করিয়া জল আনিয়া রামুর চোখে মুখে মাথায় দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে বসিত। নেশা ছুটিয়া গেলে রামু উঠিয়া বসিত। বিন্দী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিত। রামু আহার শেষ করিয়া উঠিলে বিন্দী তাহাকে আঁচাইবার জল দিয়া তামাক সাজিয়া আনিত। রামু দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত—

"সে কি আমার অযতোনের ধোন।
মনো প্রাণো যারি করে করি সমোপ্পোণ।
সে কি আমার—"

বিন্দী ভাতের গ্লাস মুখের কাছে রাখিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, রামু গাহিতেছে—

"তবে যে অপ্রিয়ো বোলি, যখনো জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকোলিই, প্রমেরি কারোণ।
সে কি আমার—"

একটা অবাক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিন্দীর সকল নির্যাতন—সকল কষ্ট মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত।

আধ ক্রোশ দূরে বাপের বাড়ী। সুতরাং বিন্দীর কষ্টের কথা মা বাপের অগোচর ছিল না। বাপ রাগিয়া বলিত, "চুলোয় যাক্ বিন্দী।" মা কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সময়ে সময়ে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইত, এবং মেয়ের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে থাকিত। বলিত, "আমার ভাত কে খায় বিন্দি, আর তুই এক মুঠো ভাতের তরে হা হা ক'রে বেড়াস্?"

বিন্দী উত্তর করিত, "কি কর্‌বো মা, কপাল।"

মা আক্ষেপ করিয়া বলিত, "তোর কপাল নয় বিন্দি, আমারই পোড়া কপাল। থাক্ তুই আমার ঘরে; পেটে ঠাঁই দিয়েছি, হাঁড়ীতে কি ঠাঁই দিতে পার্‌বো না?"

মুখ নীচু করিয়া বিন্দী বলিত, "তোমার জামাই যে রাগ কর্‌বে মা?"

মা রাগিয়া বলিত, "আরে মোর জামাই! বলে—'ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই।' মুখে আগুন অমন জামাইয়ের।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিত, "ছিঃ মা!"

মা হাত-মুখ নাড়িয়া উত্তর করিত, "আ লো, এত দরদ! তবু যদি দু'বেলা উত্তম-মধ্যম না দিত।"

বিন্দী ধীরে ধীরে বলিত, "তা মার্‌লেই বা মা, আপনার মানুষ বটে তো।"

মা গর্জ্জন করিয়া বলিত, "খ্যাঙ্‌রা মারি অমন আপনার মানুষের মুখে; মার-ধর কত্তে তো আছে, কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা শীতে তোকে জলে নেমে যে মাছ ধর্‌তে হয়, তার কি?"

মৃদু হাসিয়া বিন্দী উত্তর করিত, "তা ধর্‌লেই বা মাছ, দুলের মেয়ে তো বটি।"

মা রাগে মেয়েকে কতকগুলো তিরস্কার করিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু মায়ের প্রাণ, থাকিতে পারিত না। মাঝে মাঝে দু'সের চাল, এক সের মুড়ি, দু'পোয়া মুসুর কলায়, ক্ষেতের পাঁচটা বেগুন, বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া মেয়েকে দিয়া আসিত।

[২]

"বিন্দী!"

"কেনে?"

"হাঁড়ী তুল্‌ছিস্‌ যে?"

স্বামীকে ভাত দিয়া বিন্দী হাঁড়ী তুলিতেছিল। উনানের পাশে বেদীর উপর হাঁড়ীটা রাখিয়া তাহার মুখে সরা চাপা দিতে দিতে বিন্দী বলিল, "হাঁড়ী তুল্‌বো না তো প'ড়ে থাক্‌বে?"

রামু ভাতে নুন মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুই খাবি না?"

বিন্দী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

রা। কেনে?

বি। খিদে নেই।

রা। খিদে নেই, না ভাত নেই?

বি। রাঁধলে তো ভাত থাক্‌বে?

রা। চাল থাক্‌লে তো রাঁধবি?

বিন্দী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তোকে বলেছে চাল নেই, চাল থাক্ না থাক্, রাঁধি না রাঁধি, সে আমার খুসী। তোর মরদ মানুষের এত খোঁজে দরকার কি রে?"

ঈষৎ হাসিয়া রামু বলিল, "দূর মাগী, আমি তোর খোঁজ-খবর নেব না তো নেবে কে?'

বিন্দী মুখ ফিরাইয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে উত্তর করিল, "যম।"

রামু নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত উদরস্থ করিয়া বলিল, "তোর গোসা হয়েছে বিন্দি?"

বিন্দী একটু রাগতভাবে বলিল, "হাঁ, তোকে বলেচে গোসা হয়েচে।"

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রামু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আলবোৎ গোসা হয়েচে। কৈ, তুই আমার মাথার কিরে ক'রে বল্‌ দেখি?"

বিন্দী ভ্রূকুটি করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেখ্‌ মিন্‌ষে, খেতে বসেছিস্‌, খেয়ে উঠে যা।"

রামু মুখ নীচু করিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমি তো খেতে বসেছি, খেয়ে উঠ্‌বো, কিন্তু তুই না খেয়ে থাক্‌বি বিন্দি?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ভাল রে মিন্‌ষে, এই যে আমার ওপর দরদ দেখাতে শিখেচিস্‌?"

রামু গম্ভীরস্বরে বলিল, "কেনে বিন্দী, আমি কি তোকে দরদ করি না?"

শ্লেষের তীব্রস্বরে বিন্দী বলিল, "খুব করিস্‌। এই দুকুর বেলা কত দরদ দেখালি? চোখের কোলটা এখনো ফুলে আছে।"

লজ্জিতকণ্ঠে রামু বলিল, "বড্ড লেগেচে, না বিন্দী?"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "না, মার্‌লে কি লাগে?"

রামু নতমস্তকে কোলের ভাতগুলাকে চটকাইতে লাগিল। বিন্দী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "লাগেনি তেমন, তবে আর একটু হলেই চোখটা যেতো। তা যেতো যেতোই, তুই ব'সে রইলি যে? খেয়ে নে।"

রামু ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া, বাঁ হাতে ধরিয়া ঘটীর জলটা গলায় ঢালিয়া দিল। বিন্দী বলিল, "ও কি, ভাত ফেলে উঠ্‌ছিস যে?"

রামু বলিল, "ফেলে উঠ্‌ছি না, খেয়েই উঠ্‌ছি।"

বি। তবে ওগুলা প'ড়ে রইল কেনে?

রামু। থাক্, তুই খাবি।

রামু উঠিতে গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা খাস্, খেয়ে ফেল্, কা'ল আবার তোকে ভাড়া বইতে যেতে হবে।"

রামু বলিল, "আর তুই উপোস থাক্‌বি?"

বিন্দী বলিল, "আমার খিদে নেই, মাইরি বল্‌ছি, আমার খিদে নেই।"

রামু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে বল্‌চিস্?"

বিন্দী তাহার হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খেতে হয় খা, নয় তো চুলোয় যা। আমি কেনে কথায় কথায় তোর কিরে কত্তে যাব রে মিন্‌ষে?"

রামু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। বিন্দী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া খাইতে বসিল। রামু তামাক টানিতে টানিতে ডাকিল, "বিন্দী!"

বিন্দী মুখের ভাত চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কি ঘরে চাল ছিল না?"

বিন্দী মুখের ভাতগুলা গিলিতে গিলিতে উত্তর করিল, "আধসেরটাক প'ড়ে আছে।"

রামু বলিল, "তবে রাঁধ্‌লি না কেন?"

বিন্দী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "আজ রাঁধ্‌লে কা'ল কি খাবি!"

রামু রাগিয়া বলিল, "ছাই খাব। কা'ল খাব ব'লে আজ তুই উপাস দিবি?"

দুঃখিত স্বরে বিন্দী বলিল, "কাজেই, কা'ল আর মাছ ধর্‌তে যেতে পারবো না। কোমরে একটা দরদ লেগেছে।"

রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকা হাতে বসিয়া রহিল।

বিন্দী আহার শেষ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছিস্ ঘোড়ুই?"

রামু মাথা না তুলিয়াই বলিল, "ভাব্‌চি, মদ ছাড়্‌বো, না তোকে ছাড়্‌বো?"

বিন্দী বলিল, "মদ কি ছাড়্‌তে পার্‌বি? ছাড়িস্ তো আমাকেই ছাড়্‌বি।"

রামু মুখ তুলিল; অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোকে ছাড়্‌বো বিন্দী?"

বিন্দী ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া রামুকে শুইবার জন্য ডাকিল। রামু কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুই তিনবার ডাকিয়া স্বামীর সাড়া না পাইয়া বিন্দী বাহিরে আসিল, এবং বাঁহাতে কেরোসিনের ডিবা, ডান হাতে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "তা আমাকে ছাড়িস্ ছাড়্‌বি, এখন শুবি আয়। কা'ল সকালে উঠেই আবার তোকে ভাড়ায় যেতে হবে।"

রামু উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

[৩]

"তোর পায়ে পড়ি ভূতো, আজ আর খাব না।"

ভূতো ওরফে ভূতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেনে বল্ দেখি, আজ তুই তপিস্বি হয়েছিস্ না কি?"

রামু বলিল, "না, আমি দিলেসা করেছি।"

ভূতো বলিল, "বিন্দীর কাছে বুঝি?"

ভূতো শ্লেষের হাসি হাসিল। রামু বলিল, "আমি নিজের মনে মনে দিলেসা করেছি, ও সব আর ছোঁব না।"

ভূ। বিন্দী বুঝি বারণ করেছে!

রা। বারণ কর্‌বার মেয়ে বিন্দী নয়।

ভূ। তবে?

রা। তবে আবার কি? সে পেটে না খেয়ে আমাকে খাওয়াবে আর আমি নেশা ক'রে সব উড়িয়ে দেব!

তিরস্কারের পরে ভূতো বলিল, "এই রে, শালা মরেচে, ওরে মুখ্যু, এই যে তিন তিন কোশ পাল্কী ঘাড়ে ঘুরে এলি, এক পাত্তর পেটে না দিলে গা গতরের বেদনা যাবে কেন? বৌ আগে, না নিজের জানটা আগে? বলে—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম?"

রামু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভূতো তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "বেশী না হয়, দুপাত্তর টেনে যাবি আয়, পয়সা তোকে দিতে হবে না।"

রামু সঙ্গীর কথা ঠেলিতে পারিল না, তাহার সহিত গিয়া সিদ্ধেশ্বর শাহার দোকানে ঢুকিল। সেখানে দুই পাত্রের স্থলে চারি পাত্র উজাড় হইয়া গেল; তথাপি রামু উঠিল না। শুধু একবার বলিল, "ঘরে আজ চাল নাই ভূতো, মাগীটার খাওয়া হবে না।"

ভূতো আর একপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল, "তোকে বলেছে খাওয়া হবে না। তুই দেখছি, বিন্দীর ভাবনা ভেবে ভেবেই মারা যাবি। তুই যদি কা'ল ম'রে যাস্?"

ভীত কম্পিত কণ্ঠে রামু বলিল, "না ভূতো, তা হ'লে মাগী আছাড়ি-বিছাড়ি ক'রে ম'রে যাবে।"

ভূতো হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ম'রে যাবে না চেয়ে থাক্‌বে। তুই দেখিস্, তিন দিন না যেতে যেতে আবার একটা সাঙ্গা ক'রে বস্‌বে।"

রামু পাত্রটা গলায় ঢালিয়া দিয়া সক্রোধে বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কইবি ভূতো; বিন্দী তেমন নয়।"

ভূতো ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "রেখে দে তোর বিন্দী, অমন কত ইন্দির চন্দর দেখা গেছে। নফরা মাজির বৌটা কি কর্‌লে দেখলি না! তোর ছাঁচার ধারে পেলা কাহারের বৌটা বার বার চার বার--"

ভূতো নিজের জন্য একপাত্র ঢালিতে যাইতেছিল। রামু তাহার হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া এক নিশ্বাসে সবটা গলায় ঢালিয়া দিল; তার পর বোতলটা মেঝেয় আছড়াইয়া দিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "লেয়াও দোসরা বোতল।"

ভূতো বলিল, "আমার ট্যাঁক খালি।"

রামু আপনার কোঁচার খুঁট হইতে টাকাটা খুলিয়া ছুড়িয়া দিল।

[৪]

সন্ধ্যা হয় হয়, বিন্দী উনানে ঘুঁটে দিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল আর রামুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় রামু টলিতে টলিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; উচ্চ স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, "বিন্দী!"

বিন্দী ডালের হাঁড়ীটা উনানে বসাইয়া বাঁশের চোঙ্গা দিয়া উনানে ফুঁ দিতেছিল, চোঙ্গাটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "এসেছিস্?"

রামু বলিল, "আলবোৎ আস্‌বো। তোর বাবার ঘর যে আস্‌বো না?"

বিন্দী থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কথা শোন একবার, আজ আবার খেয়ে মরেছিস্!"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ রাও, তোর বাবার খাই!"

রামু কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার পা দুইটা এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বিন্দী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তা খেয়েছিস্ খেয়েছিস্, এখন শুয়ে পড়্‌বি আয়!

রামু হাতটা টানিতে টানিতে বলিল, "তোর বাবার হুকুমে শোব?"

বিন্দীর পিতার উদ্দেশ্যে রামু একটা কটুক্তি প্রয়োগ করিল। বিন্দী তাহার হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল, "তবে এইখানে প'ড়ে মর্।"

বিন্দী চলিয়া যাইতেছিল, রামু তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "আমি মর্‌বো! আমি ম'লে তুই কাকে সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী রাগিয়া উত্তর করিল, "যমকে।"

রামু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কর্‌বি?"

বিন্দীও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "কর্‌বো না ত কি তোকে ভয় ক'রে থাক্‌বো?"

রামু বিন্দীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লাথি মারিতে গেল; কিন্তু পাটা বিন্দীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না, তৎপূর্ব্বে রামু নিজেই উঠানের উপর দুম করিয়া পড়িয়া গেল। বিন্দী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিল। রামু উঠিয়া টলিতে টলিতে বিন্দীকে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিল। বিন্দী বলিল, "আচ্ছা, কা'ল সকালে যাব।"

রামু বলিল, "না, এখুনি যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "আমি যাব না।"

রামু চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বাবাকে যেতে হবে। তুই যদি না যাস্—"

রামু একটা ভয়ানক কটু কথা বলিল। উত্তরে বিন্দী তাহাকে গালাগালি করিল। রামু তখন বিন্দীর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বিন্দীর চীৎকারে পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকে ছুটিয়া আসিল। ভূতো বহু কষ্টে রামুকে টানিয়া আনিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে শোয়াইয়া দিল। বিন্দী প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিল; সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল এবং মুখে হাতে জল দিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিল।

বিন্দীর ছয় মাসের গর্ভ ছিল। সেই রাত্রিতে তাহার গর্ভস্রাব হইয়া গেল। সে ঘরে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভূতো চার পয়সার কুইনাইন কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল।

রামুর নেশার ঘোরটা যখন একটু কাটিয়া আসিল, তখন সে বিন্দীর যন্ত্রণাসূচক কাতর স্বর শুনিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কেমন, আর সাঙ্গা কর্‌বি?"

বিন্দী কাতরস্বরে বলিল, "ওরে—একটু জল—একটু জল।"

গর্জ্জন করিয়া রামু বলিল, "কভি নেহি, যাকে সাঙ্গা কর্‌বি, সেই জল দেবে।"

বিন্দী বলিল, "না ঘোড়ই, আর সাঙ্গা কর্‌বো না, তোর পায়ে পড়ি, একটু জল দে।"

রামু উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; মাথাটা তুলিতেই তাহা ঘুরিয়া চাটায়ের উপর পড়িয়া গেল।

ভূতো ঘরে যায় নাই, কাপড় দিয়া রোয়াকের এক পাশে পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া জল লইয়া বিন্দীর মুখের কাছে ধরিল; বলিল, "জল খা বিন্দী।"

চমকিত হইয়া বিন্দী বলিল, "তুই?"

ভূতো বলিল, "হাঁ আমি, জল খা।"

ভূতো মুখে জল ঢালিয়া দিল। বিন্দী জল খাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিন্দী ভূতোকে শত্রু বলিয়াই মনে করিত। ভূতো যে বাস্তবিক তাহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিত, তাহা নহে, বরং সে বিন্দীর অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তাহার এই চেষ্টাটুকুই কিন্তু বিন্দীর নিকট শত্রুতা বলিয়া বোধ হইত।

বিন্দী মাছ ধরিতে যাইত, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় বেশী মাছ ধরিতে পারিত না। ভূতোও

মাছ ধরিত, সে বিন্দীর অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিত, এবং কিরূপে জাল টানিতে বা তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিত। বিন্দী কিন্তু উহার এ উপদেশ গ্রহণ করিত না, সে যাহা করিতে বলিত, বিন্দী তাহার বিপরীত আচরণ করিত। ইহার ফলে তিন চারি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বিন্দী যখন দুই গণ্ডা পয়সার মাছও ধরিতে পারিত না, তখন ভূতো নিজের হাঁড়ী হইতে এক আঁজলা মাছ লইয়া বিন্দীর হাঁড়ীতে ঢালিয়া দিতে যাইত। বিন্দী তাহার এই দান লইতে চাহিত না। এক এক দিন সে হাঁড়ী হইতে ভূতোর মাছ-ভরা আঁজলাটা ঠেলিয়া দিয়া রাগে গর-গর করিয়া চলিয়া যাইত। ভূতো হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত; তাহার হাতের মাছগুলা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত।

আজি সেই ভূতোকে নিজের রোগশয্যার পাশে দেখিয়া বিন্দী শুধু চমকিত হইল না, বিরক্তও হইল। ভূতো বিন্দীকে জল খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছিস্

উত্তর করিল, "তুই এখানে কেন? ঘরে যাস্‌নি যে?"

ভূতো বলিল, "তোকে এমনতর দে'খে কি ঘরে যেতে পারি? তোকে দেখবে কে?"

বিন্দী রাগিয়া বলিল, "যম। কেন, তুই ছাড়া কি আর দেখবার লোক নাই?"

সহাস্যে ভূতো বলিল, "যে দেখবার, সে তো মেরে ধ'রে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছে। তুই একটু জল চাইলে কি জবাব দিলে, তা শুন্‌লি তো?"

বিরক্তির সহিত বিন্দী বলিল, "খুব শুনেছি। তুই এখন যাবি কি না বল্‌?"

"যাচ্চি" বলিয়া ভূতো বাহিরে আসিয়া দরজার আগড়টা ভেজাইয়া দিল।

সকালে ভূতোর মুখে সংবাদ পাইয়া, বিন্দীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে বাপও আসিল। তাহারা আসিয়া রামুকে কতকগুলা গালাগালি দিল। তারপর ভূতোর পরামর্শমতে বিন্দীকে ডুলিতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। রামু রোয়াকের এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কথার একটিও উত্তর দিল না।

অনেকটা বেলা হইলে রামু উঠিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিল। তার পর রান্না করিতে গিয়া দেখিল, উনানের উপর ডালের হাঁড়ীটা বসান রহিয়াছে। পাশে সরায় কাঁচা মসূর ডাল। রামু মসূর ডাল ভালবাসিত, এ জন্য বিন্দী মাছ বেচিয়া যে দিন দুই পয়সা বেশী পাইত, সে দিন সে মসূর ডাল কিনিয়া আনিত। মাছের চুপড়ীর ঢাকা খুলিয়া রামু দেখিল, তাহাতে বড় বড় চারিটা চিংড়ী-মাছ নুন-হলুদ মাখা অবস্থায় পড়িয়া আছে। চিংড়ী-মাছ রামুর বড় প্রিয়, এ জন্য বিন্দী চিংড়ী-মাছ পাইলে প্রাণান্তেও তাহা বেচিত না, ঘরে আনিয়া স্বামীকে ঝোল রাঁধিয়া দিত। মাছের চুপড়ীর পাশেই কর্ত্তিত আলু-বেগুন রহিয়াছে। রামু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সাম্‌নের কুলুঙ্গীতে একমুটা চিঁড়া-মুড়কী, আর একখানা তিলে পাটালী ছিল। ইহা যে রামুর জলযোগের জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে , তাহা বুঝিতে রামুর বিলম্ব হইল না। রামু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সাম্‌নের দেওয়ালের কুলুঙ্গীর উপর একটা শূন্য মদের বোতল ছিল। রামু সেটাকে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বোতলটা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামু ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া বিন্দীর পরিত্যক্ত বিছানার উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

[৫]

বিন্দী চলিয়া যাইবার পর তিন চার দিন কাটিয়া গেল। রামুর এই দিন কয়টা বড় কষ্টেই কাটিল। এখনও সে মদ খাইত, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী খাইত। মদ খাইয়া টলিতে টলিতে

আসিয়া, দাবার উপর শুইয়া পড়িত। রাত্রিটা যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা সে জানিতে পারিত না। যখন নেশার ঘোর কাটিত, জ্ঞান হইত, তখন চোখ মেলিয়া দেখিত, সকালের রোদ আসিয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর সে ধূলা ও শুষ্ক বমির উপর গড়াগড়ি দিতেছে। তখন রামুর বিন্দীকে মনে পড়িত, তাহার সেবা মনে পড়িত, অনুতাপে—আত্মগ্লানিতে তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। এদিকে উপবাসে শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিত, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে থাকিত। রামু ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইয়া, খানিকটা জল ঢক্‌ঢক্ করিয়া গলায় ঢালিয়া দিত।

একদিন রামু জল খাইতে গিয়া দেখিল, কলসী শুষ্ক, কা'ল জল তুলিতে ভুল হইয়াছে। সে রাগে কলসীটা লইয়া আছাড় দিল। মাটীর কলসী শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। ভাঙ্গিবার সময় কলসীটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে যেন একটা বিকট হাসি হাসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত রামুকে কঠোর উপহাস করিতে লাগিল। রামু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চূর্ণ খণ্ডগুলাকে কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

দুই দিন অনাহারের পর রামু রাঁধিতে গেল। কিন্তু রাঁধিবার উপকরণ কোথায় কি আছে, তাহা সে জানিত না। বহু কষ্টে ভাতে ভাত রাঁধিবার মত যোগাড় করিয়া লইয়া সে উনানে হাঁড়ী চাপাইল। কিন্তু উনান জ্বালিবার কিছু পাইল না। বিন্দী এখান সেখান হইতে ঘুঁটে কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাঁধিত। রামু বহু কষ্টে কয়েকখান ঘুঁটে আর আধশুক্‌না গাছের ডাল সংগ্রহ করিয়া উনান জ্বালিতে গেল, উনান কিন্তু জ্বলিল না। কেরোসীনের ডিবার তেল ফুরাইয়া গেল, ধোঁয়ায় রামুর চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, তথাপি উনান জ্বলিল না। রামু রাগে একটা লাঠি আনিয়া হাঁড়ীর উপর বসাইয়া দিল। হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া জল চালে উনান ভরিয়া উঠিল। রামু আপন মনে গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরে গিয়া চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িল; শুইয়া 'বিন্দী বিন্দী' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় বাজার হইতে দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া, রামু পিত্তরক্ষা করিল।

সেই দিন রাত্রে রামু স্বপ্নে দেখিল, যেন বিন্দী আসিয়া তাহার মাথার শিয়রে বসিয়াছে, এবং আস্তে আস্তে তাহার মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিতেছে, "ওঠ্ না ঘোড়ুই, দু'দিন তোর খাওয়া হয় নি, খাবি আয়।"

রামু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিন্দি, বিন্দি!"

শূন্য গৃহে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি হাসিয়া উত্তর দিল,—"হি হি হি হি!" রামু অবসন্নভাবে আবার শুইয়া পড়িল।

স্বপ্নে বিন্দীকে দেখিয়া রামুর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সে আর ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। দরজার আগড়ের ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিলে রামু উঠিয়া মুখ হাত ধুইল, এবং গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া, খেটে লাঠিটা লইয়া বিন্দীকে দেখিতে চলিল।

পিছন হইতে ভূতো ডাকিয়া বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছিস্ রে?"

পাছু ডাকায় বিরক্ত হইয়া রামু উত্তর দিল, "যাচ্চি।"

ভূতো বলিল, "কোথায় যাচ্চিস্? শ্বশুরবাড়ী নাকি?"

অপ্রসন্নভাবে রামু উত্তর করিল, "বিন্দীকে দেখতে।"

ভূতো বলিল, "আর দেকতে গিয়ে কি হবে, ফিরে আয়।"

অমঙ্গলাশঙ্কায় রামুর বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিল। সে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূতোর মুখের দিকে চাহিল। ভূতো বলিল, "বিন্দী যে তোর নামে নালিশ করেছে।"

বিস্ময়াপ্লুতস্বরে রামু বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ!"

ভূতো তখন মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি তো তোকে তখনই ব'লেছিলাম, ও সব সাঙ্গালী মাগীকে বিশ্বাস নাই, ওরা সব কত্তে পারে।"

ভূতো চলিয়া গেল। রামু ফিরিয়া লাঠি গামছা ফেলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে রামু যখন রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিল, তখন বিন্দীর ভাই পেয়াদা সঙ্গে আনিয়া রামুকে শমন ধরাইয়া গেল।

[৬]

রামু গিয়া শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরিল, পাড়ায় পাঁচজনের কাছে গিয়া পড়িল। কিন্তু বেচারাম কাহারও কথা রাখিল না; সে বলিল, "আমার মরায়ে তিন আড়া ধান আছে, এই ধান বেচে বেটাকে জেলে দেব, তবে আমার নাম বেচারাম।"

গ্রামের করালী চক্রবর্ত্তী মোকদ্দমার পরামর্শদাতা ও তদ্বিরকারক হইয়াছিলেন। রামু গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাও কি হয় বাপু! আমার কথায় নির্ভর ক'রেই বেচারী মোকদ্দমায় হাত দিয়েছে, আমি কি কথার নড়চড় করতে পারি? এতে যে আমার অধর্ম্ম হবে।"

রামু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না; কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাণটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, "তা কি জান বাপু, পেটে খেলেই পিঠে সয়! গোটা দশেক টাকা দিতে পার তো চেষ্টা দেখি। পরশু মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে। এ তো আর তোমাদের ঘরের মেয়ে পাঠানো নয়, বিস্তর খরচ, বুঝ্‌লে?"

রামু ইহা বুঝিল বটে, কিন্তু দশটা টাকা যে কোথায় পাইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু যেরূপে হউক, টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা জেলে যাইতে হয়। রামুর মনে পড়িল, বিন্দীর হাতে আটগাছা রূপার চুড়ী আছে, তাহা বেচিলে দশ টাকা হইতে পারে। বিন্দী কি চুড়ী দিয়া তাহাকে জেল হইতে রক্ষা করিবে না।

রামু তক্কে তক্কে থাকিয়া বিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যস্তভাবে বলিল, "বিন্দী, তোর চুড়ী ক গাছা দে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিন্দী বলিল, "কেনে রে?"

রামু বলিল, "করালী ঠাকুরকে দিতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া বিন্দী বলিল, "ঘুষ নাকি?"

রামু বলিল, "নয়.তো আমাকে জেলে যেতে হবে।"

বিন্দী বলিল, "তুই জেলে যাবি, তা আমি চুড়ী দিতে গেলাম কেন?"

রা। তুই যে আমার ইস্তিরী।

বি। মার্‌বার সময় সে কথাটা মনে থাকে না?

লজ্জিতভাবে রামু বলিল, "আর তোকে মার্‌বো না বিন্দী।"

বিন্দী বলিল, "আমি তোর ঘরে গেলে তো মার্‌বি?"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি না?"

মাথা নাড়িয়া বিন্দী বলিল, "উঁহু।"

রা। তবে কি আবার সাঙ্গা কর্‌বি?

বি। কর্‌বো।

রা। সত্যি?

বি। সত্যি।

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। বিন্দী জিজ্ঞাসা করিল, "চল্‌লি যে? চুড়ী নিবি না?"

মুখ ফিরাইয়া রামু বলিল, "আর দরকার নাই।"

রামু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিন্দী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ভূতো জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রামু, মামলার কিছু চেষ্টা বেষ্টা দেখ্‌লি না?'

উদাসভাবে রামু উত্তর দিল, "কি আর দেখ্‌বো?"

ভূ। তবে জেলে যাবি?

রা। গেলুম বা।

ভূ। বলিস্ কি রে, জেল যে?

রামু হাসিয়া বলিল, "যার পাছু চাইতে নাই, তার জেলই কি, আর ঘরই বা কি?"

ভূতো একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি নাকি বিন্দী আবার সাঙ্গা করবে?"

রামু বলিল, "আমিও তাই শুন্‌চি। তুই চেষ্টা দেখ্ না।"

ভূতো সে কথার কোন উত্তর দিল না।

মোকদ্দমার দিন রামু জনৈক প্রতিবেশীকে তাহার কুঁড়ে দেখিবার ভার দিয়া আদালতে হাজির হইল।

[৭]

আদালতে গিয়া রামু দেখিল, ভূতো ও পাড়ার আরও দুই একজন বিন্দীর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। বিন্দীর বাপ উকীল দিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাছতলায় বসিয়া সাক্ষীদের তালিম দিতেছেন। বিন্দী মাথায় কাপড় দিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রামুর উকীল দিবার ইচ্ছা ছিল না। সে একাই জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

অসহায়ের সহায় ভগবান। একজন নূতন উকীল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামুর মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িলে রামু গিয়া আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াইল। ফরিয়াদী বিন্দী দাসীর ডাক পড়িল। বিন্দী মাথায় ঘোমটা দিয়া আদালতের মধ্যে আসিল। রামুর উকীল তাহাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামু দুই হাতে কাঠগড়া চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দী যাহা বলিল, তাহাতে শুধু উকীল কেন, রামু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিন্দী বলিল, "হুজুর, আসামী আমার সোয়ামী। ও আমাকে বড্ড ভালবাসে। ও সে দিন বেশী মদ খেয়ে এসেছিল। আমি ধ'রে শোয়াতে যেতে ও টাল খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। তাতেই আমার গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ও কোন দিনই আমাকে একটি চড়া কথা বলেনি। আমার বাপের সঙ্গে ওর বনিবনাও নাই, তাতেই আমার বাপ পাঁচজনের মত্‌লবে নালিশ রুজু করেছে।"

রামু কাঠগড়ার ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। বিন্দীর প্রত্যেক কথায় তাহার বুকের ভিতর যেন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, "ওগো, সব মিছে, সব মিছে কথা। আমিই বিন্দীকে মেরে তার সর্ব্বনাশ করেছি।"

হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। রামু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "হুজুর!"

পাহারাওয়ালা তাহাকে ধমক দিয়া কাঠগড়া হইতে বাহির করিয়া দিল। বিন্দী হাত ধরিয়া তাহাকে আদালতের বাহিরে আনিল।

বাহিরে আসিয়া রামু জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুই কোথায় যাবি বিন্দী?"

বিন্দী উত্তর করিল, "চুলোয়।"

রা। সাঙ্গা কর্‌বি না?

বি। কর্‌বো বই কি।

রা। কাকে?

রামুর মুখের উপর একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিন্দী সহাস্যে বলিল, "আপাততঃ তোকে।"

বেচারাম হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ও ঠাকুর মশাই, একি হইলো?"

চক্রবর্ত্তী সক্ষোভে বলিলেন, "আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু হইল। বিন্দী বেটী সব নাট ক'রে দিলে। বেটী ছোটলোকের মেয়ে কি না, ওর কি একটুও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান আছে?"

ভূতো ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যা ব'লেছ ঠাকুর মশাই, ভদ্দর নোক না হলে কি ধম্মকম্ম বুঝ্‌তে পারে?"

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাক, বেটাকে এর ফল ভুগতেই হবে। এখন উকীলের সাড়ে সাত টাকা পাওনা আছে, সেটা মিটিয়ে দাও হে বেচারাম।"

বেচারাম মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিবার জন্য গেরো খুলিতে লাগিল। ভূতো শুনিতে পাইল, রামু তখন গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"সে কি আমার অযতোনের ধো-ও-ন্‌,
সে কি আমার—"

পৌষ, ১৩২৪

বাবাজী

শ্রীঃ—

দোল-পূর্ণিমার রাতে খোট্টাদের গান, ভাঙের নেশার ধমকে একটা নিতান্ত বিকৃত বিকট বেসুরো চীৎকারে দাঁড়িয়েছে!

সমস্ত দিন মাদলের বাদ্যি, আর খঞ্জনির ঝন্‌ঝনানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। মনে হয়, পাশতলার দিক্‌টা ধ'রে যেন খাটটা কে তুলছে।

অবশ্য, ভুতের ভয় ছিল না; কিন্তু ঘরেও আর আট্‌কা থাকতে মন চাইলে না। অগত্যা দরজায় কুলুপ দিয়ে সটান বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বাঙ্গালীটোলার অন্ধকার—জঘন্য গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। রাজবাড়ীর ঘণ্টায় তখন ঢং করে একটা বাজ্‌ল।

রাস্তায় লোকজন নেই; জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্ কর্‌চে। ধবধবে পথের উপর জায়গায় জায়গায় ফাগ পড়ে আছে—হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

মন উদ্‌ভ্রান্ত, কাজেই পায়ের মর্জ্জিমত যেদিকে-সেদিকে চললাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম যে, গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়াটা মানুষের কাছে কতখানি মধুর হ'তে পারে।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমে একটা বড় চাতালে গিয়ে বস্‌লাম। দূরে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে পড়ে বিষম নাক ডাকাচ্চে। মনে হলো, বেটা নেশা করেছে।

চাঁদের আলোর নীচে গঙ্গার স্ফটিক-জল একখানা বিরাট শ্লেটের মত দেখাচ্ছিল। ও-পারে বালির চর ধূ-ধূ কর্‌চে—তার পরে রাজবাড়ীর ফাটক হাঁ ক'রে আছে! যেন বুড়োর ফোক্‌লা-হাঁ!

বাঁ-দিকে মণিকর্ণিকার আগুন জ্যোৎস্নায় নেহাৎ ঢিমে দেখাচ্ছিল। সার সার তিনটে চুল্লী—জলের উপর আলো প'ড়ে ঝক্-ঝক্ কর্‌চে! যেন কষ্টিপাথরে তিনটে আঁকাবাঁকা সোনার আঁচড়।

চারিদিক্ স্তব্ধ। দে'খে যেন বুকের মধ্যে হাঁপ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ বুকের ভিতর থেকে একটা দম্‌কা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়্‌ল! কেন? কি জানি!

ঠাণ্ডা হাওয়াতে যেন দেহ জুড়িয়ে গেল ; হাই উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হাঁটু দুটোর মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়্‌বার মত হয়েছি—পিঠের উপর কার গরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম; সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌তে পেলাম "বেটা, ঘর যাও।"

ফিরে দেখি, কখন লোচন বাবাজি এসে আমার কাছে বসেছেন। তাড়াতাড়ি বাবাজির পায়ের ধূলো নিতেই তিনি হেসে বল্‌লেন, "কি রে, এত রাত্রে যে এখানে? ঝগড়া করেছিস্ নাকি?"

বাবাজির অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। শীর্ণকায় লম্বাকৃতি পুরুষ। ইনি সর্ব্বস্বত্যাগী কৌপীনধারী; কিন্তু বাবাজির যত বড় বড় রাজা-মহারাজ শিষ্য। কাশীর প্রায় সকলেই তাঁহাকে চেনে; দীর্ঘদিন কাশীবাস করাতে অনেকের সঙ্গে তাঁহারও পরিচয়। বাবাজি আমাকে একটু স্নেহই কর্‌তেন।

আমার পিঠ ঠুকে বাবাজি বল্‌লেন, "পাগ্‌লা—রাগ বড় পাজী জিনিস—ফিরে যা।"

"আমি তো রাগ করিনি মহারাজ! ঘরে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ল না, তাই এসে এখানে ব'সে আছি।"

"তোর বৈরাগ্য হয় নাকি?" ব'লে বাবাজি হাস্‌তে লাগলেন।

বাবাজির সঙ্গে অনেকবার আলাপ করেছি; কিন্তু আজ তাঁর মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার ভাব দেখলাম যে, হঠাৎ তাঁকে তাঁর জীবনের ইতিহাসটা জিজ্ঞাসা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলাম না।

বাবাজি একটু হেসে বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তোকেই বল্‌ব—এ পর্য্যন্ত কেউই জানে না, আমি কে—কোত্থেকে এসেছি।"

বাবাজি তাঁর জীবনকাহিনী শুরু করলেন,—

* * * * *

"আমি বিলাসপুরের জমিদারের ছেলে। লেখাপড়া একেবারে করিঁ নি যে, তা নয়; তবে কোন পাশটাশ করিনি—কর্‌বার বড় একটা তোয়াক্কাও রাখ্‌তাম না। হাতে যখন বিষয়-সম্পত্তি এলো, তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ। বিয়ে হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তেমন বনি-বনাও হ'ল না। কেন, তা বুঝতেই পার।—ঘরের মেয়েরা আমোদটাকে তেমন ঝাঁঝাল ক'রে তুল্‌তে পারে না। আমার কিন্তু সে ধাতই নয়। পেন্‌-পেনানি ঘেন্‌-ঘেনানির মধ্যে আমি নেই। যা চালাব, তা পুরো দমেই দস্তুরমত। এই পথে নিয়ে যাবার লোকেরও অভাব হয় না। টাকা যখন থাকে, তখন কিছুরই অভাব হয় না।

কলকাতায় ধাঁ ক'রে একখানা বাড়ি কিনে ফেলা গেল। সেখানে দিন-রাত আমোদ-আহ্লাদ। মদ এবং মেয়েমানুষের শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর শ্রাদ্ধও হয়ে এলো। বছর দুয়ের মধ্যে জান্‌তে পার্‌লাম, দেনা এত হয়েছে যে, তাঁকে ডিঙ্গিয়ে উত্তীর্ণ হবার উপায় নেই।

হঠাৎ একদিন কল্‌কাতার বাড়িতে আমার স্ত্রী এসে কাঁদাকাটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে পড়্‌ল—বলে—"কর্‌চ কি, শেষ কালে কি পথে দাঁড় করাবে?"

এ সব বিষয়ে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতা ব'লেই মনে হ'ল। রাগের মাথায় আর নেশার ঝোঁকে স্ত্রীকে পদাঘাত কর্‌লাম—কর্‌তেই—স্ত্রী তখন গর্ভিণী ছিলেন—গর্ভপাত হয়ে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁকে আর পথে দাঁড়াতে হ'ল না!

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার অভাবটা একটু একটু করে মনে হত। মনে হ'ল, দিনরাত ঝড়ের মত মাতামাতি ক'রে এক্‌ আধবার মাথা রাখ্‌বার জন্য ছোট-খাট একটু স্থান না থাক্‌লে কেমন ক'রে বাঁচি।

হঠাৎ সব বন্ধ ক'রে দিলাম। বেগতিক দে'খে বন্ধু-বান্ধবেরাও স'রে পড়লেন। আমিও কলকাতার বাড়ি বেচে বিলাসপুরে ফিরে এলাম।

এখানে সব যেন খালি মনে হত। এত বড় বাড়িখানির মধ্যে সে এমনি ক'রে আপনাকে জড়িত ক'রে রেখে গেছে, তার কথা মনে না ক'রে এক মিনিট কাটাবার উপায় নেই।

প্রথমে যা ভাল লাগ্‌ত, শেষে তা বিরক্তিকর হয়ে উঠল। এমন হ'ল যে, বিলাসপুর ছাড়াই স্থির করলাম।

যাই কোথা? এমন জায়গা কোথায় আছে—যেখানে মনের জ্বালা জুড়াতে পাই?

মনে হ'ল, তীর্থ ক'রে এলে মন শান্ত হবে। কত দেশ, কত বিদেশ ঘুরে কোথাও শান্তি পেলাম না। অবশেষে বৃন্দাবনে এলাম।

আহা, কি মধুর স্থান! একখানি ছোট বাড়ি নিয়ে বৃন্দাবনে বাস কর্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুদিন বাস করার পর জান্‌তে পার্‌লাম যে, আমি আবার জড়িয়ে পড়্‌চি। কিন্তু তখন নিরুপায়!

একটি মেয়ে হ'ল। প্রথম যে দিন মেয়েটিকে দেখলাম, সেই দিনই বৃন্দাবন ত্যাগ কর্‌লাম। মেয়েটির মুখ কেমন ক'রে কি জানি, ঠিক যেন আমার স্ত্রীর মতই হয়েছিল। হঠাৎ মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। বোষ্টমীটাকে বাড়িখানা লিখে দিলাম। কিছু নগদও দিলাম। এ জন্মে আর বৃন্দাবন যাইনি।

বিলাসপুরে ফিরে এসে দেখলাম, জমিদারি নীলামে উঠেছে। তার পর বিক্রী হয়ে গেল! যাক্, বাঁধন গেল।

কল্‌কাতায় ফির্‌লাম। এইবার তার স্বরূপ দেখ্‌লাম। পুরাণ দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা চিন্‌তে পার্‌লে না। মানুষ মানুষকে চেনে না। মানুষ টাকা চেনে। যার টাকা নেই—তার কিছু নেই।

আজন্ম নবাবি ক'রে একদিন সকালে যে কাঙাল হয়ে পথে দাঁড়ায়, তার কি লজ্জা, তা বলা যায় না।

মনে কর্‌লাম, আত্মহত্যা করি; কিন্তু ভয় হলো। মর্‌তে ভয় পেলাম। এত কষ্ট, তবুও বাঁচ্‌তে সাধ!

ভিক্ষা কর্‌তে লজ্জা হ'ল। তার চেয়ে চুরি করা ইজ্জতের কাজ মনে হ'ল। যেদিন চোরের জগতে নেমে পড়্‌লাম, সেদিন দেখ্‌লাম, আর একলা নই। অনেক দোসর জুট্‌লো।

গুরু দীক্ষা দিলেন—বল্‌লেন, চুরি কে না কর্‌চে?—কেউ বা চালাকি করে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে—আর কেউ বা সরলভাবে। অবশ্য, আমি সরল পথেই চল্‌লাম।

পুলিসের সঙ্গে বেশ আলাপ হলো; যেটা লাভ হ'ত, তার আট আনা অংশ তার হাতে তুলে দিলে কোন ভয় নেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না। একদিন আমাদের দল ধরা প'ড়ে গেল। গুরুদেব যথাসময়ে পালিয়ে বাঁচ্‌লেন। আমার চেহারা ছিল ভাল—পুলিস আমাকেই দলপতি ঠাউরে নিয়ে ঠেলে দিলে।

মামলার যখন শেষ হলো, তখন জান্‌লাম যে, কল্‌কাতা সহরে এতদিন যত কিছু চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সে সব আমারই নেতৃত্বে! তাই আমার কিছু লম্বা রকম জেল হলো।

হলো ভাল। নিরাশ্রয় আশ্রয় পেলে। জেল জায়গাটা মন্দ নয়। একটু বনিয়ে চল্‌তে পার্‌লে সেখানেও বেশ চালিয়ে দেওয়া যায়।

কিছুদিন ঘানিতে কাজ কর্‌লাম। অসুখ হয়ে যেতে সহৃদয় ডাক্তার সাহেব বল্‌লেন, 'এ কাজ ও পার্‌বে না।' হাসপাতালের অন্ন ধ্বংস ক'রে বা'র হয়ে—ছাপাখানার কাজে ভর্ত্তি হলাম। বেশ লাগ্‌ল। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করাতে—উন্নতি হলো—প্রুফ-রিডার হলাম। এমনি ক'রে কিছুদিন কাটাতেই শুন্‌লাম, আমার নাকি কিছু ক'রে মাইনে বরাদ্দ হয়েছে—সেটা বা'র হবার সময় পাবো।

জেলে যখন ঢুকেছিলাম, তখন চুল ছিল কালো—যে দিন বেরুলাম, সেদিন সব সাদা।

জেলার সাহেব ডেকে বল্‌লেন, 'যদি তুমি জেলে কাজ কর্‌তে চাও তো তাও কর্‌তে পার; নহিলে তোমার ৪০০্ টাকা আছে, তা নিয়ে ব্যবসা করেও দিন কাটাতে পার। আশা করি—আর পাপের পথে যাবে না।'

আর জেলে থাকতে ভাল লাগ্‌ল না—বেরিয়ে পড়্‌লাম। সটান্ এসে জগন্নাথ ঘাটে স্নান ক'রে উঠে এক বাবাজীর ধুনীর পাশে জায়গা নিলাম।

বাবাজি গাঁজার কলিকায় দম দিয়ে তাঁহার প্রসাদ দিলেন। জেলে থাক্‌তে গাঁজাটার অভ্যাস হয়েছিল। কয়েদীরা ত্বরিতানন্দকেই বেশী পছন্দ করে।

গাঁজা টেনে ভম্ হয়ে বাবাজির পাশেই ব'সে রইলুম। দুপুরের সময় বাবাজি উঠ্‌লেন; আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম।

বাবাজি হেসে বল্‌লেন, 'কাঁহা জায়েগা?'

'আপনার সঙ্গে।'

একটু ইতঃস্তত ক'রে বাবাজি 'আচ্ছা আও' বলে চললেন।

*　　*　　*　　*　　*

বাবাজি যেখানে থাক্‌তেন—তা আমার খুবই পরিচিত স্থান। যখন কাপ্তেনি কর্‌তাম, তখন এখানেই আমার ঘরবাড়ি ছিল।

একটা দোতালা বাড়ির নীচের তালায় বাবাজির স্থান। হয়তো কিছু ক'রে ভাড়া দিতে হয়। বাবাজির ভৈরবী নাই; কিন্তু তার অভাবে সন্ন্যাসধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবার কোন আশঙ্কা ছিল না!

প্রথম দিন বাবাজির মুটের কাজে ভর্ত্তি হলাম। দ্বিতীয় দিন পাচকের কাজ কর্‌লাম। তৃতীয় দিন বাবাজি অর্দ্ধচন্দ্র দান কর্‌লেন।

স্রোতে আবার গা ভাসালাম। সমস্ত দিন অনাহারে কাট্‌ল। সন্ধ্যার সময় ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেলাম। পেটে ভার পড়াতেই চোখে ঘুম এল; কিন্তু শুই কোথায়?

উদ্‌ভ্রান্ত-মনে পথে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একটা গ্যাসের তলায় একখানা মুখ দে'খে হঠাৎ বুক্‌টা ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌তে লাগ্‌ল। আর এক পাও চল্‌তে পার্‌লাম না। একদৃষ্টে সেই পদ্মের মত সুন্দর মুখখানা দেখতে লাগ্‌লাম।

খানিকক্ষণ পরে শুন্‌তে পেলাম, কে বল্‌চে—'ওলো স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া—দেখচিস্ নে,—বুড়োর ধাঁধা লেগে গেছে। আ মরণ, বুড়োর রকম দেখ!'

নির্ব্বাক নিস্তব্ধ ভাবে সেখানে যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানিনে। বুকের মধ্যে আগুনের হল্‌কা চল্‌ছিল। শেষকালে সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি আমার হাত ধ'রে তার ঘরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট খোলার ঘর। পরিপাটী বিছানা। মেজেতে মাদুরে বস্‌লাম। মেয়েটি তামাক সেজে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'বামুন?' আমি ঘাড় নাড়তেই হাতে হুঁকো পেলাম। মনের আনন্দে তামাক টান্‌তে লাগলাম।

ঘরের দেওয়ালে অনেক রকমের ছবি। কালী তারা ত আছেই। দূরে কুলুঙ্গীর মধ্যে একখানা ছবি দেখলাম—সেটাতে ফুলের মালা দেওয়া; চন্দন ছেটান। প্রত্যহ ধুনো দেওয়াতে ছবিখানা অন্ধকার হয়ে গেছে।

মেয়েটি আমার পায়ের কাছেই ব'সে ছিল। বল্‌লাম, 'মা, ওটা কি?'

'কোথায়?'

'ওই কুলুঙ্গির মধ্যে?'

'ও আমার বাবার ছবি।'

'নিয়ে এস তো দেখি।'

ছবিখানা নিয়ে এল। ছবিখানা দে'খে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। 'হাঁ, মা, এ ছবি কোথায় পেলে?'

'আমার মা দিয়ে গেছেন। তিনি রোজ একে এমনি ক'রে মালাচন্দন দিয়ে পূজো কর্‌তেন। আমিও তাই করি।'

বুকের মধ্যে আমার যেন একটা ব্যথার সমুদ্র তোলপাড় ক'রে গেল। 'সর্ব্বনাশ! এ কে?'

'অমন ক'চ্চেন কেন?'

আমি কোন কথার উত্তর দিতে পার্‌লুম না। আমার মনে বোষ্টুমীর কথা জেগে উঠ্‌ল। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, কি আকর্ষণে সেদিন সন্ধ্যায় মেয়েটা আমাকে টেনেছিল।

ছবিখানার দিকে চেয়ে হাসি এল—পাগল তোরা, কার পূজো করচিস্?

ঘর যেন চিতার জ্বলন্ত আগুন মনে হল।

আমি উঠে কুলুঙ্গী থেকে ছবিখানা নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেললাম।

আর সেই মেয়েটার পায়ের কাছে জেলের কামান চার শ' টাকার চারখানা নোট ছুঁড়ে—ছুট—ছুট—একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে।

"তারপর এই দেখচ আমাকে।"—বাবাজি দ্রুতপদে চ'লে গেলেন।

তখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নহবতখানা থেকে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ললিতের সুর ঊষার ঈষদুজ্জ্বল আকাশের পানে উঠছিল। দূরে একজন গঙ্গা-সলিলে স্নান করতে করতে গাইছিল,—

"আনন্দ-ভবন গিরিজাপতি-নগরী,
মন কাঁহে নহি বাস লাগাওত।"

পৌষ, ১৩২৪

ঠানদিদি

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[১]

সকলে তাহাকে বলিত ঠানদিদি। তা'ছাড়া তাঁর যে অন্য নাম ছিল, তাহা কেহ জানিত কি না সন্দেহ। ঠানদিদি বলিয়া তিনি বুড়ী ছিলেন না। বয়স তাহার বছর চল্লিশ, কিন্তু সমস্ত শরীরে তাঁর একটা নিটোল সৌষ্ঠব ছিল—যাহা দিন-রাত বয়সকে টিট্‌কারী দিত। তাঁর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য ঢলঢল করিত, চক্ষে তাঁহার বিজলী খেলিত, অলঙ্কারহীন সহজ স্থির যৌবন তাঁহাকে যেন আগাগোড়া ছাইয়া শোভামণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার সৌন্দর্য মিনমিনে ধরণের নয়, বেশ লম্বা-চওড়া, আগাগোড়া স্পষ্ট ও বৃহৎ, যেন গ্রেট অক্ষরে ছাপা একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ।

ঠানদিদি বিধবা, তাই তাঁহার গহনা নাই। তিনি মাছও খান না, সাদা কাপড়ও প্রায় পরেন। ইহা ছাড়া বৈধব্যের অপর লক্ষণ তাঁহার ভিতর নাই। অধরে তাম্বুলরাগ মাঝে মাঝে তাঁহার না দেখা যাইত, এমন নহে। একাদশীতে ভাত খাইতেন না, কিন্তু যে ভোজনের আয়োজন হইত, তাহাতে অতৃপ্তির কোনও কারণ ছিল না। আর সদাসর্ব্বদা তিনি যেমন হাসিয়া গাহিয়া রঙ্গরসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তাহা বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না।

ঠানদিদির নিন্দার অন্ত ছিল না। সতী-সাধ্বীরা তাঁর নাম করিলে আচমন করিতেন। অসতী বলিয়া তাঁর অপবাদ ছিল—সে তো তুচ্ছ কথা। দু'একজন সেকেলে বুড়ী ইহাও রটাইয়াছিলেন যে, তিনি আপন হাতে বিষ দিয়া স্বামীকে বধ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ঠিক খবরটা কেহ বলিতে পারিত না, কেন না, সে বিশ বছরের কথা—আর তাঁ'র স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল দূরদেশে তাঁর কর্ম্মস্থানে। এখন ঠানদিদি থাকেন পাড়াগাঁয়ে।

এত বড় পাপিষ্ঠাকে কিন্তু গাঁয়ের লোকে যে ঘৃণা করে, সে কথা তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। ঠাকুরঘরের দুয়ারের কাছে তিনি আসিলে সবাই কোনও না কোনও অছিলায় তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ বলিত না—তুমি এখানে আসিও না। কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণের রান্না রান্ধিতে কেহ তাঁহাকে ডাকিত না, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁহার সব বাড়ীতেই ডাক পড়িত; কারণ, এই নিভৃত পল্লীতে কেহ তাঁর মত নানা রকমের খাবার তৈয়ার করিতে জানিত না। আর ঠাকুরাণী যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই শোভন সুন্দর অমৃত তুল্য হইয়া উঠিত। সকল রকম শিল্পে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। রোগে তাঁর মত সেবিকা গ্রামে কেন দেশে কোথাও ছিল না। পাশ করা শুশ্রূষাকারিণী তাঁর কাছে লাগে না।

ঠানদিদি মিষ্টভাষিণী, পরোপকারিণী। তিনি বিশ বছর আগে যে দিন বিধবা হইয়া মীরপুর গ্রামে পা দিয়েছিলেন, সে দিন হইতে তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত কেবল দশজনের কাজে ব্যয় হইয়াছে। নিজের তাঁহার কিছু করিবার ছিল না, তবে সকলের সব কাজ সারিয়াও রোজ নিজের আহারের পারিপাট্যের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ব্রত উপবাস নিয়ম

তিনি করিতেন না। কোনও দিন কোনও ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে কেউ গড় হইতে দেখে নাই, নিজেও দীক্ষা লন নাই।

এমন একটি অদ্ভুত মেয়েমানুষ যখন প্রথম গাঁয়ে আসিয়া বসিল, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার উপর মহা ক্ষিপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই স্ত্রীলোকটির ক্ষমতা। বৎসর না ফিরিতে সে সকলকে বশ করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ সুদর্শন ভট্টাচার্য্য একদিন তাঁকে যা'নয় তাই বলিয়া গালি দিল, তা'র ঠাকুরদালান হইতে বিদায় করিয়া দিল। ঠানদিদি হাসিয়া বামা দাসীকে বলিলেন, "ঠাকুর বলেছেন ঠিক; দেবতাদের সঙ্গে আমার যে আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক, তা'তে ওঁদের ওদিকে আমার না ঘেঁষাই ভাল।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী প্রথম সাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন, ঠানদিদি হাসিয়া বলিলেন, "দিদি, শেয়াল-কুকুরকে কি চোখ দিয়েও দেখ্‌তে নেই; নেহাৎ দু'ঘা মার্‌তেও তো দেখতে হয়।" মোটের উপর, কড়া কথা বা কটু ব্যবহার ধুলার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁর হাসিভরা মুখ ও বুকভরা সেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন তিনি তাঁদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কেহ তাঁহাকে আর ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না।

[২]

আমার বিবাহ হইবার পর ঠানদিদি হইলেন আমার প্রধান সখী। তিনি আমার মায়ের বয়সী, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে আমার কোনও দিন একটুকু দ্বিধা হয় নাই, বরং শ্বশুরবাড়ীর সঙ্কোচটা তাঁহার সহৃদয় স্পর্শেই আমার কাটিয়াছিল। তিনি আমার সহিত রহস্য করিতেন, কিন্তু ঠানদিদি সম্পর্কের আর দশজনের মত ছেবলামী করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। তাঁহার কথাবার্ত্তার লঘুত্বের ভিতর এমন একটা শান্ত মাধুরী ছিল যে, সে কথায় মন পাতলা হইত, কিন্তু তাহাতে ময়লা লাগিত না, ক্লান্তি আসিত না।

কালে কালে আমি ঠানদিদির একেবারে অন্ধ উপাসক হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার সখী ও সহচরীও বটে। আর আমার সব বিষয়ের গুরুও বটে, এমন কোনও কথা ছিল না—যা'তে তাঁর কথা বেদবাক্যের মত না মানিতাম। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বিধবার অযোগ্য অনাচার আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতাম না। একদিন পান সাজিতে বসিয়াছি, তাঁকে একটা সাজিয়া দিলাম, তিনি খাইলেন। আমি বলিলাম, "ঠানদি, তুমি পান খাও কেন?"

"মর্‌ পোড়ারমুখী, একটা পান যদি বা হাতে তুলে দিলি, তার আবার খোঁটা দিচ্ছিস্‌?" বলিয়া স্নিগ্ধ হাস্যময় সুন্দর চক্ষু আমার মুখের উপর রাখিলেন।

আমি বলিলাম, "রঙ্গ রাখ ঠানদি, আজ তোমায় আমি ছাড়্‌ছি না। তোমায় বল্‌তেই হ'বে, তুমি এ সব অনাচার কর কেন?"

"যা কর্‌তে নেই, তা' কর্‌লে কি হয়?"

"পাপ হয়।"

"পাপ কর্‌লে কি হয়?"

"কে জানে কি হয়; পাপ কর্‌তে নেই, তাই জানি।"

"আমি জানি, পাপ কর্‌লে নরকে যায়, সেখানে খুব শাস্তি পায়।"

"এ কথা তুমি মান?"

"হাঁ, আরও মানি যে, বিধবা যদি আচার-নিয়ম মেনে, দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, সমস্ত জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করে, তবে তার পুণ্য হয়, সে স্বর্গে যায়, অনন্তকাল স্বামীর সহবাস করে।"

ঠানদিদির মুখের হাসিটা যেন একটু ঘোর হইয়া উঠিল।

আমি অবাক্ হইলাম, বলিলাম, "এত যদি মান, তবে নিষ্ঠা আচার-নিয়ম কর না কেন?"

"আমি স্বর্গে যেতে চাই নে ব'লে, আর স্বামীর ঘাড়ে আর চাপ্তে চাইনে ব'লে, নরকে প'ড়তে চাই ব'লে,—বুঝলি?"—বলিয়া ঠানদি আবার হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "আবার ঠাট্টা? আজ তোমায় সত্যকথা বল্তেই হ'বে।"

"ঠাট্টা নয় দিদি, খাঁটি সত্য।"—ঠানদিদির চোখটা একটু ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় আমার ছয় মাসের খোকাটি আসিয়া কখন্ পানের থালাটি ধরিয়া টান মারিয়াছে, আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে দেখিতে সব ক'টি পান মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি খোকার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিলাম, "মরণ হয় না, মুখপোড়া!"

ঠানদিদি অমনি "ষাট্ ষাট্" বলিয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মহাব্যস্ত হইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, "দেখ্ বিমলা, এমন কাজটি আর করিস্ না, ভুলেও স্বপ্নেও যেন এমন অলক্ষণে কথা মনেও আনিস না, মুখেও আনিস না।"

আমার প্রাণে তখন বড় অনুশোচনা হইতেছিল, কিন্তু বলিলাম, "সাধে কি বলি ঠানদি, দেখ দিকিন্ পানগুলো কি ক'রে দিলে?"

"হাঁরে পোড়ারমুখী, তুই তো কথাটা ব'লে দিয়েই খালাস, কথাটা গিয়ে কোন্ দেবতার কানে উঠে, মনে গাঁথা রইল, সে খবর তো তুই রাখিস্ না। ষাট ষাট বাছা ষাট ষাট।" ঠানদিদির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আমি কিছুক্ষণ কথা কহিলাম না, মনে মনে ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা কুটিলাম, আমার বাছার যেন অকল্যাণ না হয়। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, শেষে আমি বলিলাম, "হাঁ ঠানদিদি, দেবতারা কি মানুষের কথা শুনেন? তবে মানুষ যে দিন-রাত এত মানত কর্ছে, কই, কার কি হচ্ছে?"

ঠানদিদি চোখের জল মুছিতে মুছিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন "হাঁ, তাঁরা মানুষের কথা শোনেন, রাখেনও; কিন্তু সে কেবল তাদের শাস্তি দেবার জন্য। আমার মনের একটা বড় গোপন কথা শুনে তাঁরা আমায় কি শাস্তিই দিয়েছেন!"

ঠানদিদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ্ বিমলা, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি, আমি অনাচারী কেন? সে কথা তোকে খুলে বল্‌বো। কথা শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বি, ভগবান্ কেমন ক'রে আমাদের কথা রাখেন?"

ঠানদিদি তাঁর জীবন-কাহিনী বলিলেন।

[৩]

ঠানদিদির কথা

আমি যৌবনে বড় সুন্দরী ছিলাম। আমার স্বামীও পরম সুপুরুষ ছিলেন। স্বামী মজঃফরপুরে বড় চাকরী কর্তেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল, মেয়েমহলে আমার খ্যাতি তার চেয়ে কম ছিল না।

স্বামী আমাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন বুঝি কোনও স্বামী কখনও কোনও স্ত্রীকে বাসেনি। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসিতাম। সারাদিনরাত্রি আমার সব কাজ, সব চিন্তা কেবল আমার স্বামীকে ঘিরিয়া থাকিত। তিনি সে কথা জানিতেন, আর আমার ছোট ছোট সেবা ও ছোট ছোট কথায় যে চরিতার্থতা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিত তাহাতে আমার হৃদয় গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিত। ভাবিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমার বয়স যখন ঊনিশ, তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ। সেই সময় তাঁর একটা পদোন্নতি হইল, কাজও অনেক বাড়িয়া গেল। আগে যেমন দিন-রাত তাঁহাকে আমার কাছে পাইতাম, এখন আর তাঁহাকে তেমন পাই না। বাড়ীতেও তিনি সদাসর্ব্বদা কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ঘটিয়া উঠিত না।

এই সময় একদিন আমি জানালার ধারে বসিয়া আছি, দূরে রাস্তা দিয়া একটা নীলকর সাহেব যাইতেছে। এমন সময় স্বামী পিছনদিক্ হইতে আসিয়া বলিলেন, "কি গো সতি, অমনি ক'রে বুঝি বিরহযাপন কর্‌ছ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি রকম?" অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া আমার সমস্ত শিরায় শিরায় নাচন উঠিয়াছিল, সে কথা তাঁর কাছে গোপন রাখিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, "বলি, ডেভিড সাহেবের সহিত কি প্রেমালাপ হচ্ছিল?" বলিয়া তিনি আমার চিবুক টিপিয়া ধরিলেন।

"যাও" বলিয়া আমি মহা রাগ করিয়া সরিয়া গেলাম। তিনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, "মাফ কিজিয়ে মেম সাব, গোস্তাকী কিয়া।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মাফ করা গেল, কিন্তু এমন গোস্তাকী যেন আর না হয়।"

কিন্তু এমন গোস্তাকী তাঁর প্রায় হইত।

এমন সময় আমার পিসতুতো দেবর শচীকান্ত আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। সে তখন এম. এ. পড়িতেছে, শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় সে মজঃফরপুরে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে।

শচীকান্তের বয়স তখন একুশ বাইশ। সুন্দর না হইলেও তাহার শরীরে সৌষ্ঠব ছিল, আর চক্ষু দুটি তা'র এক অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল ছিল। কথাবার্ত্তায় সে অদ্বিতীয়। তার কথায় ও তার ভাবভঙ্গীতে এমন একটা মিষ্ট মোহের সৃষ্টি করিত যে, একবার বসিলে আর তা'র কথা ফেলিয়া কেহ উঠিতে পারিত না।

শচীকান্ত হইল আমার অবসরের সঙ্গী, কর্ম্মে সহচর। দিন-রাত সে কাছে কাছে থাকিত, দিন-রাত তা'র মধুময় কথা শুনিতাম, শুনিয়া তৃপ্তি হইত না।

একদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাংলোর বারান্দায় বসিয়া জামা সেলাই করিতেছি, শচীকান্ত একখানি বই লইয়া বসিয়াছে। বই কোলে রাখিয়া শচী গল্প করিতে লাগিল, আমিও সেলাই কোলে রাখিয়া শুনিতে ও মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগিলাম। বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, তাহারও পড়া অগ্রসর হইল না, আমার সেলাইও যেমন তেমনি রহিল।

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি অন্যমনস্কভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি গো, এত শীগ্‌গির ফিরে এলে?"

"বড্ড মাথা ধ'রেছে" বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। সে দিকে আমার মোটেই মন ছিল না বলিয়া সে কথা আমার কানেই গেল না। আমি শচীকান্তের কথা শুনিতে লাগিলাম। খানিক পরে তা'র কথাটা শেষ হইলে ঘরে গিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "বড্ড মাথা ধ'রেছে কি?" ঘরে আসিয়াই আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; বুঝিয়াছিলাম যে আমার বড় ত্রুটি হইয়াছে,—তাঁর পিছু পিছু ঘরে না আসায়। তাঁর মাথার যন্ত্রণা আমার সেবার মত অন্য কোনও উপায়ে আরাম হইত না।

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না—যাও।"

আমার বুকের ভিতর দুড়্‌দুড়্ করিয়া উঠিল। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। এক গ্লাস জলে ওডিকোলন ঢালিয়া আনিয়া বলিলাম, "এসো, মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে বাতাস করি।"

তিনি কিছু না বলিয়া আমার হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া মাথা ধুইয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আমি নিতান্ত অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; আমার বুক ঠেলিয়া কি-যেন একটা উঠিতে লাগিল। খানিক বাদে আমি নিঃশব্দে পাখা লইয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। স্বামী কিছু বলিলেন না।

শচীকান্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার কি অসুখ ক'রেছে?"

স্বামীর মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। আমি শচীকান্তকে ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিতে বারণ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলাম। তাহার মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি দেখিলাম, স্বামী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলেন; আমি পাখা রাখিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। সেখানে শচীকান্ত একখানা তক্তপোষের উপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

আমি গিয়া বসিতেই তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহাতে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। আমি যেন একটু কাঁপিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া সেই তক্তপোষের উপরে বসিয়া পড়িলাম।

তারপর ক্রমে একথা ওকথা হইতে হইতে আমার সঙ্কুচিত ভাবটা কাটিয়া গেল, শচীকান্ত তাহার সেই প্রাণস্পর্শী ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমি আগ্রহের সহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিলাম। কথাটা অতি তুচ্ছ, তাহাদের কলেজের কোন প্রফেসারের কেমন হাস্যকর বিশেষত্ব আছে, তাই সে বর্ণনা করিতেছিল। কিন্তু সে কথাগুলি এমন সরল করিয়া বলিত আর তার গলার আওয়াজ এত আশ্চর্য্য মিষ্ট ছিল যে, যত তুচ্ছ কথা হৌক না কেন, কান পাতিয়া শোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

এমন করিয়া কতক্ষণ গেল, বুঝিতে পারিলাম না। যখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইতেছে, এমন সময় শচীকান্ত বলিল, "বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই আমায় রাখ্‌বে না কি? খাবার দাও।" আমি লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, শচী একাগ্রচিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, আমি লজ্জিত নববধূর মত ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম।

মিথ্যাকথা কহিব না। শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল; কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তাহার উপর রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়াইয়া দিলাম, হয় তো বা আশাও দিলাম।

ঘরের ভিতর আসিতেই দারুণ বেদনা অনুভব করিলাম। আমার চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমার কান্না পাইতে লাগিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল, শচী আমাদের এখানে আসিল কেন?

আকাশপাতাল ভাবিতে ভাবিতে খাবারের থালা লইয়া শচীকান্তকে দিতে গেলাম; এবার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াই গেলাম—আর তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমি গম্ভীরভাবে খাবারের থালাটি রাখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সে বলিল, "ওরে বাপ রে, এ যে গন্ধমাদন পর্ব্বত; এতগুলো আমি খাব কি ক'রে?"

আমি বলিলাম, "তার মানে আমি হনুমান্? বলি, এমন কত গন্ধমাদন তোমার পেটে রোজ কতটা যায়, খবর রাখ কি?"

হায়, কোথায় গেল আমার গাম্ভীর্য্য, কোথায় গেল আমার আত্মরক্ষার আয়োজন!

সে বলিল, কিছুতেই সে এতগুলো খাইতে পারিবে না, এবং ধরিয়া বসিল, আমাকে

তাহার সঙ্গে খাইতেই হইবে। আমি তাহার পীড়াপীড়ি এড়াইতে পারিলাম না। আমার কেমন একটা অবস্থা হইয়াছিল যে, সে কিছু জোর করিয়া ধরিলে আমি "না" বলিতে পারিতাম না। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আমি একটা মিষ্টি তুলিয়া খাইলাম। সে বলিল, "ওতে হবে না, এই পানতুয়াটা নিতে হ'বে।" আমি অস্বীকার করায় সে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া পানতুয়াটা হাতে গুঁজিয়া দিল। আমার শিরার ভিতর রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় স্বামী আসিয়া সম্মুখ দিয়া বারান্দায় ঢুকিলেন। আমার সমস্ত শরীর একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে সাহস হইল না।

তিনি যে কখন্ বিছানা হইতে উঠিয়া ভিতরের দিক্ দিয়া বাগানে বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং কতক্ষণ যে সেখানে পায়চারী করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আমি কোনও খবর রাখি নাই। খাবার আনিবার সময়ে ঘরে গিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তখন আমি এত তন্ময় হইয়াছিলাম যে, তাঁহার কথা মনেই হয় নাই এবং তিনি বিছানায় আছেন কিনা, লক্ষ্য করি নাই।

আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ভাঙ্গা গলায় বহু কষ্টে বুকের কাঁপুনি চাপিয়া বলিলাম, "কখন্ উঠলে তুমি?"

স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "সে খবর নেবার তো অবসর হয়নি, দেওরটি নিয়েই ব্যস্ত আছ।" তাঁর মুখ প্রশান্ত, কিন্তু যেন একটা ক্ষীণ বিষাদের ছায়ায় আবৃত।

এ কথায় আমি অসম্ভব লাল হইয়া উঠিলাম, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘামিয়া উঠিল। ডেভিড সাহেবের কথায় তো কখনও এমন হয় নাই।

শচীকান্তও যেন কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে খাবার খাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, আমি কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "মাথাটা ছেড়েছে কি?"

স্বামী বলিলেন, "হাঁ, অনেকটা।"

আমি বলিলাম, "খাবার দেব কি?"

স্বামী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার কি আর খাবার দরকার আছে? তোমাদের তো হয়ে গেল দেখছি। আমায় তো একবার খবর কর্‌লে না?"

তাঁহার কথার ভাবে আমার মনের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁর খাবার আনিয়া দিলাম এবং চা করিয়া দিলাম। তার পর কথায়-বার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমার মন অনেকটা পাতলা হইয়া আসিল।

[৪]

রাত্রে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আজকার ঘটনায় আমার স্পষ্ট জ্ঞান হইল যে, আমি একটা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া ছুটিয়াছি—এই শচীকান্তের দিকে। আমার হৃদয় যে কত দূর চঞ্চল হইয়াছে, কি এক বিষম নেশায় আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিজের মনের কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনের ভিতর সে তিরস্কার পৌঁছিল না, শচীকান্তের কথামাত্রে প্রাণের ভিতর এমন একটা পুলকের ঢেউ উঠিল, তার সাম্‌নে সব যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলাম, "আমায় এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর।" কিন্তু সে কথা মুখেই রহিল, প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ, সে বলিল, "এ সুখের নেশা যেন ভাঙ্গে না!" আপনার ভিতর এ বিরোধ লইয়া আমি পর পর সুখ ও দুঃখের বেদনায় একেবারে চুরমার হইবার মত হইলাম। শেষ আমার সুপ্ত স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম,

কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কাঁদিলাম দুঃখে—নিজের ভিতরকার এই যুদ্ধের অসহনীয় বেদনায়! কাঁদিলাম,—আমি ভাল হইতে চাহিতে পারিলাম না বলিয়া! আর কাঁদিলাম সত্য দুঃখে,—আমার স্বামীর হৃদয়ের জ্বালা অনুভব করিয়া। বেচারা সমস্ত জীবন আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছে, আমা বই কিছু জানে না, তার প্রাণে এ সন্দেহের বেদনা কি নিদারুণ, তাই ভাবিয়া কাঁদিলাম। আমার পোড়ার মুখ, আমি তার এ বেদনার কেন সৃষ্টি করিলাম!

কতক্ষণ এমনি করিয়া শুইয়াছিলাম, জানি না। জাগিয়া দেখিলাম, স্বামী আমার মাথা বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার বুক প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে। আমি জাগিতেই তিনি বলিলেন, "তোমার উপর আমি বড় অবিচার করিয়াছি! তোমার ভালবাসার এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিয়াছি, এটা বড় নিষ্ঠুরের কাজ হইয়াছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

আমি আমার কালামুখ তাঁর বুকের ভিতর লুকাইলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া আবার সেই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার উঠিতে কিছু দেরী হইয়াছিল, স্বামী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বরাত্রের সে অনুশোচনার তীব্রতা তখন যেন আশ্চর্য্যরকম কাটিয়া গেল; বরং আমার মনশ্চাঞ্চল্যের স্বপক্ষে নানা ওজর খুঁজিতে লাগিলাম! স্বামীর সন্দেহটা দূর হইয়াছে, তাহাতে অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। মনটা আবার কেমন ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া খাবার করিতে গেলাম; চা' করিলাম—সব অন্যমনস্কভাবে! আমার মনের ভিতর কেবল এক অপূর্ব্ব মধুর সুর বাজিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, এটা অন্যায়, কিন্তু তখনি সে চিন্তাকে সরাইয়া দিয়া আবার মনের আবেগ আপন পথে ছুটিয়া চলিতে লাগিল, আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইলাম। ক্রমে শচীকান্ত কাছে আসিয়া জুটিল, আমি সকল চিন্তা, সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহার প্রীতি-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা সবই অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু আমি বুঝিলাম, তাহার মনের ভিতর কিসের ঢেউ খেলিয়া এই সব তুচ্ছ কথার ভিতর দিয়া আপনার রসের ধারা মিলাইতেছে। সেও যে আমার মনের কথা বুঝিল, তাহাতেও আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু আমাদের ভিতর সুধু একটা চোখের পর্দ্দার অন্তরাল রহিয়া গেল।

আমার স্বামীর নিকট হইতে আমার মন যে কখন অলক্ষিতে সরিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই দেখিলাম, স্বামীর সঙ্গ আমার কাছে প্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিতে হইত, ততক্ষণ যেন একটা বোঝা ঘাড়ে চাপিয়া থাকিত; তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। মাঝে-মাঝে এমন কি, তাঁকে একটা আপদ্ বলিয়া মনে হইত। যখন আমরা দুজনে—আমি আর শচীকান্ত বসিয়া বেশ গল্প জমাইয়া লইয়াছি, সে সময় যদি তিনি আসিয়া বসিতেন বা আমাকে ডাকিতেন, তবে আমার মনটা যেন বিষ হইয়া উঠিত, মনে হইত, আপদ্ গেলে বাঁচি। কথাটা মনে হইলেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি বাধা দিত, মনে মনে বলিতাম, বড় অন্যায় করিতেছি! কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপদ্রবটা ক্রমশঃই বেশী গা-সওয়া হইয়া উঠিতেছিল।

ইহার পর হইতে আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। প্রায়ই তিনি আফিস হইতে অসময়ে মাথা ধরিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে স্থির বুঝিলাম যে, ইহা কেবল আমাকে জব্দ করিবার ফন্দী, অসময়ে হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখিতে চান, আমি ও শচীকান্ত কি করিতেছি। এ কথা ভাবিতে আমার বড় রাগ হইত! এত অবিশ্বাস! আমি করিয়াছি কি? শচীকান্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র অন্যায় কিছু আছে, এ সময় আমি তাহা মনের কাছে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতাম না, কেবল দিন-রাত নিজের

কাছে নিজের সাফাই গাহিতাম, আর মনকে বুঝাইতাম যে, আমি কোনও দোষ করি নাই, আমার স্বামীরই অন্যায় সন্দেহ!

দোষ আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার অন্তর যে স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং শচীকান্তের উপর অনুরক্ত, এ কথা তখন ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

আমার আরও রাগ হইত আমার অদৃষ্টের উপর। আমি কোনও দোষ করি নাই, কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের যে, যখনি হঠাৎ আমার স্বামী আসিয়া পড়িতেন, ঠিক সেই সময়ই তিনি আমাদিগকে এমন একটা অবস্থায় দেখিতেন—যাহাতে হঠাৎ লোকে সন্দেহ করিতে পারে। একদিন আমরা বাগানে বেড়াইতেছি, শচী আমার পশ্চাতে পশ্চাতে কপিক্ষেতের আইল দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ আমি পা হড়কাইয়া পড়িবার মত হইলে শচী পিছন হইতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল, আমার চুল খুলিয়া তাহার পিঠের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িল। আমি সাম্‌লাইয়া উঠিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী ঠিক তখনি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমার সহিত দেখাদেখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। আর একদিন আমরা পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিয়া কথা কহিতেছি, একটা মশা আসিয়া আমার চোখের পাশে বসিল; শচী যেই মশাটা মারিবার জন্য একটা থাপ্পড় দিয়াছে, অমনি স্বামী আসিয়া উপস্থিত। আমরা দুজনেই মহা অপ্রস্তুত হইয়া ভেবাচেকা খাইয়া গেলাম। শচী বলিল, "পার্‌লাম না, মশাটা উড়ে গেল।" কথাটা সত্য হইলেও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা শুনাইল—যেন একটা বাজে ওজর। এমনি প্রায় রোজ একটা-না-একটা কিছু হইত—যা বাস্তবিক কিছু দোষের নয়, কিন্তু যা দেখিয়া স্বামী নিশ্চয় একটা ভয়ানক অন্যায় কিছু মনে করিতেন। আর তা'তে আমরা দু'জনেই সাহায্য করিতাম,—আমাদের ব্যবহার দ্বারা। এই রকম অবস্থায় স্বামী আমাদের দেখিলেই দু'জনেই যেন কেমনতর হইয়া যাইতাম—মুখ, চোখ, কান লাল হইয়া উঠিত, হয় তো এমন একটা কথা, এমন একটা অযাচিত ব্যাখ্যা দিতাম, যাহাতে সন্দেহ বাড়িত বই কমিত না।

আসল কথা এই যে, আমরা তিনজনেই পরস্পরের মনের ভাব খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু যেন বুঝি নাই, এমনি ভাণ করিয়া সবাই সবার সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছিলাম—তাই আমাদের এ বিপত্তি।

আমার যে অনুশোচনা না হইত, এমন নহে; কখনও কখনও নিরিবিলিতে কাঁদিয়া চক্ষু ভাসাইতাম; কিন্তু এই সকল সময়ে যখন স্বামীর অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিতাম, তখন যেন আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। মনকে কেবলি বুঝাইতাম, তিনি আমাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করিতেছেন। হৃদয় তাঁহার উপর বিষাক্ত হইয়া উঠিত; এক এক সময় মনে হইত, যে আমার উপর এমন অন্যায় সন্দেহ করে, এক মুহূর্ত্তও আর তাহার সহিত যেন বাস করিতে না হয়।

একদিন আমি বাড়ীর ভিতর কাজ সারিয়া বারান্দায় আসিতেছি, দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দুই ভাইয়ে কি কথা হইতেছে। আমি অগ্রসর না হইয়া কান পাতিয়া রহিলাম। কথা হইতেছিল—শচীকান্তের পড়া-শুনা সম্বন্ধে। স্বামী বলিলেন, "তোর আর এবার এক্‌জামিন দেওয়া হবে না। এখানে থেকে যা পড়্‌ছিস, তাতে তো থার্ড ক্লাশও হইবার সম্ভব নেই।"

শচীকান্ত যেন কতকটা বিব্রত, কতকটা উত্তপ্ত হইয়া উত্তর করিল, "এ পর্য্যন্ত তো কোনও এক্‌জামিনে ফার্স্ট ক্লাশের নীচে হয়নি, একটু দেখই না, এবার কি হয়, তারপর বলো।"

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যা'ক্।" তা'র পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাশিয়া বলিলেন, "আমি বলি, এই সময় একটু চেষ্টাচরিত্র কর্। কল্‌কাতায় গিয়ে এ দু'মাস প'ড়ে যাতে ভাল হ'তে পারিস্, তা'র চেষ্টা দেখ্।"

কথাটা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, শচীকান্তকে কলিকাতায় পাঠাইবার গরজের কারণ আমি। পড়া-শুনায় শচীকান্ত খারাপ হইতে পারে, এ কল্পনাও আমার কখনও আসে নাই, কাজেই সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। এ সব যে কেবল শচীকান্তকে আমার নিকট হইতে দূর করিবার ফিকির, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র রহিল না। আমি অক্ষম রোষে আপনি পুড়িতে লাগিলাম। বারান্দায় না গিয়া ঘরের ভিতর বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম।

এখন ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়, তখন আমার বোধ হইতেছিল, যেন স্বামী আমার জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। অপমানে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল। ভাবিতেছিলাম, 'হায়! এ অপমানের হাত হইতে উদ্ধার হইবার কোনও উপায় নাই কি?' কত অসম্ভব কল্পনা আমার মাথায় আসিতে লাগিল। স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া স্বাধীন হওয়া একটা কল্পনা প্রিয় দুরাশার মত আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বৈধব্যের কল্পনাও প্রীতিকর বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে, লজ্জার কথা বলিব কি, শচীকান্ত আমার সেই পতিবিহীন জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গেল। বিধবাবিবাহ, দেবরের সহিত পরিণয় প্রভৃতি কত কল্পনা আমার যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনের উপর দিয়া ছবির মত ভাসিয়া গেল—সে কল্পনায় আমি একটা অমানুষিক আনন্দের কম্পন শরীরের ভিতর অনুভব করিলাম।

পরক্ষণেই মনকে সংযত করিলাম; কল্পনার মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া নিজেকে একটু তিরস্কার করিলাম। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ মুহূর্ত্তের অসাবধান প্রচ্ছন্ন কামনা দেবতার হৃদয়ে ছাপ মারিয়া দিল; তিনি আমার এই দুর্দ্দান্ত কামনা পূর্ণ করিয়া আমার চরম শাস্তির বিধান করিলেন।

আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা একটু বেশী হইতেছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, সেটা শুধু আমাদের জব্দ করিবার একটা অছিলামাত্র। কিন্তু শীঘ্রই দেখিলাম, আমার অভিযোগ মিথ্যা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর আশ্চর্য্য রকম রোগা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমার অন্ধ নয়নে তখন সেটা পড়ে নাই। একদিন তিনি আফিস হইতে খুব বেশী মাথা ধরা লইয়া ফিরিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর আসিয়া দেখি, তিনি তেমনি পড়িয়া আছেন, গায় হাত দিতে দেখিলাম, ভয়ানক জ্বর। আমি থারমমিটার আনিয়া সাবধানে তাহা লাগাইলাম। জ্বর ১০৬ ডিগ্রীরও উপর। দেখিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন মুহূর্ত্তের জন্য অসাড় হইয়া গেল, আমি ছুটিয়া শচীকান্তকে ডাক্তার ডাকিতে বলিলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই, মস্তিষ্কের জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। ঔষধ আনিতে দিয়া তিনি শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তা'র পর ঔষধ আসিলে এক দাগ খাওয়াইয়াই তিনি বলিলেন, "একবার ডাক্তার সাহেবকে ডাকাও, অবস্থা গুরুতর বোধ হইতেছে।"

আমার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলাম, গত দুই মাসের সমস্ত ঘটনা অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার উপর যত অবিচার অত্যাচার করিয়াছি, তাহা মনে হইয়া আমাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। আর সর্ব্বোপরি তাঁর সমস্ত হৃদয়ভরা স্বার্থ-বিসর্জ্জিত ভালবাসার যে অপমান করিয়াছি, তাঁহাকে যে মিথ্যা স্নেহ দেখাইয়া বঞ্চনা করিয়াছি, সেই সব কথা মনে ভাবিতে

যেন আমার মাথার নাড়ীগুলি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, এমন বানরীর কণ্ঠে ভগবান্ কেন এ মুক্তাহার ঝুলাইয়াছিলেন!

ডাক্তারবাবু আমার স্বামীর বন্ধু। তিনি বলিলেন, "স্থির হ'ন মা। এ সময় আপনি অস্থির হ'লে কে কি কর্‌বে বলুন।"

কথাটা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। এক মুহূর্ত্তে যেন আমার ভাবপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিয়া আমি স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার সাহেব আসিলেন, আরও দুই জন ডাক্তার আসিলেন, তাঁহারা কলিকাতায় ঔষধাদির জন্য টেলিগ্রাম করিয়া যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। একজন ডাক্তার সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতেন।

কিছুতেই কিছু হইল না। স্বামী আর চক্ষু মেলিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি এই কৃতঘ্ন পাপিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া শচীকান্তের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছিত হইয়া আমি ছয় দিন ছিলাম। ক্রমে শচীকান্তের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। ক্রমে আবার সব কথা ভাবিবার শক্তি হইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাস আমি মজঃফরপুরে ছিলাম। শচীকান্ত সঙ্গে ছিল; সে তাহার সমস্ত জীবন আমার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যে প্রেমের বীজ আমি তাহার হৃদয়ে নিজ হাতে বপন করিয়াছিলাম, তাহা পত্রে-পুষ্পে সুন্দর হইয়া তাহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

এত বড় পাপিষ্ঠা আমি যে, তখনো আমার হৃদয় হইতে তাহার লালসা দূর হয় নাই। আমি তখনও তাহার কথায় তৃপ্ত, তাহার দর্শনে পুলকিত এবং তাহার কদাচিৎ স্পর্শে মুগ্ধ হইতাম। চাবুক মারিয়া আমি মনকে ফিরাইতাম, কিন্তু ফিরাইতে বেদনায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত।

আমি নিজেকে কষ্টে সংযত করিতাম, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কোনও আঘাত দিতে পারিতাম না। সে যদিও কোনও দিন একটি কথা বলে নাই, তবু তাহার হৃদয় পরতে পরতে আমার নিকট খোলা হইয়া গিয়াছিল। তাই কিসে তাহার আকাঙ্ক্ষা, কোথায় তাহার বেদনা, তা' আমি না বলিলেও বুঝিতে পারিতাম। তাই আমি তাহাকে নিরাশ করিতে—তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারিতাম না। সে যখন আমার কাছে আসিয়া বসিত, তাহাকে ফিরাইতে পারিতাম না; আমার মুখের কথা শুনিয়া সে কৃতার্থ হইত, তাহাতে আমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতাম না; আমার সেবায় সে সুখ পাইত, সে সেবা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা আমার অসাধ্য ছিল। তাই মনের সঙ্গে যতই কেন যুদ্ধ করি না, তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া পারিতাম না।

ছয় মাস পরে আমার স্বামীর জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আসিয়া পৌঁছিল। শচীকান্তই চেষ্টা করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া দিয়াছিল; চেকখানা আসিতেই একটু কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহা আমার নিকট দিয়া গেল। আমার বুক ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, চেকখানা হাতে করিতে আমার যেন সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল—সে যে আমার স্বামীর রক্ত—আমার বঞ্চনালব্ধ কলঙ্কের যৌতুক! এই কথাটাই বার বার আমার বুকের ভিতর আঘাত করিতে লাগিল যে, আমি আমার স্বামীকে আজীবন কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি! আমি তাঁহাকে ভালবাসি নাই, ভালবাসার ভাণ করিয়াছি; আমার ঝুঁটা মুক্তা দিয়া তাঁর হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ্ ঠকাইয়া লইয়াছি। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার সেই জীবনব্যাপী বঞ্চনার শেষ উপার্জ্জন!

শচীকান্ত আমার কাছে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। তা'র চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম—তা'র মনের

কথা। তা'র প্রাণ চাহিতেছিল আমাকে—বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তা'র অসীম প্রীতি দিয়া আমার দুঃখ নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া দিতে। তার বুকভরা ভালবাসা লইয়া সে আমার দুয়ারে আসিয়াছে—আমাকে সুধু দান করিয়া যাইতে। মুহূর্ত্তের জন্য এই চিন্তায় আমার মনে যেন একটা চরিতার্থতার ছায়া পড়িল! কিন্তু সেই চেকখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ আমার কর্ত্তব্য স্পষ্ট হইয়া চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল। কে যেন আমার ভিতর বলিয়া উঠিল—"ছি, আবার ঠকামি!" আমার স্বামীকে আমি যে নিদারুণ প্রবঞ্চনা করিয়াছি, আমার মনে হইল যেন, এই যুবককেও আমার সেই পৈশাচিক বঞ্চনার আবর্ত্তে ফেলিতে বসিয়াছি। আমি বলিলাম, "আর না, আজ এ বঞ্চনা শেষ করিয়া দিতে হইবে।"

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, "শচীকান্ত! তুমি আমাকে ভালবাস?" শচীকান্তের সমস্ত শরীর হঠাৎ একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল, পর-মুহূর্ত্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হ'য়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না ক'রে পারিনি। কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে, আমি জেনেছি যে, আমি নিজেকে ঠকিয়েছি, তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছি; তোমার দাদাকে আমি আজীবন ঠকিয়ে এসেছি; যখন তাঁর চোখ ফুট্‌লো, তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, কি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সর্ব্বস্ব আমি ঠকিয়ে নিয়েছি, তখন আর তাঁর শরীর তাঁকে বহন করতে পার্‌লে না; সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি এই পাপিষ্ঠাকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে স্বর্গে গেলেন। এত বড় মহাপুরুষকে খেয়েও যদি আমার ক্ষুধা না মেটে, আবার তোমাকে যদি আমি আমার বঞ্চনার আবর্ত্তে ডুবাই, তবে বল্‌তে হবে যে, আমি দুনিয়ার সেরা পিশাচী। আমি তা পার্‌বো না। তুমি আমাকে ত্যাগ কর। তোমাকে দেখ্‌লে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমাকে ভুলে যাও। আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, আমার কথা রাখ্‌বে?"

শচীকান্ত দাঁতে নখ কাটিতেছিল; তার মুখের প্রত্যেক শিরা উপশিরা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে নিপুণ ভাস্করের খোদাই করা বেদনার একখানি মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি একবার মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিলাম। তার পর উঠিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, "বল, আমার কথা রাখ্‌বে?"

এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আচ্ছা, তোমার কথাই থাক্‌বে।"

সে চলিয়া গেল। আমি সেইখানে মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিলাম; বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে দুঃখ আমি কাহাকে জানাইব? দুঃখীর আশ্রয়, তার চিরদিনের শান্তিদাতা ভগবান্, তাঁর কাছে আমি আমার এ দুঃখ কোন লজ্জায় জানাইব? তাই কেবল বুক চাপিয়া মাটীতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলাম।

তারপর আর তাকে দেখি নাই। সে কেবল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল; তাহাতে বলিয়াছিল যে, আমার চোখের সাম্‌নে সে দেখা দিবে না, কিন্তু এত দিন সে যেমন নীরবে প্রত্যক্ষ প্রেম প্রতিমার গোপন পূজা করিয়া আসিয়াছে, চিরদিন সে তেমনি করিবে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ সে রাখিতে পারিবে না।

সে চিঠির উত্তর আমি দেই নাই, কিন্তু অনেক দিন সে চিঠিখানা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম। শেষে ভাবিলাম, চিঠিখানি রাখিয়া, যে রত্নে আমার অধিকার নাই, তাহা চুরী করিতেছি। তাই তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছি।

আজ পর্য্যন্ত আমি শচীকান্তকে ভুলিতে পারি নাই। আজও তার স্মৃতি আমার বৃদ্ধ

হৃদয়কে সরস করিয়া তুলে। অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী রহিয়া গিয়াছি।

প্রথম কিছুদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহাতে আমার কোনও ক্লেশ হয় না। পরে ভাবিলাম, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া বাহিরে একটা মিথ্যা ক্লেশহীন কষ্টের আড়ম্বর রাখিয়া লোকের প্রশংসা বা সম্মান ঠকাইয়া লইবার আমার কোনও অধিকার নাই। তাহা ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আমার পাপের বোঝা কমাইয়া, আমার শাস্তি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? যে পাপিষ্ঠা আমি, অনন্ত নরক আমার যোগ্য। ব্রহ্মচর্য্যে সে যন্ত্রণা তিলমাত্র কমে, এমন ইচ্ছা আমি করিতে পারি না।

ঠানদিদি থামিলেন, দেখিলেন, আমার চোখে জল। বলিলেন, "চোখের জলের এমন অপব্যয় করিস্ না বোন্! আমার মত পাপিষ্ঠাকে ঘৃণা করতে শেখ্। লোকে যদি আমায় ঘৃণা করে, আমি তাতে তৃপ্তি লাভ করি। লোকের সম্মানে বা স্নেহে আমার আতঙ্ক হয়, মনে হয়, সারা জীবন কি কেবল ঠকামিই করিব? আমার যাহা প্রাপ্য নয়, তা কি আমি কেবলি লোকের কাছে ঠকাইয়া লইব?"

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

বন্ধ দরজায়

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

[১]

শেষরাত্রে শাশুড়ী বধূকে ডাকিতেছিলেন, "অ বৌমা,—বৌমা, ওঠ ওঠ, এখনও ঘুমচ্ছ মা, এরপর বেলা হ'য়ে গেলে আর কখন্ নাইতে যাব মা। অ সুরো, সুরো!"

কর্ত্তা বাহিরের দালানে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন,—বলিলেন, "হ্যাঁ গো, আবার বেলা হয়ে গেলে বেশী ভিড় হবে, মহা অষ্টমীর দিন।" আবার তামাক খাইতে লাগিলেন। তারপর আবার বলিলেন, "তাই তো, যোগা তা হ'লে এল না; আচ্ছা গিন্নি সে ছুটিতে বাড়ী এল না কেন? বৌমার না আজ একখানা চিঠি এয়েছে?"

"এখন তা নিয়ে আর কি কর্‌ব বল, আমার যেমন পোড়া কপাল, অমন বৌ, বেটা নিয়ে মনের সুখ হ'ল না। বরাৎ—বরাৎ ছাড়া তো পথ নেই—সুরো উঠ্‌লি, অ তৈলক্ষ্য,—তলি! ন্যাকা মাগী এখনও শুয়ে রয়েছে—ওঠ—ওঠ—অ বৌমা!"

দূরে কলের ভোঁ বাজিয়া উঠিল, ময়লা ফেলার গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, ঝাড়ুদারেদের ঝাঁটের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

"অ বৌমা—এখনও উঠ্‌লে না গা, তবে আর গঙ্গা থেকে ফেরা হয়েছে। "হ্যাঁ গো, বলি তুমি কেবল তামাকই টান্‌ছ, মুখ-হাত ধোবে না, কেবল সেই ভুড্ডুক—ভুড্ডুক—পোড়া তামাকে কি মধুই পেয়েছ!"

"হঁঃ—কি জান গিন্নি, এই ধোঁয়াটাই সব চেয়ে মিঠে, কেননা, সংসারটা এখন আমার ধোঁয়ার মতনই ঠেক্‌ছে। ওঠ রে সুরো!—"

ডাকাডাকিতে সুরো উঠিল, বৌমা উঠিল। আঁখি কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বধূ শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বলিল, "কি মা!"

"কি মা! ও মা, এ কি গো, বলি নাইতে যাবে না?"

"না মা, আমার গা-হাত কেমন যেন মাটী মাটী করছে।"

"ও কাঁচা ঘুম ভেঙে হয়েছে, নাইলেই সেরে যাবে। চল, আজ মহা অষ্টমী, আজ গঙ্গাস্পর্শ করবি নি কি—লা?"

তখন শাশুড়ী, বধূ, বাড়ীর অনেক দিনের পুরাণো ঝি তৈলক্ষ্য, ছোট দেওর সুরো আর কর্ত্তা সকলে মিলিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন।

কর্ত্তা 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া সকলের আগে আগে চলিলেন।

[২]

গঙ্গাতীরের পথে দুসারি ভিখারীরা আঁচল পাতিয়া বসিয়া আছে; কেহ বা ছেঁড়া নেকড়া রাস্তার পাথর চাপা দিয়া, কেহ বা শুধু হাত পাতিয়া বসিয়া, 'অন্ধ-নাচারকে দয়া কর মা, আজ মহা অষ্টমীর দিনে'—বলিয়া চেঁচাইতেছে। কোথাও বা পাশাপাশি দুইজন হাত পাতিয়া পয়সা ও চাউল লইতে গিয়া, দাতার হাত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন কাড়িয়া লইল।

দাতা বিরক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। ভিখারী দুই জন পরস্পরের অশ্রাব্য ভাষায় ভাঙা কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। দাতাদের মধ্যে কেহ বা নখের কোণে করিয়া চাউলের দানা পাঁচ সাতটি লইয়া প্রতি ন্যাকড়ায় নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাষ্টমীর পুণ্য ও দান করার অক্ষয় স্বর্গ মনে মনে আঁকিয়া চলিতেছেন।

রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। শান্তিরাম ভট্টাচার্য তাঁহার এই পরিবার বর্গ লইয়া সেই মদনমোহনের সামনের রাস্তা দিয়া কুমারটুলি দিয়া রাজার ঘাটের দিকে চলিলেন।

পথে বধু তাহার ছোট দেওরের সঙ্গে, ফিস্-ফিস্ করিয়া কথায়-বার্ত্তায় বলিতেছিল, কেমন করিয়া সে গঙ্গায় ডুব দিবে, তাহাকে কিন্তু ঠাকুরপো যেন হাত ধরে, নইলে যদি ডুব দিতে গিয়া বেশী জলে পড়িয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসের ভোর। হিমের আমেজে বাতাস একটু হিম্-হিম্ বোধ হইতেছিল, পথে পথে বৈষ্ণবেরা নাম গান করিতেছিল।—

'সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন।।"

ভিড়ের ভিতর দিয়া শাশুড়ী, বধূ, দেওর, তৈলক্ষ্য ঝি সকলেই অগ্রসর হইয়া শ্মশানেশ্বর ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

ঘাটের অনতিদূরে বটগাছের তলে বসিয়া এক ভিখারী গান করিতেছিল।—

"সন্ধিপূজার সন্ধিক্ষণে নিস্ মা আমার মনের বলি,
যেন অন্তকালে যায় মা এ প্রাণ, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলি।"

কর্ত্তা সেই গাছতলায় দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিলেন।

তখনও ভোরের আলোয় সব পরিষ্কার হয় নাই।

[৩]

ঘাটে একদিকে মেয়েরা, একদিকে পুরুষরা স্নান করিতেছিল। কতকগুলি সৌখীন কাপুড়ে বাবু ঘাটের উপরে দাঁড়াইয়া মেয়েদের ভিজে কাপড় ও এলোচুলের মধ্যে দেহের সর্ব্বাঙ্গের রস চক্ষুদ্বারা পান করিতেছিলেন। ঘাটে ঘাটে হাটে হাটে ঘুরিয়া বেড়ানই তাঁহাদের কাজ। যেখানে ভদ্রলোকের বৌ-ঝি, সেখানেই তাঁরা ঠারে-ঠোরো আঁখি ঠারেন। আর গিল্‌টি-করা বিলাতী সোনার চশমা নাকের উপর উঁচু করিয়া ধরেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নান সারিয়া, সপরিবারে শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বাবার মন্দিরে বাবার মেয়েদের ভিড়ে প্রায় প্রবেশ নিষেধ। বহুকষ্টে জল ঢালিয়া সকলে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

[৪]

পথে লোকের ভিড়, গাড়ীর ভিড়, জনতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রামের ঘণ্টার শব্দ আর লোকের গোলে, গাড়োয়ানদের চীৎকারে রাস্তা একেবারে হৈ-হৈ হইতেছিল।

বাগবাজারের পথ ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিতেছিলেন, হঠাৎ একটা বড় গোল উঠিল। দেখা গেল, একটা স্ত্রীলোক চীৎকার করিতেছে, "আমার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালাল, ওগো, ওই পালিয়ে গেল।" তখন চারিদিকে একটা ভারি সোরগোল পড়িয়া গেল; ভিড়ে যে যার গহনা সামলাইতে লাগিল, সকলেই দ্রুত বাড়ীর দিকে ফিরিতে লাগিল। ভট্টাচার্য মহাশয় ও সকলে দ্রুত বাড়ীর পানে অগ্রসর হইলেন। আবার একটা গোল উঠিল, ভিড়ের ভিতর একটা জোরে ধাক্কা আসিল, টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া, যাহারা দল বাঁধিয়া

আসিতেছিল, কেমন যেন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় খানিক পরে তাকাইয়া দেখেন যে, বধূমাতা যে তাঁহার ছোট দেওরের সঙ্গে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের আর দেখা যায় না। ঝি বলিল, "তারা এগুইয়ে গেছেন গো।"

"কখন্ এগুল রে, এই যে তারা পেছুতে আস্‌ছিল।"

গিন্নী বলিলেন, "না, সুরো এগিয়ে গেছে, আমি দেখেছি।"

কর্ত্তা আর কিছু না বলিয়া দ্রুত বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

[৫]

এদিকে বধূ ভিড়ের ভিতর পড়িয়া দেওরের সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে পড়িয়া গেল। তাহার পর আর একটা ধাক্কায় কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পথ হাঁটা অভ্যাস নাই, দ্রুত চলিতে পারে না, ভিড়ের ভিতর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া হতভম্ব হইয়া গেল; পথ ঠিক করিতে না পারিয়া ভিড়ের ভিতর উল্টা পথে ফিরিয়া গঙ্গার দিকে গেল। এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেই দুইজন স্থূলকায়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছ মা, তুমি বুঝি তোমার লোকের সঙ্গ হারিয়ে গেছ?"

দ্বিতীয় বলিল, "ও মা, ও যে আমাদের ভট্‌চায্যি মশায়দের বউ, না মা?"

বধূ মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

প্রথমা বলিল, "ভয় কি মা, আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব অখন; চল, এই যে আমাদের গাড়ী রয়েছে, ও মা, তার আর কি?"

বধূকে তাহারা আদর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

দূরে পথে এক জন ছিপছিপে সৌখীন চেহারা বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি একবার চোখ ঠারিয়া মুচকিয়া হাসিলেন।

গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বধূ যেন স্বস্তি পাইল। স্ত্রীলোক দুটি তাহাকে খুব সান্ত্বনা দিল, বলিল, "আর মা তোমার কোন ভয় নেই। এই সোমত্ত বয়স, ভাগ্যিস্ আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কোলকেতার সহর, নইলে কোন্ ভালখাকীর হাতে পড়তে,—এই রূপ, আর কি রক্ষে থা'কত! তা হ'লে কি হোত মা, মা সিদ্ধেশ্বরী, সর্ব্বমঙ্গলা রক্ষে করেছেন।"

বধূর প্রাণ কথাটা শুনিয়া অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল।

[৬]

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। অজানিতে তাঁহার মন যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গিন্নী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"নেকী আর সুরো ছোঁড়া গেল কোথা?"

তৈলক্ষ্য খুঁজিতে ছুটিল, কর্ত্তাও বাহির হইলেন। গিন্নী কেবল—বধূ যে ছোট লোকের মেয়ে—এই বলিয়া গাল দিতে লাগিলেন।

খানিক পরে সুরো কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল—বৌদি, কোথায় গেল!

"হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া!" বলিয়া গিন্নী সুরোকে গাল দিলেন,—বলিলেন, "সে ধিঙ্গী ছোট লোকের মেয়ে, সঙ্গে আসতে পারলেন না, আবার গেলেন কোন্ চুলোয় মর্‌তে?"

ভট্টাচার্য্য পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিলেন, কোন চিহ্নই নাই! কেবল একজন বৈরাগী বলিল,—"দেখ বাবাঠাকুর! বোধ হয়, এইখানে একজন সুন্দরী মেয়েকে দুটি স্ত্রীলোক ঘরের গাড়ী ক'রে তুলে নিয়ে গেছে। কার গাড়ী, তা বাবু জানিনে!"

ভট্টাচার্য্য হতাশ হইয়া ফিরিয়া থানায় গেলেন।

থানাওয়ালারা তাঁহার সেই ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখিয়া বলিল,—"বলি, তোমার যে ছেলের বউ, তার প্রমাণ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন—"নারায়ণ! দরিদ্র ব'লে কি আমার অভিযোগটাও মিথ্যা?"

যাহা হউক, তাহার রোজনামচায় অভিযোগ লিখিয়া রাখিল।

[৭]

এদিকে সেই দুটি স্ত্রীলোক, বধূকে লইয়া একটি বাড়িতে আসিয়া উঠিল। বধূকে তাহারা বলিল,—"এ বেলা খাওয়া-দাওয়া ক'রে ও বেলায় তোমার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি এখনই সহিসকে পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি। ভয় কি, —যোগা আমার সম্পর্কে বোনপো হয়।"

বধূ বলিল,—"ঠাকুরপোকে আসতে ব'লে দাও, আমি তার সঙ্গেই যাব, সে আমায় দেখতে না পেয়ে কত কাঁদ্‌ছে।"

একজন বলিল, —"তোমার দেওরকে বুঝি তুমি খুব ভালবাস?"

দ্বিতীয়া বলিল, —"তোমার বরের চেয়ে?"

বধূ হাসিল, —মনে করিল, এরা তাহার অতি পরমাত্মীয়।

বধূকে তাহারা সযত্নে খাওয়াইল। ভাল কালাপাড় কাপড় পরাইল। তাহার পর ডাব ও মিষ্ট সরবৎ খাওয়াইল। পান দিল।

দ্বিতীয়া বলল, —"এখন ভাই, তবে একটু শোবে চল; তার পর বিকেলবেলা, তোমার দেওর এলে গাড়ী ক'রে পৌঁছে দে আস্‌ব এখন। মাও সঙ্গে যাবে—কেমন?"

বধূর মনে কোন সন্দেহই আসিল না। তবু একটু যেন অজ্ঞাত হয় তাহার বুকের কোণ হইতে ঠেলিয়া উঁকি মারিতেছিল। সে বলিল, "আচ্ছা, গাড়ী কি এখন আসে না? হ্যাঁ মাসি, আমায় এখন পাঠান যায় না?'

[৮]

ভট্টাচার্য্য ফিরিলেন। তাঁহার বাড়িতে তখন কান্নাহাটী পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিবেশিনীরা দু একজন আসিতে লাগিল, তাহারও সকলে অনেক প্রকার। সহানুভূতি দেখাইল।

ক্ষেমার মা বলিল,—"তা, বামুনদিদি, আমার ত ভাই সন্দ হয়। জলজ্যান্ত মানুষটা, এ কি গো, হারিয়ে যাবে কি—কচি খুকী নয়। বল ত বাছা!"

পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন, —"আমি তখনই জানি বৌ, ও কথাই নয়—এর মধ্যে ছোট.. ওই বোসেদের নাতির নিশ্চয় খেল আছে,—ওই যখন তোমার বৌ ছাদে চুল শুকুতে উঠ্‌ত, ছোট.. টা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত, তা পোড়া সে চুলোমুখী কি ছাদ থেকে নড়ত। অমন জলজ্যান্ত পিদীম জ্বালা দেখ্‌লে, পোকা উড়ে ঝাঁপ দেবে না গা? ক্ষেমার মা, দোক্তার কৌটটা দিস্‌ ত বাছা, ভাত মুখে দিয়েই ছুটে আস্‌ছি। একটা পানও মুখে দিই নি, ভাত কি রোচে, আমার শরীরটে বড় কাহিল হয়ে গেছে ভাই, আর অষ্টমীর উপোস সয় না।

গিন্নী সকলের কথা শুনিতেছিলেন আর গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন; শেষ বলিলেন, "তাই বুঝি আমার যোগা এবার পুজোয় বাড়ী এলো না। ও মা, ছোট লোকের মেয়ের পেটে এত নষ্টামি, আমার গা মাটী মাটী করছে। আমি আজ যাব না মা।"

গদার পিসী বললেন,—"অ্যাঁ, বল কি বউ, পেটে পেটে এত নষ্টামি; মা, পোড়া রূপই কাল, —ওই জন্যে আমার গদার কাল বৌ এনেছি মা, কারুর তায় চোখ পড়ে না। পাড়ার বড় মানুষের ছেলেদের জন্যে ঘরে ত সুন্দরী মেয়েটি রাখবার জো নেই। এ কি কথা গা—বৌ-ঝি নিয়ে ঘর কর্‌বার যো নেই। পোড়াকপালে দেশের হোল কি?"

গিন্নী একবার নাকে কাঁদিলেন, একবার সত্য সত্যই চোখ দিয়া জল ফেলিলেন। ঠানদিদি তখন নাকি সুরে সুর মিলাইয়া রসান দিয়া বলিলেন,—"তা যা বলেছিস্, গদার পিসি! আমার মোনাও সেদিন বল্‌ছিল যে, ও বাড়ির ছোট.. তলি ঝিকে ডেকে কি দিচ্ছিল, আমায় দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ও নিজ্জস এর মধ্যে আছে, ও আমি গঙ্গাজল তাঁবা -তুলসী নিয়ে বল্‌লেও পেত্তয় যাই নে। —তুমি বৌ গিন্নীই হও, আর যাই হও, তোমার ঘর ভাল নয়, এ আমার স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই। তুমি একবার তলি ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর দেকি!"

গদার পিসী বলল, —"ঠিক বলেছ ঠানদিদি! আমি তো তাই বলি, তলি নিজ্জস এর মধ্যে আছে।"

গিন্নী তলিকে ডাকিলেন, —"ও তলি, তলি, হ্যাঁলা মাগী, বলি, ও বাড়ির ছোট.. যে চিঠি দিচ্ছ্‌ল, সে কথা তুই আমার জানাস্ নি?"

তলি একেবারে আকাশ থেকে পড়িল—"ও মা, কিসের চিঠি—ও মা, আমি যদি এমন কাজ ক'রে থাকি ত যেন দুটি চক্কের মাথা খাই, আমার যেন বুকশূল হয়। ও মা, কোথায় যাব মা, হ্যাঁগা ঠানদিদি, তুমি কেমনতর নোক গা! ভদ্দর নোকের মেয়ে, তুমি এমনতর মিথ্যেটা কেমন ক'রে কৈলে বল ত—ও মা, তোমার ধম্মাধম্ম জ্ঞেয়ান নেই গা?"

ঠানদিদি তখন ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, —"আ মর্, ছোটেলাক মাগি, তোর যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা!"

তলিও তার চেয়ে সুর চড়াইয়া বলিল,—"দেখ বাছা, আমাদের এর মুখ, তুমি সেদিন আমায় বল নি, ছোট.. পাঁচ হাজার টাকা দিতে চায়, তোমায় ব'লেছে—"

ঠানদিদিও ঝগড়া খুব সোর করিয়া আরম্ভ করিলেন, "আমি কুটনি, অ্যাঁ হারামজাদি মাগি! তোর মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে।"

গদার পিসীও সেই ঝগড়ায় যোগ দিল। তখন তুমুল কাণ্ড। বেলা দুইটা বাজিয়া গেছে, পাড়া তখন ঢাকের কাটিতে ঘা দিয়া নাচিয়া উঠিল, ভট্টচায্যিদের বউ বেরিয়ে গেছে।

বাড়ীতে উনান জ্বলে নাই। গিন্নী হতভম্ব হইয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া,—ঘরের দালানের সম্মুখে প্রতিবেশীগণের তুমুল বচসা হইতেছে, এমন সময় শান্তিরাম গলদঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন, "যোগাকে তার করলুম আস্‌তে, দুর্গে, কি করলি মা!"

ঠানদিদি, "ও মা, নাতজামাই যে' বলিয়া মাথার কাপড় টানিয়া তলিকে বলিলেন, "রইল ধামা চাপা, তোকে একবার—"

গিন্নী বলিলেন, "উপায়?"

ভট্টাচার্য্য নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"উপায়!" তাহার পর ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া দেখাইয়া আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। সুরো আসিয়া নিঃশব্দে পিতার পাশে দাঁড়াইয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"যোগাকে তার করেছি।"

"সে এলে মুখ তুলে তাকে কি বল্‌ব।"

"জিব তার আগে খসে গেলে ভাল হ'ত—ওঃ!"

বধূ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিছানায় শুইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকালের ঘুম তাহাকে জড়াইয়া আসিতেছে। তাহার পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন একটা ভয়ানক সাপ তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাহার মুখের গর্ত্ত হইতে যে চেরা জিব বাহির হইতেছে, তাহাতে জ্বলন্ত অগ্নি লক্‌লক্ করিয়া উঠিতেছে, আর যেন তাহাতে তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল। প্রথমে ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, চীৎকার করিতে পারিল না; মুখ যেন চাপিয়া ধরিল, বুকের উপর মনে হইল যেন, বিশ মণ ভারী পাথর চাপান—দমবন্ধ হইয়া আসিল। খুব জোরে শেষ চীৎকার করিয়া উঠিল—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, অন্ধকার—অন্ধকার! আর সেই অন্ধকারে, কি যেন এক জ্বালাময় তীব্র বিষাক্ত উগ্রগন্ধে ভরিয়া গেছে। বিছানা হইতে উঠিতে গেল, পারিল না, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া উঠিল। তাহার আরো ভয় হইল। আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। বিছানা হইতে উঠিয়া দোর খুঁজিতে গেল, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ ঘর বিজলীর আলোকে দিনের মন আলোকিত হইল। বধূ দেখে, সম্মুখে লম্বা ছিপ্‌ছিপে এক অপরিচিত পুরুষ, তাহাকে দুই বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। বধূ অঙ্গের স্খলিত বসন সাম্‌লাইয়া ঘরের কোণে সরিয়া যাইল।

পুরুষ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সুরমা, তোমার জন্যে আমি মরি—তোমার রাজ-ঐশ্বর্য্যে রাখব, মাথার মণি, গলার হার ক'রে রাখব—সুরমা, আমায় দয়া কর!"

সুরমা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! তখন বুঝিল, তাহার কি বিপদ্। সূক্ষ্মবস্ত্র যতই সামলাইতে যায়, ততই যেন কাঁপিতে কাঁপিতে কটিতে বাঁধিতে পারে না।

পুরুষ উন্মত্ত—মদনাতুর; কামপিপাসায় সেই সৌন্দর্য্য-ভরা দেহ ভোগ করিবার জন্য সকল পেশী দৃঢ়, নাসিকা বিস্ফারিত, ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। মাংসাশী তরক্ষুর মত দীপ্ত চক্ষু—শুষ্ক জিহ্বা—সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে—সুরমাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর। সুরমা এ কোণ হইতে অন্য দিকে পলায়ন করে। এমনি করিয়া বহুক্ষণ ব্যাঘ্র-তাড়িত মৃগীর ন্যায় সুরমা সেই ঘরের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পুরুষ তখন বিজলীর আলো নিভাইয়া হঠাৎ ঘর অন্ধকার করিয়া দিল। ছুটিয়া এক কোণ হইতে অন্য দিকে যাইতে সুরমা পড়িয়া গেল। মদোন্মত্ত রাক্ষস তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিল। তাহার নাসা হইতে অগ্নি বাহির হইতেছিল।

অন্ধকারে সুরমা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তুমি আমার বাপ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

জীবের সৃষ্টি অন্ধকারে, জীবের সংহারও অন্ধকারে।

দিনের বেলায় সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আঁধারের জীব অন্ধতম কার্য্যে সৃষ্টিকে সংহার করিতে ধাবমান হইল।

কি বীভৎস সেই আঁধারের লীলা! কিসের চাঞ্চল্যে এই সংসারের তাণ্ডব-নৃত্য যে দুলিয়া উঠে, কে তাহার অনুভব করিবে? কোন সম্বন্ধ মানুষের এ কামের মুহূর্ত্তে জাগ্রত রহে না। এই মানুষ তখন প্রকৃতি-কৃপণ, তখন চেতন অচেতনের কোন সংবিৎও রহে না। থাকে কেবল এক সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, এক প্রচণ্ড প্রলয়ের দাহ, মানুষের প্রাণের ভিতর এক প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝা, দিবসকে নিশীথ করে, হত্যাকে পরম রমণীয় মাধুর্য্য বলিয়া তখন মনে হয়।

অন্ধকারে মাটীতে পড়িয়া সুরমা সেই হিংস্রক তরক্ষুর গ্রাস হইতে নিজেকে যতই রক্ষা

করিতে গেল, ততই তাহার বল কমিয়া আসিতে লাগিল। বালিকা হইলেও সে বুঝিল যে, —এ কি! চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো! কে আছ, আমায় রক্ষা কর, ওগো, তুমি আমায় বাপ, আমি যে তোমার মেয়ে, কি—কি, ওগো, তুমিই রক্ষা কর, তুমি পুরুষ! তুমিই আমায় উদ্ধার কর—"

প্রকৃতি-কৃপণ পুরুষ তখন বধির উন্মত্তবৎ তাহার বস্ত্র আকর্ষণ করিল, বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেল। উন্মত্ত পিশাচ আবার বিজলীর আলো জ্বালিয়া দিল—সুরমা তখন উলঙ্গিনী। খোলা এলচুল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে গেল, কি লজ্জা! "ভগবান্! ভগবান্!"—সুরমা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ভগবান্!"

পুরুষ তখন হাহা করিয়া উচ্চ হাস্য করিল। ওহো কি সুন্দর, এ যৌবন যদি না—ওহো, কি বুক, কি কোমর, ওঃ....ভগবান্? ভগবান্? কেউ নেই এখানে, হাহা-হাহা—না, আর বিলম্ব সয় না—ওঃ!

তার পর আবার সেই অন্ধকার! মদোন্মত্ত করী যেমন পদ্মবন দলিয়া ফেলে—তেমনি করিয়া সুরমা দলিত হইয়া গেল!

কোন ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না!

[১০]

সুরমা মাটীতে পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, ক্রন্দন তাহার আর আসে না।—আর পুরুষ অবসাদ-বিজড়িত স্খলিত-পদে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। কণ্ঠ শুষ্ক, নিশ্বাস দ্রুত, চক্ষু রক্তবর্ণ, কোটরগত, নাসিকায় ও কপালে ঘর্ম্ম দরদর ধারে ছুটিতেছে, মাথার চুল রুক্ষ।

বাহিরের সূর্য্যের আলোক তখন সম্মুখের দালানের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। একটা কাক কা—কা—কা করিয়া উড়িয়া গেল। দ্বারের নিকটেই সেই জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "কি রায়েন বাবু, কেমন, এখন আমার আর পাঁচ হাজার।" রায়েন বাবু তাহার জামার ভিতর হইতে একতাড়া নোট ফেলিয়া দিল, দুই হাতে নিজের চোখে চাপা দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটি তখন ঘরের ভিতর আসিয়া সুরমাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি লো, আর ফোঁসফোঁসানি কেন? এখন ত ছেঁড়া আঁচলে সোনার খনি বাঁধ্‌লি, এখন অমন কচ্ছিস্, এর পর বল্‌বি, বিজলী মাসী ঠিক কথাই বলেছিল। নে ওঠ্, এখন আর ঢঙ ক'রে প'ড়ে থাকে না।"

সুরমা তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীবন ও মৃত্যুর, স্বপ্ন ও জাগরণের পারে। একবার শুধু 'মা গো' বলিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া নিঃসাড় হইয়া এলাইয়া পড়িল।

বিজলী মাসী সুরমাকে বেশ বদ্‌লাইয়া মাথায় গোলাপজল ঢালিয়া দিল। গেলাসে করিয়া, জোর করিয়া আবার সরবৎ পান করাইতে গেল, তৃষ্ণার্ত্ত সুরমা তাহা পান করিল। প্রাণ এতই কঠিন, যে ইহাতেও সে বাঁচে। তবে সংহার হয় কোনটা? নাশ হয় কিসের? দেহ যদি অনিত্য, তবে তার এত দর কেন?

[১১]

তারপর রাত্রি হইল—সুরমা ঘরের মেজেতে বসিয়া কপালে হাত দিয়া, কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার স্বামী যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কেন আসেন নাই? সেই চিঠি লইয়া সারারাত্রি কি ক্রন্দন! তাহার পর মনে পড়িল, সে একদিন মায়ের কাছে কত আদর পাইয়াছে, তাহার

পর বড় হইয়াছে, তাহার সেই বিবাহের রাত্রি—স্বামীর সহিত প্রথম সম্ভাষণ, ছোট দেওরের আধখানা পেয়ারা মুখ হইতে কাড়িয়া খাওয়া—সব মনে পড়িল।

এক একবার মনে হইতে লাগিল, না, আমি বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। উঃ, কি ভয়ানক স্বপ্ন! না না—ঠাকুরপো, সুরো ভাই!—হঠাৎ পদশব্দে চমকিত হইয়া কহিল, "কে ঠাকুরপো!" চোখ মেলিয়া দেখে, এক বীভৎস বিশালদেহ কদাকার ঠিক বুনমহিষের মত একজন কে দাঁড়াইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে। একবার হাসিল, যেন রক্তমাংসলোলুপ ভীষণ ভল্লুক ফুৎকার করিয়া উঠিল! সুরমা যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা তখন সংজ্ঞাহীন, শুধু তাহার মনে হইল, যেন পৃথিবীটা একটা আগ্নেয় পর্ব্বত, আর কেবল অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইতেছে।

[১২]

পরদিন আবার প্রভাত হইল। দিন রাত-তো কখন চুপ করিয়া থাকে না। সে তো কাহারও—কোন মানুষের ভাবনা ভাবে না—কার কোনও কথা শোনে না। আলো আসে, সকলে জাগে; আলো যায়, আঁধার আসে, মানুষ ঘুমায়। জীবের সুষুপ্তি আসে। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতেও প্রভাত হইল। রাত্রে দীপ জ্বলে নাই, প্রাতেও জলছড়া পড়ে নাই।

পুত্র যোগেন্দ্র ভোরের ডাকগাড়ীতে আসিল। পথে তাহাকে আসিতে দেখিয়া পল্লীর অনেকে হাসিল, পরিচিতেরা কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র বাড়ী আসিতেই, সুরো আগে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "দাদা!" আর বলিতে পারিল না।

পিতা পুত্রের মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না; নয়ন দিয়া দরদরধারে বক্ষ ও শ্মশ্রু ভিজিতে লাগিল। পোষা চন্দনা পাখীটাও নীরব। ঘরে-দোরে ঝাঁট পড়ে নাই।

যোগেন্দ্র বলিল, "বাবা—এ কি!"

পিতা পুত্রকে বক্ষের ভিতরে টানিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আর মাতা ধরাশয়নে নীরবে শুধু অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন।

[১৩]

এ দিকে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। বধূকে যে কে কোথায় লুকাইয়া রাখিল, তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। পল্লীতে রব উঠিল, বামুনদের বউ বেরিয়ে গেছে।

ভট্টাচার্য্য সুরোর পড়ার জন্য কলিকাতায় থাকিতেন। বাগবাজারের বাসা তুলিয়া দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। দেশে গিয়াই মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ শয্যা লইলেন।

পুত্রও মুখ অন্ধকার করিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নারী-মাত্রেই অবিশ্বাসিনী।

[১৪]

বিজলী মাসি ছিলেন নাকি কোন বড় ঘরের বউ, স্বামীও নাকি ছিলেন খুব পণ্ডিত, আর সেই স্বামীর ঔরসজাতকন্যা, সৌরভ, তাহাকেও লইয়া এই কলিকাতা সহরের সঙ্গিন কাজগুলা ও তাহার এই পেয়ারের ব্যবসা চালাইতে লাগিল। সাপে-কাটা ছুঁচার বিষ বেশী—তেমনি বিজলী মাসীর কিছু বিষ বেশী কন্যা মাতার যেমন শরীরের আয়তন, তেমনি কর্ম্মের কুশলতাও অভাবনীয়। সহরের বড়মানুষের ছেলেরা ইহাদের পাকা খরিদ্দার। যেখানে নতুন ফুলের সন্ধান একবার ইহারা পায়, তাহাকে তাহার বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িবেই ছিঁড়িবে। বিজলী-মাসীর

ধর্ম্মই তাই। শুঁড়ীখানা বন্ধ হইলে বিজলী মাসী দ্বিগুণ দামে দোক্তা-পাতার জল-মিশান ব্রাণ্ডির বোতল ভারি রাত্রে চালাইয়া থাকে। বিজলী মাসীর খোলা ভাঁটী—কত চাও! অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দ্বারা বিজলী মাসী এই কারবার চালাইতেছেন। বিজলী মাসীর হাতে কত জমীদার পুত্র, কত খেতাবী রাজার ছেলে, কত গুণ্ডা, কত শুঁড়ী, কত চুনোপুঁটী, বড় বড় ভেট্‌কি একেবারে কান্‌কো উল্‌টে বিজলী মাসীর দোরে খাবি খায়। থিয়েটারের ম্যানেজার বিজলী মাসীর হাতধরা, কত দারিদ্দরের বেনেফিট নাইট করিয়ে দিয়েছে। এ হেন বিজলী মাসীর হাত হইতে সুরমা-পাখী কি উড়িতে পারে! তাহারা তাহাকে কাশীতে চালান করিয়া দিল।

[১৫]

সেই সে বুনো মহিষ বদে শুঁড়ী, তার অনেক টাকা, পুরুষানুক্রমে মদ বেচিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। সেই বিজলী মাসীর সায়েনসা খরিদ্দার রায়েন বাবুতে ও বদে শুঁড়ীতে টক্কর লাগিল। বদে তখন সুরমাকে লইয়া একেবারে কাশীতে পলায়ন।

রায়েন বাবুর সঙ্গে সৌরভের একটু আস্‌নাই ছিল, সৌরভ চাহে না যে, সুরমাকে রায়েন বাবু অমন চোখে দেখে—কাজেই সে বোদে শুঁড়ীকে দিয়ে একটা চাল দিয়াছিল।

কাশীতে গিয়া বোদে বড় গোলে পড়িল, কেবলই তাহার কেমন ভর করিতে লাগিল। সে শেষে তাহার থিয়েটারের ম্যানেজার-বন্ধুর পরামর্শে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল —সুরমাকেও সঙ্গে আনিল। উকীল ডাকা হইল। উকীল বলিল, "বাঁচিবার এক সহজ উপায়—সুরমাকে দিয়া পুলিশ-কমিশনারের কাছে এক আরজী পেশ করা যাউক—তাহাতে সুরমা যেন প্রার্থনা করিতেছে যে, তাহার স্বামী ও শ্বাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, সে কুলের বাহির হইয়া, এই সহরে স্বেচ্ছায় উদরান্নের জন্য নাগরিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায়।"

বিজলী মাসি বলিল, —"তার আর কি, আমি নিয়ে যাব এখন, কোন ভয় নেই,—আমার যে তখন কেমন ভুল হয়ে গেল, রায়েন যা কর্‌তে লাগল। আমি বদিকে বলেছি আগে, তার মুখের গ্রাস কি আমি প্রাণ ধ'রে আর কাকেও দিতে পারি? রায়েন আমায় দশ হাজার টাকা দিতে এসেছিল, —আমি টান মেরে ফেলে দিয়েছি। বল্‌লুম—সেটি হবে না আমা হ'তে, আমি বদিকে জবান দিয়েছি, জবান দেওয়াও যা, জাত দেওয়া তা।"

বদি বলিল, —"বিজলী, মাইরি বলছি, দেখ্‌, আমি তোর কেনা গোলামচোর হয়ে থাকব; দেখ্‌, ম্যানেজার বলে, কা'ল সকালে দশটার ভেতর এ দরখাস্ত না পেশ করতে পার্‌লে উপায় নেই; আমার কেমন সন্দ হচ্ছে, বেটারা গন্ধ পেয়েছে।"

বিজলী বলিল—"আরে, তার জন্যে কি, কি বল ম্যানেজার; শেমোকে ডাকাই, সে চারটাকায় ওরকম দরখাস্ত আমায় ঢের করিয়ে দেছে।"

বদে বলিল,—"বলি, একজন নামজাদাকে দিলে হয় না?"

বিজলী।—"আরে রামঃ, তুমিও যেমন, শুধু শুধু ষোলটা টাকা খরচ কর্‌বে? তবে আজ রাত্রেই সবই করিয়ে নাও—না লেখে, জোর ক'রে হাতের টিপ সই আমি করিয়ে নেব। দরখাস্ত লিখ্‌বে কে?—ওই যে শ্যামবাবু আস্‌ছেন, অনেক দিন বাঁচবেন। দেখুন, এ একটা সেই কেশ! বুঝছেন, —কালই কাজ ফতে কর্‌তে হবে।"

শ্যাম। —তার আর কি; স্ট্যাম্প-কাগজ? —আচ্ছা—তা তোমার কাছে যা আছে, তাতেই হবে এখন।"

শ্যামবাবু তখন দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিলেন। বিজলী মাসী সুরমাকে টানিয়া আনিয়ে সেই ঘরে লইয়া আসিল; বুঝাইল, এই কাগজখানা সই করিয়া দিলেই—তাহাকে তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে কা'ল সকালে দশটার সময় গাড়ি করিয়া লইয়া যাইবে।

সুরমা তো কিছুতেই রাজী হইল না—তখন তাহাকে ভয় দেখান হইল, তাহাতেও হইল না। বদে তখন একখানা ছোরা লইয়া তাহার বুকের উপর তুলিয়া ধরিল, —"সই করিবিনি কি! —হারামজাদী—"

তখন বিজলী সুরমার বাম হাতে বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে কালি মাখাইয়া জোর করিয়া কাগজে ছাপ লইতে গেল, বলিল, "হুঁ, তোমাদের কি কাজ! এই দেখ—"

ওদিকে অকস্মাৎ সশব্দে সেই ঘরে পুলিশের লোক প্রবেশ করিল। ম্যানেজার পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। শ্যাম উকীল পুলিশের লোকদের বলিল,—"আমি সরকারের পক্ষে সাক্ষী রইলেম।" আর সুরমা দারোগার পায়ের তলে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "বাবা, আমায় রক্ষা কর!" বিজলী মাসী রাগে সুরমার গলাটা টিপিয়া ধরিল। পুলিশের লোকেরা—তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

[১৬]

বিচার যাহাদের যেমন শাস্তি হইবার, তাহাই হইল। কাহারও পর্য্যাপ্ত হইল, কাহার বা কিছুই হইল না। অর্থ যাহাদের স্ব-বলে, মানুষও তাহাদের কবলে। কেহ বা বেশ হাজার কয়েক টাকার পুঁটলী ও থলি ঝাড়িয়া দিয়া রেহাই পাইল। কিন্তু বুঝিল না যে, সুদ জমা হইতেছে, বোঝা ভারি হইতেছে। সমাজ তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না। জাতি হীনতার পঙ্কে ডুবিলে তাহাই হয়। পাপই পাপকে আশ্রয় করে। কিন্তু বিচারেরও বিচার হয়। দাঁড়িপাল্লা ঠিক ওজনই দেয়।

[১৭]

সুরমা সংসারে একাকিনী। বিধি তাহাকে রূপ দিয়াছিলেন, তাহার প্রাণের সর্বস্ব হরণের জন্য। বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র খেলা কে জানে, এর কোথায় উৎস! তাহার যৌবন আছে, কাল এখনও তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করে নাই। এই জনপূর্ণ নগর আজ তাহার কাছে জনহীন। তাহার রূপ দেখিবার জন্য—কিনিবার জন্য খরিদ্দার বড়মানুষের ছেলে বিস্তর—লোক্ কর্‌করে টাকা লইয়া ঘুরিতে লাগিল। সুরমা তাহাতে কান দিল না। একদিন গভীর রাত্রি— মেঘান্ধকার, কাল-বৈশাখের ঝড় উঠিয়াছে—জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে, সুরমা সেই অন্ধকারে তাহার শ্বশুরের দেশের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। শুনিতে পাইল, স্বামীর কণ্ঠস্বর—"এখন ও সকল কথা রাখ মা—বাবা এখন তখন।"

সুরমা দ্বারে ধাক্কা দিল; দ্বার খোলা ছিল, প্রবেশ করিতেই শ্বাশুড়ী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে রে?"

সুরমা অস্ফুট ক্রন্দন-স্বরে ডাকিল, "ঠাকুরপো! ভাই সুরো!"

সুরো ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল,—তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রুগ্ন মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই কান্না শুনিয়া ক্ষীণ বিকৃত মরণাহত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'আঃ—দূর করে দাও, দে—দে—দূর্ করে দে। —যোগা!'...

স্বামী ইতঃস্তত করিতে লাগিল, একবার মনে হইল অবিশ্বাসিনী—আবার ভাবিল, আমি না দেখলে, —কে...

শাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—'দূর হ হারামজাদি মর্‌তে জায়গা পাওনি, বেরো'—

পুত্র পিতার উপর দু-কথা শুনাইবার মত মুখ করিয়া উঠিল, তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুতপদে ভিজিতে ভিজিতে আঙিনায় নামিয়া, এক হাত দিয়া সুরোকে চাড়াইয়া, পত্নীর সিক্ত কেশরাশি মুঠা করিয়া ধরিয়া, দূরে দ্বারের বাহিরে টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া সজোরে দ্বার রুদ্ধ করিল।

সুরমা চীৎকার করিয়া বলিল,—'আমার একটা কথা শোন, ওগো—'তারপর বন্ধ দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। মুষলধারে বৃষ্টি ; বাজের ডাকে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে? ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর পার্শ্বে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলের উপর ভয়ানক শব্দে বাজ পড়িল—দেবমন্দির চূর্ণ হইয়া গেল। সুরমা ভয় চকিত দৃষ্টিতে একবার সেই ভগ্ন দেবমন্দিরের পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, দেবতা গুঁড়া হইয়া গেছে। আগুনের লেলিহান শিখার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া বিদ্যুত আকাশে সর্পের মত খেলা করিতেছে। সুরমা আর একবার ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিয়া অন্ধকারে চলিয়া গেল। অন্ধকারে জীব সৃষ্টি হয়, অন্ধকারেই চলিয়া যায়।

সুরমার একটা কথা আর কেহ শুনিল না কি?

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

ব্রহ্মশাপ

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

[১]

গোরা সর্দ্দারের স্ত্রী কুসী বামুনপাড়ার চুপড়ী-ধুচুনী বেচিতে গিয়া যখন শুনিল, গোবিন্দ ঠাকুর সরিকী মামলায় তাহার স্বামীকে সাক্ষী মানিয়াছে, তখন সে রাগিয়া, চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিতে করিতে গোবিন্দ ঠাকুরের বাড়িতে উপস্থিত হইল, এবং ঠাকুরের সাক্ষাৎ না পাইয়া ঠাকুরাণীকে শুনাইয়া দিয়া আসিল যে, তাহারা ছোটলোক, গরীব মানুষ, গতর খাটাইয়া খায়। ভদ্দর লোকেরা হলপ করিয়া পরের বিষয় কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু ছোটলোক তাহারা, তাহারা বিষয়ের ধার ধারে না, কাহারও বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া লোকের মর্ম্মান্তিক নিশ্বাস মাথা পাতিয়া লইতে চাহে না। সে নিশ্বাসের উত্তাপ সহ্য করিবার মত শক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং সে বামুনের দরজায় মাথা কুটিয়া রক্তগঙ্গা হইবে, তথাপি তাহার মরদকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে দিবে না।

নীচ ডোমের মেয়ের ধর্ম্মজ্ঞানের এই আতিশয্য দর্শনে ভদ্রপল্লীর অনেকেই তাহাকে উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। কুসী কিন্তু কাহারও কথায় কান দিল না। সে আপন মনে বকিতে বকিতে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সাক্ষী দিও না। আমার সব গেছে, ঐ শিবরাত্তির সল্‌তেটুকু আছে; বামুনের মেয়ের নিশ্বেস পড়্‌লে বাছা আমার বাঁচবে না।"

গোরাচাঁদ তাহার বাহুবেষ্টন হইতে পা ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিল, "মর্ মাগী, খেপে এলি নাকি? রোদে ঘুরে তোর মাথা গরম হয়ে গেছে, যা ডুব দিয়ে আয়।"

কুসী তাহার পায়ের উপর মাথাটা গুঁজিয়া বলিল, "না গো, তুমি আগে বল, সাক্ষী দেবে না?"

বিরক্তভাবে গোরাচাঁদ বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা, ডুব দিয়ে এসে আখাটা জ্বেলে দে। বেলা দেখ্‌ছিস্, দুপুর গড়িয়ে গেছে।"

কুসী উঠিয়া চোখের জল মুছিল, এবং মাটীর কলসীটা কাঁখে লইয়া ডুব দিতে চলিল।

গোবিন্দচন্দ্র আকুলি মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই যখন ঐহিক ধন, মান, পরিজন সকলের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সার বস্তুর অন্বেষণেই আপনার প্রবৃত্তি ও শক্তিকে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এবং কলুষ সংসারের সংস্রব পরিহারপূর্ব্বক স্বপাকভক্ষণে রত হইলেন, তখন রাষ্ট্র হইল, গোবিন্দ আকুলির ন্যায় সাত্ত্বিক-প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গ্রামে আর নাই। তাঁহার গলদেশে লম্বিত রুদ্রাক্ষমাল্য, ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র, দেখিলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিত না, গ্রামে এমন লোক খুব কমই ছিল। আকুলি মহাশয়ের চিত্ত সম্পূর্ণ বিষয়-বিতৃষ্ণ ছিল, এবং তিনি সর্ব্বদাই এই পাপতাপ পূরিত কলুষ সংসারের অসংখ্য দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাহার সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মোহময় সংসারের এমনই কুহক যে, তাঁহার নানা উৎপাত চারিদিক্ হইতে আসিয়া নিস্পৃহ ব্রাহ্মণকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিত যে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

এইভাবে সংসার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও যখন আকুলি মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আপনার নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন, এবং লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন যে, অতঃপর তিনি এই সংসার ত্যাগ করিয়া, বিশ্বেশ্বরের পদে আত্মসমর্পণের জন্য যাত্রা করিবেন, তখন জ্ঞাতিভ্রাতা অনুকূল আকুলি সহসা মহাযাত্রা করিয়া তাঁহার যাত্রার পথে বিষম কণ্টকরোপণ করিল।

অনুকূল, শিশু পুত্র ননীলাল, বিধবা পত্নী এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরে ষোল বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছিল। এই ষোল বিঘা জমির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর তের বিঘা জমি লইয়া একটু গোল ছিল। অনুকূলের বাপ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাত মাসের কড়ারে ছয় শত টাকার জন্য এই জমিগুলি মনোহর আকুলির নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন। এই টাকা তিনি শোধ করিয়াছিলেন কি না, কেহ জানে না; বন্ধকী খতের পিঠেও কোন ওয়াশীল দেওয়া ছিল না, এবং খতখানা মনোহরের নিকটেই ছিল। তবে কড়ারের সাত মাস অতীত হইলেও মনোহর বন্ধকী জমি স্বীয় অধিকারে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। মনোহর নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ আকুলিই জ্যেষ্ঠতাতের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন।

অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে এই বন্ধকী খতখানাও আকুলি মহাশয়ের হস্তগত হইল। তিনি একবার অনুকূলকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় অনুকূল বলিয়াছিল, "খতের টাকা সব দেওয়া হইয়াছে, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।" প্রমাণ যে কি, তাহা অনুকূল খুলিয়া বলিল না। আকুলি মহাশয়ও খতখানাকে তুলিয়া রাখিলেন।

অনুকূলের মৃত্যুর পর আকুলি মহাশয় খতখানা বাহির করিয়া অনেককে দেখাইলেন, এবং এই করারী বন্ধকী কোবালাই যে বিক্রয়-কোবালাস্বরূপ হওয়ায় আবদ্ধ সমুদয় জমি তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে, ইহাও বুঝাইয়া দিলেন। তবে এতদিন কেন দখল লওয়া হয় নাই, এ কৈফিয়ৎ কাহাকেও দিলেন না।

অনুকূলের বিধবা পত্নী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আকুলি মহাশয় ধীরভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এ সময়ে কি আমি অধর্ম্ম ক'রে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিতে পারি বৌমা? তবে নেহাৎ ন্যায্য যা তাও তো ছাড়্তে পারি না। সংসারে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তো সংসারীর মতই থাক্তে হবে। তবে তুমি যখন কাঁদাকাটা কচ্চো, তখন ননীকে দু'বিঘে জমি ছেড়ে দিচ্চি। ননীও তো আমার পর নয়।"

বিধবা কিন্তু তাঁহার এই আত্মীয়তায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। সে গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে গিয়া পড়িল। ভদ্রলোকেরা আকুলি মহাশয়কে বুঝাইতে আসিলে আকুলি মহাশয় মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব খুলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিস্তৃত কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইয়া দিলেন। তাহারা নিরস্ত হইল। কিন্তু দুই এক জন জেদী লোক এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তাহারা নাবালকের পক্ষ হইয়া জমির নূতন প্রজাবিলি করিয়া দিল।

ধর্ম্মভীরু আকুলি মহাশয় জোরজবরদস্তির দিকে গেলেন না। তিনি আদালতে গিয়া এই মর্ম্মে নালিস রুজু করিয়া দিলেন যে, মনোহর আকুলির নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যে সকল জমি তিনি এযাবৎকাল ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছিলেন, কয়েকজন দুষ্ট লোকের পরামর্শে অনুকূলের স্ত্রী তাঁহাকে সেই সকল জমি হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জমিতে মনোহরের অধিকারের প্রমাণস্বরূপ তিনি বন্ধকী কোবালা দাখিল করিলেন এবং আপনার দখল প্রমাণের জন্য কয়েকজন প্রজা, জনকতক কৃষাণ, এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমির চাষী গোরাচাঁদ সর্দ্দারকে সাক্ষী মানিলেন।

আগে বেতনের পরিবর্ত্তে চৌকিদারেরা যখন চাকরাণ জমি ভোগ করিত, তখন গোরাচাঁদের

চৌকিদারী পদ ছিল। তার পর গবর্ণমেণ্ট চাকরাণ জমি খাসে আনিয়া বেতন-প্রথার সৃষ্টি করিলে, গোরাচাঁদ চৌকিদারী ছাড়িয়া জাতি-ব্যবসা ও মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। গোরাচাঁদের চাকরাণ জমির অধিকাংশই এই সকল বিবাদী জমির আশে-পাশে ছিল, তা ছাড়া বর্ত্তমানে আকুলি মহাশয়ের মজুররূপে এই সকল জমিতে ধান রোয়া, ধান কাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই জন্য আকুলি মহাশয় তাহাকে একজন প্রধান সাক্ষী মানিয়া আসিলেন।

[২]

সন্ধ্যার পর কেরোসিনের ডিবার সম্মুখে বসিয়া গোরাচাঁদ ঝুড়ি বুনিতেছিল আর গুন্-গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"মোন আমার, পাখীর বাচ্ছা পুষ্‌বি যদি খাঁচা সার, খাঁ—চা সার।"

বাঁ হাতে লণ্ঠন ধরিয়া, ডান হাতে ধরা লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করিয়া মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে আকুলি মহাশয় আসিয়া ডাকিলেন—"গোরাচাঁদ, ওহে গোরা!"

গোরাচাঁদের সঙ্গীত থামিয়া গেল, হাতের ঝুড়িটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কে বাবা ঠাকুর? পেন্নাম হই!"

গোরাচাঁদ হাত দুইটা তুলিয়া কপালে ঠেকাইল। আকুলি মহাশয় উঠান হইতে একটু অন্তরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কল্যাণ হোক্, কেমন আছিস্ রে গোরা?"

গোরাচাঁদ কাপড়ের খুঁট দিয়া কাঠের খুর্‌সীটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আপনকারদের চরণের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। এমন সময় কি মনে ক'রে বাবাঠাকুর?"

লাঠিটার উপর ভর দিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোদের একবার দেখ্‌তে এলাম। দিনে তো সময় পাই না, পূজা-আহ্নিকেই কেটে যায়। তাই বলি, এই সময় একবার তোদের খবরটা নিয়ে যাই।"

সহর্ষকণ্ঠে গোরাচাঁদ বলিল, "তা আস্‌বে বই কি বাবাঠাকুর, আমরা আপনকার চরণেই প'ড়ে আছি।"

খুরসীটা উঠানের মাঝখানে পাতিয়া দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

ত্রস্তভাবে আকুলি মহাশয় বলিলেন, থাক্ থাক্, ওখানে আর যাব না, তোদের জল-থল পড়ে।

আকুলি মহাশয়ের কথায় তাঁহার শুদ্ধাচারিতার কথা গোরাচাঁদের মনে পড়িল; তাঁহার মত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ যে ডোমের ঘরে প্রদত্ত আসনে বসিতে পারেন না, ইহা জানিলেও গোরাচাঁদ ব্যস্ততায় সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া সে যে কিরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছে, ইহাই ভাবিয়া গোরাচাঁদ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

আকুলি মহাশয় সহাস্য-প্রশ্নে তাহার এই সঙ্কোচভাব দূর করিয়া দিয়া, তাহার ছেলেটি কেমন আছে, কাজ-কর্ম্ম কেমন চলিতেছে, এখন কোথায় কি মজুরিতে কাজ হইতেছে, ইত্যাদি নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তিনি প্রস্থানোদ্যত হইয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে। তোমাকে বাপু আমার একটু বেগার দিতে হবে।"

গোরাচাঁদ হাত দুইটা জড় করিয়া সবিনয়ে বলিল,—"আজ্ঞে করুন।"

আকুলি মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "এমন কিছু কঠিন বেগার নয়। শুনেছ তো, অনুকূলের স্ত্রী পাঁচজন দুষ্ট লোকের পরামর্শে আমার ন্যায্য সম্পত্তি হ'তে আমায় বেদখল ক'রেছে। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমার তো গায়ের জোর নাই, আমার জোর ভগবান্। আমার সহায় ধর্ম্ম। কাজেই আমাকে আদালত কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু আদালতে গেলেই তো হয় না, প্রমাণ

চাই, সাক্ষী-সাবুদ চাই। তা আমার পাকা দলীলপত্র আছে, দরকার শুধু দু'একটা সাক্ষী। তা বাপু, তোমাকে সাক্ষীটা দিয়ে আস্‌তে হবে।"

গোরাচাঁদ চমকিত হইয়া ভীতিপূর্ণদৃষ্টিতে আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তুমি পাশের চাষী ছিলে কিনা, সুতরাং তোমার সাক্ষ্যটা খুব বলবৎ হবে। আমি যে বরাবর ও জমি দখল ক'রে এসেছি, তুমি শুধু এইটুকু ব'লে আস্‌বে। আজ শমন এসেছিল, তা আমিই বকলমে সই করিয়ে দিয়েছি। আস্‌চে মাসের সাতুই দিন। মনে থাকে যেন।"

আকুলি মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু বাবাঠাকুর—"

ফিরিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোমার রোজ মারা যাবে না হে, সে আমি আগেই দিয়ে যাব।"

গোরাচাঁদ দৃঢ় গম্ভীরস্বরে বলিল, "না বাবাঠাকুর, আমি হলপ নিয়ে মিছে কথা বল্‌তে পার্‌ব না।"

সবিস্ময়ে আকুলি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "পার্‌বে না?"

গোরাচাঁদ বলিল, "না। আমরা ছোট লোক, আমাদের এত পাপ সইবে না।"

তাহার মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আকুলি মহাশয় রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে অপমান কর্‌বে?"

গোরাচাঁদ মাথা নীচু করিয়া বিনম্রস্বরে বলিল,—"আমাকে মাপ কর বাবাঠাকুর, আমি এক ছেলে নিয়ে ঘর করি।"

ছোট লোকের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞতা দেখিয়া আকুলি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর স্থিরগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "ছেলের তরে ব্রাহ্মণের কথা অমান্য কর্‌বে?"

গোরাচাঁদ ভীত-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আমার ঐ একটি ছেলে বাবাঠাকুর।"

বজ্রগম্ভীরনাদে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তোমাকে ও ছেলে নিয়ে ঘর কর্‌তে হবে না। আমি যদি ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ হই, ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্য হন, তবে তোমার ছেলে বাঁচ্‌বে না,—বাঁচ্‌বে না,—বাঁচ্‌বে না। এ না হয় তো আমি এই পৈতা ছিঁড়ে দীঘীর জলে ফেলে দেব।"

জোরে জোরে লাঠির ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতে করিতে আকুলি মহাশয় চলিয়া গেলেন। গোরাচাঁদ হাত দুইটা বুকের কাছে রাখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসী আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

শুষ্ক জড়িত-কণ্ঠে গোরা বলিল, "বামুন কি শাপ দিয়ে গেল শুনেছিস্?"

কুসী বলিল, "শুনেছি। কিন্তু আমরা তো কোন দোষে নাই। দিলেই বা শাপ, আমাদের মা আছে।"

[৩]

আকুলি মহাশয়ের শুধু জমিজায়গার আয়েই সংসার চলিত তাহা নহে, তাঁহার আয়ের আর একটা পথ ছিল। তাঁহার গৃহে শালগ্রামশিলা হইতে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি দেবতারই ঘটপট ছিল। গ্রামের লোক আপদে-বিপদে এই সকল দেবতার যে পূজা দিত, তাহাতে আকুলি মহাশয়ের আয় বড় মন্দ হইত না। সুতরাং আকুলি মহাশয় এই সকল গৃহ-দেবতাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না এবং তাঁহাদের জাগ্রত মহিমা সম্বন্ধে বহুল উদাহরণ প্রচার করিতেন। আগে অনুকূলও এই আয়ের একজন অংশীদার ছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর হইতে সমগ্র আয়টাই গোবিন্দ আকুলির হাতে পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তির পরিমাণও অনেক গুণ বাড়িয়া গেল।

সে দিন আকুলি মহাশয় স্নানান্তে পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, গোরাচাঁদের স্ত্রী কুসী

একটি মেটে পাথরে পোয়াটেক চাউল, দুইটি কাঁঠালি কলা এবং এক পয়সার বাতাসা লইয়া ভিজা কাপড়ে ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আকুলি মহাশয় রাগে জ্বলিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই? —তুই ঠাকুরঘরের দরজায়?"

তাঁহার সেই রুদ্রমূর্তি, ক্রোধকম্পিত স্বর শুনিয়া কুসী ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া সকাতর কণ্ঠে বলিল, "বাবা আমার কালুর—"

গর্জ্জন করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আগে নেমে আয় বেটি; বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ, একেবারে ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়ে উঠেছে! পাজি বেটী, ছোটলোক বেটী!"

হাতের পাথরটা দরজার সামনে রাখিয়া কুসী ভয়ে ভয়ে নামিয়া আসিল। আকুলি মহাশয় ক্রোধকম্পিত পদে রোয়াকে উঠিয়া পাথরখানার দিকে চাহিয়া কর্কশ-কণ্ঠে বলিলেন, "এটা এখানে রেখে গেলি যে?"

কুসী হাত দুইটা জড় করিয়া ভীতিকম্পিত স্বরে বলিল, "আমার কালুকে মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে বাবাঠাকুর, তাই মায়ের পূজো এনেছি।"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "পূজো এনেছে! তোর এই চালকলায় মায়ের পূজো হবে? বেটি ছোটলোক!"

আকুলি মহাশয় পা দিয়া জোরে পাথরখানা ঠেলিয়া দিলেন। পাথরখানা উঠানে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল, চাউল বাতাসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কুসী সকাতর দৃষ্টিতে সে গুলার দিকে চাহিয়া রহিল। আকুলি মহাশয় হাতের ঘটীর জলটা দরজার সামনে ঢালিয়া দিয়া স্থানটা পবিত্র করিয়া লইলেন। কুসী নিদারুণ অপরাধীর মত হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আকুলি মহাশয় ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া পূজায় বসিলেন। কুসী দুই পা অগ্রসর হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবা মাকে জানাও, আমার কালুকে—"

বজ্রকঠোর-স্বরে আকুলিমহাশয় বলিলেন, "তোর কালু যাতে শীগ্‌গীর মায়ের খর্পরে যায়, তাই দিবারাত মাকে জানাচ্চি।"

কুসীর সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে মুহ্যমানভাবে স্তব্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন আকুলি মহাশয় পূজা শেষ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। কুসী সকাতরে বলিল, "বাবাঠাকুর, মায়ের একটু চন্নামেত্তর—"

"চন্নামেত্ত নাই" বলিয়া আকুলি মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কুসী মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেখানে পূজার বাসি ফুল-বিল্লপত্র ফেলা হয়, সেই খানে চন্দনাক্ত অর্দ্ধশুষ্ক একটি বিল্বপত্র দেখিতে পাইল। কুসী সযত্নে সেইটি কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল, এবং মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া সোপান প্রান্তেক মাথা কুটিয়া বলিল, "মা গো, আমরা গরীব, তুই ছাড়া আমাদের আর কোন ভরসা নাই। আমার কালুর গায়ে তোর পদ্মহাত বুলিয়ে দে মা, আমি বুক চিরে তোর এখানে রক্ত দিয়ে যাব।"

রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে বসিয়া দেবতা তাহার এই আকুল প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন কি না, তাহা চিন্তা না করিয়াই কুসী দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

[৪]

"বাবা কালু!"

বসন্তের ভীষণ আক্রমণে কালু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল করিয়া চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না, তথাপি পিতার আহ্বানে সে কষ্টে চোখ মেলিয়া চাহিল। গোরা তাহার মাথায় স্নেহশীতল হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেমন আছিস্ বাবা?"

ক্ষীণস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালু বলিল, "সব জ্বলে পুড়ে গেল বাবা, জ্বলে মলুম!"

গোরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, মায়ের চন্নামেত্তর খেলেই সব ভাল হ'য়ে যাবে।"

কালু ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মা কোথায়?"

গোরা বলিল, "সে মায়ের চন্নামেত্তর আন্‌তে গেছে?"

কালু চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বসন্তের আক্রমণে বীভৎসদর্শন মুখের দিকে চাহিয়া গোরা বসিয়া রহিল।

কুসী আসিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। গোরা তাহার রিক্তহস্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের চন্নামেত্তর?"

কুসী কোন উত্তর দিল না। সে একটা পাথরবাটি লইয়া পুকুরঘাট হইতে জল আনিল। তার পর আঁচল হইতে বিল্বপত্রটা খুলিয়া সেই জলে ডুবাইয়া জলটুকু ছেলের মুখের কাছে ধরিল; ডাকিল, "বাবা কালু, মায়ের চন্নামেত্তরটুকু খেয়ে ফেল বাবা।"

কালু চোখ না খুলিয়াই হাঁ করিল; কুসী তাহার মুখে বাটীর জলটুকু ঢালিয়া দিল, এবং বিল্বপত্রটি লইয়া তাহার মাথায় গায়ে বুলাইয়া দিল।

কালু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল। তারপর সহসা চোখ মেলিয়া ডাকিল, "বাবা গো!"

গোরা তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল,"কেন বাবা!"

কালু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "কৈ, চন্নামেত্তরে তো ঠান্ডা হলো না বাবা? উঃ! জ্বলে মলুম বাবা, জ্বলে মুলম!"

গোরা বলিল,"মায়ের চন্নামেত্তর খেয়েছে বাবা, মা এবার ঠান্ডা ক'রে দেবেন। মাকে ডাক।"

কালু যাতনাজড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা গো!"

পাশে কুসী স্তব্ধ পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। হায়, কোথায় মায়ের চন্নামেত্তর! এ যে শুধু বেলপাতা-ধোয়া জল। মায়ের চন্নামেত্তর খেলে কি এখনো এত কষ্ট থাক্‌তো? হায় মা, ছোটলোক আমরা, চন্নামেত্তর পেলাম না, তাই ব'লে তোর দয়াও কি পাব না মা?"

কুসীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিল। তীব্রকণ্ঠে গোরা বলিল, "রোগা ছেলের পাশে ব'সে চোখের জল ফেলিস্ না কুসী!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুসী বলিল, "হাঁগা, কবরেজ ডাক্‌লে হয় না?"

কর্কশ-কণ্ঠে গোরা বলিল, "কবরেজে কিছু হবে না কুসী, এ ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপের কাছে সাক্ষাৎ শিবও কিছু কত্তে পারে না।"

কুসীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। গোরা পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু বাতাসে অন্তরের জ্বলা প্রশমিত হইল না। কালু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আর্তকণ্ঠে পিতাকে ডাকিতে লাগিল।

সহসা গম্ভীরস্বরে গোরা ডাকিল, "কুসী!"

কুসী মুখ তুলিয়া স্বামীর কঠোর মুখের দিকে চাহিল। গোরা বলিল, "কাল মামলার দিন। আমি আজ চল্লাম।"

কুসী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

"সাক্ষী দিতে।"

"মিথ্যে সাক্ষী দিতে?"

তীব্র-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গোরা কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "আমরা ছোট

লোক ডোম, আমাদের আবার সত্যি মিথ্যে কি? আমি ছেলেটোকে বেঘোরে মেরে ফেল্‌তে পারবো না।"

কুসী বলিল, "কিন্তু আর একটা ছেলেকে পথে বসাবে?"

গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া,দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "যে পথে বসে ব'স্‌বে, আমার তাতে কি? আমার কালু গেলে তাকে আর ফিরে পাব না। আমি চল্‌লাম, তুই ছেলেটাকে দেখিস্‌।"

গোরা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কুসী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া বলে, "ওগো, তুমি যেও না,—যেও না।"

কিন্তু কালুর রোগবিকৃত মুখের দিকে চাহিতেই সে আর উঠিতে পারিল না,; কে যেন শিকল দিয়া তাহার পা দুইটাকে পুত্রের রোগশয্যার সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

[৫]

গোরাচাঁদ এক প্রকার ছুটিয়াই আকুলি মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইল। কিন্তু আকুলি মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না; তিনি সাক্ষী-সাবুদ লইয়া মঙ্গলবারের বারবেলা পড়িবার পূর্ব্বেই মহকুমা আরামবাগ যাত্রা করিয়াছিলেন। আরামবাগ প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে; সুতরাং পূর্ব্বদিনে বাহির না হইলে যথাসময়ে আদালতে পৌঁছান যাইবে না, উকীলের সঙ্গেও পরামর্শ হইবে না। আকুলি মহাশয় চলিয়া গিয়েছেন শুনিয়া গোরা দ্রুতপদে আরামবাগ অভিমুখে চলিল।

গোবিন্দ আকুলির বাড়ির পরই অনুকূলের বাড়ি। ননীর মা সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। গোরাকে দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, "গোরাচাঁদ!"

গোরা থমকিয়া দাঁড়াইল। ননীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ছুটাছুটি কোথায় চলেছো?"

গোরা মাথাটা নীচু করিয়া বলিল, "আরামবাগ।"

ননীর মা বলিলেন, "তুমিও সাক্ষী আছ বুঝি?"

গোরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার ছেলে কেমন আছে?"

"ভাল নয়।"

"কবরেজ দেখাচ্ছ তো?"

"না।"

"কবরেজ দেখাও না? সে কি?"

গোরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কবরেজে কিছু কত্তে পার্‌বে না মা ঠাকরুণ, ব্রহ্মশাপ—আমার কালুর ওপর ব্রহ্মশাপ হয়েছে।"

চমকিতভাবে ননীর মা বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মশাপ!"

গোরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ননীর মা বলিলেন, "তুমি তো কারো ভালয় মন্দয় নাই গোরাচাঁদ, তোমার ছেলেকে কে এমন শাপ দিলে?"

রুদ্ধস্বরে গোরা বলিল, "আকুলি মশায়?"

ননীর মা বিস্ময় স্তব্ধনেত্রে গোরার মুখের দিকে চাহিলেন। গোরা তখন অভিশাপের কারণ বিবৃত করিল। ডোমের ছেলের এই ধর্ম্মভীরুতাশ্রবণে ননীর মার চক্ষু দুইটা বিস্ময়ে বিস্ফারিত, আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া আসিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আজ যে আবার আরামবাগে যাবে?"

অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গোরাচাঁদ উত্তর করিল, "ছেলেটার কষ্ট আর সহিতে পাচ্চি না। তাই মনে করেছি, সাক্ষী দেব। মা ঠাক্‌রুণ গো, ছেলের মায়া যে বড় মায়া!"

গোরাচাঁদের বড় বড় চোখ দুইটা দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ননীর মার চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কর গোরাচাঁদ, সাক্ষী দাও; আহা, ছেলেটা যদি বাঁচে।"

মুখ তুলিয়া গোরা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু মা ঠাকরুণ, আপনকার ছেলে পথে বস্‌বে!"

ধীর প্রশান্ত স্বরে ননীর মা বলিলেন, "তা বসে বসুক, আমার ছেলে না হয় পথে বস্‌বে, কিন্তু তোমার ছেলে তো প্রাণে বাঁচবে। আমি বলছি গোরাচাঁদ, তুমি যাও, সাক্ষী দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচাও!"

গোরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বামুনের মেয়ে বলে কি? নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতেছে, পরের ছেলের প্রাণের জন্য নিজের ছেলেকে পথে বসাইতে একটুও কাতরতা প্রকাশ করিতেছে না। গোরা একটা কথাও বলিতে পারিল না; শুধু স্তব্ধদৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণকন্যার মহিমা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ননীর মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর দাঁড়িয়ে থেকো না, বেলা যায়। তুমি কিছু ভেব না গোরাচাঁদ, আমার তাতে এক বিন্দু দুঃখ হবে না। আমি বামুনের মেয়ে হুকুম দিচ্চি, তুমি গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এস। আমি কাপড় ছেড়ে মায়ের চানজল নিয়ে তোমার কালুকে দিয়ে আস্‌ছি। আহা ছেলের চাইতে কি আর কিছু আছে গোরাচাঁদ।?"

গোরার বুকটা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল; সে আর এই ব্রাহ্মণকন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

সাক্ষ্য-মঞ্চে উঠিয়া গোরাচাঁদ কি যে বলিল, তাহা সে নিজেই জানে না। সে তখন আদালত, হাকিম, উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদী কাহাকেও দেখিতেছিল না, তাহার দৃষ্টির সম্মুখে শুধু ব্রাহ্মণকন্যার সেই মহিমা-প্রদীপ্ত মুখখানা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সুতরাং সে উকীলের প্রশ্নের উত্তরে—আকুলি মহাশয় ও তদীয় উকীলের যত্ন-শিক্ষিত কথাগুলা যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া এমন সব কথা বলিল, যাহাতে বিবাদী জমীতে অনুকূল আকুলির দখলই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল। আকুলি মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গোরাচাঁদ সাক্ষ্যমঞ্চ হইতে নামিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

[৬]

গোরাচাঁদ সাক্ষ্যমঞ্চ হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, কিন্তু আদালতের প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই যেন বিষাদের একটু গুরুভার মনের ভিতর একটু একটু করিয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল। সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিয়া অবধি সে যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে জাগ্রত অবস্থায় উপনীত হইল। তাহার কালুর কথা মনে পড়িল, তাহার রোগের কথা মনে পড়িল, এখানে সাক্ষ্য দিতে আসিবার উদ্দেশ্য স্মরণ হইল। তারপর আকুলি মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। গোরাচাঁদকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত দেখিয়া তিনি কতই না আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার ছেলের জন্য কোন চিন্তা নাই; তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া, মাকে জানাইয়া, কালুকে আরোগ্য করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারে? ব্রাহ্মণ মনে করিলে লোককে রোষাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে, আবার মনে করিলে তাহাকে জ্বলন্ত বহ্নির করাল-কবল হইতে অক্ষতদেহে ফিরাইয়া আনিতেও পারে। সুতরাং কালুর জন্য গোরাচাঁদের ভয় কি?

কিন্তু হায়, গোরা এ কি করিল! সেই সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি

প্রদান করিয়া সে আপনার পুত্রের মরণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল! এতক্ষণ তাহার কালু কি আর আছে? ভূদেবতার বর্দ্ধিত রোষাগ্নিতে হয় ত সেই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আশঙ্কার উদ্বেগে গোরাচাঁদের বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দ্রুত চলিবার ইচ্ছা থাকিলেও অবসন্ন পা দুইটা যেন উঠিতে চাহিল না। গোরা প্রাণপণ চেষ্টায় অবসন্ন কম্পিত পা দুইটাকে টানিয়া বহু কষ্টে গৃহাভিমুখে চলিল।

অবসাদ-মন্থর-পদে গোরাচাঁদ যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি অনেক। শুক্লা দশমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ বনরেখার মধ্যে অস্পষ্ট দৃশ্যমান গ্রামখানা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পথ, ঘাট, মাঠ সকলই একটা অসাড় নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। ম্লান চন্দ্রালোক তাহাদের উপর স্বপ্নের সূক্ষ্ম আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। সেই স্বপ্নাবিষ্ট নিদ্রালস গ্রামখানার কোন এক প্রান্তভাগ হইতে শুধু শোকের একটা করুণ ক্ষীণ সুর উত্থিত হইয়া যেন রজনীকে বিষাদময়ী করিয়া তুলিতেছে।

গোরাচাঁদ কম্পিত-বক্ষে স্খলিতপদে যখন আপনার কুটীর প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে, সর্ব্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, অন্ধকারের কালো ছায়া আসিয়া প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

স্তব্ধ অন্ধকারময় কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংযোজিত করিয়া, অস্ফুটকণ্ঠে গোরা ডাকিল, "কালু!"

উত্তরে কুটীরমধ্য হইতে একটা শুধু আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। গোরা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পুত্রের সৎকার শেষ করিয়া গোরা যখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, আকুলি মহাশয়ও তখন মহকুমা হইতে ফিরিতেছিলেন। গোরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাবাঠাকুর গো, আমার কালু যে চ'লে গেল গো!"

ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "ঠিকই হয়েছে! ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয়? ওহে গোরাচাঁদ, ঘোর কলি হইলেও এখনো ব্রাহ্মণ আছে, ব্রহ্মণ্য-তেজ আছে। তোমরা মনে কর, বামুন বেটারা আবার কে, ধর্ম্মটাই সব। তার ফল দেখলে তো? কৈ, ধর্ম্ম এসে তোমার কালুকে রাখ্‌তে পার্‌লে না?"

গোরা তাঁহার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল; ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, "অমন আজ্ঞে কর্‌বেন না বাবাঠাকুর! আপনারা কলির দেবতা, আপনাদের কি ধম্মের নিন্দা কর্‌তে আছে? না ছেলে গেছে ব'লে ধর্ম্মকে আমি অমান্য কর্‌তে পারি? আমার কালু গেছে, কিন্তু ধর্ম্ম তো যায় নি বাবাঠাকুর! ছেলে দুদিনের, কিন্তু ধর্ম্ম যে চার যুগের।

গোরার স্থির প্রশান্ত মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক "বেটা বোকা ছোটলোক!" বলিয়া আকুলি মহাশয় দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গোরা তাঁহার পদাঙ্কিত স্থানের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল।

শ্রাবণ, ১৩২৫

কাহার দোষ?

সরোজনাথ ঘোষ

[১]

মাতার অনুরোধ-উপরোধে উপেক্ষা করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ভীতি-প্রদর্শনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, নবীন জমীদার রাজকুমার যখন কলিকাতার কোন স্কুলের সামান্য বেতনের মাস্টার অবনীনাথের সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা কন্যাকে স্বয়ং মনোনীত করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, তখন তাহার মাতৃদ্রোহিতার ও অযোগ্য নির্ব্বাচনের উল্লেখ করিয়া দেশের প্রবীণ ও প্রধানগণ তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের নবীন-বয়স্ক আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এই পুত্র-কন্যা-ব্যবসায়ের যুগে, তাহার এই প্রকার আত্মত্যাগ এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া, রাজকুমারকে প্রশংসার মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার যে প্রকৃত মনের তেজ আছে, সে যে দেশের মধ্যে যথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে, এ কথার উল্লেখ করিয়া সমাজের উদীয়মান যুবকগণ তাহাকে সমাজ-সংস্কারকের উচ্চাসন দান করিয়াছিল।

বিবাহের পর পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। রাজকুমারের জননীর মনে বিশ্বাস ছিল,—অবনীনাথ সুন্দরী কন্যার রূপের ফাঁদে ফেলিয়া, তাঁহার একমাত্র সন্তানকে অবৈধরূপে বশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অমন মাতৃভক্ত পুত্র বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। বেচারা অবনীনাথ বহুচেষ্টা করিয়াও বৈবাহিকার মত-পরিবর্ত্তন ও ক্রোধ-শান্তি করিতে পারেন নাই। কিন্তু কালে মানুষ পুত্রশোকও বিস্মৃত হয়। রাজকুমারের মাতা অবশেষে সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী রূপিণী বধূমাতাকে, দুই বৎসর পরে সস্নেহে ঘরে তুলিয়া লইলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুত্রকে সন্তুষ্ট এবং আপন বশে রাখিতে গেলে, পুত্রবধূকে সমাদরে গৃহে আনিতে হইবে, নচেৎ পরিণামে পুত্র একেবারে হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে।

মাধুরীর রূপজ্যোৎস্নায় রাজকুমার যে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পত্নী, গৃহে আসিবার পর সে মাধুরীকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে লাগিল। বসনে ভূষণে সে পত্নীকে এমনভাবে সাজাইয়া রাখিত যে, অল্পদিনেই রাজকুমারের স্ত্রৈণ আখ্যা চারিদিকে রটিয়া গেল। সে স্বয়ং কাব্য ও উপন্যাসের ভক্ত ছিল। পত্নীর মনোরঞ্জন এবং তাহার কল্পনা-বৃত্তির পূর্ণ-বিকাশের অভিপ্রায়ে, রাজকুমার বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিকগণের যাবতীয় গ্রন্থ নির্ব্বিচারে মাধুরীকে আনিয়া দিয়াছিল। বন্ধু বান্ধবগণের কেহ তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। লোকমতের অপেক্ষা রাখিয়া সে কোনও দিন কোনও কাজ করিত না। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও জানিত, স্বভাবতঃ নিরীহ-প্রকৃতি রাজকুমার যাহাতে জিদ করে, তাহা হইতে কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

গৃহলক্ষ্মী ঘরে আসিবার এক বৎসর পরে, নবীন বংশধরের আবির্ভাবে জমীদারবাটীতে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। কিন্তু প্রসূতির শরীর ইহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্তারেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পশ্চিমের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন বাস করিলে মাধুরীর শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিবে না এবং তাহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

পরামর্শমত পশ্চিমযাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। টাইমটেবল প্রভৃতি দেখিয়া, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজকুমার স্থির করিল, তাহারা তিন মাস দেরাদুনে থাকিবে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের সময় দেরাদুন বাঙ্গালীর বাসের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান হইবে না জানিতে পারিয়া, সে আপাততঃ কাশীধামে থাকিবার সংকল্প করিল। কাশীতে শীতকালে আহার্য্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য তাহার লুব্ধ মনটিকে সেই দিকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল। ডাক্তারেরাও বলিলেন যে, বারাণসীধাম শীতকালে স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে।

কোনও কোনও আত্মীয় পরামর্শ দিলেন যে, বিদেশে প্রবাস-যাপন কালে, অভিভাবিকাস্বরূপ কোনও বর্ষীয়সী আত্মীয়ার সঙ্গে থাকা আবশ্যক। রাজকুমার অবশ্য ততটা প্রয়োজন অনুভব করে নাই; কিন্তু সকলেই যখন এ বিষয়ে তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন সে জননীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। বাড়ীতে পূজা আসন্ন, তার পর বারমাসে তের পার্ব্বণ, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা আছে। বিশেষতঃ তিনি চলিয়া গেলে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের—কুলদেবতার পূজা ও অর্চ্চনার ব্যাঘাত ঘটিবে। মাতা অসম্মত হইলেন দেখিয়া রাজকুমারও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে প্রস্তাব করিয়াছিল মাত্র। মাতাই যখন নিজে সে প্রস্তাবে রাজি হইলেন না, তখন সে অন্য কোন আত্মীয়ার অপ্রীতিকর সঙ্গ-গ্রহণের চেষ্টা করিল না। সঙ্গে প্রাচীনা দাসী থাকিবে, তাহাতেই চলিবে। পাচক ও ভৃত্য ব্যতীত তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুস্থির ও মহাদেব তাহাদের সহযাত্রী হইবে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

[২]

বাঙ্গালীটোলার কোন দ্বিতল অট্টালিকায় একদিন বাস করিবার পরই রাজকুমার বুঝিল, যে উদ্দেশ্যে সে কাশীধামে আসিয়াছে, এ অঞ্চলে থাকিলে তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর স্নিগ্ধ পবিত্র সলিলে প্রত্যহ অবগাহন করিয়া, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়া, আরতিদর্শনের সুবিধা হইলেও, স্বাস্থ্যলাভের আশা এখানে অল্প। অপ্রশস্ত, দুর্গন্ধময় গলির উপর অসংখ্য গগনস্পর্শী অট্টালিকা; বায়ু ও সূর্য্যালোক এখানে পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া শুধু আকাশপথেই চলাফেরা করে। মানুষের সহিত তাহাদের সংস্রব কতটুকু? সুতরাং, সর্ব্বদা দেবদর্শনজনিত পুণ্য ও অবগাহন-স্নানের আরাম ত্যাগ করিয়া তাহাকে অন্যত্র স্থান করিয়া লইতেই হইবে।

বন্ধু যুগলের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকুমার শিক্‌রোলে একটা পছন্দমত বাড়ী ভাড়া করিল। এখানে আসিয়া সকলেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল; মুক্তির পরমানন্দ সহজেই অনুভব করিতে লাগিল। বায়ু এখানে অব্যাহত। সূর্য্যালোক উদয়াস্ত পর্য্যন্ত তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। প্রভাত ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের কোনও অসুবিধা নাই। পর্দ্দার অনুশাসন এখানে নিষ্ফল। তীর্থক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই এরূপ সুবিধা আছে বটে; কিন্তু উন্মুক্ত ক্ষেত্র, প্রশস্ত রাজপথে মহিলাগণের ভ্রমণ করিবার সুযোগ ও সুবিধা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় কি?

দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মাধুরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। ক্রমে সে সবন্ধু স্বামীর সহিত রাজপথে প্রভাত ও সান্ধ্যবায়ু সেবনের যোগ্যতা লাভ করিল। প্রকাশ্য দিবালোকে স্বামী ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত রাজপথে ভ্রমণে মাধুরী প্রথমতঃ ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু রাজকুমার যুক্তিতর্কের বলে এবং প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাহার সকল প্রকার ওজর ও আপত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল। প্রচলিত অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতি সে ছিল না। উহা যে সকল সময়েই একান্ত আবশ্যক, তাহাও সে মানিত না, অন্ততঃ কলেজে পড়িবার সময় এই মতটি তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ঘরে ও বাহিরে বিভিন্ন নীতি প্রচলিত রাখিবার

প্রয়োজন সে ইদানীং স্বীকার করিত না। বাহিরের আলোক ঘরের অন্ধকার দূরীভূত করে। বাহিরের নির্ম্মল বাতাস অবরুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ুকে পবিত্র না করিয়া দিলে সেই ঘর বাসের অযোগ্য হয়, অন্ততঃ স্বাস্থ্যনীতির কথা মানিয়া চলিতে গেলে, এ সত্যকে অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। মানুষের পক্ষেও এই নীতি অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান কালের দেশী ও বিদেশী গ্রন্থরাজি পাঠে সে এই তত্ত্বটি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং মাধুরী তাহার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের সম্মুখে বাহির হইলে ও তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলে, মহাভারত অশুদ্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা সে দেখিতে পাইত না। বরং তাহাতে উভয় পক্ষেরই অন্ধ কুসংস্কারের জড়তা দূরীভূত হইয়া সেই স্থলে সত্যের আলোক সমুজ্জল হইয়া উঠিবে। মাধুরী আজন্মের সংস্কার বশতঃ প্রথমতঃ সে কথা বুঝিতে চাহিত না; কিন্তু স্বামীর যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্তে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেও তাহার অনুরোধ-উপরোধ এড়াইতে পারিল না। কাজেই ক্রমশঃ বাধ্য হইয়া সে সুস্থির ও মহাদেবের সম্মুখে বাহির হইতে বা তাহাদের সহিত কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না। এরূপ অবসর এবং সুযোগ দিনের মধ্যে নানা প্রকারে দেখা দিত।

বিদেশে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া সংসারের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত থাকিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকালে বৈকালে ভ্রমণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাচক-প্রস্তুত আহার্য্য ভোজন, অবকাশ-সময়ে উপন্যাস ও কাব্য-গ্রন্থপাঠ, রাত্রে নিদ্রা। কিন্তু দীর্ঘ অবকাশ শুধু বই পড়িয়া কাটান যায় না, ভালও লাগে না। কাজেই প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তাসের আড্ডা বসিত। রাজকুমার, মাধুরী, মহাদেব ও সুস্থির, চারিজনে তাসের যুদ্ধে যোগদান করিত। খেলামাত্রেরই একটা প্রচণ্ড নেশা আছে—বিশেষতঃ তাসখেলায়—একবার আরম্ভ হইলে সহজে উহা ত্যাগ করা যায় না। বিশেষতঃ যে পক্ষ হারিয়া যায়, তাহারা প্রতিপক্ষকে হারাইবার জন্য মাতিয়া উঠে। কাজেই রাজকুমারের তাসের আড্ডা প্রতিদিনই অপ্রতিহত-তেজে চলিতে লাগিল। স্বামীর বন্ধুবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার পক্ষে মাধুরীর তরফ হইতে যে সঙ্কোচটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাস-ক্রীড়ার রঙ্গভূমিতে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও চলিত। ক্রমে ক্রমে মাধুরীকে তাহাতেও যোগ দিতে হইত বই কি! রাজকুমার ও সুস্থির পাকা খেলোয়াড় ছিল। কাজেই উহারা দুই জন দুই পক্ষ অবলম্বন করিত। মাধুরী ও মহাদেব এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহকারিতা করিত। রাজকুমারের প্রস্তাবে, মাধুরী সুস্থিরের দলেই পড়িয়াছিল। রাজকুমার খেলায় জিতিবার আশায় মহাদেবকেই নিজের পক্ষে টানিয়া লইয়াছিল।

মহাদেব স্বভাবতঃ একটু নিরীহ-প্রকৃতির ছিল। কিন্তু সুস্থির ঠিক তাহার বিপরীত। নামের সহিত তাহার প্রকৃতির কোনই সামঞ্জস্য ছিল না। স্বভাবতই সে চঞ্চল। সর্ব্বদা হাস্য-পরিহাস, গল্প-গুজব, আলাপ-পরিচয়ে সে সকলকে ছাড়াইয়া চলিত। তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা ছিল। কোনও বিষয়ে সে সহজে নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিত না। কোনও বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হইলে, সে নিজের মতটি বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। যুক্তির দোহাই দিতে না পারিলেও অনেক সময় গলাবাজি করিয়া সে নিজের মত অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিত। রাজকুমার ও মহাদেব তর্কে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। মাধুরী অনেক সময় নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বন্ধুত্রয়ের তর্ক যুদ্ধ দেখিত। তাহাদের এই বাগ্‌যুদ্ধে বাহ্যবিক্ষোভ ও অঙ্গসঞ্চালনের বাহুল্য দেখিয়া মাধুরীর হৃদয়ে কি ভাবের স্রোত বহিত, তাহা কাহারও জানা নাই বটে; কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার বিশাল নয়ন যুগলে বিস্ময় ও কৌতুকের আলোক-রেখা যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাহা কাহারও কাহারও দৃষ্টি একেবারে এড়াইত না।

মহাদেব বলিল, "না না! আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তবে—"

সহসা সে থামিয়া গেল। নিজের মনের সন্দেহ প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার আছে কি না, বোধ হয়, একবার সে তাহা ভাবিয়া থামিয়া গেল।

সুস্থির উত্তেজিত-ভাবে বলিল, "আমারও আগে সেই ধারণা ছিল। কিন্তু গত রাত্রের ব্যবহারে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে।"

"এ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সংসারে আর কাহাকেও বিশ্বাস করা চলে না ভাই! মাধুরীর মত অমন চমৎকার স্বভাবের মেয়ে আমাদের দেশে অতি কমই আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। আমি ছেলেবেলা হইতে উহাকে দেখিয়া আসিতেছি, বড় মিষ্ট, বড় ধীর স্বভাব। সেই মাধুরীর মনের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহা হইলে দুনিয়াতে আর স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করা চলে না। বিশেষতঃ রাজকুমার উহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উহাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় অকৃত্রিম, প্রগাঢ় ও দৃঢ়।"

সুস্থির বলিল, "সে বিশ্বাস তো আমারও কম ছিল না। আমিও ছেলেবেলা উহাকে দেখিয়াছি বটে, তবে তখনকার কথা আমার বড় মনে নাই। কিন্তু বিবাহের পর বধূবেশে যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন হইতেই উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মাধুরীর মধুর ও নম্র ব্যবহার এবং মিষ্ট স্বভাবটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বাস্তবিক এ বয়সে নানাদেশে নানাপ্রকার রমণী দেখিয়াছি। কিন্তু উহার সমকক্ষ আমি আর একটিও দেখি নাই। সেইজন্য এই আবিষ্কারে আমি বিষম আঘাত পাইয়াছি, ভাই! এখন আমার এই সন্দেহ ভিত্তিহীন কি না, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

মহাদেব সবিস্ময়ে বলিল, "পরীক্ষা? সে আবার কি রকমে হইবে?"

"তাই তো ভাবিতেছি। একটা কিছু আবিষ্কার কর না?"

কিন্তু তখন কোনও উপায়ই আবিষ্কৃত হইল না। মধ্যাহ্নে আহারের পর বন্ধুযুগল একত্র মিলিত হইল। গতকল্য রজনীতে তাস-ক্রীড়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত খেলার বৈঠক অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল। কাজেই আজ মধ্যাহ্নে তাসখেলা বন্ধ ছিল। শরীরের ক্লান্তিবশতঃ রাজকুমার ও মাধুরী মধ্যাহ্নে শয়নকক্ষ ত্যাগ করিল না। মহাদেব ও সুস্থির তাহাদের নবাবিষ্কৃত সমস্যার ও মীমাংসা করিতে বিব্রত হইয়া পড়িল।

অনেক চিন্তা, আলোচনা ও বাদানুবাদের পর সুস্থির যে প্রস্তাব করিল, তাহা মহাদেবের মনঃপুত হইলেও সে অগত্যা তাহাতে সায় দিল। তখন সুস্থির কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিল। অনেকবার কাটাকুটি করিয়া শেষে লেখা যাহা দাঁড়াইল, তাহা সে অনুচ্চ কণ্ঠে মহাদেবকে পড়িয়া শুনাইল।

"মাধুরি!

তোমার মধুর, স্নিগ্ধ ব্যবহার আমাকে যে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বাল্যকালাবধি তোমাকে জানি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তোমার কমনীয় দেহে লাবণ্যের জোয়ার যেমন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, মনের সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে বাড়িতেছে; তাহা যাহাব চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পাইবে; যাহার হৃদয় আছে, সেই বুঝিতে পারিবে। তোমাকে যে ভালবাসে না, সে মানুষ নহে। সুতরাং তোমাকে স্নেহ করি, ভালবাসি এ কথা বলিলে কিছুই বলা হইল না। ইদানীং তোমার নয়নে, আননে যে ভাষা একবার শব্দময়ী হইয়া ক্রমশঃ উঠিতেছে, তাহা অন্যের নিকট দুর্ব্বোধ হইলেও আমার অন্তরে অতি স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিব না। আমার এ ধারণা কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা হয়,

তবে তাহাকে সংশয়ের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই। যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। মনের গতি অপ্রতিহত, তাহা স্বীকার করি। সে আপনার পথে আপনি চলে, কাহারও বাধা, কোনও নিষেধ মানিতে চাহে না। কিন্তু তথাপি তাহাকে অপথে বিপথে চলিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। সংযমের বাঁধনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে হইবে। তোমার নয়নের ইঙ্গিত, আননের নীরব ভাষা যদি সত্যই হৃদয়ের যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে আমার সংশয়ভঞ্জন করিও। সেরূপ ক্ষেত্রে বন্ধুর আশ্রয়ে থাকিয়া আমি নিজেকে মুহূর্ত্তের জন্যও অপরাধী করিব না। ইতি

সুস্থির।"

মহাদেব বলিল, "যদি আমাদের অনুমান মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মাধুরী হয় তো ইহা রাজকুমারকে দেখাইতে পারে। তখন কি করিবে?"

সুস্থির দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে তো ভালই হইবে। আমাদের সন্দেহ যদি অমূলক হয়, তবে আর কথা কি? তখন কি বন্ধুর কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া ক্ষমা চাহিতে পারিব না?"

অপরাহ্নে যখন সকলে নিয়মিত ভ্রমণে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছে, সেই সময় মাধুরীকে একা পাইয়া সুস্থির তাহার সম্মুখে পত্রখানি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বারান্দা পার হইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সে চকিতে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া মাধুরী উহা বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিল। ঠিক সেই সময় কক্ষান্তর হইতে রাজকুমার বাহিরে আসিয়া বলিল, "চল মাধুরি, আর দেরী করা হবে না। আজ অনেক দূর বেড়াইতে যাইবার কথা। সুস্থির ও মহাদেব বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।"

মাধুরী কি উত্তর দিল, তাহা শুনিবার অপেক্ষায় সুস্থির আর সেখানে দাঁড়াইল না। রাজকুমার তাহাকে যাহাতে দেখিতে না পায়, সেই উদ্দেশ্যে সে কি নিঃশব্দে বাহিরের ঘরে গিয়া বসিল?

[৪]

আকাশে মেঘ গম্-গম্ করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা দম্‌কা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সকলকে শীতে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। একে পৌষমাস, তাহার উপর বাদ্‌লা হাওয়া, কাজেই আজ কেহই লেপের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উঠিতে চাহিতেছিল না। মহাদেব একেই একটু জরদ্গবের মত, তাহাতে পশ্চিমের প্রবল শীত। সে লেপের মধ্য হইতে কোন রকমে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল, "কি হে সুস্থির, বলি ব্যাপার কি?"

সুস্থির তখন ড্রয়ারের উপর প্যাণ্ট চড়াইয়া, গায়ের মোটা কোটের বোতাম আঁটিয়া, একেবারে সাহেব সাজিয়া বারান্দায় বসিয়াছিল। নিয়মের ব্যতিক্রম সে পারত-পক্ষে করিতে চাহিত না। বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ শয্যাগত থাকিলেও সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উঠিয়া চাকরকে দিয়া চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ষ্টোভ জ্বালিয়া দিয়া সে কেট্‌লি চড়াইয়া গরমজলের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বন্ধুর প্রশ্নে সুস্থির গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "তুমি তো কুড়ের সর্দ্দার। একটু বাদ্‌লা হওয়া দিয়াছে, আর বিছানা ছাড়িবার নাম নাই। কিন্তু প্রাতরাশ তো কাহারও জন্য বসিয়া থাকিবে না। বেলা যে আটটা বাজিয়া গিয়াছে।"

মহাদেব বলিল, "তা বাজিতে দাও না, ভাই! নিয়মমাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। একদিন না হয় প্রাতরাশ নাই হইল। রাজকুমারের খবর কি? সেও তো উঠে নাই দেখিতেছি!"

"সেও তো তোমারই দলের। যাক্, তোমাদের তো কাহারও ক্ষুধা নাই। আমি কিন্তু না খাইয়া পারিব না।"

গরম জলের কেট্‌লি নামাইয়া সুস্থির তাহাতে চা ঢালিয়া দিল। এ কার্য্যটি ইদানীং মাধুরীই

করিত। কিন্তু আজ শীতের প্রকোপে সেও বোধ হয়, অন্যের ন্যায় কর্ত্তব্য ভুলিয়া, বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছে। ভোরবেলা গোয়ালা যোগান দুগ্ধ দিয়া গিয়াছিল। যাহারা খাটিয়া খায়, কর্ত্তব্যের ত্রুটি তাহাদের বড় একটা দেখা যায় না। চায়ের সঙ্গে পাউরুটির টোস্ট প্রত্যহ বরাদ্দ ছিল; কিন্তু আজ বাড়ীর গৃহিণী অনুপস্থিত, টোস্ট তৈয়ার করে কে? কাজেই সুস্থির বিনাটোষ্টে চা পান করিবার অভিপ্রায়ে ভৃত্যকে পেয়ালা সাজাইতে বলিল। সে বেচারা, তুলার কোর্ত্তা গায় থাকা সত্ত্বেও শীতে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বারান্দার তিন দিকে কোন আবরণই ছিল না। পশ্চিমদিক্ হইতে বাতাস হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া সুস্থির মুখ ফিরাইল। অকস্মাৎ তাহার কেশলেশহীন সুন্দর গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। শালখানা উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়া মাধুরী ধীর-পদক্ষেপে সেখানে উপস্থিত হইল। পৌষের বারিসিক্ত বাতাস তাহার মুক্ত অলকগুচ্ছ দোলাইয়া দিয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "সুস্থির বাবুর দেখ্‌ছি নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। সময় যায় দেখে, শেষে নিজেই চা তৈয়ার ক'রে ফেলেছেন দেখ্‌ছি!" বলিয়াই সে একখানা বাঁধান বহি শালের অন্তরাল হইতে বাহির করিয়া সুস্থিরের সম্মুখে রাখিল। সুস্থির প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিবামাত্র মধুর হাসিয়া সে বলিল, "আপনি সে দিন এই বইখানি পড়বার জন্য চেয়েছিলেন, আজ হঠাৎ মনে পড়ায় নিয়ে এলাম।"

বইখানি কোটের পকেটের মধ্যে রাখিয়া সুস্থির গম্ভীরভাবে বলিল, "চা খাবেন না? এক পেয়ালা নিন্।"

"একটু অপেক্ষা করুন। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে টোষ্ট কয়খানা তৈয়ার করিয়া আনিতেছি।"

মহাদেব র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "বলিহারি যা হোক্, আজ এই ঠাণ্ডায় বারান্দায় না বসিলে কি চা পান হইত না?"

"ওটা যে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। রোজ যেখানে বসিয়া প্রাতরাশ করা যায়, আজ সেখানে বসিয়া সে কাজ না করায় বিশেষ কোন বাধা ঘটে নাই। তুমি পেঁচার মত ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক গে যাও।"

সর্ব্বাঙ্গ আলষ্টারে ঢাকিয়া, গলায় মফলার আঁটিয়া, রাজকুমার সেখানে আসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি?—সুস্থিরের প্রাতরাশ বুঝি অপেক্ষা করিতে জানে না?"

"সে তো জানই ভাই, আমি ঘোর ঔদরিক। নিয়মিত সময়ে আমার কিছু খাওয়া চাই। শীত, বৃষ্টি—ও সব আমি কিছুই বুঝি না।"

তখন হাসিতে হাসিতে বন্ধুত্রয় চায়ের টেবিলের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। মাধুরী পাঁউরুটি ভাজিয়া আনিয়া তাহাদের প্লেটে সাজাইয়া দিল। তার পর এক পেয়ালা চা লইয়া সে চলিয়া গেল। একত্র বসিয়া পান-ভোজনটা সে এখনও অভ্যাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আজ আর প্রাতভ্রমণের সুবিধা ছিল না। তখন বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল। কাজেই প্রাতরাশ শেষে বন্ধুত্রয় বৈঠকখানায় আশ্রয় লইল।

মহাদেব ও রাজকুমার যখন একটা সাহিত্যিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতে লাগিল, সুস্থির তখন মাধুরীর প্রদত্ত বইখানি কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আজ তাহার স্বাভাবিক তর্ক-প্রবৃত্তি যেন শীতের আর্দ্র হাওয়ায় জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। বেশী কথা কহিবার ইচ্ছা তাহার হইতেছিল না।

বইখানি খুলিবামাত্র বিস্ময়ে তাহার নয়ন-যুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দেখিল, পুস্তকের মধ্যে খামে আঁটা একখানি পত্র রহিয়াছে, শিরোনামা তাহারই নামে। হস্তাক্ষর দেখিয়া, পত্রখানি কাহার লেখা, তাহা অনুমান করিতে সুস্থিরের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। পত্রে কি

লেখা আছে, তাহা জানিবার জন্য সুস্থিরের ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে কোনরূপে রাজকুমারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় সে অতিকষ্টে কৌতূহল দমন করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে পত্রখানি কোটের পকেটে রাখিয়া দিল। তার পর অতি কষ্টে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশের চেষ্টা করিল। দুই চারি ছত্র পড়িবার পর সে মনে ভাবিল, এখন যদি সে তাহাদের সহিত চিরাচরিত আলোচনায় যোগদান না করে, তাহা হইলে তাহার এই ভাবান্তর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বইখানি একপার্শ্বে রাখিয়া সে বন্ধুদ্বয়ের কাছে আসিয়া বসিল।

কিন্তু যে কারণেই হউক, আজ আলোচনা তেমন জমাট, ঘোরালো হইয়া উঠিতেছিল না, তর্কে তেমন জোর, যুক্তিতে সেরূপ আন্তরিকতা দেখা যাইতেছিল না। আলোচনা যেন চলিতে চলিতে হঠাৎ মাঝখানে আসিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। প্রকৃতির বিপর্য্যয়ই কি তাহার হেতু?

অন্যদিন মাধুরী তাহাদের তর্কযুদ্ধ দেখিবার জন্য, সভাস্থলের এককোণে আসন গ্রহণ করিত, কিন্তু আজ তাহার খোকার সর্দ্দি হইয়াছে বলিয়া সে সেখানে অনুপস্থিত। কিয়ৎকাল পরে রাজকুমার, খানকয়েক জরুরী পত্র লিখিবার অভিপ্রায়ে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মহাদেব, বন্ধুর মুখমণ্ডল গম্ভীর দেখিয়া বলিল, "কি হে, আজ প্রকৃতির সঙ্গে তুমি সমান সুরে তান বাঁধিয়াছ না কি?"

সুস্থির কোটের পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিল, "উত্তর আসিয়াছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মহাদেব বলিল, "কি লিখিয়াছে?"

"এখনও পড়ি নাই। এস পড়া যাক্।"

পত্রে লেখা ছিল,—

"এক সুরে যখন দুইটি বীণা বাঁধা থাকে, তখন একটিতে আঘাত করিলে অপরের তন্ত্রীও ঠিক সমান সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। কেন এমন্ হয়, জানি না। কিন্তু ইহা যে ঘটিয়া থাকে, তাহা তো অস্বীকার করা যায় না! সত্যকে কেহ কোনদিন কোনরূপ আবরণেই ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। দুর্ব্বলা নারী যে আজ তাহা পারিবে, ইহা কি সম্ভবপর? এই সত্য জানিবার পর যদি আপনি স্থান ত্যাগ করেন, তবে তাহা আর একজনকে কিরূপ গভীরতর আঘাত করিবে, মর্ম্মপীড়া ও বেদনা দিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। শুধু দর্শনেও যে তৃপ্তি, যে সুখ, তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত রাখা কি ধর্ম্ম-সঙ্গত? হৃদয় কি সে কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিবে? শাসন, শৃঙ্খলা, নিয়ম, সংযম, এ সকল কি শুধু কথার সমষ্টি নহে? সকলের উপর সনাতন সত্য—হৃদয়। তাহার বাণী, তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য যাহার থাকে থাকুক, কিন্তু অভাগিনীর যে নাই, তাহা গোপন করিব না।"

মহাদেব পাংশুমুখে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কি কঠোর ভীষণ সত্য!"

দৃঢ়কণ্ঠে সুস্থির বলিল, "আমার অনুমান অযথার্থ নহে, এখন বুঝিলে?"

"কিন্তু ইহা মিথ্যা, জানিতে পারিলে—অত্যন্ত সুখী হইতাম।"

"আমিও হইতাম; কিন্তু সত্য চিরকাল স্বপ্রকাশ।"

"এখন কি করিবে, কি করা উচিত?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

[৫]

বায়ু, অগ্নি ও জল সংযত অবস্থায় থাকিলে যেমন বিশ্বের উপকারে লাগে, উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে তেমনই সৃষ্টি সংহার করিয়া থাকে। মানবের হৃদয়, প্রবৃত্তিও ঠিক সেইরূপ।

যদি শাসন ও শৃঙ্খলার বন্ধনে হৃদয় সংযত না থাকে, তাহা হইলেও দুর্ব্বার প্রবৃত্তি মানব-সমাজের কল্যাণের কারণ না হইয়া ধ্বংস-সাধনের হেতু হইয়া উঠে। এই চিরন্তন সত্য সুস্থিরের অগোচর ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টা করিয়াও আত্ম-সংবরণ করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মাদক দ্রব্যের এমনই প্রভাব যে, একবার উহার স্বাদ পাইলে সহসা পরিত্যাগ করা কঠিন। নেশা জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে পরিণামের কথা মনে ভাবিয়া কেহ মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকে না।

নেশার ঘোরে সুস্থিরের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মাধুরীর প্রথম পত্রে মধ্যে যে মাদকতা ছিল, তাহা তাহার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে সেই পত্রের উত্তর দিবার প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারে নাই। সুর একটু চড়াইয়াই সে উত্তর দিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে সে এমন অনেক কথা জানিল যে, তখন মস্তিষ্ক ও হৃদয় শাসন ও সংযমের বাঁধন মানিয়া কাজ করিতে চাহিল না। সে আরও একটু উঁচু পর্দ্দায় সুর চড়াইয়া 'উতোর' গাহিল।

এইরূপ উভয়ের মধ্যে পত্র-দূতী প্রত্যহই আনাগোনা করিয়া এমন একটা অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, তাহাকে অমান্য করিয়া চলা সুস্থিরের পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়া উঠিল। এতদিন তাহার হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে সুর প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অতি মৃদু, অতি অস্ফুট স্পন্দন তুলিতেছিল, এখন তাহা ভৈরব রাগে ঝঙ্কৃত হইয়া সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে।

বেদনার ও আনন্দের আতিশয্যে সুস্থির অধীর হইয়া উঠিল। এ কি নিদারুণ ব্যথাভরা চেতনা! বহুদিন হইতে কী সে ইহাই চাহিয়াছিল। নিশ্চয়! নহিলে এমন ভাবে সত্যের উপলব্ধি তাহার হইবে কেন? ইহা কি সত্য? আত্মপ্রবঞ্চনা নহে তো? নিশ্চয়ই নয়! হইতে পারে, সমাজ বিধির ইহা অনুকূল নহে; কিন্তু মনের এ অবস্থা যে সত্য, তাহা সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। তাহা যেন হইল; কিন্তু এখন কর্ত্তব্যই বা কি? —স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ায় ছাড়া সে তো অন্য কোন পথ দেখিতে পাইতেছে না। তার পর? হাঁ, সেও তো তাহাই ভাবিতেছে, —কোথায় ইহার সমাপ্তি, পরিণামই বা কি?

নূতন ভাবের প্রবাহে ভাসাইয়া, নূতন আশার সম্ভাবনা দেখাইয়া দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে শুধু খেলা ভাবিয়া যাহা আরম্ভ করা গিয়াছিল, তাহা যে শুধু এখন অর্থহীন খেলা নহে, উহা যে প্রকৃত সত্য, ইহা তো এখন অস্বীকার করাই চলে না।

গল্প ও উপন্যাস সুস্থির যথেষ্টই পড়িয়াছিল। কিন্তু মানুষের সত্যকার জীবনে যে গল্প ও উপন্যাসের অপেক্ষাও বিচিত্র, ঘটনা-বহুল এবং বিস্ময়জনক, ইহা সে আগে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখন সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে, গল্প অপেক্ষা সত্য অধিক বিস্ময়কর ও বিচিত্র। কিন্তু এই সত্য, ইহাকে অস্বীকার করাও যেমন কঠিন, আবার বরণ করিয়া লওয়াও সেই অনুপাতে দুরূহ। নিশীত রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া দারুণ শীতেও সুস্থির ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। পথের ভিতর দিয়া যে ভাব ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা যেমনই মধুর, তেমনই তীব্র।

না—আর সে পারিয়া উঠিতেছে না। আত্মসংবরণ করিয়া থাকা ক্রমেই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। নেশার ঘোরে সে পত্রের মধ্যে তাহার হৃদয়ের ভাবরাশি ক্রমেই খুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল. মাধুরীর পত্রেও ইঙ্গিতগুলি ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার হৃদয়ও বিদ্রোহের জয়ধ্বজা তুলিয়া দিতে আর কুণ্ঠিত নহে!

[৬]

সে দিন শিবচতুর্দ্দশী। আজ আবাল-বৃদ্ধ-বিনতা বিশ্বেশ্বরের মাথায় ফুল, জল ও দুগ্ধ চড়াইবে। সমগ্র কাশীধাম আজ 'হর হর ব্যোম' শব্দে পরিপূর্ণ। সখ করিয়া রাজকুমার সস্ত্রীক।

শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস করিয়াছিল। সখের ন্যায় ধর্ম্মস্পৃহাও অনেক সময় সংক্রামক। তবে উহা ব্যাধি নহে। মহাদেব এ সকল বিষয়ে তেমন অগ্রণী ছিল না। কিন্তু সকলের দেখাদেখি সেও আজ পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আর সুস্থির? তাহার তো আজ উৎসাহের অন্তই ছিল না। অন্ততঃ তাহার ব্যবহারে সকলে কতকটা সেই রূপ অনুমান করিয়াছিল।

পূর্ব্বদিবস, সান্ধ্যভ্রমণের পর বাসায় আসিয়া, সে আর একখানা পত্র পাইয়াছিল। ইদানীং দিনের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে তিন চারিবার পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। এই পত্রে সুস্থির এমন কিছু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিল, যাহাতে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। খেয়ালবশে সে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহা কোনও বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রসন্তানের লেখনী হইতে নিঃসৃত হইবার উপযুক্ত নহে, পত্র যথাস্থানে পাঠাইবার পর-মুহূর্ত্তে ইহা একবার চকিতবৎ তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন "পাশা হস্তচ্যুত" —কোনও উপায় ছিল না। তার পর যখন সেই প্রশ্নের অনুকূল উত্তর সে পাইল, তখন সমস্ত বিশ্বটা তাহার কাছে একেবারে যেন নূতন বলিয়া মনে হইল। এই উত্তরটা যেমন উত্তেজনা-মূলক, তেমনই সাংঘাতিক। ইহা কি সে কোনও দিন স্বপ্নেও প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে যে মাধুরীর কত প্রিয় তাহা এখন সে অনুমানবলে বুঝিয়া লইল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়াও মাধুরী শপথ করিতে সম্মত হইয়াছে! কোনও হিন্দুপত্নী যে এমন করিয়া অনুকূল মত কাগজে কলমেও প্রকাশ করিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে সুস্থিরের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মাধবী এবারের পত্রে এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র কোথাও ছিল না।

হৃদয়কে পরীক্ষা না করিয়াই অপরিণত বুদ্ধিবশে সে অন্যের পত্নী হইয়াছে, বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এত দিন পরে সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার চিত্ত এমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষায় না পড়িলে হৃদয় কি চাহে, কাহাকে চাহে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। কৈশোরের চপলতায় সেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে তাঁহার হৃদয় সমুজ্জ্বল; সেই দীপ্ত রশ্মিরেখায় অন্তরের যেখানে যাহা ছিল, সবই এখন স্বপ্রকাশ? সে এত দিনে নিজের ভ্রম বুঝিয়াছে, আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে। আর সে আত্মপ্রবঞ্চনা করিবে না। কিন্তু যে সমাজের বন্ধন, যে ধর্ম্মের অনুশাসন তাহাকে মানিয়া চলিতে হইতেছে, তাহাকে পূরোবর্ত্তী করিয়া এই নব উপলব্ধিকে সে কাজে লাগাইতে পারিবে না। ইহার উত্তরে সুস্থির যাহা লিখিয়াছিল, তাহা উত্তেজনা ও উন্মাদনায় অধীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে সাহস করতি না। যদি হৃদয় সত্যই কোন বন্ধনে আপনাকে একান্তভাবে ধরা দিয়া রাখিতে না চাহে, যদি সত্যিই কাহারও চিত্ত সেই বন্ধনকে শুধু দাসত্বের নিগড় ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে না পারে, প্রতিমুহূর্ত্তই যদি আত্মা সেই বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তখন সেই মিথ্যাবন্ধনে জড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? সমাজবন্ধন লোকস্থিতির জন্য, যদি স্থিতিই না হইল, তবে সে সংস্কারের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া মানুষকে এমন স্থলে যাইতে হয়, এমন অবস্থা গ্রহণ করিতে হয়, যেখানে এ সকল ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও বন্ধন নাই। যে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে না চাহে, সে এই সত্যের সন্ধান পাইবামাত্র তখনই তাহাকে বরণ করিয়া লয়।

এইরূপ পত্র আদান-প্রদানের পর একটা কিছু সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ সম্ভবতঃ উভয়ে কোন অভিনব অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ হইবার কল্পনা করিয়া থাকিবে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া, দেবতা স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গীকার স্বীকার করিবার উল্লেখ শেষ পত্রে ছিল। তবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেও তদনুসারে কোন ব্যবস্থা সংপ্রতি সম্ভবপর হইতে পারে না, এ ইঙ্গিতও সুস্থির যে না পাইয়াছিল, তাহা নহে। ইহাতে সুস্থিরের বিশেষ কোন আপত্তিও ছিল না। কারণ, তাহাকেও তো সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

সারাদিন উপবাসের পর, রাজকুমার সস্ত্রীক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে চলিল। যাইবার সময় সে সুস্থির ও মহাদেবকে গাড়িতে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিল। মহাদেব দ্বিরুক্তি করিল না, কিন্তু সুস্থির কোনও মতে সঙ্গে গেল না। বিশেষ কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের সহযাত্রী হইবার প্রলোভন সংবরণ করিল! আজ তাহার হৃদয় অসম্ভবরূপ চঞ্চল হইয়াছিল বলিয়াই কি সে রাজকুমারের সঙ্গ এড়াইল?

সকলে চলিয়া গেলে সুস্থির অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সহসা একখানা শাল গায় দিয়া পদব্রজে মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। মন্দির তখন অসংখ্য পূজার্থী নরনারীতে পরিপূর্ণ। কোনরূপে ভিড় ঠেলিয়া সুস্থির অগ্রসর হইল। কিন্তু রাজকুমার প্রভৃতিকে প্রথমতঃ সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে অনেক কষ্টে পাণ্ডার সাহায্যে মন্দিরের একাংশে সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। সুস্থিরকে দেখিয়া রাজকুমার প্রসন্নহাস্যে বলিল, "এত দেরী ক'রে এলে? তোমার জন্যে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এইমাত্র আমরা পূজা শেষ করেছি। যাও, এখন তুমিও কাজ সারিয়া লও।"

সুস্থির একবার স্থির-দৃষ্টিতে মাধুরীর দিকে চাহিল। উপবাসজনিত ক্লান্তির রেখা তাহার সুন্দর মুখখানিকে একটু ম্লান করিলেও, তাহার ললাটের সিন্দুররাগ আজ যেন আরও সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মাধুরীর পরিহিত রক্তাম্বরখানি স্থানে স্থানে দেবমন্দিরের দুগ্ধ ও গঙ্গাজলধারায় সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া দেবতার পবিত্র নির্ম্মাল্য দুলিতেছিল। ঈষৎ হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে মাধুরী বলিল, "যান্ সুস্থিরবাবু, শীঘ্র পূজা শেষ করুন। আমাদের যাহা পূজা করিবার ছিল, শেষ করিয়াছি।"

সুস্থির কি শিহরিয়া উঠিল? ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু সে দৃঢ়চরণেই মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে অগ্রসর হইল, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় রাজকুমার বন্ধুযুগলকে সংক্ষেপে জানাইল যে, আর এক সপ্তাহমধ্যে তাহারা দেশে ফিরিবে। মাধুরীর শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। দেরাদুনে যাইবার আর প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ কয়েকটি জরুরী বৈষয়িক কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য তাহার আর এখানে বিলম্ব করা অসম্ভব।

সুস্থির নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেল।

[৭]

বারাণসীধাম হইতে আসিয়া রাজকুমার তাহার ভবানীপুরের বাড়ীতে উঠিল। কলিকাতায় কয়েকটা কাজ ছিল, তাহা সারিয়া তার পর দেশে যাইবে। মাতার নিকট সেই মর্ম্মেই সে সংবাদ দিয়াছিল। কার্য্যানুরোধে মহাদেব আগেই দেশে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজকুমার সুস্থিরকে যাইতে দিল না। কলিকাতার কাজ মিটাইয়া তাহারা একসঙ্গেই পল্লী-জননীর নিভৃত ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সুস্থির সে অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তাহার নিজেরও কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ রাজকুমারের আতিথ্য উপস্থিত পরিত্যাগ করিবার বাসনা তাহার ছিল না।

বাহিরের আলাপে ব্যবহারে তাহাদের হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র ব্যক্ত হয় নাই বটে, মুখের কথায়, অথবা ইঙ্গিতে কেহ কাহারও নিকট ও পর্য্যন্ত ধরা দেয় নাই সত্য; কিন্তু কাগজ, কালি ও লেখনীর সাহায্যে তাহাদের মধ্যে যে জিনিসটি ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার উপায় আছে কি? থাকিলেও হৃদয় কি তাহার অনুমোদন করিতে পারে? ধূমায়মান বহ্নিতে সুস্থির কি নিজেই প্রচুর ইন্ধন যোগায় নাই? তবে?—

সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। এখন আর কোনও মতেই নিশ্চেষ্ট থাকিবার উপায় নাই। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া সুস্থির পত্রযোগে মাধুরীকে জানাইয়া রাখিল যে, অদ্য রাত্রি দশটার সময় রাস্তায় একখানি মোটরগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার নির্দ্দেশমত চলিলেই অবিলম্বে পুরাতন, অপ্রীতিকর বন্ধন হইতে উদ্ধারলাভ ঘটিবে। তার পর নূতন জীবন, নূতন আলোক। তবে শিশু পুত্রের মায়া? —যদি তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদে, যবনিকাপাত হওয়া কর্তব্য।

উত্তরে সুস্থির যাহা জানিতে পারিল, তাহাতে সে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন মনে করিল না। রাজকুমার আজ আহারাদির পরই কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে যাইবে। সে আজ আর ফিরিতে পারিবে না। সুস্থিরও বন্ধুর সহিত এক সময়েই বাটীর বাহির হইল। সেও এখন বরাহনগরে ভগিনীর ওখানে যাইতেছে। তাহারও আজ বন্ধুগৃহে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই কি সুস্থির এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল?

* * * * *

রাত্রি তমোময়ী। ঘন নভোরেণুজালে সমগ্র কলিকাতানগরী, আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। ফাল্গুন মাসেও শীত বেশ জোরেই পড়িয়াছিল! কয়েদিন পূর্ব্বে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, সেজন্য শীত তাহার রাজত্বের অবসানকালেও একবার জাঁকিয়া বসিয়াছিল। দূরে কোনও ঘড়ীতে রাত্রি দশটা বাজিবার শব্দ বাতাসে মিলাইয়া গেল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই একখানি মোটর রাজকুমারের বাটীর সম্মুখস্থ পার্কের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। থামিবার পূর্ব্বেই মোটরের বাঁশী পাঁচবার বাজিয়া উঠিয়াছিল।

এক ব্যক্তি মোটরের দ্বার খুলিয়া নামিয়া আসিল। তাহার গায় ওভারকোট, মাথায় নাইট্‌ক্যাপ্। মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, রাজপথ জনশূন্য। কুজ্ঝটিকার ঘনান্ধকারে দুই হাতে দূরের কোন পদার্থ দেখাই যায় না। লোকটি দ্রুতপদে রাজপথ অতিক্রম করিয়া রাজকুমারের নিস্তব্ধ অট্টালিকার সম্মুখে আসিল। বাটীর সম্মুখদ্বারে না গিয়া, অন্তঃপুরচারিণীদিগের বাহিরে আসিবার জন্য সে স্বতন্ত্র দ্বার ছিল, তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কপাটে কয়েকবার টোকা দেবার পরই দ্বার মুক্ত হইল। সর্ব্বাঙ্গ শালে আবৃত একটি নারীমূর্তি মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে আসিল। আগন্তুক নীরবে অগ্রে চলিল, নারীমূর্ত্তি তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। মোটরের দ্বার খুলিয়া পুরুষ রমণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। রমণী মোটরে আরোহণ করিবামাত্র পুরুষটিও সোফারকে গাড়ী চালাইতে বলিয়া স্বয়ং বিপরীত দিকের আসনে বসিয়া পড়িল। সেই দারুণ শীতেও পুরুষটির শরীরে স্বেদধারা দেখা দিল। জড়ের ন্যায়ে সে কিয়ৎকাল আপনার আসনে বসিয়া রহিল। সঙ্গিনী নারীর সহিত কোনও রূপ বাক্যালাপের সামর্থ্য বোধ হয় তাহার ছিল না।

মোটর হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "মাধুরি!"

কোন উত্তর নাই। শুধু পরিধেয়-বস্ত্রের একবার খস্‌খস্ শব্দ সে শুনিতে পাইল। সম্ভবতঃ চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও তাহার কানে প্রবেশ করিয়াছিল। এ দীর্ঘশ্বাস কি স্বামী-পুত্র-ত্যাগ-কাতরার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছিল? উত্তেজনার বেগ কি এত শীঘ্রই কমিয়া আসিয়াছে? পরিণামের চিন্তা কি এখনই অনুশোচনায় পরিণত হইল? অসম্ভব নহে। সুস্থিরও তো মানুষ,তাহার হৃদয়-নামক পদার্থটিও তো আছে। সুতরাং এখন যে সদ্য গৃহত্যাগিনী নারীকে বিরক্ত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। এরূপ অবস্থায় মানুষ কি করিয়া থাকে, তাহার নানা প্রকার কাহিনী সে অনেক গ্রন্থে পড়িয়াছে; কিন্তু সেরূপ কোন ভূমিকা অভিনয়েরই চেষ্টা সে করিল না।

প্রায় পনের মিনিট পরে, নগরীর একাংশে একটি নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে

মোটর সহসা থামিল। সুস্থির অমনই দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে নামিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "মাধুরি, নেমে এস।"

মোটর-চালকও তখন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শীতের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্যে সেও উত্তমরূপে টুপি আঁটিয়া ও কম্ফর্টারের দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। কুজ্ঝটিকা তখনও সমানভাবে রাজত্ব করিতেছিল। রাজপথের অপরপার্শ্বস্থ আলোকস্তম্ভ হইতে গ্যাসালোক-শিখা সে স্থানের অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে সরাইয়া দিয়াছিল।

প্রথম আহ্বানে মাধুরী নামিয়া আসিল না। সে কী কবে শুনিতে পায় নাই? সুস্থির কম্পিত-কণ্ঠে আবার ডাকিল, "মাধুরি, শীঘ্র নেমে এস!"

তখন নারীমূর্ত্তি গাড়ীর বাহিরে আসিল। সুস্থিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ সে গায়ের শাল ও অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল।

প্রেতযোনি দেখিলে মানুষ যেমন আতঙ্কে বিবর্ণ ও স্তম্ভিত হয়, সুস্থিরের অবস্থা ঠিক তেমনই হইল। তাহার শরীরের শোণিত প্রবাহ সহসা যেন থামিয়া গেল।

"বড় সাধে বাজ পড়িয়াছে; কেমন নয়, বন্ধুবর?"

সে বিদ্রূপে সুস্থির আহত হইল কি না বুঝা গেল না; কিন্তু সে যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার কম্পিত চরণের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

শ্লেষভরে রাজকুমাব বলিল, "বন্ধুর গৃহে থাকিয়া, তাহার আতিথ্যের মর্য্যাদা চমৎকারভাবে রাখিয়াছ! আগে বিশ্বাস করিতাম না, বন্ধুর বুকে বন্ধু এমন ভাবে বিষের ছুরী মারিতে পারে! তোমার বড় সুখে আজ হন্তারক হইয়াছি—কি? বড় কষ্ট হইতেছে? কুলবধূকে ঘরের বাহিরে করিতে কি এতই আনন্দ?"

সুস্থির নির্ব্বাকভাবে তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

মেটার-চালক দুই পদ অগ্রসর হইয়া সকৌতুকে এই অভিনয় দেখিতে লাগিল।

কোন উত্তর না পাইয়া রাজকুমার উত্তেজিত-স্বরে বলিল, "তোমার প্রথম পত্র পাইয়া আমার স্ত্রী তাহা আমাকেই দেখাইয়াছিল।"

সুস্থির একবার চকিত হইয়া উঠিল, তারপর যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

রাজকুমার সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "চিঠিখানা সে তাহার চরণে পিষ্ট করিয়াই ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই পত্রের উত্তর সে বাড়ীর দাসীর দ্বারাই দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা করিতে দেই নাই। আমার মহা বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তোমার বিদ্যার দৌড় কতদূর, তাহা পরীক্ষা করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাই আমারই নির্দ্দেশক্রমে, আমার পত্নী তোমার সেই জঘন্য পত্রগুলির জবাব দিয়াছিল। পত্রের ভাষা আমার, হস্তাক্ষর তাহার। এ অভিনয় অনেক আগেই শেষ করিবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধে করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরস্ত হইব না দেখিয়া, অগত্যা তাহাকে আমার মতানুসারেই চলিতে হইয়াছিল। বন্ধুর অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াও যে পাপিষ্ঠ সে বিশ্বাস রাখিতে জানে না, তাহার পাপের দণ্ড কি, তাহা জানি না। তবে শুধু বিনা মার প্রহারে বা দ্বারবানের গলা-ধাক্কায় যে সে অপরাধের কোনই প্রায়শ্চিত্ত হয় না, তাহা ঠিক। একদিন যাহাকে পরমস্নেহে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম, তাহাকে আরও কঠিন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।"

সুস্থির মস্তক উন্নত করিয়া বলিল, "আমার অপরাধের কোন কৈফিয়ৎ তোমায় দিব না। সে বিচার যিনি উপরে আছেন, তিনিই করিবেন, কিন্তু আজ সত্যই আমি নিশ্চিন্ত। আমার মহাভ্রান্তি আজ দূর হইয়াছে। তবে—" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে মোটর-চালককে টানিয়া আনিল। একটানে তাহার মাথার টুপি ও কম্‌ফর্টার খুলিয়া লইয়া বলিল, "ইহাকে চিনিতে পার?"

গ্যাসালোক-শিখা মোটর-চালকের উপর পড়িয়াছিল। রাজকুমার সবিস্ময়ে দুই পদ পিছাইয়া গেল। এ যে তাহারই সহধর্ম্মিণীর অগ্রজ শ্রীশ।

দৃঢ়স্বরে সুস্থির বলিল, "এখন হয় তো বুঝিতে পারিবে, তোমার স্ত্রীকে কুলত্যাগিনী করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। ভ্রান্তবিশ্বাসের বশেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছিল। শেষে যখন বুঝিলাম, বাধা-বিঘ্ন না মানিয়া মন উদ্দামগতিতে ছুটিয়া চলিতেছে, তখন তাহার ভ্রাতার সাহায্যে তাহাকে তাহারই পিত্রালয়ে আনিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমার মনে বিশ্বাস ছিল, স্বামী ও পুত্র ত্যাগ করিয়া কোনও স্নেহশীলা নারী—কুলধর্ম্মের বাহিরে যাইতে পারে না। পথিমধ্যেই অনুতাপ আসিয়া তাহার মনের গতি ফিরাইয়া দিবে। তবে এ কথা আজ তোমার নিকট গোপন কবির না, মাধুরীকে আমি যথার্থই শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। সেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই তাহাকে আমার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। যদি নীচ-প্রবৃত্তি, কু-অভিসন্ধি থাকিত, তাহা হইলে রাজকুমার, যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল, সেই অবকাশে তোমার উচ্চমস্তক হয় তো এতদিন অনেক নিম্নে ঝুলিয়া পড়িত। আর একটা কথা, হৃদয় লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা কখনও করিও না। হৃদয় ও আগুন একই শ্রেণির অন্তর্গত। আগুন লইয়া খেলিতে গেলে খুব ভাল খেলোয়াড়েরও গায়ে আঁচ লাগে, ফোস্কাও পড়ে।"

শ্রীশ বলিল, "কথাটা বড় ঠিক। সত্য রাজকুমার, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা আমি করিতে পারি না। বিলাতী সভ্যতার নকল করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় বিপদ্ বাড়াইয়া তুলি। কাশ্মীরের দ্রাক্ষা বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত চাষ করিয়া কেহ সুফল দেখাইতে পারে নাই। সুস্থির আমাকে সব চিঠি দেখাইয়াছে, সব খুলিয়া বলিয়াছে। আমার সুশীলা ভগিনী যে তোমার হাতে পড়িয়া এমন দুঃশীলা হইয়া পড়িয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহার ও তোমার উপর আমার মর্ম্মান্তিক রাগ হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, তুমিই একটা প্রকাণ্ড বানর। রাগ করিও না। সত্যকথা বলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। নিজের সহধর্ম্মিণীকে দিয়া কোনও ভদ্রলোক যে খেলার ছলেও পরপুরুষের নিকট এমনভাবে পত্র লিখাইতে পারে, পূর্ব্বে সে বিশ্বাস আমার ছিল না। এ কি সর্ব্বনেশে খেলা! যাক্, এখন চল, বাড়ীর ভিতর যাই। মা বাবা কিছুই জানেন না। বাহিরের ঘরে রাতটুকু থাকিবে চল। আমাকে আবার কুমার বাহাদুরের মোটরটা এখনই রাখিয়া আসিতে হইবে।"

সুস্থির মৃদুস্বরে বলিল, "আমার অপরাধ গুরুতর; এখন তোমার কাছে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলে হয়তো তুমি তাহা উপহাস বলে মনে করিতেও পার। কিন্তু সত্য রাজকুমার, আমি যা-ই হই, অপরাধকে ব'লে স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি এখনও হারাই নাই। আমার দোষ, —আমার অভদ্র ব্যবহার, যদি পার, মার্জ্জনা করিও।"

রাজকুমার এতক্ষণ নীরবে কী ভাবিতেছিল। সহসা দুই হস্তে সুস্থিরকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "সে কথা নয়। আমি ভাবিতেছিলাম, এ ব্যাপারের জন্য দায়ী কে? দোষ কাহার?—তোমার, না আমার?"

পার্শ্বের বাড়ীর বাহিরের রোয়াকের উপর কোন পথচারী, গৃহহীন ভিক্ষুক রাতটুকু কাটাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে ছিন্ন কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়াছিল। শীতের জড়তা দূর করিবার জন্য সে গাহিতেছিল—

"দোষ কারো নয় গো মা—
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি!"

শ্রীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক।—এখন চল, বড় ঠাণ্ডা!"

আশ্বিন, ১৩২৫

কৃতজ্ঞতা

সরোজনাথ ঘোষ

[১]

বিধুভূষণকে যাহারা জানিত, তাহাদের সকলেই একবাক্যে বলিত যে, তাহার বড় 'জোর কপাল।' তা' যে জন্যই হউক না কেন, সে যে বাণীপাণি ও কমলা উভয়েরই সু-নজরে পড়িয়াছিল, উত্তরকালে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

অত্যন্ত কৃশকায় বিধুভূষণ, চৌদ্দবৎসর বয়সে যখন জমীদার রাধামাধব চৌধুরীর গৃহ-জামাতার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই ক্ষীণ-স্বাস্থ্য বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়রূপ সমুদ্রের পরীক্ষার পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউগুলি ভাঙ্গিয়া, অনায়াসে অপর পারে উত্তীর্ণ হইবে।

রাধামাধব বাবু একালে জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক বিষয়ে নেহাৎ 'সেকেলে' লোক ছিলেন। অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া, কুলীন ও নাবালক জামাতাকে গৃহে রাখিয়া, তাহাকে মানুষ করিয়া তোলার দিকে তাঁহার বড় ঝোঁক ছিল। হাল সভ্যতা তাঁহাকে এ বিষয়ে মোটেই কাবু করিতে পারে নাই। তাই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন, কুলীন বিধু-ভূষণকে জামাতার পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কাঁচা সোনার ন্যায় বর্ণ ও অটুট কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যতীত বিধুভূষণের গর্ব্ব করিবার আর কিছুই ছিল না। রাধামাধব বাবু এই দুইটি গুণের জন্যই তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর শ্বশুরালয়ই বিধুভূষণ দিনযাপন করিতেছিল। তাহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ভাবিয়াছিলেন, রাজভোগে থাকিয়া এবং ক্রমোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী পত্নীর সাহচর্য্যে তাহার লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হওয়া অত্যন্তই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যথাসময়ে সে যখন অবলীলাক্রমে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে এফ্ এ পড়িতে আরম্ভ করিল এবং নাকের উপর সোনার চশমা আঁটিয়া দৃষ্টিকে উর্দ্ধগামী করিয়া দিল, তখন বাধ্য হইয়া সকলেই তাহার 'তারিফ্' করিতে লাগিল।

কলেজে পড়িবার সময় বিধুভূষণ শ্বশুর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিল যে, হিন্দু-হোষ্টেলে থাকিয়াই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া ঠিক; নহিলে লেখা-পড়ার অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। শ্যামবাজার হইতে প্রত্যহ বাড়ীর গাড়ী অথবা ট্রামে চড়িয়া কলেজে যাতায়াত করা চলে বটে; কিন্তু তাহাতে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হইবে। রাধামাধব বাবু অবিলম্বেই সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জামাতাকে মানুষ করিয়া তোলাই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তাহার কোনও সাধ তিনি অপূর্ণ রাখিলেন না।

অন্যান্য ধনীর সন্তানেরা হোষ্টেলে থাকিয়া যেমন স্বচ্ছন্দে কলেজ-জীবন যাপন করে, রাধামাধব বাবু নিজ জামাতার জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে পর্য্যাপ্ত অর্থ-সাহায্যই করিতেন। বিধুভূষণও রীতিমত উঁচু চালে চলিত।

অর্থ মানুষকে অনেক সময় পথভ্রান্ত করে, একথা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হাতে থাকায় বিধুভূষণ যে প্রকৃতই বিপথে চলিতেছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ থাকিলেও এক শ্রেণীর লোক রটনা করিয়া দিল যে,

যৌবন-সুলভ চাপল্য বশতঃ বিধুভূষণ একটু ভিন্নপথে চলিয়াছে। ক্রমশঃ কথাটা রাধামাধব বাবুর কানে উঠিল। বিধুভূষণ প্রায়ই নিষিদ্ধ স্থলে যাতায়াত করিয়া থাকে এবং কালোচিত সভ্যতার অনুমোদিত আনুষঙ্গিক নানাবিধ পান ও ভোজনে ক্রমশঃ দক্ষ হইয়া উঠিতেছে, এ সংবাদ আর গোপন রহিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষয়-বুদ্ধিতে পরিপক্ক রাধামাধব ক্রমশঃ বিধুভূষণের মাসহারার টাকা কমাইয়া দিলেন; যে পরিমাণ টাকা না হইলে হোষ্টেলের খরচ চলে না, শুধু ততটুকু সাহায্যই করিতে লাগিলেন। বিধুভূষণ শ্বশুরের এ ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল। এ অপমানের স্মৃতি সে জীবনে ভুলিল না।

কয়েকবৎসরের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি ও নির্ম্মাল্য লাভ করিয়া বিধুভূষণ কলিকাতার কোনও কলেজে অধ্যাপনার কাজ যোগাড় করিয়া লইল। তারপর একদিন সহসা সে রাধামাধব বাবুর নামে আদালতে চুক্তিভঙ্গের দাবী দিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিল। এজন্য তাহার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ জন্মিয়াছিল কি না, সে সংবাদ কাহারও জানা নাই; তবে জামাতার এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া অপমান ও লাঞ্ছনার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিধুভূষণের দাবীর দুই হাজার টাকা যখন রাধামাধব মিটাইয়া দিয়াছিলেন, তখন বিধুভূষণের স্বভাবগম্ভীর মুখমণ্ডলে যে হাস্যরেখা বিকসিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই চোখে পড়িয়াছিল।

[২]

ইন্দিরার শুভদৃষ্টি যখন যাহার উপর পড়ে, তখন চারিদিক্ হইতে তাহার মস্তকে অর্থ, মান ও যশঃ অজস্রধারায় বর্ষিত হয়। শ্বশুর-জামাতার মধ্যে যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, কালক্রমে তাহা মুছিয়া দিল। জামাতার সাফল্যে তিনি তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। বিধুভূষণ যেমন মেধাবী, তেমনই কৌশলী। ব্যবসায়-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তাহার বিশেষরূপেই ছিল। কলেজে অধ্যাপনার কাজ করিতে করিতে সে বুঝিতে পারিল যে, প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের রচিত গ্রন্থাদির মুদ্রণ ও প্রচারভার যদি সে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে, তাহা হইলে কমলা অচিরে তাহার ঘরে অচলা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সে জন্য প্রথমতঃ কিছু অর্থের প্রয়োজন। ধনবান্ শ্বশুর যাহার প্রতি অনুকূল, তাহার পক্ষে অনেক দুরূহ বিষয়ও সুসাধ্য হইয়া উঠে। বিধুভূষণের সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া রাধামাধব বাবু তাহাকে কয়েক সহস্র টাকা দান করিলেন।

উদ্যোগী বিধুভূষণ কয়েক বৎসরের মধ্যে, বহুসংখ্যক সাহিত্যিককে কবলিত করিয়া অর্থের মঞ্জুষা ও যশের নির্ম্মাল্যের অধিকারী হইল। তাহার শীর্ণ ঋজু দেহে সৌভাগ্যের সকল প্রকার চিহ্ন ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া বিধুভূষণও আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

এইরূপে বিধুভূষণের অদৃষ্টাকাশ যখন শারদগগনের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময় তাহার শ্বশুর রাধামাধব বাবু একটিমাত্র একবৎসরের শিশু পুত্র রাখিয়া পরপারে যাত্রা করিলেন। বিপুল সম্পত্তি অপরিণামদর্শী, মুর্খ এবং লুণ্ঠন-লোলুপ নায়েব-গোমস্তার হাতে পড়িয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুশিক্ষিত বিধুভূষণ শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বিচক্ষণ ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিল। কিন্তু এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ ও উচ্চশিক্ষিত জামাতা থাকিতে অন্য কাহারও হাতে তিনি নাবালক পুত্রের পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষার ভার দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলেন না। বিধুভূষণ প্রথমতঃ 'তানা নানা' করিয়া কিছুদিন কাটাইয়া দিল বটে; কিন্তু অবশেষে শ্বশ্রূ মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না।

কর্ত্তব্যবোধে সে কর্ণধারহীন সম্পত্তির কর্ণ দৃঢ় হস্তে ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছাড়িয়া দিল।

[৩]

তাহার কাজও ক্রমে অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিধুভূষণের সুদৃশ্য ত্রিতল অট্টালিকা যেন গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল; মোটর-গাড়ী কেনা হইয়াছিল, বাগানবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সহচরবর্গের বাহবাও লাভ করিল। কংগ্রেস অথবা কোন প্রকার রাজনীতিক আন্দোলনে বিধুভূষণ কখনও যোগ দিত না। বড় বড় সাহেবসুবার সহিত মেলা-মেশার দিকেই তাহার বেশী ঝোঁক ছিল। তাহার ফলে কলিকাতা মহানগরীর কোন বিভাগের অবৈতনিক হাকিমত্ব তাহার ললাটে জয়টীকা লেপিয়া দিয়াছিল। সকলেই বলিত যে, অদূর-ভবিষ্যতে রায়সাহেব অথবা রায় বাহাদুরী খেতাব-লাভ বিধুভূষণের পক্ষে অসম্ভব নহে।

তাহার এইরূপ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে নষ্ট-দুষ্ট লোক বলিত, 'শ্বশুরের চেষ্টায় এবং শ্বশুরালয়ের দৌলতেই বিধুভূষণ আজ লোকসমাজে পরিচিত হইয়াছে।' অনেকে প্রকাশ্যভাবে এমন ইঙ্গিতও করিত যে, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায়, নাবালক শ্যালকের লৌহ-সিন্দুক এবং সম্পত্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তাহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে।

এ রটনা বিধুভূষণের কর্ণেও প্রবেশ করিত। সে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিল, সুতরা নিন্দাকারিগণের এরূপ কুৎসা সে হাসিয়া ঠেলিয়া ফেলিত। শ্বশুর তাহার এমনই কি করিয়াছেন? যাহা তাঁহার করা উচিত ছিল, শুধু সেইটুকুই তিনি পালন করিয়াছেন। সে কুলীনের সন্তান, মৌলিকে কাজ করিয়া, তাহার বংশ-মর্য্যাদার প্রভাবে শ্বশুরবংশকে উন্নত করিয়া দিয়াছে। বিনিময়ে শ্বশুর তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন। তাহার নিজের উদ্যম ও চেষ্টা না থাকিলে কি সে সাফল্য লাভ করিতে পারিত?

মানুষের নিকট এরূপ কৈফিয়ৎ দিলেও তাহার অন্তর কিন্তু ইহাতে প্রবোধ মানিত না। সত্যকে যাহারা আমল দিতে চাহে না, তাহাদের নিকট সত্য শুধু কঠোর নহে, উহা বিষের মত তীব্র, জ্বালাময় ও দুষ্পাচ্য। কোনও কোনও স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক আত্মীয় তাহার মুখের সম্মুখে তাহার আকস্মিক উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া এমন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, প্রকাশ্যে হাসি-মুখে উপেক্ষা করিলেও তাহার হুলটুকু খোঁচার মত সর্ব্বদাই বিধুভূষণের মনে খচ্-খচ্ করিত এবং জ্বালা দিত। যে শ্বশুরের অন্নে তাহার দেহ পুষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার নামে টাকার জন্য সে নালিশ করিয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে কেহ কেহ সে কথারও আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ঠিক তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই যে এ সকল কথার আন্দোলন হইত, তাহা নহে, কিন্তু নিমকহারামীর কথা উঠিলে তাহারা গল্পচ্ছলে প্রকাশ্য সভায় এই ঘটনার উল্লেখ করিত। যাহারা তাহার বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস জানিত, তাহারা এই আলোচনায় আনন্দ পাইত এবং তাহাদের নয়নের বিদ্রূপচঞ্চল দৃষ্টি ও আননের কৌতুক-হাস্য বিধুভূষণের অন্তরতম প্রদেশে বিষম জ্বালা উৎপাদন করিত।

এই সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আলোচনার ফলে শ্বশুরকুলের প্রতিই বিধূভূষণের চিত্ত শুধু বিরূপ নহে—বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিতেছিল।

[৪]

নিজের পুস্তকের ব্যবসায়, হাকিমী ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা বিশেষ বিব্রত থাকিতে হয় বলিয়া, বোধ হয়, বিধুভূষণ নাবালক শ্যালকের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ও পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। নহিলে লাটের খাজানা দেওয়া ও সংসারের

মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার খরচ কুলাইবার জন্যই বা লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ লৌহসিন্দুকের নিভৃতকক্ষ ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিবে কেন? দশ বৎসর ধরিয়া বিধুভূষণ সম্পত্তির কর্ণধার। এই সময়ের মধ্যেই রাধামাধবের দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থ রাশি বিষয়ের আয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কেন অন্তর্হিত হইল, বিধুভূষণ তাহার নির্দ্দিষ্ট কারণ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারিত না। যশোদেব তাহার সকল কর্ম্মে সহায় হইয়াও নাবালকের বিষয়-রক্ষার ব্যবস্থায় তাহার সঙ্গে বড় 'আড়া-আড়ি' করিতেছিলেন।

এ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে বলিত, "আমি আর পারি না। নায়েব-গোমস্তাগুলির সবই চোর—কেবল দু'হাতে লুঠ করিবে! কর্ত্তার আমলের লোক, কাহাকেও কিছু বলিলে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ অসন্তুষ্ট হ'ন। তায় ক'বছর খালি অজন্মা। এতে কি জমীদারী আর রাখা যায়? যদি ঠাক্‌রুণ্‌ একটু শক্ত হ'তেন, তা' হ'লে বরং কিছু সুবিধা হ'ত। তিনিও দু'হাতে কেবল টাকা খরচ কর্‌বেন।"

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, লাটের খাজানার জন্যও দেনা না করিলে আর বিষয় রক্ষা হয় না। কোন মহালে প্রজার বিদ্রোহ, কোথাও অজন্মা, আবার কোন কোন স্থল হইতে নায়েব গোমস্তার তহবিল-তছরূপের সংবাদও আসিতে লাগিল। বিধুভূষণ ইতিমধ্যে কোন কোন মহালের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করিয়া সেই সেই স্থলে নিজের নির্ব্বাচিত বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন সুফল দেখা গেল না। পাওনা অপেক্ষা দেনার ঘরের অঙ্কেই ক্রমশঃ শূন্য বাড়িতেছিল।

রাধামাধবের বিশাল জমীদারীর চারিদিকে হাহাকার উঠিল। আত্মীয়-স্বজন সকলেই অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিধবা মাতাও নাবালক সন্তানের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। আন্দোলন-আলোড়নে বিধুভূষণের ধৈর্য্যের বাঁধও টলিয়া উঠিল।

[৫]

প্রাতঃস্নানশেষে সাজিভরা সদ্যচয়িত ফুল ও বিল্বদলে শিবপূজা সারিয়া রাধামাধবের বিধবা পত্নী সবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ব্যস্তভাবে বিধুভূষণ সেখানে উপস্থিত হইল। কোঁচান চাদরখানি কোমরে সন্তর্পণে বাঁধিয়া, সোনার চশমার মধ্য হইতে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আজ অষ্টম, তা জানেন ত?"

সরলা বিধবা কর্ম্মচারীদিগের মুখে আজ সকালেই সে কথা শুনিয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত বিশ হাজার টাকার যোগাড় আজ না হইলে বিষয় লাটে উঠিবে। মহাল হইতে যে টাকা আসিয়াছে, তাহাতে খাজানার অর্দ্ধেকও কুলাইবে না। এ সংবাদে তাঁহার মনে যে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ফলে আজ তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ইষ্টদেবতার চরণে অর্ঘ্য দিতে পারেন নাই।

জামাতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "তা' ত জানি বাবা।"

অধীরভাবে বিধুভূষণ বলিল, "কিন্তু টাকার উপায় কি? এত টাকা এখন কোথায় পাওয়া যায়?"

বসিবার জন্য জামাতাকে আসন পাতিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বিধবা বলিলেন, "সবই তো তোমার উপর ভার বাবা। যা'তে ভাল হল, তাই কর। আমি আর কি বল্‌বো? বিষয়টা তো রক্ষা করা চাই।"

বিধুভূষণ আসনগ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "দুই চারি হাজার করিয়া আমি তো এ যাবৎ দশ হাজার টাকা আপনার ষ্টেটে ধার দিয়েছি, তা তো আপনি জানেন। সে জন্য কোন দলিল পর্য্যন্ত এখনও হয়নি। শুধু হাতে আমি আর কত দিতে পারি, বলুন?"

আজ প্রাতে সদরের কর্ম্মচারীরা মনিব ঠাকুরাণীকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল যে, জামাইবাবু ছাড়া এ বিপদের সময় এখন এত টাকা আর কেহ দিতে পারিবে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী বলিলেন, "এ সময় তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে কেন? সবই তো তোমার উপর নির্ভর। যেমন করিয়াই হউক না কেন, লাটের খাজানা দিতেই হইবে।"

বিধুভূষণ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার কাছে অবশ্য আরও বিশ হাজার টাকা আছে; কিন্তু শুধু হাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব তো দিতে পারি না। পরিণামে কোন গোলযোগ ঘটিলে, আমি গরীব মানুষ, মারা যাইব। সুতরাং যদি *** পরগণাটা বন্ধক রাখেন, তবেই আমি টাকাটা যোগাড় করিয়া দিতে পারি।"

বিধবা শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীর কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন, *** পরগণা তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তির মধ্যে লাভবান্ ও উৎকৃষ্ট। সেই সম্পত্তি সর্ব্বাগ্রেই বন্ধক দিতে হইবে? উপায় কি? শিরে সংক্রান্তি। বিষয়-রক্ষা করিতেই হইবে; সুতরাং গত্যন্তর নাই। প্রাচীরগাত্রে পরলোকগত স্বামীর তৈলচিত্র দুলিতেছিল; বিধবা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিলেন।

এমন সময় একাদশ বর্ষের নাবালক পুত্র রমেশ, মাষ্টারের কবল হইতে সে বেলার মত মুক্তিলাভ করিয়া নাচিতে নাচিতে মাতার কাছে ছুটিয়া আসিল। অপাঙ্গে ভগিনীপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "মা, আমায় একটা কলের গান কিনে দিতে হবে।"

অলক্ষ্যে নয়নাশ্রু মার্জ্জন করিয়া জননী সস্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইলেন। কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিলে, "আচ্ছা, বাবা!"

বিধুভূষণ নীরসকণ্ঠে বলিল, "এই সকল বাজে খরচ বন্ধ না করায় আজ এমন অবস্থা হয়েছে। আপনি তো মোটে বোঝেন না।"

বিধবা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সত্যই কি তাঁহারই অপব্যয়ে আজ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এই দুর্দ্দশা?

বিধুভূষণ অধীরভাবে বলিল, "আর সময় নেই। কি করিতে চান, বলুন। বন্ধক দিতে যদি আপত্তি—"

রমেশজননী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "না বাবা, তুমি যা ব্যবস্থা ক'রে দেবে, তাই হবে। আমার বল, বুদ্ধি ও ভরসা সবই তুমি।"

বিধুভূষণ দ্রুত চঞ্চলচরণে নীচে নামিয়া গেল।

অষ্টম রক্ষা হইল। সে যাত্রা বিষয় লাটে উঠিল না। রাধামাধব বাবুর পত্নী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা এবং সমগ্র সম্পত্তির অছি ছিলেন। সেই অধিকারে তিনি ত্রিশ হাজার টাকায় *** পরগণা জামাতার নিকট বন্ধক রাখিলেন। যথারীতি দলিলাদি সম্পাদিত হইল।

[৬]

নিজমুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও বিধুভূষণের অনুগ্রহভাজনেরা চারিদিকে তাহার এই মহত্ত্বের কথা প্রচার করিয়া দিল। বিংশ শতাব্দীতে কে এমন আছে যে, শ্যালকের বিষয়-রক্ষার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া থাকে? কিন্তু বাঙ্গালী জাতি, বিশেষতঃ বিধুভূষণের আত্মীয়-স্বজন তাহার এই উদারতা, মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিল না। বরং এই ব্যাপারে তাহার স্বার্থপরতা ও কৃতঘ্নতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া তাহার শ্বশুরালয়ের সংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাধামাধব বাবুর পত্নীর বিষয়বুদ্ধি কোনও কালে তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না। তিনি অত্যন্ত সরলা ও সহজ-বিশ্বাসী ছিলেন। সংসারের কুটিলতা, স্বার্থপরতা কোনও দিন তাঁহার পবিত্র

চরিত্রকে কলঙ্কমলিন করিতে পারে নাই। কৃতবিদ্য জামাতার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক সে যে কোনও দিন তাঁহার নাবালক পুত্রের অনিষ্ট করিবে, এ আশঙ্কা কোনও দিন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। স্বামীর আমলের স্বর্ণপ্রসূ সম্পত্তি ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, এ চিন্তা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য; কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিধুভূষণকে অপরাধী মনে করিতে পারেন নাই। রাধামাধবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ তাহাতে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। তারপর উপর্য্যুপরি বিষয়সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুতর মোকদ্দমায় জলের মত টাকা ব্যয় হইবার সংবাদও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মহালে অজন্মা ও প্রজাবিদ্রোহ ঘটিতেছে, এ সম্বন্ধে বহু কাহিনী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং এ সকলের জন্য বিধুভূষণকে নিমিত্তভাগী না করিয়া তিনি নিজের ভাগ্যেরই দোষ দিতেন।

কিন্তু যে দিন ত্রিশ হাজার টাকায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট বিষয়টি বিধুভূষণ বন্ধক রাখিয়া অষ্টমের কার্য্য নির্ব্বাহ করিল, সে দিন বিধবার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। তাঁহারই অন্নে পুষ্ট, অর্থে প্রতিপালিত, সুশিক্ষিত জামাতা বিষয়-রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ তালুকটি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিল, এই চিন্তা তাঁহার স্নেহ-পরায়ণ মাতৃহৃদয়কে অত্যন্ত ব্যথিত করিল। মনকে তিনি আর কোনও মতেই প্রবোধ দিতে পারিলেন না। জামাতার প্রতি তাঁহার একান্ত নির্ভরতা, অটল বিশ্বাস বিষম ধাক্কা খাইয়া চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্য শুনিতে শুনিতে তাঁহার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের বাঁধ ভগ্ন হইবার উপক্রম করিল। নাবালক পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিধবা মাতা অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। যে রক্ষক, সেই যখন ভক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তখন আর মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

কয়েকটি বিশিষ্ট আত্মীয়ের পরামর্শে অবশেষে শঙ্কিতা নারী গোপনে স্বামীর কোনও বিচক্ষণ বন্ধুর হস্তে সম্পত্তি-রক্ষার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলেন।

বিধুভূষণ যখন এ সংবাদ পাইল, তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও আক্রোশে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্বশুর-কূলের উদ্দেশে তখন সে যে অভিসম্পাত করিল, তাহা শুনিয়া স্বয়ং অন্তর্যামী বোধ হয়, শিহরিয়া উঠিয়া থাকিবেন।

[৭]

প্রৌঢ় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্দ্দার বাহিরে দণ্ডায়মানা দাসীকে বলিলেন, "কর্ত্রীঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর, জামাই বাবুর আমলের হিসাবপত্রের কি করা যাইবে?"

দাসী মনিব ঠাকুরাণীর শিক্ষামত উত্তরে বলিল, "মা বল্‌ছেন, আপনার কথা তিনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।"

প্রৌঢ় ম্যানেজার তখন কণ্ঠস্বর আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে, বিধুভূষণের সময়ের হিসাবপত্র দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, হিসাব-নিকাশ করিলে বিধুভূষণের নিকট লক্ষাধিক টাকা পাওনা হইবে। এতগুলি টাকার ব্যবস্থা করা তো চাই! তিনি জামাতা বাবাজীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, যদিও এই টাকা হিসাব-নিকাশে বাহির হয়, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন এবং এক কপর্দ্দকও তিনি দিতে বাধ্য নহেন। বিধুভূষণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে যে টাকা ধার দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র সুদসমেত শোধ না করিতে পারিলে তিনি উপায়ান্তর অবলম্বন করিবেন। কিন্তু ষ্টেটের এতগুলি টাকার কি হইবে?

বিধবা, দাসীর দ্বারা বলাইলেন, "তা সে যদি না মানে, তা হ'লে আর উপায় কি?"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "উপায় আছে বৈ কি? হিসাব-নিকাশের দাবী দিয়া নালিশ করিলেই টাকা আদায় হইতে পারে। উকীলেরাও সেই পরামর্শ দিতেছেন।"

যবনিকার অন্তরালে বিধবা শিহরিয়া উঠিলেন। জামাতা—যাহাকে পেটের সন্তানের ন্যায় এতকাল মানুষ করিয়াছেন, তাহার নামে নালিশ! দাসীকে দিয়া তিনি বলাইলেন যে, এমন কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না। যদি সে টাকা ভাঙ্গিয়াই থাকে, কোন উপায় নাই। ইহার জন্য তিনি আদালতে যাইতে পারিবেন না। কখনই না।

ম্যানেজার অনেক প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিবেন কেন? তিনি তো আপনাকে রেহাই দিতেছেন না? আমি সংবাদ পাইয়াছি, বিধুবাবু তাঁর প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য ইতিমধ্যেই আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি, তিনি তাহা শুনেন নাই।"

যবনিকা একবার দুলিয়া উঠিল। ম্যানেজারের কর্ণে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রবেশ করিল। দাসী মনিবের শিক্ষামত বলিল, "মা বল্‌ছেন, তার ধর্ম্ম তাকে যেমন বলেছে, সে তাই করেছে। কিন্তু আমি তার নামে নালিশ কর্‌তে পার্‌ব না। অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

ক্ষুণ্ণ-মনে ম্যানেজার বিদায় লইলেন।

[৮]

সাবালক হইয়া রমেশ যে দিন জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করিল, তাহার মাসখানেক পরে একদিন সহসা বিধুভূষণ শ্বশুরালয়ে পদধূলি দিল। দুই চারিটি কথার পর সে শ্যালককে নিভৃতে জানাইল যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার যে ডিক্রি সে পাইয়াছে, তাহা তামাদি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া এতদিন সে চুপ-চাপ্ বসিয়াছিল— ডিক্রি-জারী করে নাই। কিন্তু এখন সে টাকা যদি রমেশ এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে ডিক্রী-জারি করিতে হইবে।

রমেশ দশদিক্ অন্ধকার দেখিল। সে ভাবিয়াছিল, হাজার হউক, বিধুবাবু তাহার ভগিনীপতি, নানা উপায়ে ক্রমশঃ তাঁহার টাকাটা শোধ দিলেই চলিবে। বিশেযতঃ সুদটা হয় তো তিনি ছাড়িয়াও দিতে পারেন। বাস্তবিক কি তাহার নিকট হইতে তিনি সুদ লইবেন, না, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিবেন না? কিন্তু মানুষের কুটুম্বিতা বা আত্মীয়তার সঙ্গে অর্থের কিরূপ সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে প্রাপ্তমাত্রযৌবন রমেশের প্রকৃত অভিজ্ঞতা তখনও হয় নাই।

সামান্য আলোচনার পরই রমেশ বুঝিতে পারিল, বিধুভূষণ আর দুই সপ্তাহ-মাত্র অপেক্ষা করিবে। এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্য টাকা দিতে না পারিলে বিষয় নীলামে চড়িবে। ঘৃণায়, অভিমানে রমেশ আর কোন কথা বলিল না।

মাত্র দুই সপ্তাহ সময়! এই অত্যল্পসময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার সংস্থান করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয় সমরানলে দেশের লোক বিব্রত। কোন উত্তমর্ণই এ সময়ে সঞ্চিত অর্থ হাত-ছাড়া করিতে চাহিল না। রমেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতৃবন্ধু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবৎসর হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। নূতন ম্যানেজার কবুল জবাব দিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অন্য স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সমগ্র সম্পত্তি উচ্চহারে বন্ধক রাখিলে টাকা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্ততঃ দুই মাস সময় লাগিবে।

ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া রমেশ বিধুভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিল; সমস্ত কথা বুঝাইয়া

বলিল। অর্থ-সংগ্রহের কোন উপায় নাই। বিধুভূষণ তখন প্রস্তাব করিল যে, পঞ্চাশ হাজার টাকায় সে *** পরগণা ডাকিয়া লইবে। তারপর রমেশকে ঐ সম্পত্তি পুনরায় ইজারা দিবে। শ্যালকের সম্পত্তি গ্রাস করিবার তাহার অভিপ্রায় নাই। ক্রমে ক্রমে যদি রমেশ তাহার সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিতে পারে, তখন ঐ সম্পত্তি সে পুনরায় ফিরাইয়া পাইবে।

রমেশ সানন্দে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। হাজার হউক, বিধুভূষণ তাহার ভগিনীপতি, সত্যই কি সে তাহাকে ভাসাইয়া দিতে পারে? অনেকটা নিশ্চিন্তমনে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

[৯]

নীলাম-ঘরের মধ্য হইতে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাহির হইয়া বিধুভূষণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন যদি কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিত তাহা হইলে তাহার নয়নের জয়োল্লাসজনিত উৎকট দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইত। রুমালে মুখ মুছিয়া সে যেমন পশ্চাতে ফিরিবে, অমনই প্রবীণ উকীল বিশ্বনাথের সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিল। বিশ্বনাথ বহুদিন হইতেই তাহার শ্বশুরের সম্পত্তির যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া আসিতেছেন। বিধুভূষণের ইতিহাস তিনি ভালরকমই জানিতেন।

বিধুভূষণ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, বিশ্বনাথ বলিলেন, "কি বিধু বাবু, কেমন আছ, পালাচ্ছ কেন?"

রুমালে আবার মুখ মুছিয়া বিধুভূষণ বলিল, "অম্‌নি এক রকম আছি। আপনার সব ভাল ত ?- -একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি—'

বিশ্বনাথ বলিলেন, "তা জানি, আজ তোমার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। কিন্তু কাজটা কি ভাল হ'ল?"

বিধুভূষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন, মন্দ কাজটা কি হ'ল?"

শ্লেষভরে বিশ্বনাথ বলিলেন, "না—এ আর মন্দ কাজ কি? ত্রিশ হাজারে *** শ্বশুরের পরগণা নীলাম করাইয়া লইলে, বাকী বিশ হাজার টাকার জন্য আবার অন্য সম্পত্তি ক্রোক দিবে, এটা আর মন্দ কাজ কি? কিন্তু আমার অগোচর কিছুই তো নাই। এত পাপ, এত অধর্ম্ম ভগবান্ সহিবেন কি?"

বিরক্তিভরে বিধুভূষণ বলিল, "ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলিতে হয়, আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন দেখিতেছি। প্রাপ্য টাকা আদায় করা কি অধর্ম্ম? আপনি কি মনে করেন, দানছত্র খুলিবার জন্য আমি টাকা রোজগার করিয়াছি?"

বিধুভূষণের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া আরও কতিপয় উকীল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "দেখ বিধুবাবু, তোমার রোজগারের কথা আর গলাবাজি করিয়া কাহারও কাছে বলিও না। অনাথা, বিধবা ও নাবালকের সর্ব্বনাশ করিয়া যাহারা অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের মুখদর্শন করাও পাপ। ভাবিয়াছিলাম, তুমি উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, অন্ততঃ সে জন্যও এতটুকু চক্ষুলজ্জা তোমার থাকা উচিত ছিল। তোমার বই-বেচার ইতিহাসও আমি জানি। নাবালকের সম্পত্তির কি দুর্দ্দশা করিয়াছ, তাহাও কাহারও জানিতে বাকী নাই। তোমার সঙ্গে কথা কহিতেও ঘৃণা হইতেছে। তোমার কৃতঘ্নতা ও অধর্ম্মের পুরস্কার এই ঘোর কলিতেও তুমি এক দিন পাইবে, এ কথা আমি বলিয়া রাখিলাম।"

দারুণ ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া উকীলবাবু চলিয়া গেলেন। চারিদিক্ হইতে একটা বিদ্রূপ ও টিট্‌কারীর অনুচ্চ ধ্বনি উঠিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া বিধুভূষণও দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বহুদিনের ইপ্সিত ফললাভে আজ বিধুভূষণের আনন্দ ও উল্লাস রাখিবার স্থান ছিল না। এত দিন সকলেই তাহাকে যাহার অন্নদাস বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই শ্বশুরের বংশধরের সম্পত্তির কিয়দংশের সে মালিক। প্রয়োজন হইলে শ্যালক তাহার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি ইজারা লইয়া তাহারই প্রজা হইবে। অতএব, এত দিনে তাহার সাধনা কতকটা সার্থক হইয়াছে। শ্বশুরবংশের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, এত দিনে তাহার কতকটা উপশম হইল। কিন্তু বিশ্বনাথ উকীলের কথাগুলি থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের মধ্যে খোঁচা মারিতেছিল। মনটাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বিধুভূষণ মোটর হাঁকাইয়া তাহার "চিত্ত-বিশ্রামে" চলিয়া গেল।

অপরাহ্নের ছায়া যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন বাড়ী ফিরিবার কথা তাহার স্মরণ হইল। তাহার অনুগ্রহভাজন সহচরেরা আজিকার শুভসংবাদ জানিবার জন্য তাহার গৃহে হয় তো এতক্ষণ সমবেত হইয়াছে, ব্যগ্রভাবে তাহারা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। দুই এক দিনের মধ্যে একটা বৃহৎ ভোজেরও যে আয়োজন করিতে হইবে, একথাটাও বিধুভূষণের মনে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল।

মোটর যখন তাহার বাড়ীর ফটকের মধ্যে দিয়া গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বৈঠকখানা-ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বহু লোক তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাও সে চকিতে দেখিতে পাইল; কিন্তু অন্য দিনের মত আজ উচ্চ হাস্য-পরিহাসের শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না কেন?

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র বাড়ীর সরকার তাহার সম্মুখে পড়িল। তাহার মুখে আশঙ্কা ও উদ্বেগের চিহ্ন দেখিয়াই বিধুভূষণ থমকিয়া দাঁড়াইল—প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

সরকার বলিল, "বাবু, আপনি কোথায় ছিলেন? আদালতে আপনাকে খুঁজিয়া পাই নাই। ছোট বাবুর ভারী অসুখ—কলেরা—"

অকস্মাৎ বিধুভূষণের সমস্ত দেহ থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কলেরা?— তাহার একমাত্র বংশধর, যাহার জন্য সে এত আয়োজন করিয়া রাখিতেছে, সে কি তবে তাহাকে ফেলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াছে?

কোনও দিকে না চাহিয়া বিধুভূষণ লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিল। দাস-দাসীরা শঙ্কামলিন-মুখে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বিধুভূষণ সম্মুখের কক্ষে উন্মাদের মত প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে—ভূমিতলে তাহার বংশ-প্রদীপ, আদরের দুলাল, আঠারো বছরের ফণিভূষণ শায়িত! গৃহমধ্যে আরও কয়েকটি মনুষ্য-মূর্ত্তি রহিয়াছে বটে; কিন্তু বিধুভূষণের দৃষ্টি তখন এমন আচ্ছন্ন যে, সে কাহাকেও সে সময় চিনিয়া উঠিতে পারিল না। ধপ্ করিয়া সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তি নিঃশব্দ-দ্রুত চরণে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহ-চিকিৎসক তাহাকে বলিতেছিলেন, "অত ব্যস্ত হইবেন না। অবস্থা গুরুতর; কিন্তু এখানে গোলযোগ করিলে বিপদ্ আরও বাড়িবে। ধৈর্য্য ধরুন।"

তা কি পারা যায়? একমাত্র সন্তান, স্নেহের দুলাল মুমূর্ষু—পিতার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু চিকিৎসকের প্রবোধবাক্যে অবশেষে বিধুভূষণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

পুত্রের শিয়রে বসিয়া শুভ্রবসনা কে ঐ বৃদ্ধা? হাঁ, তিনিই তো! তাহার শ্বশ্রূঠাকুররাণীই তো বটেন! একমনে বৃদ্ধা দৌহিত্রের মস্তকে বরফ দিতেছিলেন। পার্শ্বে অশ্রুনতনেত্রে তাহার পত্নী পাখা করিতেছেন। আর পদতলে ও কে? মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দৃঢ়-দেহ, সুস্থ, সবল ঐ যুবক তাহারই শ্যালক নহে কি? কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহারই সম্পত্তি বিধুভূষণ জুয়াচুরি করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে না? এ কি পরিহাস? যাহাকে পরাজিত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সে লালায়িত, যাহাকে খর্ব্ব করিয়া নিজের প্রাধান্য বাড়াইবার জন্য সে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাহার সম্পত্তি নীলাম করিয়া লইয়াছে, সেই এখন তাহার পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য নির্ব্বিকারভাবে সেবা করিতেছে!

* * * * *

কঠোর সাধনা, অদম্য পুরুষকার এবং ঐকান্তিক ঈশ্বরনিষ্ঠার ফলে মৃত্যুদূত পরাজয়ের কলঙ্ককালিমা মাখিয়া ফিরিয়া গেল।

রাত্রিশেষে বাড়ির ডাক্তার বলিলেন, "আর ভয় নাই, কিন্তু খুব সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হইবে। রমেশ বাবু, এখন আপনাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনারা যান। আমরা পালাক্রমে ভার লইতেছি।"

শুশ্রূষার জন্য নূতন দল আসিল। রমেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা ও ভগিনীকে লইয়া বাহিরে গেল।

বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাসে, বারান্দায় রমেশ খানিক দাঁড়াইল। ভগিনী চারুবালা ভ্রাতার হাত ধরিয়া বলিলেন, "রমু, ভাই আমার, অপরাধ ক্ষমা কর্। আমি সব জানি—আজ আমা হইতেই তোকে প্রায় পথে দাঁড়াতে হ'য়েছে।

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, দিদি, বিষয় থাকে, আবার যায়। এতে আর দুঃখ কি? আর ফণি যে আমার ভাগ্নে, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমার শরীরে যে রক্ত-স্রোত বইছে, তাতেও কি তার কিছু নাই? আমি যদি বিয়ে না করি, তা হ'লে সেই তো উত্তরাধিকারী। এর জন্য এত দুঃখ কেন দিদি?"

উন্মত্তের ন্যায় বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণ বলিল, "রমেশ, তুমি দেব্তা না মানুষ?" আচ্ছা, কা'ল সকালেই এর প্রায়শ্চিত্ত কর্বো।"

রমেশ দুই হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "থামুন বিধু বাবু,—ফণির অবস্থা এখনও ভাল নয়। অত গোল করিবেন না।"

কার্ত্তিক, ১৩২৫

ভাগ্যহীনা

গিরিবালা দেবী

হাওয়া খাইতে কাশী আসিয়াছি। হাওয়া খাওয়াই বল, আর তীর্থ করাই বল, এখানে আসিয়া দুটোই পাওয়া যায়,—যেমন "রথ দেখা ও পাথর কেনা।" বাহির-মহল হইতে আসিয়াছেন, স্বয়ং খোদ কর্ত্তা ও তাঁহার খাস-মহলের চাকর হরিচরণ! অন্তঃপুর হইতে আসিয়াছে, দাসী-মহলের প্রধান এবং কলহশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া—ক্ষেমির মা। আর আসিয়াছি—শ্রীমতী আমি। বড়দের সঙ্গে একটি নেজুড়ীরও আবির্ভাব হইয়াছে, সেটি সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব নয়। এখন তো বাপের গোত্র ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাই এতদিন যাহারা নিজের লোক ছিল, এখন তাহারা পর হইয়া গিয়াছে, আর যাহারা পর ছিল, তাহারাই নিজের লোক হইয়াছে। এই নিয়মই না কি মনু, পরাশর প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন! শৈলি আমার নিজের ছোট বোন্ হইলেও এখন আর তাহাকে নিজস্ব বলিতে পারি না।

কাশীপ্রবাসী বিপিন বাবুর উপরে বাড়ী ঠিক করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এ বাড়ীতে ঢুকিয়াই আমি মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঠিক কেদারঘাটের উপরেই বাড়ীখানা; মনে হয়, গঙ্গাগর্ভ থেকেই তৈয়ারী হইয়াছে। বড় সুন্দর স্থান, বড় মনোরম স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে বসিয়াই দুকূল-বাহিনী, শরতের সুপ্রসন্না রৌদ্রে উদ্ভাসিতা, কল্লোলগীতিমুখরা গঙ্গার সুবিশাল মূর্ত্তিটি দেখিতে পাই। কত নৌকারোহী অনুকূল পবনে শাদা পাল উড়াইয়া ভাটিয়ালি সঙ্গীতে গঙ্গা-বক্ষ মুখরিত করিয়া যাইতেছে। কত বালক ও কিশোর সস্মিত হইয়া সাঁতারে সাঁতারে গঙ্গার স্বচ্ছজল ঘোলা করিতেছে। রক্ত,নীল, শাদা, কত ফুল ও বিল্বদল গঙ্গাগর্ভে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি মধুর দৃশ্য, চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

নূতন স্থানে আসিয়াছি বলিয়া রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। রাত্রিপ্রভাত হইলেই সব দেখিতে পাইব, এই কথা মনে হইতেই হৃদয়ের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। প্রভাতে বিছানায় শয়ন করিয়াই শুনিতে পাইলাম—গঙ্গাস্নানযাত্রীদের কোলাহল ও মা গঙ্গার সুললিত পদাবলী। প্রভাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভক্তকণ্ঠে গদগদস্বরে শঙ্করাচার্য্যের অতুলনীয় "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে" শুনিয়া দুইটি হস্ত যুক্ত করিয়া মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। আর প্রণাম করিলাম, সেই এই অতুলনীয় পদাবলীর রচয়িতা শঙ্করাচার্য্যকে।

এ কয়েকদিনে কাশীর দর্শনীয় অনেকটাই দর্শন করিয়াছি। জগতের এই অপূর্ব্ব শান্তিধাম থেকে আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে সাধক ও সিদ্ধি যেন পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মা অন্নপূর্ণার দুয়ারে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ভিখারী; এমন দৃশ্য জগতে আর কোথায় আছে? কাশীর তুলনা কাশীতেই। কলিকাতার "মণিকোঠা" ছাড়িয়া এখানে আসিয়া বড় সুখে, বড় শান্তিতে রহিয়াছি।

এখানে মেয়েদের অন্তঃপুরে আলো-বাতাস-বর্জ্জিতা হইয়া থাকিতে হয় না। ছোট বড় ঘর নাই, ইচ্ছা করিলেই সকলেই অবাধে রাস্তায় বাহির হইতে পারে। গায়ে একখানা কাপড় ঢাকা থাকিলেই হইল। বাঙ্গালীর মেয়েরা যে কাশী কাশী করিয়া এত উতলা হন, ইহার মূলাধার বুঝি একটু স্বাধীনতার প্রয়াসে।

লোকে কথায় বলে, "বেশী সুখ সয় না।" আমাদেরও তাই হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী আসিয়াও নিস্তার নাই দেখিতেছি। এখানেও রাস্তা-ঘাট "হরিবোল" ও "রাম রাম" শব্দে সুখরিত হইয়া উঠিল। মৃত্যু-রাক্ষসী শুধু কলিকাতাতেই তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে নাই, এমন সোনার দেশেও তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া ওঠে। কর্ত্তাটি তো এখানে আসিয়া "টো-টো" "কোম্পানীর" ম্যানেজার হইয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত দিনের ভিতর এক স্নানাহারের সময় ভিন্ন তাঁহার চুলের টিকীটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। রকম-সকম দেখিয়া সময় সময় ভারী রাগ হয়, আবার একটু করুণাও না হইয়া যায় না। আহা, চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালী! বারমাসই তো ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, অসুখ নাই, বিসুখ নাই—ঘানিগাছে কলুর বলদের মত ঘুরিয়াই মরা। কর্ত্তাটিকে আজ নিরালা পাইয়া বলিলাম, "কাশীর তো সমস্তই দেখাশুনা হইয়াছে, চল এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক্, এখানে যে মড়ক লেগেছে,বড় ভয় হয়!" উত্তর হইল, কল্‌কাতায় কি লোক মরে না? তোমার যদি এতই ভয়, তুমি হরিচরণের সাথে শৈলিকে আর ক্ষেমির মাকে নিয়ে চলে যাও। আমি ছুটীর কটা দিন বিপিনের ওখানেই কাটাতে পার্‌বো।" আমি বলিলাম, "আমার নিজের জন্য আমি ভয় করিনে,তোমার জন্যই ভাবনা হয়।" তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার যদি কাশীপ্রাপ্তিই অদৃষ্টে লেখা থাকে, তার জন্য তোমার চিন্তা কিসের? সে তো তোমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।" কথার রকম দেখেই গা জ্বালা করে! রাগ ক'রে ঘর থেকে চলিয়া আসিলাম।

নিস্তব্ধ দুপুরবেলা, হাতে কোন কাজ নেই; মেজদিদিকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না। মেজদিদিকে চিঠি লেখা বড় শক্ত কাজ, অনেক মাল-মশলা দরকার; আমার বাপু অত কারীকুরী আসে না। কিন্তু মেজদি মাথার দিব্য দিয়া বার বার বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে চিঠি লিখিতে যেন আমার ভ্রমণের একটি সুদীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট "ডায়েরী" লেখা হয়। একটি কথা যেন বাদ না যায়। সে কবি মানুষ কিনা? তাই তার আশা, কাশী না দেখেই শুধু আমার চিঠিটা পড়েই কবিতা লিখিতে পারিবেন। তাই বর্ণনা-বহুল সুললিত করিয়া পত্র লেখার ভার আমার ঘাড়ে চাপাইয়া, পত্রের প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রায় দুই তিন ডজন কবিতা লিখিবার খাতা কিনিয়া 'বোচ্‌কা-বিড়ে' বাঁধিয়া মেজদি আমাদের সহযাত্রীই হইতে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ ছেলের অসুখ হওয়াতে তাঁহার সমস্ত আশাই আকাশকুসুমে পরিণত হইল।

এখানে আসা হইল না বলিয়া তাঁহার যত দুঃখ না হোক, তাঁহার এত সাধের কবিত্ব-কল্পনা যে হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ থাকিয়া আকুলি বিকুলি করিবে, এই দুঃখেই তিনি বড় দুঃখিত। তখন অনেক কথাই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলাম; এবং আমি খুব বড় ক'রে প্রতিদিনকার ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইব, এ কথাও স্বীকার করিয়াছিলাম। আজ তো ভাবিয়াই আমার চক্ষুস্থির। আমার অতিবড় শত্রুও আমাকে কবি বা কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অপবাদ দিতে পারে না। আমি আজ ভাবুকতা কোথায় পাব? তোমরা কেউ ধার দিবে ভাই? আকাশের দিকে চাহিয়া কোন কূল কিনারা পাইলাম না। শুধু দেখিলাম, শরতের সুপ্রসন্ন অসীম উদার স্বচ্ছ আকাশ—সূর্য্যের উজ্জ্বলপ্রভা দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠিতেছে। "ও সেজদি, দেখে যাও ভাই, রাস্তায় কি কাণ্ড হচ্ছে"—শৈলি ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি কথা কয়েকটি বলিয়াই, তেম্‌নি ত্বরিতপদে চঞ্চলার মত ছাদে উঠিয়া গেল। মেজদিদির চিঠি চুলায় যাক্; আমি শৈলির পশ্চাৎ ছাদে উঠিয়া দেখি, রাস্তায় কতকগুলি লোক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছে, আর ভীষণ-কণ্ঠে "বল হরি, হরি বল্" বলিয়া রাস্তা মুখরিত করিতেছে। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা তাহাদের কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে কিছুমাত্রও কোমলতা নাই,—সে অমানুষিক ভীষণ শব্দেই

হৃদয় শিহরিয়া উঠে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া আসিতে আসিতে চাহিয়া দেখি, ভিড়ের ভিতরে একটি স্ত্রীলোক অস্পষ্ট কণ্ঠে কি যেন বলিতেছে, আর ললাটে করাঘাত করিতেছে। তাহার একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া সাধারণ ভিখারী বলিয়া বোধ হয় না; ভদ্রঘরের রমণী বলিয়া মনে হয়। হয় তো দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া আজ উহার এই দশা হইয়াছে। অসভ্য ইতর লোকগুলির অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা হইল না। নীচে চলিয়া আসিলাম।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে শুনিলাম, হরিচরণের সহিত ক্ষেমির মা'র ভয়ানক বাক্যযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। এ কয়েকদিন এই নিত্তনৈমিত্তিক কার্য্যে উহাদের অবহেলা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, এই নূতন মহাতীর্থে আসিয়া উহাদের দারুণ বিদ্বেষভাব সন্ধিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমার ভুল ধারণা হইয়াছিল, বেশ বুঝিলাম। সহসা উপস্থিত হইয়া উহাদের এত বড় কুরুক্ষেত্রের বুকে যবনিকা প্রসারিত করিতে ইচ্ছা হইল না; অন্তরালে দাঁড়াইয়া উহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

ক্ষেমির মা তাহার কাংস্যবিনিন্দিত-কণ্ঠে কহিতেছে, "বল্ হতভাগা, আমার আঁচল থেকে পয়সা খুলে নিয়েছিস্। হরিচরণ তাহার ভাঙ্গা জয়ঢাকের মত গম্ভীর আওয়াজে কহিল, "মর মাগী, আমি কেন তোর আঁচল থেকে পয়সা নিতে যাব?" রাস্তায় কি দেখ্তে গিয়েছিলি, কে খুলে নিয়েছে; আমি তার কি জানি?" "তুই জান্‌বি কেন মুখপোড়া, পাড়াপড়সী জানে। রাস্তার লোকের তো কাজ নেই, আমার আঁচল থেকে পয়সা নিতে এসেছিল। এ কাজ আর কারো নয়, এ তোর কাজ, তুই একটা আধলার লোভ সামলাতে পারিস্ না, এ তো দুই আনা পয়সা।" হরিচরণ ক্রোধ কম্পিতস্বরে কহিল, "এক চড়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব, জানিস্? ভারী তোর দুই আনা; বাবুর জামাকাপড়ের ভিতর কত দুই আনা রোজগার করি, জানিস্ মুখপুড়ি?" আমার ভয় হইতেছিল, শেষে বাক্যযুদ্ধের পরিবর্ত্তে সত্য যুদ্ধই বুঝি আরম্ভ হয়। ক্ষেমির মা উচ্চ চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া বলিল, "তুই বাবুর জামা-কাপড়ের মধ্যে থেকে রোজগার করিস্ ব'লে অহঙ্কারে অস্থির হচ্ছিস্; আমি বুঝি হাত গুটিয়ে বসে থাকি? ভাঁড়ারে থেকে আমি যা রোজগার করি; তুই তা ছয় মাসে পাবি না, জেনে রাখিস্!" আজ এই পুরাতন বিশ্বাসী ঝি-চাকরের নিজমুখের স্বীকারোক্তি শুনিয়া মনটা বড় প্রসন্ন হইল না। ওখান থেকে চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতা ফিরিবার দিনও হইয়া আসিল। এক মাস মাত্র—ত্রিশটি দিন বই তো নয়। এর ভিতরেই ফুরাইয়া গেল। কাশী ছাড়িয়া আর যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। এমন আনন্দভবন, এমন সুখের স্থান, কে যেন কি একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু তবুও যাইতে হইবে। মনটা বড় বিষণ্ণ লাগিতেছে। তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া শেষ করিয়া, আজ একবার দুর্গাবাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে। তাঁহাকে বলিলাম, "চল দুর্গাবাড়ী যাই।" তিনি বলিলেন, "হরিচরণ নিয়ে যাক, আমার সময় নেই।" সময় আর থাকিবেও না। পাশার আড্ডায় সব সময় খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা তুলিয়া অনর্থক তর্ক করিতে ইচ্ছা হইল না, তাই চুপ করিয়াই রহিলাম।

আমরা যখন দুর্গাবাড়ীর চাতালে গাড়ী হইতে নামিলাম, তখন সূর্য্যাস্তের শেষ রৌদ্ররেখা দুর্গাবাড়ীর চূড়ায় ঝল্-মল্ করিতেছে, ঘনায়মান সন্ধ্যা ধরণীর প্রফুল্লমুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। মন্দিরের মধ্য হইতে ভক্তপূজিত নির্ম্মাল্য-কুসুমের মৃদুগন্ধটুকু বহিয়া ধীরে ধীরে সমীরণ বহিতেছিল। এই স্থানটি বেড়াইবার পক্ষে বড় সুন্দর, বড় নিরিবিলি; আমার বড় ভাল লাগে। ঠিক ছায়ানিবিড় আম্রকাননে ঘেরা পল্লীভবন বলিয়া মনে হয়। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইয়া মনে মনে আজ শেষ বিদায় লইতেছিলাম। হয় তো এ জীবনে আর এখানে না আসিতে পারি। "ও সেজদি, দেখেছ ভাই, আবার সেই এসেছে।" শৈলির আহ্বানে চাহিয়া দেখি, আজিও সেই সেদিনকার স্ত্রীলোকটি রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

আজও তাহার পশ্চাতে কয়েকটি লোক অনবরত হরিধ্বনি করিতেছে। বড় কৌতুহল হইল। একটি মুখের কথা কি এ রমণী সহিতে পারে না? পাগল বলিয়াও তো মনে হয় না; বরং তপস্বিনী পবিত্রহৃদয়া পুণ্যবতী দেবীমূর্ত্তি যেন উহার ভিতরে লুকাইয়া আছে। ক্ষেমির মাকে পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরে ক্ষেমির মার পশ্চাতে স্ত্রীলোকটি দুর্গাবাড়ীর চাতালে প্রবেশ করিল। সে যখন আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, রমণী এখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে নাই। যৌবনে সে যে অসাধারণ লাবণ্যবতী ছিল, আজও সে চিহ্ন উহার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। রমণী আমার নিকট বসিয়া পরিষ্কার বাংলায় মধুর-কণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?" আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম দেখিয়া রমণী পুনরায় কহিল, "কি কথা বলিবে মা, বল না কেন? আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কর। মা, তুমি আজ আমাকে ডাকিয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দ হইতেছে; আজ কত বছর কেহ ডাকিয়া একটি মুখের কথাও কয় না।" এই বলিয়া রমণী একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রমণীর মহিমাময় বিষাদপাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া ও তাহার স্নিগ্ধ-কণ্ঠের কথাগুলি শুনিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়? এখানে তোমার আর কে আছে?" আমার কথায় সে উত্তর করিল, "মা, এখানে কেন, ইহলোকে আমার আর কেহই নাই।" আকাশের দিকে অঙ্গুলী তুলিয়া দেখাইল, "ঐখানে সকলেই আছে। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি সকলই ঐ লোকে রহিয়াছে। আমি শুধু পথহারা পথিকের মত পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান্ কবে এই সর্ব্ববঞ্চিতাকে তাহাদের সহিত সম্মিলিতা করিবে, সেই প্রতীক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছি।" আমি বলিলাম, "বাছা, তুমি কি সংসারে বড় দুঃখ-ব্যথা পাইয়াছ? তোমার সব কথা আমার শুনিতে সাধ হইতেছে।" রমণী তাহার স্নিগ্ধ-মধুর-কণ্ঠে কহিল, "আমার সব কথা কি তোমার শুনিতে ভাল লাগিবে মা? আমার জীবনের কথা গল্পের মত—

"রাজপুতানা আমার জন্মস্থান। আমার পিতা ক্ষত্রিয় ছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া আমি পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। পিতার হৃদয়ভরা স্নেহ-ভালবাসার ছায়ায় কখনও মায়ের অভাব বুঝিতাম না। মুক্ত প্রজাপতির মত বনে বনে ফুল তুলিয়া, ঝরণার পথে পাথর কুড়াইয়া আমার শৈশব অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আমি যৌবনে পদার্পণ করিলাম। আমার অন্তরাকাশের দিগন্ত হইতে যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় আমার অন্তর-বাহির সব মধুরতা-পূর্ণ হইয়া গেল। বয়সের সাথে সাথে আমার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মা, একদিন রূপসী বলিয়া আমার খুবই খ্যাতি ছিল। আজ কি আমাকে দেখিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে? রাজপুতানার বনান্তরালে ঝরণার পার্শ্বে ষোড়শবর্ষীয়া লক্ষ্মীবাইএর সহিত আজ এ তাপদগ্ধা ভাগ্যহীনা ভিখারিণীর তুলনা কোথায়?

"এই রূপের জন্যই আমাদের আশেপাশের গ্রাম হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমার পাণিপ্রার্থী যুবকদল আমার নিকটে তাহাদের কত মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু আমার হৃদয় কিছুতেই তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইত না; বরং তাহাদের নির্লজ্জ অভিনয় দেখিয়া আমার মন আরও বিমুখ হইয়া পড়িত। আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা নাই, আর একমাত্র দুহিতাকে এত শীঘ্র বিলাইয়া দিতে পিতারও ইচ্ছা ছিল না। যখন আমার ষোড়শ বৎসর বয়স, তখনও আমি কুমারীই রহিলাম। পিতা পুত্রী পরস্পর পরস্পরের সাথী হইলাম। আমি যে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি, এ কথা আমার একবারও মনে হইত না। আর আমার পিতা, তিনি বোধ হয় আমাকে দশমবর্ষীয়া বালিকা বলিয়াই মনে করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার হৃদয়-ভরা স্নেহ-ভালবাসায় ইহাই প্রকাশ পাইত। আমার পিতা এককালে

রাজসরকারে সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হঠাৎ মায়ের মৃত্যুতে তাঁহাকে সে চাকুরী ছাড়িয়া আমার জন্যই গৃহে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পিতার নিকটে কত বীরত্বের গল্প, কত যুদ্ধের গল্প শুনিয়া আমার তরুণ হৃদয়খানি কত স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিত। বড় আনন্দে, বড় সুখে আমাদের দিনগুলি কাটিতেছিল। তখন যে দিকে নয়ন ফিরাইতাম, কত মধুরতার, কত নবীনতার উৎস পৃথিবীর বুকে বহিয়া যাইত। আশা, আনন্দ, উল্লাস যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আমার নিকটে অগ্রসর হইত। মনে হইত, পৃথিবীর সমস্ত পথই বুঝি সরল ও সুপ্রশস্ত।

"সে দিন শ্রাবণের নিভৃত সন্ধ্যায় আমি পিতার পদতলে বসিয়া চিতোরের যুদ্ধ-কাহিনী শুনিতেছিলাম; বাহিরে বর্ষার পুঞ্জীকৃত অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার স্বহস্তরোপিত পুষ্পবৃক্ষের উপরে টপ্-টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। একটা দুরন্ত বাতাস ভেজা কেতকী-ফুলের তীব্র গন্ধটুকু গায়ে মাখিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ আমাদের প্রাঙ্গণ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'অতিথি।' আমি ও পিতা চমকিয়া উঠিলাম। সেই সময় বাহিরে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। পিতা উঠিয়া সাদরে অতিথিকে গৃহে আনিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে উজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ কি দেবতা? এমন সুন্দর মূর্ত্তি, এমন মধুর অবয়ব আমি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, কোন নিপুণ শিল্পী যেন বহু যত্নে তাঁহার বড় বড় চক্ষু ও প্রসন্ন হাস্যময় মুখমণ্ডল নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়াছেন; কি গৌরবর্ণ, কি বীরোচিত দেহগঠন, সর্ব্বোপরি কি আশ্চর্য্য অতুল্য মুখচ্ছবি! সেই প্রথম পুরুষের রূপে আমার নয়ন দুইটি মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই দিনই আমি মজিলাম, মরিলাম। আমার কুমারী-চরিত্রের যত দৃঢ়তা, যত ধৈর্য্য, একটি দম্‌কা বাতাসে শুষ্ক তৃণের মত কোথায় উড়িয়া গেল। সেই দিনই আমার জীবন, যৌবন সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম। ভয় হইতেছিল, যদি আমার এ স্বপ্ন সত্য না হয়? কিন্তু জোর করিয়া সে আশঙ্কা হৃদয় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলাম। যদি না হয় নাই হইবে; ইহলোকে যদি না হয়, পরলোকে অবশ্যই হইবে। আর আমার ভয় কি? আমাদের দেশের কত মেয়ে তো চিরকুমারীও থাকে। আমিও না হয়, তাহাদের দলভুক্ত হইয়া আমার বাঞ্ছিতের মূর্ত্তি হৃদয়মাঝে পূজা করিব।

"তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম, তিনি বাঙ্গালী কায়স্থের সন্তান; সম্প্রতি দেশভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। দেশে এক শিশুপুত্র ও মাতা ব্যতীত আর কেহ নাই। রাজপুতানায় সমস্ত দেখাশুনা করিতে তাঁহাকে প্রায় দশ বারো দিন থাকিতে হইল। পিতা তাঁহাকে লইয়া কত বনে, কত পাহাড়ে, কত ঝরণার পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখাইতে লাগিলেন; আমিও ছায়ার মত তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তিনি দেখিতেন রাজপুতানার কত বন, কত উপবন, কত পাহাড়-পর্ব্বত, কত নির্ঝরিণীর জলপ্রপাত, আর আমি দেখিতাম তাঁহাকে—তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত; মনে ভাবিতাম , আমি ইহার নিকট সুন্দরী? না, কখনও না! হইতেই পারে না। কত দিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিতেন, তখনই আমি এ লজ্জিত মুখখানি ও অবাধ্য চক্ষু দুটি নত করিতাম। মনে ভাবিতাম, তাঁহার দিকে আর চাহিব না, তিনি কি মনে ভাবেন, ছিঃ! মনে ভাবিতাম বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হইত না। আমার নির্লজ্জ নয়ন আবার তাঁহার দিকেই চাহিয়া থাকিত। কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, এ জীবনেও যেন তাঁহার রাজপুতানা দেখা শেষ না হয়। কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা ভগবানের চরণে পৌঁছিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; অথবা আমিই মূঢ়, তাই মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। তিনি উদয়পুর

দেখিতে চলিয়া গেলেন; উদয়পুর হইতে ফিরিবার পথে আবার এখানে আসিবেন, এ কথাও বলিয়া গেলেন।

"তাঁহার প্রস্থানের পর আমার নিকটে যেন সব শূন্য শূন্য বোধ হইত। জগৎ যেন অন্ধকার দেখিতাম, গৃহকার্য্যে মন টিকিত না। পিতার মুখে বীরস্থানের বীরকাহিনী আর পূর্ব্বের মত সুললিত লাগিত না। 'শয়নে স্বপনে' আমি তাঁহারই চিন্তা করিতাম। তিনি যেখানে বসিতেন, যে পালঙ্কে শয়ন করিতেন, আমিও সেইখানে বসিয়া সেই পালঙ্কে শয়ন করিয়া বড় আরাম পাইতাম। শুধু দিন গণিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া আমার দিন কাটিত। আমার হৃদয়ের গোপনীয় কথাগুলি, আমার যথাসাধ্য বাহিরে লুকাইয়া রাখিতাম; কিন্তু তখনও জানি নাই, এক জোড়া তীক্ষ্ণ স্নেহদৃষ্টির পাহারা আমার অন্তরস্থল ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মের গোপন কাহিনী জলের মত দেখিতেছে, সেখানে লুকাইবার কিছুই নাই, গোপনীয় কিছুই নাই। সে দৃষ্টি আমার পিতার।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা কার্য্যাবসানে আমি তাঁহারই আশাপথ চাহিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিতাম; সে দিনও বসিয়া ছিলাম। সে দিনও শ্রাবণের নিভৃত সন্ধ্যা,—কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, একটু মেঘের রেখাও ছিল না। পূর্ব্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বর্ষার জল প্লাবিত শস্যক্ষেত্রগুলি সন্ধ্যার ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পথ-ঘাট সব নির্জ্জন, আমি শুধু কল্পনারাজ্যে তাঁহার চিন্তা লইয়া বিভোর। আবার তাঁহাকে দেখিব, আবার তিনি আসিবেন, এ কথা স্মরণ করিতেও বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় দিশাহারা হইয়া উঠিতেছিল। আবার ভয়ও হইতেছিল; আমি যাঁহাকে দেখিবার জন্য যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল, তিনি কি আমার কথা মনে করেন? তিনি মনে না করিলেন, আমি আমার এই নীরব পূজা করিয়াই শান্তি পাইব। সহসা আমার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—'লক্ষ্মী!' প্রথমে আমি চমকিয়া উঠিলাম; পরক্ষণেই লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার সাধ হইল। এ কণ্ঠস্বর তাঁহার, তিনি আসিয়াছেন। হৃদয় তো কত কথা কহিবার জন্য আকুল হইল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কোন কথাই কহিতে পারিলাম না; নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার নিকটে উপবেশন করিলেন। ক্ষণিকের জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন শিথিল হইয়া গেল; চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমারই মুখের উপরে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই দিন সেই বর্ষাস্নাত তৃণাসনে বসিয়া সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকারে তাঁহার কণ্ঠের অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। এ বাক্যহীনার কণ্ঠ রুদ্ধ থাকিলেও নয়নের ভাষায় তাঁহার যাহা জানিবার, তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন।

"সেই সপ্তাহেই আমি তাঁহার হইলাম;—প্রথম দর্শনেই আমি তাঁহার হইয়াছিলাম; কিন্তু সে লোক-চক্ষুর অগোচরে। পিতা সর্ব্বলোক-সমক্ষে শালগ্রাম ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে তাঁহার হাতে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহান্তে একপক্ষ পরে আমি আমার সেই আবাল্যের চির-পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া, জগতের একমাত্র অবলম্বন স্নেহময় পিতাকে ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইলাম। সুদীর্ঘ একটি বছর তাঁহার সহিত ভারতের নানাতীর্থে ঘুরিয়া আমরা এইখানে এই কাশীতে আসিলাম। দীর্ঘ-ভ্রমণের পর বিশ্রাম করিবার জন্যই এখানে কিছুদিন থাকিবার ব্যবস্থা হইল। তিনি একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া নানা আস্‌বাবপত্রে সাজাইয়া লইলেন। বড় সুখে, বড় শান্তিতে এইখানে, আমার এই ভূকৈলাসে তিনটি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু মা, এ হতভাগ্য অদৃষ্টে এ সুখ বেশী দিন টিকিয়া রহিল না। একদিন সংবাদ পাইলাম, সংসারের একমাত্র অবলম্বন আমার স্নেহময় পিতা আর ইহজগতে নাই। আমার হৃদয়খানি শতধা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ধূলিশয্যায় লুটাইয়া আমার পিতৃস্মৃতি স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সময় তো কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না; শোকও সময়ে হ্রাস হইয়া

আসে। পিতার মৃত্যুশোক কিছুতেই সহিতে পারিব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু যে অলক্ষ্য হস্ত হইতে হৃদয়ে এই আঘাত পাইয়াছিলাম, সেই অলক্ষ্য হস্ত হইতেই শান্তিধারা বর্ষিত হইয়া আবার হৃদয় শান্ত করি। পিতা আমাকে এই বিশাল সংসারে একাকিনী ফেলিয়া গেলেন। তাঁহার অসীম ভালবাসায়, আদর-যত্নে আমার নিরাশ ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চায় হইল। এই দুঃখময় শোকময় পৃথিবী পুনরায় নবীনতাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মা, এ ভাগ্যহীনার পোড়া অদৃষ্টে এ সুখ সহিবে কেন? আমার শান্তির আকাশে—সুখের আকাশে বৈশাখী কাল-মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল; কাহার সাধ্য, তাহার গতিরোধ করে? সহসা তাঁহার বক্ষে কি একটি ব্যথা ধরিল, ক্রমে দিনে দিনে তাঁহার সেই দেবতা-বাঞ্ছিত সুন্দর নিটোল দেহখানি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল; ভয়ে চিন্তায় আমি এতটুকু হইয়া গেলাম। ডাক্তার ডাকাইলাম, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলাম,—কিন্তু কিছুই হইল না। একদিন তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে করিতে কহিলাম, 'চল, কলিকাতায় যাই, সেখানে বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ দিয়ে দেখান যাইবে।' তিনি উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী, আমারও বড় সাধ হয়, মা'র কাছে ফিরে যাই, রণুকে দেখি, কিন্তু'—তিনি চুপ করিলেন। আমি তাঁহার অসম্পূর্ণ কথার অর্থ বুঝিলাম। আমার জন্যই কি তিনি গৃহে ফিরিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন? আমার জন্যই কি তিনি মাতা পুত্রকে মুখ দেখাইতে লজ্জা অনুভব করিতেছেন? এম্‌নি স্বার্থপর! নিজের সুখেই বিভোর রহিয়াছি; একথা একবার মনেও করি নাই।

"আমি বলিলাম, 'তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছ? আমি তোমার সাথে গেলে যদি তোমার লজ্জা হয়, অপমান হয়, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যাইতে চাহি না। আমি রাজপুতানায় চলিয়া যাই।'—বলিলাম বটে, কিন্তু চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার চোখে জলের ধারা ছুটিল। তিনি সস্নেহে আমার মস্তক বক্ষে লইয়া আমার অশ্রুপূর্ণ নয়নে চুম্বন করিয়া স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, 'ছিঃ লক্ষ্মী, তুমি আমাকে এতই কাপুরুষ মনে কর? আমি জীবনে মরণে কোন দিনও আমার ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিব না। তোমার কাছে গোপন করিব না, আমি বাড়ী যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু এই ভাবিয়া, আমার মা যদি তোমাকে ভিন্নদেশীয়া রাজপুতের মেয়ে ভাবিয়া স্নেহের চক্ষে না দেখেন; আমার পুত্র রণু যদি তোমাকে মা বলিয়া ভক্তি না করে। এ কথা আপন মনে ভাবিতেও আমার অসহ্য হয়। লক্ষ্মী, তোমাকে পাইয়া আমার লজ্জা হয় নাই, আমার গৌরব আরও বেশী হইয়াছে।' আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না; শুধু নত হইয়া আমার দেবতার চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইলাম।

"আশা নিরাশায় চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়ে একদিন তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইলাম। তখন আমার হৃদয়ে কি ঝড় বহিতেছিল, কে বলিবে? তাঁহার পুত্র, তাঁহার মাতা আমাকে কি চক্ষে দেখিবেন, তাহার স্থিরতা কি? বৃহৎ থামযুক্ত প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিতেই, তিনি অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইলেন, 'লক্ষ্মী, এই তোমার নিজের বাড়ী চেয়ে দেখ।' আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য! ইহার পূর্ব্বে তাঁহার আর্থিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এতটা কল্পনায় ভাবিতে পারি নাই। তিনি অন্তঃপুরের ফটকে গাড়ী থামাইতে গাড়োয়ানকে হুকুম করিলেন। গাড়ী থামিতেই চাহিয়া দেখি, দরজার সম্মুখে একটি মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে একটি অপার্থিব করুণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। অনুমানে বুঝিলাম, ইনি মাতা। পাঁচ ছয় বৎসরের একটি নধরকান্তি বালক প্রফুল্লমুখে গাড়ীর দিকে চাহিতেছিল। কি সুন্দর মুখ, ঠিক যেন উনির মত—জগতে অতুল্য, অমূল্য, নিখুঁত, নিটোল। উনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন; দুই বাহু প্রসারিত করিয়া রণুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মা একবার চকিত দৃষ্টিতে

গাড়ীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রমেশ, গাড়ীতে আর কে আছে?' চাহিয়া দেখি, তাঁহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের জন্য। তিনি রণুকে বক্ষ হইতে নামাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, যাও তো রণু, গাড়ীতে তোমার মা আছেন, তাঁকে নামিয়ে আন।' বালক প্রফুল্লমুখে 'মা মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার তৃষিতবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কি আনন্দে, কি সুখে আমার হৃদয়খানি প্লাবিত হইয়া গেল! আমি আমার তপ্তবক্ষে রণুর মুখখানি নিবিড় করিয়া ধরিলাম। বালক উচ্ছ্বসিত অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি এতদিন কেন তাহাকে ঠাকুরমার নিকটে ফেলিয়া 'বাপের বাড়ী' গিয়াছিলাম। অন্দরের নিভৃত কক্ষে অজস্র চুম্বনে আমি রণুর মন হইতে সমস্ত অভিমানরেখা মুছাইয়া দিলাম।

"মা'র স্নেহ-ভালবাসায় এবং রণুর আত্মসমর্পণ দেখিয়া ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টে কি এত সুখ সহিবে? এই শান্তিপূর্ণ গৃহের এত ঐশ্বর্য্য, এত স্নেহ-মমতা ভিখারিণী দীনা-হীনার ভাগ্যে সহিবে কেন? দেবী মায়ের দেবপুত্র, রণু আমার দেবশিশু; এই পাপ-পূর্ণধরায় কি তাহারা থাকিতে পারে? তাঁহার বক্ষের ব্যথা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; কত ডাক্তার, কত কবিরাজ আসিল, কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি চলিয়া গেলেন; তাঁহার পদপ্রান্তে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমার নিকটে পৃথিবীর সমস্ত আলো চিরতরে নিবিয়া গেল। শান্তিস্রোত অর্দ্ধপথেই মরুভূমে পরিণত হইল, হৃদয় পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল, আমি পাষাণী তখনও মরিলাম না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন চাহিয়া দেখি, তিনি আর নাই; তাঁহার ছায়াটুকুও আর ইহলোকে দেখিতে পাইব না। আমাদের বহির্ব্বাটী হইতে একাধিককণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'বল হরি হরি বল।' আমি এ শব্দ সহিতে পারিলাম না। আমার বক্ষের ভিতর দিয়া, মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কি এক তাড়িত-শিখা বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার জ্ঞানহারা হইলাম। যাঁহাকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারি নাই, কখন যে পারিব, তাহাও ভাবি নাই, সেই তাঁহাকে হারাইয়া বাঁচিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বড় দুঃখে—বড় কষ্টে। জীবননদীতে অর্দ্ধপথেই চড়া পড়িয়া গেল, আমার পূর্ণিমারজনী দারুণ অমানিশার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বীণা বাজাইতে লইয়া তার ছিঁড়িয়া গেল, আমার বড় আনন্দের বড় আশার ফুলবন হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইল। সব শূন্য, জগৎ শূন্য তবুও আমি বাঁচিয়া রহিলাম।

"পুত্রশোকাতুরা জননী তাঁহার প্রস্থানের পর শয্যা গ্রহণ করিলেন,—সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা হইল। মাকে হারাইয়া আমি অকূলে ভাসিলাম; কোথায় দাঁড়াইব, কে আশ্রয় দিবে? মাথার উপরে বিপুল ঐশ্বর্য্য, আমি রমণী, আত্মীয়-বান্ধবহীনা; বালকপুত্র লইয়া কাহার নিকটে দাঁড়াইব ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলাম। বেশী দিন ভাবিতে হইল না। তাঁহার দূরসম্পর্কের মামা না কি কে, একদিন তাহার দলবল লইয়া বোঁচকা-বিড়ে লইয়া আমাদের গৃহে মৌরশী পাট্টা গাড়িয়া বসিল। তাহারা স্বামী স্ত্রী মিলিয়া দুই দিনেই বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নী সাজিয়া সংসারমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করিতে লাগিল। কাহার খবর কে লয়? নিজের অসহ্য যন্ত্রণায় রাত্রি-দিবা দগ্ধ হইতেছিলাম; উহাদের অভিনয় ভাল লাগিত না। মনে করিতাম, তাঁহার যাহা কিছু, সবই তো রণুর; উহারা ভোগ করিবে; দুই দিন বই তো নয়—করুক। কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গিতে বেশীদিন লাগিল না; বুঝিলাম, রণুকে উহারা বিষতুল্য দেখিতেছে। আহা, পাষণ্ডদের ভিতরে বুঝি কিছুই ছিল না; তাহাদের শরীরগুলি বুঝি বিধাতাপুরুষ রক্তমাংসের পরিবর্ত্তে লোহা দিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। আমার সোনার রণু উহাদের তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে দিনে দিনে নিদাঘে দগ্ধ ফুলটির মত শুকাইতে লাগিল। মনে করিলাম, এ শয়তানদের হাত হইতে রণুকে লইয়া কোথায়ও পলাইয়া যাই। কিন্তু যাইব কোথায়? জগতে কাহাকেও তো রাখি নাই যে, তাহার আশ্রয়ে যাইব! মনে করিলাম, রণুর হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। আমার ভিক্ষান্নে রণুকে বাঁচাইয়া রাখিব। মনে

ভাবিলাম বটে, কিন্তু পারিলাম কই? তখনও এ দেহে রূপযৌবন তাহার পুরা রাজত্ব করিতেছে; তাই পথে বাহির হইতে পারিলাম না। চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করিলাম, শয়তানেরা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল করিল। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কণ্টকস্বরূপ রণুকে এ পৃথিবীতে রাখিতে দিল না। তাহারা আমার বাছাকে একটু একটু করিয়া দিনে দিনে হত্যা করিল। বেলা-শেষের ঝরা ফুলটির মত রণু আমার, তাহার মায়ের বুকে ঝড়িয়া পড়িল। মা গো, আর কি শুনিবে? আমি রণুকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু পারিলাম না! সেই পাপাত্মা হরলাল, তাঁহার মামাতো ভাই না, কি, সেই বিকটদর্শন নরকের কীট, তাহার লালসাপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া আমার বক্ষ হইতে আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি, কণ্ঠের হার, অনাথার সর্ব্বস্ব রত্ন ছিনাইয়া লইয়া গেল। জোর করিয়া পারিলাম না। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুটিয়া গেলাম; দেয়ালের ধাক্কা খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম; উঠিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। শুনিলাম পাষণ্ডেরা উচ্চ চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া 'বল হরি হরি বল্' বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেল। অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের ঐ বিকটধ্বনি আমার বক্ষ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে বিধিতে লাগিল। সেইদিন হইতে ও নাম আর শুনিতে পারি না, মা। ঐ কথা শুনিলেই আমি জ্ঞানহারা হইয়া যাই। আমার নয়নের সম্মুখে আমার প্রিয়তমের অন্তিমশয্যা, আমার প্রাণাধিক পুত্রের চিরবিদায় ছবির মত ভাসিয়া ওঠে। ঐ হৃদয়হীনেরা এ কথা জানে না, তাহারা তামাসা বলিয়া আমার হৃদয়খানি আরও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

"মা, তোমাকে সমস্তই বলিলাম, আর শেষটুকুই বা বাকী থাকিবে কেন? সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভাবিলাম, পতিপুত্রের স্মৃতিমন্দিরে তাহাদের মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব। কিন্তু এ ভাগ্যবিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতার সব পথই রুদ্ধ। সব আশাই আকাশ-কুসুম। নরকের কীট হরলালের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমায় অনুসরণ করিয়া বেড়াইত; কিছুতেই গৃহে টিকিতে পারিলাম না। পাড়ার এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা কাশীবাসিনী হইবেন শুনিয়া তাঁহারই নিকটে কাঁদিয়া পড়িলাম। তিনি আমার সমস্ত কথা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার সাথে আনিলেন। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন। দশ বার বছর তাঁহার কাছে নিরাপদেই কাটাইয়াছি। আমার অদৃষ্টে দুই বৎসর হইল, তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে সেই গৃহেই আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের অন্ন গ্রহণ করি না। ছত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাতেই আমার একবেলার হবিষ্যান্ন স্বচ্ছন্দে চলিযা যায়।

ইচ্ছা করিলে তাঁহার ধনরত্ন অনেক সাথে করিয়া আনিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আনি নাই। জগতের যে অমূল্য অতুল্য রত্ন, তাহাই হারাইয়াছি; তুচ্ছ ধন, ঐশ্বর্য্য, তাহা দিয়ে কি হইবে? তাঁহার প্রীতি-উপহার গহনাগুলি আমার বড় আদরের, তাঁহার বড় মনোনীত করিয়া তৈরী, তাই সেগুলির মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলাম না। তাঁহার দান আমার বড় আদরের; সেগুলি বেচিলে আমার মত পাঁচটি বিধবার চিরজীবন কাটিতে পারিত। আমি ভিখারিণী আমার রত্ন দিয়ে কি হইবে? আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের গহনাগুলি আতুরাশ্রমে দান করিয়াছি।

ধীরে ধীরে রমণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি অঞ্চলের প্রান্তে বার বার চক্ষু মুছিয়াও চোখের জল সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া চাহিলাম, সে তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাৎ হইতে ধ্বনি হইতেছিল "বল্ হরি হরি বল্।"

শ্রাবণ, ১৩২৬

মায়া

সুষমা সিংহ

"দেখ্ যতীন, এবার কিন্তু তুই না বল্‌তে পার্‌বি না। এই তো B. Sc. পাশ কর্‌লি ; এবার আর তোর কোন ওজর আপত্তি শুন্‌ছি না। বিয়ের কথা পাড়্‌লেই তো তুই বল্‌বি 'খাওয়াব কি', 'পাশ করি' ইত্যাদি। চৌধুরীদের মেয়েটী বেশ দেখ্‌তে শুন্‌তে, লেখা পড়াও বেশ জানে, আর দেবে থোবেও বেশ—।" "দোহাই মা, রক্ষে কর 'দেখ্‌তেও বেশ' আবার 'টাকাকড়িও বেশ।' "বেশে'র দৌরাত্ম্যে দেখ্‌ছি বাড়ী ছাড়া হ'তে হবে। তোমার বড় লোক বউমার এসেন্স, সাবান, সাড়ী, গহনার ফরমাসের চোটে প্রাণ বাঁচান দায় হবে।" মাতা কিছু অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন "যা যা—কি যে বকিস্ তার ঠিক্ নেই। বড় লোকের মেয়ে হ'লেই বুঝি অত ফরমাস করে? এই আমিও তো রে বড় লোকের মেয়ে ছিলুম, কই তোর বাপ, ঠাকুমার কাছে থেকে কত ফরমাস করেছিলাম? অত কথা কাটাকাটী আমি শুন্‌তে চাই না, এই বৈশাখেই আমি তোর বিয়ে দেব।" যতীন বেশ নিরুদ্বিগ্ন মুখে বলিল "বেশ, তবে দাও—তোমার যতীনকে চৌধুরীদের কাছে বিক্রী করে। তোমার কোল ছাড়া কর্‌তে এত যদি ইচ্ছে, তবে টাকার সঙ্গে তোমার যতীনকে বদল কর।" "ষাট্, ষাট্! কি যে বলিস ; যাঃ আর বিয়ের কথা বল্‌ব না—আচ্ছা, তবে কি তুই বরাবর আইবুড়োই থাক্‌বি?" "আইবুড়ো থাক্‌ব কেন! যতদিন না ভাল করে মানুষ হয়ে উঠি, ও তোমার বড় লোক বউমা আনবার উপযুক্ত হই, ততদিন একটু সবুর কর। আর ভাব্‌ছি, তিন বছরের জন্য একবার বিলাতটা ঘুরে আসা যাক্, কি বল মা? বেড়ানও হবে, একটু বিদ্যাশিক্ষাও হবে ; কি মা! বছর তিনেকের জন্য তোমার অন্ধের যষ্ঠী, নয়নের তারা ষেঠের ধন যতীনকে কোলছাড়া কর্‌তে পার্‌বে?" "কি কথায় কি কথা এল? আমি বল্লুম 'বিয়ে কর্‌তে', না গুণধর ছেলে বল্লেন 'বিলেত যাব'। বেশ বাপু, একটা কর্‌না, চৌধুরীদের মেয়েটীকে বিয়ে করে বিলেত ঘুরে আয় না।" "সে হবে না মা, সেই যে ১১/১২ বছরের নোলক পরা মেয়েটা আমার সাম্‌নে এসে প্যান্ প্যান্ করে কাঁদবে, আর আমার বিলাত যাওয়া তখন মাথায় থাক্‌বে ; সে কিছুতে হচ্ছে না। বেশ তো তুমি ঠিক করে রাখ, আমি কিনা বছরের মধ্যেই ফিরে এসে তোমায় বউ এনে দেব। শোন মা, বউ এলে তো আমাকে দূর করে দেবে না? যে দরদ দেখ্‌ছি ভাবী বউর উপর।" "পাগল আর কি? মা কি কখন ছেলেকে দূর করে দেয়? তোর যে কবে আক্কেল বুদ্ধি হবে, বুঝি না। আমি তো কিছুতেই পার্‌লাম না, ভাবলাম বউ এলে তুই ঠিক হবি ; তা তাও আন্‌বি না।" "হ্যাঁ মা, তুমি আমাকে ঠিক কব্‌তে পার্‌লে না, আর পার্‌বে কি না—সেই তোমার ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্‌পেনে, নোলক পরা, মল পরা একাদশ বর্ষীয়া সাধের বউমা?"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই এসে তোকে ঠিক কর্‌বে" বলিয়া মাতা স্নেহের হাসি হাসিতে হাসিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

[২]

আজ তিনমাস হইল, যতীন অসুস্থ হইয়া মধুপুরে বাস করিতেছে, সঙ্গে মাতা ও তাহাদের আশ্রিতা মামাতো ভগ্নী রমা। উপরোক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই যতীন মহোৎসাহে লণ্ডন যাত্রা করে ; সেখানে পাঁচ মাস ধরিয়া বেশ মনোযোগ ও আনন্দ সহকারে শিক্ষালাভ

করিতেছিল। কিন্তু দুর্দ্দৈবশতঃ হঠাৎ সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। সেখানকার ডাক্তারগণ একমত হইয়া শীতপ্রধান দেশ লণ্ডন ছাড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন। যদি সে লণ্ডনে থাকে, তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইবে ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; সেই জন্য সে, দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পশ্চিম বাস করিতেছে। লণ্ডনের ডাক্তারগণ তাহাকে বাস্তবিকই বলিয়াছিলেন যে, তথাকার শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। বাস্তবিক মধুপুরে থাকিয়া ক্রমশঃ সে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল।

মধুপুরের প্রায় সকলের সঙ্গেই তাহাদের বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তবে অতুলবাবুদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। অতুলবাবুর দুই কন্যা ও দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্বশুরালয়ে থাকে ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া F. A. পড়ে, ছোট মেয়ে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া মায়া ও অষ্টমবর্ষীয় বালক অমল সঙ্গে থাকে। রমার সঙ্গে মায়ার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। দুই পরিবারে যাওয়া আসা, গল্পগুজব, আদান-প্রদান খুবই হয়। যতীন রমা, মায়া অমল একসঙ্গে বেড়াইতে যায় ; মায়া যতীনের সঙ্গে খুব বেশী কথা কহিত না। মায়া প্রায়ই দেখিত—যতীন তাহার মুখের দিকে অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিয়াছে, চোখোচোখী হইলেই যতীন অপ্রস্তুত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইত ; মায়া কিন্তু বিরক্ত হইত। মাঝে মাঝে রমাকে বলিত "হাঁ ভাই, তোর দাদা কি বল্? হাঁ করে চেয়ে থাকেন কেন? আমার কিন্তু বড় বিরক্ত লাগে, তা তুই রাগ কর্, আর যাই কর্।"

সেদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় মায়া রমাদের বাটিতে রমার সন্ধানে আসিয়াছিল। দেখিল—মাঝের ঘরে মেঝেতে বসে যতীনের মা ছেলের জন্য রেকাবীতে খাবার সাজাইতেছে, আর যতীন দূরে চেয়ারে বসিয়া একখানা বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়িতেছে। "রমা কোথায় মাসিমা?" যতীনের মা মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিলেন "রান্নাঘরে আছে বোধ হয় ; হ্যারে, তুই এত রোদে এলি কি করে রে—মুখটা যে রোদে রাঙ্গা সিন্দুর হয়ে উঠেছে! একখানা ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে আস্তেও পারিস্নি?" উত্তরে মায়া একটু মৃদুমধুর হাসিল। যতীন ক্ষুব্ধনেত্রে মায়ার বায়ুবিতাড়িত চূর্ণ-কুন্তল-শোভিত আরক্ত মুখখানি দেখিতেছিল। মায়া তাহার দিকে চাহিতেই সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "মায়া, এ মাসের কাগজটা এসেছে দেখেছ? বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি আছে।" মায়া টেবিলের পাশে সরিয়া আসিলে যতীন তাহাকে ছবি দেখাইতে লাগিল। একখানা ছবির দিকে তাকাইয়া মায়ার মুখের উপর মুগ্ধ চক্ষু দুটি স্থাপিত করিয়া মাতার অশ্রুত মৃদুস্বর জনান্তিকে বলিল "এটা কেমন বলত মায়া! বেশ না?" মায়া একবার চাহিয়া আরক্তমুখে "ছি ছি বলিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একেবারে বাড়ীতে নিজের বিছানায় গিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। ছবির বিষয়টা এই যে নব পরিণীতা প্রেমোৎফুল্ল যুবক পিছন দিক হইতে নিঃশব্দে আসিয়া কার্য্যনিরতা লাজরক্তা কিশোরী বধূর মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া চুম্বনে উদ্যত! শুইয়া মায়া ভাবিতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! উনি আমাকে কেন এমন ছবি দেখালেন? আমাকে এ রকম অপমান কর্বার তাঁর কি দরকার আছে? একথা যে কাউকে বলা যায় না, মা বাবা—ছিঃ ছিঃ তাঁদের কি বলা যায়? রমাকে আমি বল্ব—নিশ্চয়ই বল্ব ; বেশী বাড়াবাড়ী করিলে মাকেও বল্তে হবে?"

[৩]

সেদিন যতীনের বাড়ীতে ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। পাড়ার কয়েকঘর পরিবারের যতীনের বাটীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। রমা মায়া ও পাড়ার আরও দুই একটী সমবয়স্কা মেয়ে সকলে এক জায়গায় বসিয়া পান সাজিতেছে, গল্প করিতেছে। উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে মায়া আর

একলা যতীনের সম্মুখে আসিত না, আসিতে হইলে হয় রমা, অমল নয়ত পাড়ার কোন মেয়েকে সঙ্গে লইত। সেদিন যতীনের জন্মতিথি ছিল ; মাতা একমাত্র সন্তান যতীনের জন্মতিথি উপলক্ষে পাঁচজন লোককে ডাকিয়া নিজহস্তে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। সেদিন যতীন মাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ নূতন কালপেড়ে দেশী ধুতিখানি পরিয়া ও রমার সুকোমল হস্ত গ্রথিত বেলফুলের মালাছড়াটি গলায় দিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যেখানে পান সাজা হইতেছিল একবার সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল ; মৃদু হাসিয়া রমাকে বলিল "দেখদেখি রমা, আমাকে কি রকম দেখাচ্ছে? বেশ দেখাচ্ছে না?" "হ্যা দাদা বেশ দেখাচ্ছে।" অন্যান্য বালিকাগণ তাহার চন্দনপরা, নূতন কাপড় পরা লইয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। মায়াও ছাড়িল না। সে একটু হাসিয়া বলিল "আপনি কি কচি খোকা? মালাছড়াটা পরতে লজ্জা কর্‌ল না?"

যতীন বলিয়া উঠিল, "বেশ মায়া, আমি তো নয় বুড়ো মানুষ, তুমি তো ছেলেমানুষ, তুমি নেবে মালাগাছটা? সঙ্গিনীরা সব হাসিয়া উঠিল, মায়া দাঁড়াইয়া রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনার মালা আমি নিতে যাব কেন? আপনি আমাকে নিজের বাড়ীতে পেয়ে বারবার অপমান কর্‌ছেন কেন? আপনার মালা যে চায় তাকে দিন। ছিঃ ছিঃ আমার সঙ্গে এরকম নির্লজ্জের মত ব্যবহার কর্‌তে আপনার লজ্জাবোধ হয় না?" মায়া দ্রুত পদক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিল ; সঙ্গে রমা ও অন্যান্য সঙ্গিনীরাও গেল। যাইতে যাইতে একজন বলিল "মায়া! তুই যে বড় রাগ করে চলে এলি? তোর সঙ্গে যদি যতীনবাবুর বিয়ে হয়, যদি কেন! তোর বাবা তো তাই চেষ্টা কর্‌ছেন, খুব সম্ভব তাই হবে ; তখন তুই কি কর্‌বি?" মায়া চটিয়া গিয়া "তোর মুণ্ডপাত কর্‌ব" বলিয়া একেবারে বাড়ী গিয়া হাজির। রমার শত আহ্বানেও আর মায়া আসিল না। আনন্দপূর্ণ জন্মোৎসব রাত্রি যতীনের নিকট ম্লান হইয়া গেল।

ক্রমে এই মালার গল্পটা অতিরঞ্জিত হইয়া মায়ার মাতার কাণে উঠিল ; মাতা বুঝিলেন যে যতীন তাঁহার কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সেদিন রাত্রেই তিনি স্বামীর নিকট যতীনের সহিত মায়ার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মায়ার পিতাও আনন্দ সহকারে সম্মত হইলেন ; এদিকে মায়া শুইয়া শুইয়া সবই শুনিল ; মনে মনে রাগে গুমরাইয়া উঠিল। পরদিন মাতা যতীনের সহিত যে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে তাহার একটু আভাষ দিলেন, মায়া আর থাকিতে পারিল না বলিল, "যতীন বাবুকে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না মা, তার থেকে মধুপুরের কোন সাঁওতালকে বিয়ে করতে রাজি আছি।" মাতা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কন্যার ঘৃণা ও বেদনামিশ্রিত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিলেন না, নীরবে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মায়ার পিতা শুনিয়া বলিলেন, "বিয়ে কর্‌বে না আবার কি কথা।" অবসর বুঝিয়া আর একদিন যতীন রমার সাম্‌নে মায়াকে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল, মায়া অশ্রদ্ধাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল।

যতীন মায়ার উপর যেমন আকৃষ্ট হইতেছিল, আবার তাহার ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, ও বিয়োগ দেখিয়া তেমনই চটিতেছিল। শেষ একবার নিজে বলিয়াও যখন বিফল মনোরথ হইল তখন সে তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত ও অপমান করিবার সঙ্কল্প করিল। দিন কয়েক পরে যতীন মায়ার পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেইদিন বৈকালে তাহার পিতা মায়াকে দেখিতে যাইবেন। পিতার আদেশ মায়া ঠেলিতে পারিল না ; মাতার নিকট খুব একচোট কাঁদিয়া লইয়া চুল বাঁধিয়া সাজিয়া ঠিক হইয়া রহিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রি আসিল, তথাপি কেহ আসিল না। সন্ধ্যায় রমা আসাতে মায়ার পিতা যতীনের পিতার খবর লইবেন। রমা অবাক হইয়া গেল, বলিল "কই তিনি তো এখানে আসেন নাই। হ্যাঁরে মায়া তুই সেজে গুজে বসে আছিস কেন? অপমানিত মায়া সবই বুঝিল, রমাকে যা তা বুঝাইয়া সাজসজ্জা

খুলিয়া ফেলিল। বুঝিল যে, তাহাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিবার জন্য এ আয়োজন—কিন্তু তাহার সরলপ্রাণ পিতামাতাকে কেন এ ব্যঙ্গ করা—অপমান করা? সুশিক্ষিত তিনি ইচ্ছা করিলে কত শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা তাঁহার জীবন সঙ্গিনী হইতে পারে ; কিন্তু আমার উপর তাঁর এ আক্রোশ কেন? যাক অপমান করা তো যথেষ্ট হইল, এবার যেন তিনি আমাকে অব্যাহতি দেন!

অতুলবাবুও তাঁহার পত্নী যতীনের এরূপ ব্যবহারের বিস্মিত ও অপমান বোধ করিলেন ; কিন্তু একবার গিয়া যতীনকে জিজ্ঞাসা করা কি খবর লওয়া, সেসব কিছুই করিলেন না। দুইদিন পরে যতীনের বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল ; পাড়া প্রতিবেশীরা ব্যাপার জানিবার জন্য ছুটিয়া যতীনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। শুনিল যতীন বিবাহ করিবার জন্য আজ ৭টার ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইতেছে। প্রতিবেশীদের মুখেই অতুলবাবুরা সব শুনিলেন ; মায়াও শুনিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

যতীন বিবাহ করিয়া আসিয়াছে ; সকলে বউ দেখিয়া বেশ প্রশংসা করিল। যতীন আসিয়াই রমাকে বলিল "কেমন বউ হয়েছে রে? মায়ার থেকে ভাল না খারাপ হয়েছে? নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে না!" রমা দাদার মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে! কই নূতন জীবনারম্ভে চোখে মুখে সে আনন্দের ছটা নেইতো? কে যেন তাহার বদলে ঐ বেদনা বিবর্ণ-মুখের উপর হতাশার কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। কই, চোখ হ'তে তো হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে না? তাহার বদলে যেন অশ্রুকণা গলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। ঠোঁট দুটী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রমা কিন্তু মায়ার সহিত বউকে তুলনা করাতে চমকাইয়া উঠিল। তবে কি দাদা স্বেচ্ছায় এ বিবাহ করে নাই। শুধু মায়াকে আঘাত দিবার অপমান করিবার জন্য? সে বুদ্ধি করিয়া বলিল, "কেন দাদা, মায়ার থেকে তো বৌ ঢের বেশী সুন্দরী হয়েছে?" "মায়া বউকে দেখতে আসে নি।" "না দাদা, মাসিমা দেখে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন? বৌভাতেও মায়া গেল না, রমাও ডাকিল না। রমা ডাকিল না এই জন্য যে, মায়া সেখানে উপস্থিত হইলে দাদা পাছে আবার কিছু বলিয়া বসেন ; মায়াও সেই কারণে গেল না। কিন্তু লোকে বুঝিল যে যতীনের সঙ্গে বিবাহের কথা হয়েছিল বলিয়াই মায়া যায় নাই। ৩/৪ দিন পরে সন্ধ্যার সময় যতীন তাহার স্ত্রী সুধাকে মায়াদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। মায়ার মা অতি যত্নের সহিত তাহাদের বসাইলেন ; কিন্তু বধূর সাজসজ্জা দেখিয়া অবাক হইলেন। নবপরিণীতা বধূ আজ সামান্য একখানা সরু কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া আসিয়াছে? কিন্তু একি ; গলায় একছড়া পুরাতন শুষ্কফুলের মালা কেন? মায়ার জননী কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "এস মা, এ ঘরে এস, মায়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।" যতীন দেখিল মায়া তাহার সামনে বাহির হইল না, সে কিন্তু বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে বউকে তাহার জন্মদিনের ধুতি ও মালা পরা দেখে অপমানে মায়ার মুখের ভাব কিরূপ হয় দেখিবে ; কিন্তু সে তো হইল না!

মায়া বধূর সাজসজ্জা দেখিয়াই বুঝিল যে আবার অপমান করিবার এ এক নূতন পন্থা ; মুখে সে কিছুই বলিল না। অতি যত্নের সহিত তাহাকে আপ্যায়ন করিল।

[৪]

আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের উপর হইল মায়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; সে আজ একটি সন্তানের জননী। যতীনদের খবর রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোন খবরই সে পায় নাই ; তবে রমার বিবাহের খবরটা পেয়েছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে মায়ার স্বামী বিনয় পুরী বেড়াইতে গিয়াছে ; সে মাঝে মায়াকে লিখিয়াছিল সে সেখানে তার একটি সহপাঠীর সহিত দেখা

হইয়াছে ; আরও লিখেছে যে বন্ধুটীর বড় অসুখ, সম্ভবতঃ বাঁচিবে না, তাহার একটী চার বছরের ছেলে আছে। তাহার উপর ছেলেটীর ভার দিয়াছে, বলিয়াছে যে তাহার অবর্ত্তমানে বালকটীকে যেন বিনয় নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া মানুষ করে দুইচারিদিনের মধ্যে যে বিনয় ফিরিয়া আসিবে তাহাও লিখিয়াছে।

বিনয় আজ ফিরিয়া আসিয়াছে ; সেই ছেলেটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। মায়া পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকটীকে মায়ের মত করিয়া বুকে টানিয়া লইল। সদ্য পিতৃহারা বালকটি একটু আশ্রয়, ভালবাসা যত্ন পাইয়া নির্ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। বিনয় তাহার পরিচয় দিতে লাগিল ঃ—"আমার এক সহপাঠী নাম যতীন্দ্রকুমার রায়, অসুস্থ হইয়া পুরী গিয়াছিল ; আসিবার দুইদিন পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল। সে যেন জীবনটাকে কষ্টের সঙ্গে বহন কর্‌ছিল, মৃত্যুতে সে যেন কত আরাম, কত মুক্তি পেল। অচৈতন্য অবস্থায় কেবল মায়া মায়া করেছে—আহা বোধ হয় যতীনের স্ত্রীর নাম মায়া ছিল। শুন্‌লাম্ সেও তো আজ দুই বছর মারা গেছে! ওকি মায়া। কি হয়েছে অমন কর্‌ছ কেন?" "না কিছুই হয়নি, মাথাটা কি রকম ঘুরে উঠল। দয়াময়! আমাকে ক্ষমা কর, তাহার আত্মাকে শান্তিদান কর। ভগবান একি তোমার বিধান, আমাকে নিমিত্তের ভাগী হতে হল শেষে!" যতীনের ছেলেটী ঘুম হইতে উঠিয়া ডাকিল "মা ক্ষিদে পেয়েছে।" মায়া বিস্মিত হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "চল বাবা খাবে চল ; মা বলে ডাক্‌তে কে তোমায় বলে দিল বাবা?" "বাবা চলে যাবার আগের দিন আমাকে বলে ছিলেন যে তুমি আবার মা পাবে, আমার জন্যে কেঁদ না। আচ্ছা তবে কি তুমি আমার মা নও—তবে কাকে আমি মা বল্‌ব!" বালকের অশ্রুরুদ্ধ করুণ কণ্ঠে মায়ার চোখে জল আসিল, সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিল "হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমার মা—"

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

গৌরী

গিরিবালা দেবী

[১]

বাল্যকালে পিতৃহীন হইবার পর হইতেই আত্মীয় বন্ধুদের নিকট অনবরত শুনিয়া আসিতেছিলাম, আমার লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমাদের বাঙ্গালী জাতির অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই না কি লেখাপড়া শিখিবার প্রয়াস। আমার অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন যখন অল্প, তখন আর অনর্থক কতকগুলি ইংরাজী-বাংলা পুস্তকের মুণ্ডপাত করিয়া লাভ কি? আমার বাপ-ঠাকুরদাদা, তাঁহাদের একমাত্র বংশধরের জন্যে দয়া-পরবশ হইয়া যাহা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, "আমিরী চালে" চলিলেও নাকি আমার সাতপুরুষ তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি। হিতৈষী বন্ধুদের এই তিলকে তাল করিবার অযাচিত চেষ্টার ফলে আমাদের ক্ষুদ্র-গ্রামবাসিদিগের নিকট আমি একাধারে সম্মান ও ঈর্ষার পাত্র হইয়া উঠিতেছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমি সমস্ত বিষয়ে একটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অসাধারণ হইবার চেষ্টায় অকালপক্কতা লাভ করিয়াছিলাম। বিশেষত্বের মধ্যে গ্রামের বিদ্যাটুকু আয়ত্ব করিতেই আমার বাঙ্গালী জীবনের কুড়ির কোঠা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

উচ্চবিদ্যায় ভূষিত হইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া আমার নবীন জীবনের আশা উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সিনেটহলে বক্তৃতা শুনিয়া, গোলদীঘির ধারে গবেষণা করিয়া, দুইদিনের মধ্যেই বিংশ শতাব্দীর "গ্যারিবল্ডি" হইবার কল্পনায় মাতিয়া উঠিলাম। কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া সকাল-সন্ধ্যায় তেতালার নিভৃত ছাদে স্বদেশ-উদ্ধারের জল্পনা-কল্পনায় দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বদেশ উদ্ধারব্রতে আমরা যতদূর অগ্রসর হইতে লাগিলাম, লেখাপড়ায় তাহার শতাংশের একাংশও নহে। ভারতের ভাবী বীরচূড়ামণিদের বীরত্বের আস্ফালনে কুসুম-কোমলা বীণাপাণি সভয়ে মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মনে মনে সান্ত্বনা ছিল যাঁহারা বীরত্বে এই ক্ষণস্থায়ী জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি ডিগ্রিই আয়ত্ত করেন নাই। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারিদেরও উহার প্রয়োজন হইবে না।

[২]

গ্রীষ্মের ছুটির সময় কলেজ বন্ধ হইবার পর, মা দেশ হইতে পত্র লিখিলেন, "শীঘ্র বাড়ী আসিও" ; আমি উত্তরে লিখিলাম, "এখন আমার যাইবার উপায় নাই, কাজ আছে।" সমস্ত দিন না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে সকলের বাড়ী-বাড়ী চাঁদার খাতা লইয়া ছুটাছুটী করিতেই আমার সময় কাটিয়া যাইত। দেশ-উদ্ধার ব্রতে এতই মাতিয়া উঠিলাম যে, আহার-নিদ্রার কথাও স্মরণ রাখা কঠিন হইয়া উঠিত। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা যেন আশু কর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছিলাম। কি উপায়ে সেই দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করিয়া এ বিশ্ব-জগৎকে চমকিত করিব, তাহারও একটা মোটামুটি "প্ল্যান্" মগজের মধ্যে দিবানিশি ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন ঘন ঘোর বর্ষানিশীথে আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, এ জীবনে

কখনও পরাধীনতা স্বীকার করিব না। আপনাদের স্বদেশজাত দ্রব্য ছাড়া বিলাতী দ্রব্য গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত জ্ঞান করিব, এবং আজীবন বিবাহ না করিয়া সন্তান ধর্ম্ম পালন করিব ইত্যাদি। কয়েকদিন পরে সেদিন প্রভাতে গুড় সংযোগে চা পান করিতেছিলাম (স্বদেশজাত চিনির প্রতি আমাদের আদৌ আস্থা ছিল না ; তাই সব চাইতে নিরাপদ গুড়ের কৃপাতেই আমাদের উক্ত কার্য্যটী সমাধা করিতে হইত) ; অমূল্য ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "হরিশ।" অমূল্যের অসম্ভাবিত আগমনে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বাড়ী থেকে কখন এলে? বাড়ীর সব ভাল ত?" অমূল্য হাস্যবিকসিত মুখে বলিল, "আমি এই তো এখনই আস্‌ছি। তুমি বাড়ী যাওনা ব'লে তোমার মা বড় উতলা হয়েছেন। তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ; আজই আমার সাথে তোমাকে যেতে হবে।" অমূল্যের কথায় মার স্নেহভরা মুখখানি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আজ কত দিন মাকে দেখি নাই ; মা আমাকে পত্র লিখিয়া বাড়ীতে ফিরাইতে না পারায় আমার একনিষ্ঠ স্নেহমুগ্ধভক্ত অমূল্যকে পাঠাইয়াছেন। মা'র স্নেহ-মমতার কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "দুঃখিনী মাতৃভূমি এ অধম সন্তানকে কয়েক দিনের ছুটি দাও না, মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া নবীন উদ্যমে, নব উৎসাহে এ হৃদয়-মন তোমার কাজেই নিয়োজিত করিতে আবার ফিরিয়া আসিব, দেবি!" অমূল্যের কথায় যখন বাড়ী যাইতে স্বীকার করিলাম এবং জিনিষপত্র গুছাইতে বসিয়া গেলাম, তখন প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে চাহিয়া দেখিলাম, অমূল্যের প্রফুল্ল মুখখানিতে প্রচ্ছন্ন আনন্দের আভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

[৩]

বহুদিনের পর দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি নব বসন্তের আসন্ন আগমনে পুষ্পপত্রে সাজিয়া উঠিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই যেন সৌন্দর্য্যের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। স্রোতস্বিনী নদীবক্ষে, ঘন পল্লবিত কুঞ্জ ভবনে, ঝিল্লীমুখরিত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমার হৃদয় মন যেন উধাও হইয়া মিশিয়া যাইতে চাহিতেছিল। মনে হইতে লাগিল, প্রকৃতিদেবী যেন বহুদিনের প্রত্যাগত তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপাসকের আগমন আশায় এ মোহন সাজে সজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন। বাড়ী ঢুকিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। মার মুখখানি আসন্ন আনন্দের আভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দুই একটী আত্মীয় বন্ধুর কোলাহলে আমাদের নির্জ্জন গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঝি চাকর সকলেরই মুখে আনন্দের আভা খেলিয়া যাইতেছে। একটী অসম্ভব সম্ভাবনায় আমার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; মা হাসিমুখে মুখ নত করিলেন। আমার দূরসম্পর্কীয় ঠাকুরমা আগু বাড়াইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম কামাই।" আমি ঠাকুরমার কথায় যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। ঠাকুরমার কাছে কথায় কথায় জানিয়া লইলাম, আমার বিবাহের ঘটক অমূল্য। তাহার দুঃস্থ মামাটীর আস্ত কন্যাদায়ের হাত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অমূল্যই এ বিবাহে মাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে ; এবং বিবাহে যে আমার অমত ঘটিবার কারণ নাই, অমূল্যই মাকে সেটুকুও বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে। সমস্ত কথা শুনিয়া রাগে দুঃখে আমার চক্ষু ফাটিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হায় মাতৃভূমি, তোমার আকাশে কি বজ্র নাই যে, এ বিশ্বাসঘাতকদের মস্তকে নিপতিত হয় না? কিন্তু রাগ করিয়া লাভ কি? নিজের হৃদয়ে শুধু শত বৃশ্চিকদংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। অমূল্য প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

[৪]

ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গৌরীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলাম। অমূল্যর উপর যত রাগ-দ্বেষ, নিজের সঙ্কল্পের ব্যর্থতায় ক্ষোভ সমস্ত বৃত্তিই গৌরীর স্কন্ধে চাপাইয়া আমি অনেকটা প্রশান্তচিত্ত হইলাম ; কিন্তু আমার সমস্ত আশাভরসার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া গেল। আমার কল্পনাযশঃসূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইল। উজ্জ্বল জীবনের উপর কোথা হইতে যেন অন্ধকারে যবনিকা প্রসারিত হইল। গৌরীর সঙ্কোচনত মুখখানি, লজ্জাজড়িত দেহলতা দেখিলেই আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিত। এই কি আমার উপযুক্ত স্ত্রী? এ প্রশ্নে আমার সমস্ত দেহ মন সাড়া দিয়া উঠিত। না একি উপযুক্ত! ঝান্সির 'লক্ষ্মীবাই', আনন্দমঠের 'শান্তি', চিতোরের 'পদ্মিনী', ইহার কেহ আমার পদপ্রান্তে বিবাহ-প্রার্থিনী হইয়া আসিলেও আমি আশ্চর্য্য হইতাম না। কিন্তু গৌরী সেই স্থান পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইতেছে ইহা মনে করিলে আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইবার মত হইত। প্রভাতে মায়ের পূজার আয়োজন করিয়া মধ্যাহ্নে বামন দিদির শ্রীহস্ত হইতে কাড়িয়া উচ্ছের সুক্ত আর সজনাখাড়ার চর্চ্চরী রাঁধিয়া এবং অপরাহ্নে মা'র পদতলে বসিয়া মহাভারত পড়িয়া, সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে আলো প্রদান করিয়াই যে গৌরী আমার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর আসন অধিকৃত করিবে, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? নোলকপরা অশ্রুভরা শ্যামচিক্কণ দেহলতা লইয়াই যে গৌরী আমার স্ত্রী নামে সকলের নিকট পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখিবে, ইহা মনে করিতেও লজ্জায় হৃদয়খানি ম্রিয়মান হইত। বিবাহ-রজনীতে মনে ভাবিয়াছিলাম, গৌরীকে লইয়া বুঝি আমার এক দিনও কাটিবে না ; কিন্তু এ হেন বিভীষিকারূপিণী গৌরীকে লইয়া আমার নির্ব্বিবাদে একটী বছরও কাটিয়া গেল। এক বছরে গৌরীর সহিত আমার আলাপ পরিচয় সামান্যই ঘটিয়াছিল। গৌরী যখন আমাদের বাড়ী থাকিত, আমি তখন নানা অছিলায় কলিকাতায় কাটাইয়া দিতাম। বাড়ী থাকিলেও তাহার লজ্জিত দেহলতা, সঙ্কুচিত মুখ দেখিলেই আমার রাগ হইত। আমি কি তাহার নিকটে এত সহজ-লভ্য যে, আমি সাধিয়া কথা না বলিলে, সে চুপ করিয়াই কাটাইবে। একাদিক্রমে পাঁচ সাত দিন কথা না কহিয়া দেখিতাম, তাহাতে গৌরীর কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পাইত না। সে দিন রাত্রে খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। শয়ন গৃহে যাইয়া দেখিলাম, শুভ্র-শয্যাতলে গৌরী অকাতরে নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মুক্ত গবাক্ষ পথে চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নারেখা গৌরীর সুপ্তবদনে ক্রীড়া করিতেছে। কি সুন্দর মুখখানি! বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য যেন ওই শান্ত কোমল সরলতাপূর্ণ মুখখানিতে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আমার পাষাণহৃদয় একটু আর্দ্র হইল। মনে ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাকে যখন ত্যাগ করিবার উপায় নাই,—আজীবন নীলকণ্ঠের মত এ বিষ আমার কণ্ঠে রহিবে ; তখন আর ইহাকে উপেক্ষা কেন? এই সরল হৃদয়টিতে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া ইহাকে আমার উপযুক্ত করিয়া গড়িতে হইবে। গৌরীর নিকটে দাঁড়াইয়া এই প্রথম আমি তাহাকে ডাকিলাম, "গৌরী!" গৌরী চমকিয়া শয্যাতলে উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত মুখখানি যেন অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখা'তে চাই, তুমি শিখিবে কি?" গৌরী কথা কহিল না। তাহার স্নিগ্ধনয়ন-দুইটী আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। আমি তাহার নয়নের ভাষা বুঝিলাম। সে মিনতিপূর্ণ স্নিগ্ধ নয়ন যেন বলিতেছে, "তুমি শিখাইলেই আমি শিখিব।" আমি বলিলাম, "কাল সকালবেলা থেকে তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দিব। সকালে ইংরাজী পড়্‌বে, দুপুরে ইতিহাস, আর বিকেলে ভূগোল" —আমার কথায় বাধা দিয়ে গৌরী ধীর অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "সকালে মা'র পূজোর জোগাড়"—আমি তাহার অসম্পূর্ণ কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলাম, "তুমি যখন এখানে

ছিলে না, তখন মা'র পূজোর জোগাড় কে কর্‌তো? আমি বরং মা'কেও সে কথা বল্‌বো?" আমার কথায় গৌরী কাতরকণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, মা'কে এ কথা ব'লোনা। আমি রাত্রেই রোজ তোমার কাছে পড়্‌বো, ঘর-সংসারের কাজ ফেলে রেখে দিনের বেলা তোমার কাছে পড়্‌তে আমি পার্‌বোনা, আমার বড় লজ্জা কর্‌বে।" গৌরীর কথায় রাগের কোনই কারণ ছিল না ; কিন্তু আমার বীর হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত গৌরীর কথায় শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া উঠিল। নিজের মহামূল্য সময় ব্যয় করিয়া যে অজ্ঞকে মনুষ্য করিতে চাই, সেই বলে কি না আমি তোমার কথা শুনিব না! আর ক্রোধবহ্নি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলাম না। আমি তীব্র কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার লজ্জাই যখন সব চেয়ে বড় হ'ল, তুমি লজ্জা নিয়েই থাক। তোমাকে দিয়ে আমার কোনও দরকার নাই।" শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

[৫]

পরদিন সকালে উঠিয়াই মা'কে বলিলাম, "আমার আজই কলিকাতা যেতে হ'বে।" মা সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "কই, কাল্ তো যাবার কথা কিছু বল্লি না।" আমি অম্লানবদনে বলিলাম "রাত্রেই যাওয়া ঠিক করেছি, না গেলেই হবে না।" মা আর কোন আপত্তি করিলেন না। তাঁহার সরল মনে আমার কথাই অকাট্য প্রমাণ। মনে মনে বেশ একটু জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম,—গৌরী আজ বুঝুক যে, তাহার লজ্জার জড়তা অপেক্ষা আমার সম্মান অনেক বেশী।

আমাদের বাড়ী হইতে ষ্টেশন কিছুদূরে ; তাই ট্রেনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই নৌকারোহণে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। যাত্রাকালে গৌরীর সহিত সাক্ষাতের কোনও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। আমার নৌকাটী যখন নিঃশব্দে আমার গন্তব্য পথের দিকে ভাসিয়া চলিল, তখন হঠাৎ চাহিয়া দেখি—আমাদের অন্দরের ঘন-বনবেষ্টিত বাগানে বকুল-বীথির ছায়া-শীতলতলে দাঁড়াইয়া কে যেন আমার বিদায় ব্যাপারটা তৃষিতনয়নে দেখিতেছে। চৈত্রের শেষ-অপরাহ্নের স্নিগ্ধ-আলোকে পল্লববিতানে আপনার ঘনমুক্ত কেশজালের মধ্য হইতে কাহার উৎসুক নয়ন দুইটীর কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর সংবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সুন্দর সরল বদনে অপার্থিব করুণা বিচ্ছুরিত হইতেছে ; সে বিষণ্ণনয়নে কি কোমলতা বিরাজ করিতেছে! বীর হৃদয়ের দৃঢ়তা আর বুঝি থাকে না! মনে ভাবিলাম, গৃহে ফিরিয়া যাই ; সমস্ত রাগ, অভিমান, গর্ব্ব, আত্মমর্য্যাদা অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া ওই বেদনাভারে নিপীড়িতা বালিকার সজল মলিন মুখখানি বক্ষে তুলিয়া লই। কিন্তু মা'র নিকটে না যাইবার কি প্রমাণ দেখাইব, ভাবিয়া পাইলাম না। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম, ঊর্দ্ধে তাপিতা নীলাম্বর, অদূরে খরস্রোতা তটিনী, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোক-স্বরূপিণী একটি মুগ্ধা কিশোরী ঘন পল্লববিতানে আপনাকে লুকাইয়া সজলনয়নে কোন সুদূরের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে নৌকাখানি দূরে চলিয়া গেল। তরুশ্রেণীর অন্তরালে সে করুণ মূর্ত্তিখানি আমার নয়ন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু হৃদয়-কোণে একটী অশ্রুলোচনা ঘনমুক্তকেশজালে সমাচ্ছন্ন কিশোরীর মুখখানি অন্ধকারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ফুটিয়া উঠিল।

[৬]

কলিকাতায় আসিলাম ; কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কি এক তীব্র অনুশোচনা হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল। আহারে, বিহারে, হাসি-আনন্দের মাঝখানে কাহার কোমল মুখখানির কাতরদৃষ্টি আমার সমস্ত কাজেই বাধা দিতে জাগিয়া উঠিত। নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইতাম। এ পাষাণকে কেমন করিয়া সে মায়ালতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! আমি

জানিতাম, আমি গৌরীকে ভালবাসি না, কখনও ভালবাসিবার কল্পনাও করি নাই। দিনে দিনে তিলে তিলে গৌরী আমার হৃদয়খানি কেমন করিয়া হরণ করিয়াছে, তাহা একদিনের তরেও বুঝিতে পারি নাই। আজ প্রথম বুঝিতে পারিলাম যে, আমি নিজের অজ্ঞাতসারে গৌরীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

আমার সমস্ত কাজেই অমনোযোগ, উদাসীনতা প্রকাশ পাইতেছিল। অমূল্য আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হরিশ, বাড়ী থেকে তো ঝগড়াঝাটি ক'রে পালিয়ে আসিস্ নাই? আমাদের বি, এ এক্‌জামিন সম্মুখে, আমারাও তো তোর মত রাত দিন চিন্তা করি না?" অমূল্যর কথায় আমি বলিলাম, "যারা এক্‌জামিন দেবে, চিন্তাটা কি তাদেরই একচোট না কি? যাদের আসন্ন পরীক্ষার বালাই নাই, তারা কি চিন্তাটুকু কর্‌বারও অযোগ্য?" আমার কথায় অমূল্য অপ্রতিভ মুখে নীরবে বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। মনে ভাবিলাম, বাড়ী ফিরিয়া যাই ; এ সমস্যার শেষ করিয়া দিই। কিন্তু যাইতেও পারিতেছি না ; কারণ, আমার জনৈক বন্ধুর শুভ বিবাহে যোগদান করিবার জন্য বন্ধু ধরিয়া রাখিয়াছেন।

আজ বন্ধুর বিবাহ! এ বিবাহটা মিটিয়া গেলেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিব, এ কথাটী মনে করিয়াই হৃদয়খানি আনন্দের আবেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। হায় মোহ, আজ কোথায় গেল দেশ-উদ্ধার—কোথায় গেল দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন! একটী ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র স্মৃতিতে হৃদয়খানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চাকর একখানা চিঠি দিয়া গেল ; চিঠিটা খুলিয়া দেখিলাম, এ চিঠি গৌরীর। গৌরী লিখিয়াছে, "তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া এস। আমি দিনের বেলাই তোমার কাছে পড়িব। আর অবাধ্য হইব না।" এই প্রথম গৌরী আমাকে চিঠি লিখিয়াছে। কি সুন্দর হস্তাক্ষরগুলি! তাহারই কোমল নয়ন-দুইটীর নীরব সম্ভাষণ, এ যেন আমার নিকটে তাহার হৃদয়দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ব্যথিতা বালিকা কত হৃদয়-বেদনা বহিবার পর এই চিঠি খানি লিখিতে সক্ষম হইয়াছে, আজ আমার কাছে সে ভাবটুকু গুপ্ত রহিল না। মনে মনে ভাবিলাম,—আজ বন্ধুর বিবাহ, কালই আমি রওনা হইব। 'তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছ, গৌরী? যে আত্মমর্য্যাদায় অন্ধ হইয়া হিন্দুবধূর কর্ত্তব্য হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিতে চাহিয়াছিল, সেই তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া যাইতেছে। প্রসন্ন হাস্যে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার সকল দৈন্য মুছাইয়া দিও।' গৌরীর চিঠিখানা পড়িয়া আমার জামার বুক-পকেটে রাখিয়া দিলাম।

রাত্রি দশটার সময় বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া সাঁচি পানের খিলি মুখে পুরিয়া, বেলফুলের মালা গলায় জড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া দেখি, অমূল্য উৎকণ্ঠিত নয়নে আমারই আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই অমূল্য বলিয়া উঠিল, "হরিশ, আর দাঁড়াবার সময় নাই ; চল ভাই, এগারটার ট্রেনেই আমাদের বাড়ী যেতে হবে। এই টেলিগ্রাম এসেছে।" আমি অমূল্যর হাত হইতে টেলিগ্রাম লইয়া পাঠ করিলাম, "গৌরীর বিসূচিকা, তোমরা সত্বর এস।" আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে আশঙ্কার ঝটিকা বিপুল বেগে বহিতে লাগিল।

[৭]

সমস্ত পথ কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, কিছুই মনে পড়ে না। বাড়ীর ঘাটে যখন নৌকা থামিল, আশা-পূর্ণনয়নে একবার পল্লব-ঘন বকুল-বীথির তলে চাহিয়া দেখিলাম। আজ আর অশ্রুলোচনা বনদেবীর মধুর মূর্ত্তিখানি নয়নপথে নিপতিত হইল না। সে কাননে শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। নৌকা হইতে আমায় হাত ধরিয়া নামাইয়া লইতে, বিষাদ-পূর্ণস্বরে অমূল্য

কহিল "হরিশ, এতদিন তোমার সম্বন্ধে একটী ভুল ধারণা ক'রে আমি তোমার কাছে বড় অপরাধ ক'রেছি, ভাই! তোমাকে না জানিয়ে আমিই গৌরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, গৌরীকে পেয়ে তুমি বড় সুখী হবে। গৌরীর মত মেয়ে নিয়ে যে কেউ অসুখী হ'তে পারে, এ ধারণা আমার এতটুকুও ছিল না; কিন্তু এতদিন তোমায় দেখে আমার মনে হতো—তুমি বুঝি গৌরীকে ভালবাস্‌তে পার নাই, তাকে নিয়ে সুখীও হও নাই। তবে সেটা আমার বুঝ্‌বার ভুল, তা' আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।" আমি কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "তুমি সব জাননা, অমূল্য, আমি কি যে করেছি!" আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না।

যখন আশা-আশঙ্কার মহাদ্বন্দ্ব বুকে লুকাইয়া গৃহে আসিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পল্লীবালকগণ খেলাধূলা শেষ করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গৃহে ফিরিতেছে। গ্রাম্যবধূরা পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া সেদিনের মত পরস্পর সখীদের নিকটে বিদায় লইতেছে। বাড়ী ঢুকিয়া দেখিলাম, বাড়ীখানি নিস্তব্ধ; সকলের মুখই বিষণ্ণ। মা রোদন-জড়িত স্বরে আমার শয়নগৃহে যাইতে বলিলেন।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, নিদারুণ রোগের যাতনায় গৌরীর প্রভাত-পদ্মের মত প্রফুল্লমুখ খানিতে কালিমা বেষ্টিত হইয়াছে। সরল শান্তিপূর্ণ নয়নদুইটী নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। নিদাঘে দগ্ধ ফুলটীর মত গৌরী শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আমি যখন সেই আসন্ন-মৃত্যু—বিবর্ণ হিম শীতল দেহখানি বক্ষে জড়াইয়া ডাকলাম "গৌরী", তখন মৃত্যু-বিবর্ণ মুখে হাস্যছটা বিকসিত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "গৌরী, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" আর কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুজল বহিয়া পড়িতে লাগিল। গৌরী প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ কেঁদনা, তুমিই আমাকে ক্ষমা করো। আমি লজ্জা ক'রে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি; তোমার তো কোন দোষ নাই। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আবার যেন সেইখানে ভগবানের শ্রীচরণে তোমার সাথে মিলিতে পারি।" আজ সঙ্কোচ-নতা অবাক্‌পটু অজ্ঞ বালিকার কথার একটী উত্তরও বিংশ শতাব্দীর "গারিবল্ডি"র কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল না।

গৌরী আমাকে হাসিমুখে ক্ষমা করিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি যে আজও ক্ষমা করিতে পারিতেছি না।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

ঠিকে ভুল

গিরিবালা দেবী

১লা ফাল্গুন—আবার নবীন বসন্ত আসিয়াছে। আম্র মুকুলের গন্ধ বহিয়া নব নব কিশলয় গুলি দোলাইয়া সেই চিরপরিচিত দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। প্রকৃতিরাণী ফুল সাজে সজ্জিতা হইয়া ঋতুরাজকে ডাকিয়া কাছে বসাইবার জন্য আপনার শ্যামল অঞ্চলখানি বিছাইয়া দিয়াছে। নব বসন্তের সাড়া পাইয়া কত সুদূর দেশ হইতে অজানা পাখীগুলি আসিয়া মনহরা সুরে বসন্ত আবাহন গাহিতে ব্যস্ত। আজ মনটা যেন ঘরে থাকিতে চাহে না,—আমার মন যে আজ কোথায় উদাস হইয়া যাইতে চাহে তা' বলিয়া আর কি হইবে? এ দুয়ার একবার খুলিলে বন্ধ করা কঠিন হইবে। থাক্, ওগো, রুদ্ধ হইয়া থাক্। আজ এই মধুদিনের সূর্য্যোদয়ে আমার প্রবাসী প্রিয়ের হস্তচিহ্নভরা প্রীতিপূর্ণ একখানি চিঠির আশা। সে হাতের সে লেখাগুলি আমার নিকটে কত যে জীবন্ত তাহা আমি ছাড়া আর এমন করিয়া কে জানে? সে অক্ষর গুলি তো তাঁহারই অজস্র প্রেমমগ্ন আধমেলা নয়ন দুইটীর নীরব সম্ভাষণ। আজ দীর্ঘ সুদীর্ঘ একটী বছর আমাদের চিঠি লিখিয়া চিঠি পড়িয়া কাটিয়া যাইতেছে। কু'ক্ষণে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী ডাক্তার হইয়াছিলেন, তাই ছুটী নাই। হায়, সদাশয় ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের কি ঘরে স্ত্রী নাই? তারা কি বিরহবিধুরা দশায় তোমাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না? মিলনের আশায় এ মরুশুষ্ক হৃদয়কে আর কত সজীব রাখিব? এ যে বিরহের তাপে বৃন্তচ্যুত এ ফুল যে শুকাইয়া যাইতেছে। আমার তাপদগ্ধ হৃদয়ে স্নিগ্ধ সব-জুড়ান জ্যোৎস্নালোক যে তাঁহার চিঠি, অন্ধকারে যে আলোক রেখা। সেই চিঠির আশায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের এ আকুলতা, এ উচ্ছ্বাস। ভাই "মনের কথা আমার" (ডায়েরী), এ গোপন হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস সমস্ত দিন বসিয়া তোমার বুকে প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া সংসারের যে আরও কাজ আছে। ঝড়ুয়া ডাকিয়া গেল, এইবার উঠি।

২রা—আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠিয়াই তাঁর চিঠি পাইয়াছি। এ যে বড় আদরের, বড় আনন্দের জিনিস ; এবার তাঁর এ চিঠিখানি আরও আনন্দময়, এ যেন আনন্দ ধাম হইতে আনন্দ সাগরে স্নান করিয়া আনন্দ গীতি গাহিতে আসিয়াছে। আমার প্রিয়তম শীঘ্র আসিবেন। এ কথাটী বহন করিয়া মানুষ দূত আসিলে আমার অর্থবিত্ত সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতাম, কিন্তু এ যে চিঠি! ইহাকে কি দিব? আমার উৎসুক নয়নের নীরব দৃষ্টি দিয়ে ইহাকে অভ্যর্থনা করে—আমার জ্যাকেটের নীচে যেখানে তাঁর সাথে মিলনের আশায় এত স্পন্দন এত আকুলিব্যাকুলি সেইখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। টুনি ঠাকুরঝি অনেক খুঁজিয়া সমস্ত ঘরটী খানাতল্লাস করিয়া তার দেখা না পাইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। সে তো জানে না—আমার প্রিয়তমের অজস্র ভালবাসা মাখা চিঠিটা আমার কোথায় লুকান আছে।

৩রা—সোনাপুর থেকে নরেশ ঠাকুরপো আমাদের সকলকে নিতে আসিয়াছেন। দশই ফাল্গুন তাহার বিবাহ, এ বিয়েতে আমাদের সকলকেই যাইতে হইবে। শুনিয়া ভয় হইতেছে—তিনি যে শীঘ্র বাড়ী আসিতে চাহিয়াছেন। এতদিনের পর বাড়ী আসিয়া যদি কাউকে দেখিতে না পান, তাহা হইতে তাঁর মনটা কেমন হইয়া যাইবে? আবার বিয়েটা দেখারও বড় লোভ হইতেছে। সেখানে আমার কত বাল্যসখীদের সহিত দেখা হইবে, কিন্তু

কোন আনন্দই আমার সে প্রিয়সন্দর্শনের সাথে তুলনা হইতে পারে কি? তিনি যে আমার অতুলনীয়।

৫ই—ভাই "মনের কথা", কাল সমস্ত দিনটার ভিতরে একবারও তোমার সাথে দেখা করিতে পারি নাই ; রাগ করিও না। কাল বড়ই ব্যস্ততায় দিন কাটিয়া গিয়াছে, নরেশ ঠাকুরপোর সাথে মা টুনী ঠাকুরঝিকে লইয়া সোনাপুর চলিয়া গিয়াছেন। নরেশ ঠাকুরপো আমাকে লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ করিতেছিলেন কিন্তু মা রাজী হইলেন না, সেই জন্য আমার যাওয়া হইল না। মা বলিলেন, "বউমার আর যাওয়া হইবে কেমন করিয়া, আমি না গেলে দাদা রাগ করিবেন, তাই টুনীকে নিয়ে ঘুরে আসি, অহিনের শীঘ্র আসিবার কথা আছে, বউমা বাড়ীতেই থাকুক"। মা গেলেন, ভাই বোনরা গেল, আমি বাড়ী থাকিয়াই যেন তাঁর মা বোন আত্মীয় স্বজন সকলের অভাব পূর্ণ করিতে পারিব। মার কথায় বড় লজ্জা হইতেছে।

দিদিমা আমার পাহারায় রহিলেন, থাকো ঝিটা পর্য্যন্ত কান্নাকাটি করিয়া মার সঙ্গে গেল। খালি বাড়ীতে আজ দিদিমার উপহাসের স্রোতটা আরও বেশী বেগে বহিতেছে। দিদিমা কিন্তু সেকালের মানুষ, তবুও তাঁর সাথে কাহারও পারিয়া উঠিবার উপায় নাই। আমি দিদিমার কথা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই, একটা জলজীয়ন্ত সতীন নিয়ে ঘর করিয়াও দিদিমার হাসির উৎস শুকায় না। আমরা হইলে বোধ হয় এক দিনের তরে সহিতে পারিতাম না। যা হ'ক্ ধন্য মেয়ে, বাপু। ঐ শোন দিদিমা রেণু রেণু করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, দিবা রাত্র এত ডাকা কেন বাপু?

৬ই—কাল দিদিমার কোলের কাছে শুইয়া দাদা মহাশয়ের গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্রি জাগিয়াছিলাম। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি নন্দ ঠাকুরের তখনও শুভাগমন হয় নাই, উনুন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আজ মা বাড়ীতে নাই, বীরু ঠাকুরপোও বাড়ী ছাড়া, কাজেই নন্দ ঠাকুরকে পায় কে? নন্দ ঠাকুরের কল্যাণে আজ আমাকেই অন্নপূর্ণা হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্ন যা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিচয়টা আমি নিজে নাই দিলাম। সরকার কাকা চক্ষু লজ্জার খাতিরে ভাত সম্মুখে করিয়া নন্দ ঠাকুরের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে ছিলেন, আর ঝড়ুয়া "হামরা আজ বদ্ হজমী হোগা" বলিয়া থালা শুদ্ধ ভাত রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দিদিমার নিরামিষ তরকারি আর কুলের আচারে এ যাত্রা দারুণ ক্ষুধার হাত হইতে প্রাণ রক্ষা হইল। মেয়েছেলে হইয়া রান্না জানি না কি লজ্জার কথা, এইবার রেশম পশম চুলোয় যাক্, রান্না শিখিতে হইবে। সন্ধ্যা বেলা চোরের মত গুটি গুটি পায়ে নন্দ ঠাকুরকে রান্না ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিলাম "ও বেলা এস নাই কেন?" সে অম্লান বদনে বলিল, "মার মরা খবর পেয়েছিনু কি না তাই গঙ্গাস্নান কর্‌তে গিয়েছিনু, মা"। আমি বলিলাম "দুই মাস আগে না তোমার মা একবার মরেছিল?" নন্দ উত্তর করিল "আমার তো আর একটা মা নয়"। তা তো ঠিকই, তার বাপ তো আর খৃষ্টান নয় যে বহু বিবাহের সুখ সুবিধায় বঞ্চিত।

৭ই—খালি বাড়ীতে দিদিমার সাথে গল্প করিয়া সময় যেন কাটিতে চাহে না। নরেশ ঠাকুরপোর বিয়ের আরও তিন চারদিন বাকি ; উনি তো 'শীঘ্র' আসিতে চাহিয়া একেবারে চুপ, "শীঘ্র" যেন আর আসিতে চাহে না। দিদিমার রসিকতায় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। আজ দুপুর বেলা দিদিমার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিলাম, দিদিমা বলিলেন, "রেণু তোর মুখটা এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন? মনটা বুঝি ভাল নাই?" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "কেন দিদিমা, ও কথা বলছ কেন? দিদিমা প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বোম্বেয় মেয়েদের পর্‌দা নাই জা'নিস তো?" "তাতে কি হয়েছে দিদিমা"? আমি এই কথা বলিয়া দিদিমার পাকা চুল তুলিতে আমার ভয়ত্রস্ত মনটাকে আরও নির্বিষ্ট করিয়া দিলাম। দিদিমা বলিলেন "হবে আবার কি?

তোর রসরাজ যে জাল ছিঁড়েছেলো, তাই ছুটী নাই। তুই নিশ্চয় জানিস্ ও একটী মহারাষ্ট্রী কি গুজরাটী না নিয়ে ফিরছে না। অহিন তো তার ঠাকুরদাদারই নাতী"। আমি চেষ্টা করেও দিদিমার পরিহাসের উত্তর দিতে পারিলাম না। দিদিমার কি সর্ব্বনেশে কথা! দীর্ঘ এক বছর বোম্বে গিয়াছেন, কে জানে সেখানে কি লইয়া আছেন? স্ত্রীলোকের মনেরও জীবনের পরিধি বড় ক্ষুদ্র, তাই এত সন্দেহ ; সম্বলের মধ্যে একটু 'যা আছে তা' হারাইবার এত ভয়। আজ বার বার করিয়া কত কথাই মনে আসিতেছে ; কিন্তু আর ভাল লাগিতেছে না।

৮ই—আজও প্রভাতের অরুণোদয়ের সাথে সাথে একটী আশা লইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার আশালতাকে হৃদয় হইতে পথের ধূলিতে বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাঁর কোনই খবর নাই। শুনিতেছি বোম্বে মহামারীতে শত শত লোক চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে। মাগো! বাবা গো! আমার যে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তিনি আসুন বা না আসুন দুই ছত্র চিঠিতে তাঁর মঙ্গল সংবাদ পাইলেই যে বাঁচি। কটক হইতে বাবা পত্র লিখিয়াছেন মার বড় জ্বর হইয়াছে। মনটা তাই আরও অস্থির। স্বামী সুদূর বোম্বেয় আত্মীয় বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিসের আশায় এত দীর্ঘ দিবা দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। মা, বাবা ভাই বোনরা সব কটকে, আমি শুধু এইখানে বিষাদের অশ্রু চক্ষে লুকাইয়া আমার সর্ব্বস্ব ধনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

৯ই—আজ বিকাল বেলা ও বাড়ীর সতী দিদি আসিয়াছিলেন, আমি খালি বাড়ীতে চুপটি করিয়া থাকি বলিয়া দিদিমা দিদিকে ডাকাইয়াছিলেন। সতী দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। কি উপাদানে দিদিকে যে ভগবান গড়িয়াছেন আমি শুধু তাই ভাবি। এ জগতের মানুষ কি এমন হইতে পারে গা? আহা, সতী দিদি ভাগ্যদেবতার দ্বারা বড় বিড়ম্বিতা, সে বিষাদ প্রতিমার মুখের দিকে চাহিতেই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। স্বামী বিবাহের অনতিকাল পরে পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন সংসার লইয়া সুখী হইয়াছেন, ভ্রমেও দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন না। কিন্তু তবুও দিদির কি ভালবাসা, কি ভক্তি, স্নেহ! এ মর জগতে এ আপনাভোলা প্রেমের উপমা হয় না। স্বামীর উপেক্ষিতা হইয়া সংসারের নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও দিদি সেই খানেই স্বামীগৃহে থাকিতে চায়। বাপ মা কত বলিয়া কহিয়া কয়েকটী দিনের জন্য এবার এখানে আনিয়াছেন। আমি বলিলাম "তুমি বলেই আবার সেখানে যেতে চাও, এমন স্বামী! তোমার কি রাগ হয় না দিদি?" দিদি একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "তোরা তাঁকে যতটা নিষ্ঠুর মনে করিস্ তিনি তা নয় বোন, তাঁর অমতে আমার শ্বশুর তাঁকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন—তাই তিনি—তা'হোক্, তাতে কি হয়েছে? তিনি যে অন্যকে নিয়ে সুখী হয়েছেন এতেই আমার সুখ। তাদের সেবা করে, তাদের সুখ সচ্ছন্দ চোখে দেখেই আমি সুখী হই, রেণু। তাঁর মুখ ছাড়া আমার কামনার আর কি থাক্‌তে পারে, বোন?" আমি বলিলাম "দিদি, যে তোমার এমন সুন্দর আশা পূর্ণ জীবনটী ব্যর্থ বিফল করে দিল তার সুখ সুখ করে তুমি বলেই পাগল হও। যে তোমাকে শুধু ভাল বাস্‌তে পারে নাই নয়, তোমার গলায় সতীনের মত পাষাণ বেঁধে তোমার ভরাডুবি করেছে, তুমি বলেই তাকে ভালবাস"। আমার কথায় বাধা দিয়ে দিদি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন "তাঁর দোষ দিস্ না, রেণু, তিনি আমাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই, এ আমার অদৃষ্টের দোষ। সে সুখ ভগবান আমার অদৃষ্টে লেখেন নাই, তা কি করে হবে? তবুও আমি সুখী, বোন্, তাঁর সুখ চক্ষুতে দেখেই আমার জীবন সব চেয়ে সফল হয়েছে।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া হিন্দুর সমাজের এই মহিমাময়ী কামনাশূন্যা দেবী প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিস্ময়বশে পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধন্য হইতেও ভুলিয়া গেলাম। বাপ মার 'সতী' নাম রাখা সার্থক হইয়াছে বটে। এমন সতী শুধু ভারতেই হইত, আর আজও যে হয় তাই এত দূরে পড়িয়াও এদেশ এত বড়।

১০ই—আজ নরেশ ঠাকুরপোর বিয়ের দিন, এই দশই ফাল্গুন আমারও বিয়ের তারিখ। আজ বারবার করিয়া আমার সেই অতীত জীবনের কথাগুলি হৃদয় দুয়ারে কি সুখেরই আঘাত করিতেছে। দুই বছর পূর্ব্বের সেই বাসন্তী সন্ধ্যাটী আজ আমার মনের ভিতরে তার সমস্ত রস মাধুর্য্য লইয়া উপস্থিত। সে দিনের মত আজ এ সন্ধ্যাটা বড় মধুর বড় মনোরম—চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। অন্ধকার তরুশ্রেণীর মধ্য হইতে সে দিনের মত আজও শুক্ল পক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ রূপার থালার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বসন্তের মৃদু সমীরণটুকু বেলফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ গায়ে মাখিয়া সেদিনেরই মত আজও অভিসারে পাগল। কিন্তু সেদিনের মত আজ আর তাহার স্পর্শে তো সে মাদকতা নাই। আজ মনে পড়িতেছে বাল্যের শত স্মৃতি ভরা পিতৃভবনের কত চিত্র। বাবা, মার স্নেহভরা আনন্দপূর্ণ মুখচ্ছবি, আত্মীয় বন্ধুদের কলহাস্য, সেই সানাইয়ের আসন্ন-বিদায়-করুণ রাগললিত ভিক্ষার মধ্যে একটী চন্দনে চর্চ্চিত তরুণ মুখের কোমল দৃষ্টি, আমার হৃদয় মাঝে আজও তা' তেম্‌নি উজ্জ্বল তেম্‌নি চিরাঙ্কিত। যার শুভসমাগমে আমাদের বৃহৎ ভবনটীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল কত হাস্য কৌতুকে গৃহখানি মুখরিত হইয়াছিল আজ বার বার করিয়া সেই নব পরিচিত নবীন অতিথির স্নিগ্ধ নয়ন দুইটীর মধুর দৃষ্টি মনে পড়িতেছে। আমার মুকুলিত হৃদয়ে যে দেব মূর্ত্তির আলেখ্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল আজ যেন সে মূর্ত্তিটী আরও উজ্জ্বল হইয়া আরও মধুরতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঘরে গিয়া আজ সে দিনের সেই কথাগুলি স্মরণ করিয়া আমার ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম। আমার সেই স্বাগত মধু দিনটি অনন্ত রসময়েরই জীবন্ত বিগ্রহ, আমি কেবল এই ইষ্টেরই পূজারী!

১১ই—দুপুর বেলা দিদিমার রান্নার কুট্‌না কুটিতেছিলাম। বাইরে গোলমাল শুনিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একখানা বোঝাই গাড়ী আসিয়া আমাদের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী থামিতেই তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল, আহা! ওগো, আজ দেখ হৃদয় আমার কেমন শীতল হইল। আনন্দের আবেশে আমার ভাবনদী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ও কি? এ কে? একটী পোনর যোল বছরের মেয়ে তাঁর পশ্চাতে নামিয়া আসিল। মেয়েটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা ; তার সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু শুকতারার মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। মেয়েটীর সুন্দর মুখের মৃদু হাসিটুকু আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। কে আমার স্বামীর সাথে সুদূর বোম্বাই হইতে আসিতে পারে? কাহারও কথা মনে হইল না। হঠাৎ স্বপ্নের মত দিদিমার সে দিনের কথাগুলি মনে পড়িল, দিদিমা যা' বলিয়াছিলেন এ বুঝি তাই হইল। আমার কপাল বুঝি পুড়িল। তা ছাড়া আর কি সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু এখন উপায় কি? আমি কেমন করিয়া এমন স্বামীকে মুখ দেখাইব? চিন্তার অবকাশ কোথায়? দিদিমার ঘরে তাঁহার উচ্চ হাসি শুনিতে পাইলাম, দিদিমা বলিতেছিলেন "রেণু যে 'সতীন' সইতে পারে না অহিন, তুই সেই সতীনই এনেছিস্"। তাঁর কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনুমানেই আমার যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইলাম। কতক্ষণ পর চাহিয়া দেখি তিনি আমার ঘরের দিকেই আসিতেছেন। পশ্চাতে সেই মেয়েটী সলজ্জ প্রফুল্ল মুখে আসিতেছে। তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "কুন্দকে শীগ্‌গির খেতে দাও, ও-রাত থেকে কিছু খায় নাই।" পরে মেয়েটীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কুন্দ, ইনিই তোমার দিদি"। মেয়েটী নত হইয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল, তিনি হাসিভরা মুখে আমার দিকে চাহিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি কুন্দর স্নানাহারের সব ঠিক করিয়া দিলাম। আমার বড় ভয় হইতেছিল পাছে ইহার সম্মুখেই আমার হৃদয়ের সব জ্বালা প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বামীর উপর যত ভালবাসা ; যত প্রীতি কেমন করিয়া যেন এক নিমিষেই দারুণ বিদ্বেষে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এই স্বামী!—ইহারি জন্য আমার কত

বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করা? কত আশাপূর্ণ নয়নে সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াছিলাম, হায়, ইহাকেই এত ভালবাসা এত পূজা? আমার সেই অসীম, অনন্ত প্রেমের কি এই প্রতিদান? নাম 'কুন্দ,'—মরণ আর কি? এ যেন বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় "বিষ বৃক্ষের" অবতারণা। বুকের ভিতরে অজস্র অশ্রু—আকুলি বিকুলি করিতেছিল। সমস্ত দিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা বেলা কি কাজে যেন আমার ঘরে যাইয়া দেখি তিনি চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন "রেণু, তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন? শরীর ভাল আছে তো?" আমি কোন উত্তর না দিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "রেণু, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কুন্দ কোথায়? তার কথা"—আমি তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। দিদিমার ঘরের দিকে যাইতে দেখিলাম, কুন্দ তাঁহার পাকাচুল তোলায় লাগিয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে আসিয়া এই কাজটী বরাবর আমার হাতেই ছিল, আজ দেখিতেছি সেখানেও অন্যের অধিকারের বিজয় পতাকা! প্রতিদিন দিদিমা রেণু, রেণু, করিয়া উতলা হইয়া উঠেন, আজ দিদিমারও দেখিতেছি রেণুর খবরের দরকার নাই। কোথায় যাইব? কোথায় জুড়াইব? আমার সুস্থির হইবার ঠাঁই কোথায়? একবার মনে ভাবিলাম তাঁহার কাছে যাইয়া তাঁহার কুন্দ লাভের কথাটা সবিস্তারে শুনিয়া আসি, কিন্তু সে কঠিন কাজ পারিলাম না। অনুমানেই বুঝিলাম কুন্দ লাভ করা তাঁহার ডাক্তারী বিদ্যারই ফল। হয় তো কুন্দর আর কেহ ছিল না। তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় ডাক্তারের হাতে মেয়েটীকে অর্পণ করিয়া দিব্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, আর কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। এ কথা আর নূতন করিয়া শুনিয়া কি হইবে? উপন্যাসে যথেষ্ট জানা আছে। রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বীরু ঠাকুরপোর পড়িবার ঘরে তেতালার নিভৃত কক্ষে দরজা বন্ধ করিবার পর কোথা হইতে যেন বন্যার স্রোতের মত অশ্রুজলে আমার দুই চোখে ধারা ছুটিল, কিছুতেই সে অজস্র অনাহুত অশ্রুস্রোতকে বাধা দিতে পারিলাম না। কতক্ষণ পর মন কিছু শান্ত হইলে কাগজ কলম লইয়া মাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কাগজের পর কাগজ চক্ষুর জলে নষ্ট করিয়াও মাকে একখানি চিঠি লেখা ঘটিয়া উঠিল না। জানি না কত রাত্রে আমার বন্ধ দুয়ারে শব্দ হইল এবং মৃদুস্বরে ডাক আসিল "রেণু দুয়ার খুলিয়া দাও"। আমি আলো নিভাইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া তেমনি বসিয়া রহিলাম। তাঁর ব্যথিত কণ্ঠের অনেক কথাই আমার কর্ণে আঘাত করিতেছিল, কিন্তু আমি অটল হইয়াই রহিলাম। সিঁড়িতে মৃদু মন্দ জুতার শব্দ ধীরে মিলাইয়া গেল। আমি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িলাম। পাশের বাড়ীতে টুনী ঠাকুরঝির সই বিভা সেতারের সুরে সুর মিলাইয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল "আর কেন, আর কেন, দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ"।

১২ই—প্রভাতের সর্ব্বযাতনাহর স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে আমার প্রাণের জ্বালা অনেকটা জুড়াইয়া গেল। আজ প্রথমেই সতী দিদির কথা মনে পড়িতেছিল। আজ বড় সাধ হইতেছে সতী দিদির পায়ের কাছে বসিয়া তাহার নিষ্কাম ব্রতের দীক্ষা লই। কি করিলে সতী দিদির মত হওয়া যায়? আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ঝড়ুয়া ডাকিল "মায়ী, চিঠ্‌ঠি"। চিঠি হাতে লইয়া দেখি এ তাঁর লেখা চিঠি, চার দিন আগে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এ চিঠিটা বাইরের ঘরে তক্তপোষের নীচে পড়িয়াছিল। আজ তাঁর আদেশে ঘর সাফ করিবার সময় পলাতক চিঠিটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বুঝিলাম জানলা দিয়া চিঠি খানা ফেলিয়া দিয়াই পিয়ন তার কাজ শেষ করিয়া গিয়াছে, আর কর্ত্তব্যপরায়ণ চাকরদের ওদিকে খবর লওয়ার কোনই দরকার হয় নাই। চিঠিটা একবারে না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কাজে অতটা পারিয়া উঠিলাম না। চিঠি খুলিয়া পড়িলাম, লেখা আছে।

"রেণু আমার,—

ইহার আগে যে চিঠি লিখিয়াছি তাহাতেই জানিতে পারিয়াছ আমি শীঘ্র যাইতেছি। পরশু দিন রওনা হইব স্থির করিয়াছি। দুই মাসের ছুটীও লইয়াছি ; ইহার পর আর এখানে আসিতে হইবে না। কলিকাতার কাছেই এবার থাকিতে পারিব, কাজেই আমাকে আর লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিতে হইবে না, বুঝিলে রেণু? তোমার কাকা কৈলাস বাবুর মেয়ে কুন্দ তার স্বামী ধীরেনের সাথে এখানে আসিয়াছে। ধীরেন পূণায় বদ্‌লি হইল, তাই কুন্দকে আমার সাথে তোমার কাছে পাঠাইতেছে। ধীরেন পূণায় বাসা ঠিক করিয়া কুন্দকে লইয়া যাইবে। কুন্দ তোমাকে দেখিবার জন্য খুব ব্যাকুল। আমার ভারী ইচ্ছা হইতে ছিল কুন্দর কথা আগে তোমার কাছে কিছুই না লিখিয়া একেবারে লইয়া গিয়া চম্‌কাইয়া দিব, কিন্তু অত সাহস রাখিতে পারিলাম না। তুমি হয় তো স্বামীর সাথে বোনকে দেখিয়াই মূর্চ্ছা যাইবে। তোমাদের অসাধ্য কাজ নাই, তাই সব খুলিয়া লিখিলাম। আমি ভাল আছি। আজ আর বড় চিঠি লিখিবার দরকার নাই, কেমন রেণু?

ইতি—
জীবনে মরণে
তোমারই অহিন।

ওগো আমি এ কালো মুখ কোথায় লুকাইব? এ পাপ সন্দেহের কথা কেমন করিয়া তাঁহার কাছে কহিব? কুন্দর কাছেই বা কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাইব? কাকার মেয়ের নাম তো মনু বলিয়াই আমরা জানিতাম। কাকা চিরকালই দূর বিদেশে চাকুরী করিতেন, তাই তাঁহার সহিত আমাদের সর্ব্বদা দেখাশুনা হইত না, ছয় সাত বছর পূর্ব্বে কুন্দকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহাকে সকলে "মিনু" বলিয়া ডাকিত। তাঁহার উপর ভারী রাগ হইতে লাগিল, কেন আমাকে আগে বলেন নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম তাঁর এতটুকু দোষও নাই। তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, কুন্দর কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমিই তো অভিমানের জ্বালায় চলিয়া আসিয়া ছিলাম। ছিঃ ছিঃ, আমি এত ছোট, এত ক্ষুদ্র আমার মন! কোন্ মুখে কেমন করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইব? চাহিয়া দেখি তিনি আসিতেছেন। ঘরে ঢুকিয়া বেদনাকাতর স্বরে কহিলেন "রেণু, তোমার কি হ'লো আমায় খুলে বল, এত দিন পর বাড়ী এসে তোমার এমন ব্যবহার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই তা' তো তুমি জান।" আমি কোন কিছু না কহিয়া তাঁহার দুটী পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলাম। আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু জলে তাঁহার পা' দুটী সিক্ত হইয়া গেল। তিনি আমার মাথাটী তাঁহার বুকের উপর তুলিয়া লইলেন, আমার হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। তিনি চিঠিটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া অভিমানজড়িত কণ্ঠে কহিলেন। "এত অবিশ্বাস রেণু! তুমি যা সন্দেহ করেছ, আজ সকালে এ চিঠি দেখেই আমি বুঝেছি"। আমি কোন মতে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া কহিলাম "আমাকে ক্ষমা কর।"

তিনি আমার মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে না রেণু, তোমার কোন অপরাধ আমার কাছে দাঁড়াতে পারে না। কুন্দর কাছে একবার ক্ষমা চেয়ো।"

বৈশাখ, ১৩২৭

জেরাণ্ড-জয়ী

সৌরীন্দ্রনাথ বসু

(প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প লেখক Adrienne Cambry এর একটি গল্প হইতে)

দৃশ্য।

[সামান্য একটি কক্ষ, দুইখানি চেয়ার, একটি টেবিল, ও ক্ষুদ্র একটি পুস্তকাগারে গৃহখানি সজ্জিত। ক্লোতিলদ্ টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্টা, তাহার পুস্তক-কয়টি টেবিলের উপর রাখা আছে।]

রেনের টুপি-হস্তে প্রবেশ।

রেন—নমস্কার মাদ্‌মোয়াজেল্ (মহাশয়া), আপনার কুশল তো?

ক্লোতিলদ্—আজ্ঞে, হাঁ। ধন্যবাদ মিঃ রেনে। আপনি ভাল আছেন তো?

রেনে—আমি!—হাঁ, চির দিনই যেমন থাকি।

ক্লোতিলদ্—চিরদিনই যেমন থাকেন—সে আবার কেমন কথা!—খোলসা করে বল্‌তে হয়।

রেনে—আপনি বেশ জানেন আমি পীড়িত।

ক্লোতিলদ্—না, আমি তো তা' জানি না।

রেনে—জানেন না! তবে সে আমার দুর্ভাগ্য।

ক্লোতিলদ্—বাস্তবিক আপনার পীড়ার কথা আমি কিছুই জানি না।

রেনে—কেন—প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় ল্যাটিন পড়তে যখন আপনার নিকট আসি, তখন বরাবর তো এ কথা আপনাকে জানিয়ে থাকি।

ক্লোতিলদ্—ল্যাটিন পড়া!—আসুন তবে আরম্ভ করা যাক্। সব দিনই তো শুধু বাজে কথায় কেটে যায়।

রেনে—(বিরক্তি সহকারে) সে অপরাধ আমার নয়। আপনিই তো আমার স্বাস্থ্যের কথা পেড়ে থাকেন, সৌজন্যের খাতিরে বাধ্য হয়েই না আমায় উত্তর দিতে হয়। আমি বুঝতে পারি নে আপনি নিরর্থক আমার স্বাস্থ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন—আপনি তো সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ক্লোতিলদ্—এ আপনার কল্পনা মিঃ রেনে। আজ বুঝি বা কল্পনার দৌড় আরো অনেক দূর গিয়েছে। মিঃ রেনে, আপনার কল্পনাশক্তি বেজায় প্রখর!

রেনে—আমার তা' বেশ জানা আছে, মাদ্‌মোয়াজেল। শিশুকাল থেকে লোকে এ কথা আমায় ব'লে আসছে। যখন ছ-বছরেরটি ছিলাম, তখন নিজের কাছে নিজে গল্প আবৃত্তি করে আমি কৌতূক উপভোগ করতাম ; নিজের মনে নিরিবিলি কত কি বকতাম, তাই এমন রুগ্ন হয়ে পড়েছি। এই কল্পনাপ্রাখর্য্যই তো আমার রুগ্নতার কারণ...

ক্লোতিলদ্—(রেনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) যেমন রুগ্ন আজ দেখাচ্ছে?

রেনে—হাঁ—হাঁ—আজ বড় রুগ্ন দেখাচ্ছে না কি?

ক্লোতিলদ্—বাস্তবিকই কি আপনি তাই বিশ্বাস করেন, না—এ আপনার কল্পনার খেলা?

রেনে—না—না--এ আমার কল্পনা নয়। সারা জীবন ধরে এ ব্যাধি আমি পোষণ করে আসছি এবং এতেই আমার জীবনলীলার সাঙ্গ হবে।

ক্লোতিলদ্—আমরা সবাই একটি না একটি মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছি ; অল্পবিস্তর অনেক কাল ধরে তাকে সইতেই হয়। এই তো জীবন। আসুন এখন তবে পড়া আরম্ভ করা যাক্। বাড়ীতে বেশ মন দিয়ে পড়েছেন তো?

রেনে—হাম্! (Hum!)...এ আমার মাথায় ঢোকে না, ছাই!

ক্লোতিলদ্—বটে! আপনার মাথায় ঢোকে নাই ঠিক। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা মিঃ রেনে, কারণ আপনার এ বয়সে কেউ কিছু নূতন শিখতে গেলে বিষয়টিতে তিনি যে আকৃষ্ট এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে তাতে আনন্দ পাবার তো কথা ; সুতরাং উন্নতিও দ্রুত হওয়া উচিত।

রেনে—তা হ'লে আপনি আমায় একটি মস্ত গর্দ্দভ বল্‌তে চান। হ্যাঁ—তা বেশ বুঝা গেছে।

ক্লোতিলদ্—না—না, এমন কথা আমার মনেও আসে নি। হয় তো ল্যাটিন পড়তে আপনার ভাল লাগে না, তা না লাগবারই কথা।

রেনে—না, সে কথা মিথ্যা, বরং ল্যাটিন শিখ্‌তে আমার অনেক কালের সাধ। আমার বাবাই এ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ল্যাটিন কোন কাজেরই নয়।

ক্লোতিলদ্—আর আপনার বুঝি ঠিক তার উল্‌টো ধারণা?

রেনে—আমি যখন ল্যাটিন শিখ্‌তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, এমন সময় একদিন শুনলাম যে, যে সকল যুবকরা দিনের বেলায় কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকে, তাদের সন্ধ্যার পর এই বাটীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

ক্লোতিলদ্—সে আপনি বেশ করেছেন,--এইখানে পড়তে এসে। আমাদের আরো অনেক ছাত্র আছে।

রেনে—(চিন্তিতভাবে)—আপনার ছাত্রদের মধ্যে যুবক ছাত্র আছে?

ক্লোতিলদ্—হাঁ, অনেক যুবক আছে।

রেনে—তারা খুব সৌভাগ্যবান্।

ক্লোতিলদ্—আপনার তুলনায় কোন অংশে বেশী নয় তা ঠিক জানবেন।

রেনে—হ্যাঁ, তা'রা আমার চেয়ে বেশী ভাগ্যবান বই কি, কারণ তারা আমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

ক্লোতিলদ্--সে আপনারই দোষ, আপনি তো চেষ্টা করবেন না।

রেনে—বটে, আপনার ঐ রকম ধারণা।

ক্লোতিলদ্—হ্যাঁ, প্রথম প্রথম আপনি বেশ মনযোগ দিয়ে পড়েছিলেন বটে ; ফলে শব্দ প্রত্যয়গুলি অনায়াসেই শিখে ফেলেছিলেন। ঐ সর্ব্বনাম শব্দেই...

রেনে—আঃ! সর্ব্বনাম! ঐ সর্ব্বনামগুলি—কি বিপদ! (আবৃত্তি করিয়া) হিক্ (Hic) হেক্ (Hoec) হক্ (Hoc)! হুইক (Huic) হক্! (hoc) হাক্! (hac) হো! (hoc)!!

ক্লোতিলদ্—(হাসিতে হাসিতে)—হ্যাঁ, এইবার আমরা ক্রিয়াপদে এসেছি।

রেনে—"সুম্" (Sum)—আমি হই—I am...আমি...কি?

ক্লোতিলদ্—মস্ত একটা পাহাড়, যেখানে ছিলেন, অচলের মত ঠিক সেইখানে আছেন, কারণ ঐখান থেকেই আপনার উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। এখন "আমো" (amo) এই ক্রিয়াপদটীর রূপ করুন।

রেনে—"আমো"—ভালবাসি—আচ্ছা, মাদমোয়াজেল, আপনি জানেন কি এই "ভাল বাসিকে" নিয়ে সবাই কেন ক্রিয়ারূপ সাধতে আরম্ভ করে, আরো তো অনেক পদ আছে?

ক্লোতিলদ্—(উদ্বিগ্ন হইয়া)—তা' কি জানি...সাধারণ নিয়ম হবে বোধ হয়। তা "ভালবাসি" শব্দে যদি আপনার আপত্তি থাকে আরো অনেক ঐ একই ধাতুর শব্দ আছে, আপনি পছন্দ ক'রে নিতে পারেন।

রেনে—না, না, আমি সাধারণ নিয়মকেই মেনে চলি, আমি "ভাল বাসি কেই" বেশী পছন্দ করি। (ক্লোতিলদ্ সঙ্কুচিত ভাবে কাগজ পত্তর উল্টাইতে লাগিল, যেন কত ব্যস্ত!)

রেনে—বলিতে পারেন, মাদমোয়াজেল, আমি কি ভাবছি?

ক্লোতিলদ্—না, মশাই।

রেনে—আমি মনে মনে ভাবছি যে আমার জীবনে এ একটা বড় হাস্যাস্পদ ঘটনা।

ক্লোতিলদ্—কি ঘটনা?

রেনে—এই আপনার ন্যায় কুমারীর কাছ থেকে ল্যাটিন শিক্ষা। মনে হয় বিশ্বের সনাতন পদ্ধতি গুলি একেবারেই রাহুগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। সেকালের দিনে মহিলার ল্যাটীন পড়াবার কথা তো শুনিনি।

ক্লোতিলদ্—কেন মশাই, সেকালে অনেক বিদুষী মহিলার কথা শুনতে পাওয়া যায়। যদিও স্বীকার করি যে সে সময়ের অধিকাংশ স্ত্রীলোক একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এখনকার মত অর্দ্ধশিক্ষিতার ভাগ অনেক কম ছিল।

রেনে—সে যা হৌক, আজ কাল ল্যাটীনই মেয়েদের একটী "ফ্যাসান" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্লোতিলদ্—কারণ পুরুষেরা ঐটেকে উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছেন বলে, স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য এই দীপ শলাকাটুকু নির্ব্বাপিত না হতে দেওয়া এবং সময়ে পুনরায় ঐটিকে পুরুষের হাতে অর্পণ করা।

রেন—বটে! বটে! এ আপনাদের খুবই সাধু উদ্দেশ্য।

ক্লোতিলদ্—(গম্ভীর হইয়া)—আমি আপনাকে মিনতি করছি, আসুন আমরা আমাদের কাজ করে যাই, পড়া ছেড়ে আবার বাজে কথায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

রেনে—রাগ করবেন না মাদমোয়াজেল, আপনি বিরক্ত হলে আমি এর বেশি আর কিছুই শিখতে পারব না।

ক্লোতিলদ্—আপনি দেখছি বেজায় অভিমানী!

রেনে—আমায় এ রকম ব্যতিব্যস্ত করে তুললে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই, রূঢ়বাক্য বলে কেউ কোন দিন আমার কাছে থেকে কিছুই আদায় করতে পারেনি ; শুধু মিষ্টি কথায় আদর করে যদি একবার "এস রেনে"...তাহোলে...

ক্লোতিলদ্—(হাসিয়া ফেলিয়া)—আমি তো আর যা হোক (অনুকরণ করিয়া) "এস রেনে" বলে আপনাকে অভিভাষণ করতে পারিনে।

রেনে—কেন? বাঃ! এই তো আপনি বেশ বলেছেন।

ক্লোতিলদ্—তবে আসুন এখন পড়া আরম্ভ করি। আজ কোন্ খানে পড়া?

রেনে—Gerundএ। gerund কাকে বলে মাদমোয়াজেল?

ক্লোতিলদ্—এই এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। Gerund ক্রিয়ামাত্রবোধক ধাতুরূপের একটী রূপ বিশেষ। এটি এক রকম রূপ করণ, ক্রিয়ার্থে কি ঘটতে যাচ্ছে বা কি ঘটা উচিত এটি এই ভাব জ্ঞাপক।

রেনে—এ সব বেশ তো নির্ব্বিঘ্নে ব্যাখ্যা করে গেলেন, এসব কেমন করে জানলেন?

ক্লোতিলদ্—আমি যা' শিক্ষা দিচ্ছি তা' যদি আমার না জানা থাকে সেটী আমার পক্ষে তাহ'লে—

রেনে...হাঁ, হাঁ, তাত বটেই।

ক্লোতিলদ্—তারপর indicative mood-এর বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের "o" স্থানে andi, ando, andum বসিয়ে Gerund করতে হয়। দৃষ্টান্ত...দেখুন, একটী দৃষ্টান্ত দিন তো।

রেনে—'Amo'—"আমি ভালবাসি"...আমি ভালবাসি।

ক্লোতিলদ্—আপনি ভালবাসেন, সে বেশ বোঝা গিয়েছে। আপনি ভাল বেসেছেন। তারপর, বর্ত্তমান কাল?

রেনে—বর্ত্তমানে! হে বিধাতা, কি বিড়ম্বনা!!

ক্লোতিলদ্—আপনি কি বলছেন?

রেনে—কিছুই নয়, মাদমোয়াজেল, আপনি ব্যাখ্যা করতে থাকুন।

ক্রোতিলদ্—তাহলে আপনিই বলুন ভাল বাসা'র Gerund কি হবে।

রেনে—Gerund! ভাল বাসার Gerund! কি শ্রুতিমধুর ক্রিয়াপদ! এর আবার Gerund?

ক্লোতিলদ্—আপনি আদৌ মনোযোগী নন, মিঃ রেনে।

রেনে—হাঁ, আমি খুব মনোযোগী, এই দেখুন না, "o" স্থানে andi বসাতে হবে এইতো?

ক্লোতিলদ্—শুধু andi নয়, ando ও andum, হাঁ, এইতো বেশ!

রেনে—কিন্তু এই andi, ando, andum, এ গুলির তাৎপর্য্য কি।

ক্লোতিলদ্—বেশ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এই amo ক্রিয়া পদটি...

রেনে—এর 'o'র স্থানে andi বসিয়ে হল amandi।

ক্লোতিলদ্—বাহ্। বেশ।

রেনে—তারপর, ando যোগে হল amando।

ক্লোতিলদ্—হাঁ ঠিক। বেশ! বেশ!

রেনে—আবার andum বসিয়ে হল amandum।

ক্লোতিলদ্—বাঃ! আপনি তা হলে বুঝেছেন দেখছি।

রেনে—(আহ্লাদে গদ গদ হইয়া) amandi, amando, amandum-এগুলিতে যেন ঠিক চীনে বাদামের গন্ধ, কি সুমিষ্ট! এখন এই gerund গুলির অর্থ কি?

ক্লোতিলদ্—এদের gerund বলে না, amo এই ক্রিয়াপদের gerund রূপ। এদের তিনটি করে আছে—amandi—ভালবেশে, amando—ভালবাসার সহিত, amandum—ভাল বাসতে।

রেনে—ভালবেসে, ভালবাসার সহিত ও ভালবাসতে। সবই বেশ বোঝা গেল।

ক্লোতিলদ্—কেমন করে?

রেনে—হ্যাঁ, জীবনে আমরা এই তিন অবস্থার একটি না একটিকে আশ্রয় করেই তো বেঁচে আছি। কেউ বা ভালবেসে জীবনে সুখী হয়েছে, কেউ বা ভালবাসায় সুখী হচ্চে, আর কেউ বা ভালবাসবার আশায় জীবন ভার বহন করে আসছে। কবির কথায় বলতে গেলে—

ধনী বা নির্ধনী হও
রাজা, মহারাজ,
প্রভু সে যে নিত্য রহে
শিয়রে জাগিয়া
বর্ত্তমান, ভবিষতে, অতীতের
ত্রিকাল ব্যাপিয়া।

ক্লোতিলদ্—বাঃ! বেশ খামখেয়ালি অর্থ তো!

রেনে—সে যা হোক, আমি যে বুঝেছি এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

ক্লোতিলদ্—এ পর্য্যন্ত আপনি তা হলে শিখেছেন। এখন gerund বেশ সহজ হয়ে এসেছে তো?

রেনে—সে আপনারই অনুগ্রহে, মাদ্‌মোয়াজেল্। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে শীঘ্রই আবার ভুলে যাই।

ক্লোতিলদ্—না, বার বার আবৃত্তি করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দেবেন, তা' হলে ভুলবেন না। বেশ আসুন আমরা উদাহরণ দিই। আমি প্রথমে আরম্ভ করব, আপনার কিন্তু শেষ করতে হবে। রাজী আছেন তো? উদাহরণ যথা—

"আমি পড়তে পড়তে হাঁটি"—"ambulo"—

রেনে—Ambulo...amando...

ক্লোতিলদ্—আমি আপনাকে "পড়ার" gerund করতে বলেছি "পড়া" lego, ঠিক "ভালবাসার" মত একই ধাতুরূপ।

রেনে—"ভালবাসার" gerund রূপ আমার বেশী পছন্দ হয়, ambulo, amando—এই ঠিক, নয় কি মাদ্‌মোয়াজেল!

ক্লোতিলদ্—হাঁ, ঠিক বটে, কিন্তু আমি তো আপনাকে তা' জিজ্ঞাসা করিনি।

রেনে—কিন্তু আমরা যে "ভালবাসা" নিয়ে আরম্ভ করেছি।

ক্লোতিলদ্—আপনি বড় অবাধ্য ছাত্র, সব বিষয়েই আপনার তর্ক বিতর্ক করা চাই।

রেনে—রাগ করবেন না, রাগ করবেন না, মাদ্‌মোয়াজেল! আপনি বিরক্ত হলেন?

ক্লোতিলদ্—হ্যাঁ, আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। আপার মতন নই যে "এস রেনে" বলে ডাকতেই গলে যাব।

রেনে—কিন্তু এই অসন্তুষ্টির স্বরও এত মধুর! আমি আর কোন দিন এমন কোকিলকূজনরব শুনিনি। আপনাকে এই ভাবে "রেনে" বলে ডাকতে শুনলে আমি যে gerund এর di, do, dum ভুলে যাই।

ক্লোতিলদ্—আমি যদি রূঢ়ভাবে কিছু বলে থাকি সে মশাই, আপনারই হিতের জন্য, তা'তে আমার কোনই স্বার্থ নেই।

রেনে—আপনি তবে রাগ করেছেন যে দেখছি।

ক্লোতিলদ্—হ্যাঁ, একটু করেছি বই কি? আপনার মত এরকম আর একটি ছাত্রও আমার যোটে নি।

রেনে—বটে!

ক্লোতিলদ্—কেন? আপনার প্রশংসার জন্যে বলা হয় নি!

রেনে—গভীর সন্দেহের বিষয়—আপনার চোখের ভাষা যদি ছাপাতে পারতেন, মাদ্‌মোয়াজেল।

ক্লোতিলদ্—আমার সকল ছাত্রই মনোযোগী, পরিশ্রমী, ও যত্নশীল ; বস্তুত তারা আমার গৌরবের বিষয়।

রেনে—আর আমি—আমি আপনার বুঝি...

ক্লোতিলদ্—আমি তা' বলি নি। সে যাই হোক্, আপনি আমার সকল ছাত্রের মধ্যে সব চেয়ে বড়, আর সকলে আপনার তুলনায় নাবালক বল্‌লেও হয়।

রেনে—খুব সত্যি ; আমারও বিশ্বাস যে আমার-বয়সী অতি অল্প ছাত্রই আছে। ত্রিশ বৎসর বয়সে নূতন বিদ্যোপার্জ্জনে সাধ, এ অতি হাস্যাস্পদ ব্যাপার নয় কি?

ক্লোতিলদ্—হাঁ লজ্জার কথা বটে যদি পাঠে উন্নতি দেখাতে না পারা যায়।

রেনে—এবং যেহেতু আমি কোনই উন্নতি দেখাতে পারিনি...আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি মাদ্‌মোয়াজেল, তবে ঐখানেই ক্ষান্ত দেওয়া যাক ; এবং অতি সন্তোষের সঙ্গে আমি আপনার দেনা পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি।

ক্লোতিলদ্—এ্যাঁঃ। কি বল্‌ছেন!

রেনে—কিছুই নয়, মাদ্‌মোয়াজেল তবে আসি।

ক্লোতিলদ্—কেন, আপনার হয়েছে কি?

রেনে—(দুঃখিতভাবে)—তাতে আপনার কিছু যায় আসে না।

ক্লোতিলদ্—কিন্তু হঠাৎ এ ভাবের কারণ কি? আপনি কি ল্যাটিন ছেড়ে দিলেন?

রেনে—তার সঙ্গে সঙ্গে gerund ও, আমি ও শিখে উঠতে পারব না।

ক্লোতিলদ্—আপনি সবে মাত্র আরম্ভ করেছেন, দুদিন বাদে সহজ হ'য়ে আসবে।

রেনে—পড়বার জন্যে আর আমায় অনুরোধ করবেন না। অনেক আয়াস স্বীকার ক'রে "ভালবাসা" পর্য্যন্ত এসেছি, আর তা' থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। "কালের" অপেক্ষায় আমি আর থাক্‌তে পারি নে।

ক্লোতিলদ্—কিন্তু আপনি তো একরূপ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন—"gerund" পর্য্যন্ত এসেছেন।

রেনে—amand—"ভালবাসিয়া"—এইখানেই আমি শেষ করতে চাই। "ভালবাসিয়া" তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আপনি এই লাইনটি অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন কি, মাদ্‌মোয়াজেল।

ক্লোতিলদ্—নিরর্থক মশাই।

রেনে—তবে আমি যাই। যদি আবার কোনদিন ল্যাটীন পড়তে আরম্ভ করি তো পুরুষের শরণাপন্ন হব।

ক্লোতিলদ্—আপনার যথা অভিরুচি। আমারও যদি ছাত্র পছন্দ করে নেবার স্বাধীনতা থাকতো তা হলে আমি সকল ছাত্রকে নিতাম না, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, পড়িয়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়, আমি স্বাধীন নয়।

রেনে—মাদ্‌মোয়াজেল ক্লোতিলদ্! দেখুন, আমার দিকে একবার তাকান। আপনাকে বেদনা দিয়েছি। আঃ! আপনি যে কাঁদছেন! আমার অপরাধ হয়েছে ; ঐ "জেরাণ্ডই" যত অনর্থের কারণ। একবার চেয়ে দেখুন। আমি বিদায় নিচ্ছি সত্যি কিন্তু এভাবে নয়। আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার সৎসাহসের জন্যে আমি অন্তরের সঙ্গে আপনাকে সাধুবাদ করছি। এ বড় মধুর দৃশ্য—আপনার মত নিঃসহায় বালিকাকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করতে দেখা। আমি আপনার গুণে মুগ্ধ—আমি আপনাকে...।

ক্লোতিলদ্—আপনি!

রেনে—হ্যাঁ আমি...আমি যে তা' ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করে বলে উঠতে পারছিনে। তবে যদি অনুমতি করেন ল্যাটিনে বলতে পারি কি?

ক্লোতিলদ্—ল্যাটীনে! ল্যাটীনে বলতে পারবেন না!

রেনে—পারবো—ছোট একটী ছত্রে, এত ছোট যে দুটী কথার বেশী হবে না, এমন কি এক কথারও হ'তে পারে।

ক্লোতিলদ্—তবে বলুন।

রেনে—আপনি বেশ জানেন, সেই ক্রিয়াপদটী আমরা যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম।...amo "ভালবাসি"।

ক্লোতিলদ্—শুধু ক্রিয়াপদ—কর্ম্ম নাই?

রেনে—দেখুন, মাদ্‌মোয়াজেল, উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ আমার কম্পিত, শঙ্কায় হৃদয় আমার

চঞ্চল, আমার সাহসে কুলাচ্ছেনা ; হায়, আপনি যদি আমায় একটু উৎসাহ দিতেন, একটুখানি কোমল স্বরে যদি একবার বল্‌তেন...!

ক্লোতিলদ্—কি বলব—"এস রেনে"?

রেনে—আহা, কি সুন্দর! কি মধুর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত। আমার শঙ্কা দূর হয়েছে, সাহস জেগেছে, হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার আজ খুলে দেখাব, খুলে বলব এ ক্রিয়ার কর্ম্ম কি?—"আমি ভালবাসি"...কাহাকে!...কাহাকে এ হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে ভাল বাসি?...তোমায় ক্লোতিলদ্।

ক্লোতিলদ্—আমায়! সত্যিই কি আমায়!

রেনে—কেন সন্দেহ ক্লোতিলদ্! আমি কি তোমায় শুধু স্তোক বাক্যে ভুলাচ্ছি? আমায় কি অন্তঃসার শূন্য একটী অপদার্থ বলে মনে কর?

ক্লোতিলদ্—না। আপনি হয়ত ক্ষণিকের উত্তেজনায় ভ্রান্ত হয়েছেন, ভ্রম...আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করি যে...।

রেনে—কি স্মরণ করিয়ে দিতে চাহেন? বুঝেছি আপনি আমায় পছন্দ করেন না।

ক্লোতিলদ্—হাঁ, আপনাকে আমার...।

রেনে—তবে কি আপনার আর কোন উদ্দেশ্য আছে, আর কাউকেও তবে ভাল বাসেন?

ক্লোতিলদ্—না। আমার কথা কে আর ভাববার আছে?

রেনে—তবে আর কিসের চিন্তা? আমি তোমায় ভালবাসি—যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিন থেকে ভাল বাসতে আরম্ভ করেছি, সেইদিন থেকে তোমার মোহন প্রতিমাখানি হৃদয়ে ধরে পলে ২ তোমারই চিন্তা সার করছি। এস হৃদয় রাণী! বল আমার এ সাধ মিটবে কি? প্রার্থীর এ যাজ্ঞা মিলবে কি? তুমিতো আমায় জান। তবে বল, একটী বার বল...উত্তর দাও।

ক্লোতিলদ্—আমি জানি আপনি মহাশয় হৃদয়বান্ পুরুষ। এই আমার উত্তর, মিঃ রেনে।

রেনে—ধন্যবাদ, তোমায় শত ধন্যবাদ। আজ আমি বড় সুখী। আবার আমরা ল্যাটিন পড়তে শুরু করব। উষার প্রথম আলোকে যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি সেইদিন এর শুভ উদ্বোধন ; আর আবার যে দিন বিধাতার আশীর্ব্বাদে এ পৃথিবীর চক্ষে তোমায় আমায় মিলন হবে সেইদিন ল্যাটীন দেবতার মঙ্গলগীতি আবার বেজে উঠবে।

ক্লোতিলদ্—মনে পড়বেতো কোন খানে আমরা ক্ষান্ত দিয়েছিলাম?

রেনে—"জেরাণ্ড" ভালবাসার জেরাণ্ড—ভালবাসিয়া, ভালবাসার—ভালবাসিতে উদাহরণ—যথা—ভালবাসিয়া সুখী হইয়াছি—amandi ; ভালবাসার সুখে জীবন পথ অতিক্রম করিতেছি—amando ; এইবার তোমার পালা ক্লোতিলদ্, উদাহরণ সম্পূর্ণ করে দাও।

ক্লোতিলদ্—তোমায় ভালবাসতে জীবন ধারণ করে থাকবো—"amandum"।

বৈশাখ, ১৩২৭

সঙ্গম-তীর্থে

শিবরাণী দেবী

প্রথম পরিচ্ছেদ

[১]

নবলক্ষ্মীকে আমার মত কেহ চিনিত না, আবার আমার জীবনের পথের পাশে অনাদরে আধফোটা সে মুকুলটি আমিই সবার অপেক্ষা দেখিয়াও দেখি নাই। ফুল তো ফুল, অমন কতই না দেখিয়াছি। ফুটিলে ওর মধ্যে যে আবার ওরকম গন্ধ অত নয়নাভিরাম রূপ উছলিয়া উঠিবে তাহা কি জানিত? যে দিন সে সাড়া পাইলাম চির জীবনের মত বঞ্চিত হইয়াই পাইলাম। তখন সে ঊষার তোলা জীবনটি পূজার সাজি হইতে গঙ্গাজলে চন্দন তুলসী ভরা নৈবেদ্যের ডালার অঞ্জলি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে আমার মনভরা কান্না আর ভক্তিনত পূজা। যে দিন নবলক্ষ্মীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছি "একি সেই লক্ষ্মী? রাতারাতি কোন্ সোণার কাঠির ছোঁয়ায় সেই কালো এমন ধারা আলোয় আলো হলো?" সে দিন হইতেই আমার জীবনের মোড় ফিরিল। কথাটা গোড়া হইতে বলি। আমার বাড়ী হালীসহর, চাকুরীস্থান বর্ম্মায় মুলমীনে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে লতার মত লক্ষ্মী সেই কৈশোরে কবে যে আমার জীবনে আসিয়া আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় হইয়া ঢুকিয়াছিল তা' মনে নাই। সমাজ-সংস্কারক ঠাকুর! ভ্রূকুটি করিও না বাপু ; বলিয়া ফেলি, আমাদের হইয়াছিল বাল্যবিবাহ! বরাবর এক সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরের শিকেয় তোলা আমচুর কাসন্দি চুরি করিয়া খাইয়াছি, রাগ হইলে গুম্ গুম্ করিয়া মেয়েটাকে ধরিয়া কিলাইয়া দিয়াছি, তার খিমচুনির জ্বালায় কালো পিঠভরা চুলের মুঠি ধরিয়া মর্ম্মান্তিক টানিয়া তাহাকে কাঁদাইয়াছি, এই তো মনে আছে। সে স্ত্রী আমি স্বামী এ ভাব অন্তরে ঢুকিতে অনেক দেরি হইয়াছিল, তার অনেক আগে আমি বর্ম্মায় পোষ্টমাষ্টারী পাইয়াছিলাম, লক্ষ্মীকে চাকুরী স্থলে আনিবার বহু পূর্ব্বে একেবারে বকিয়া গিয়াছিলাম।

মা যখন আমাদের গাঁয়ের গুড়গুড়ে ভটচাযকে সঙ্গে দিয়া লক্ষ্মীকে বর্ম্মায় পাঠাইয়া দিলেন, তখন ঊনপঞ্চাশটি নেশা আমার উল্টো ট্যাঁকে গোঁজা, নাপোর বোন তায়া আমার ঘরের উপদেবতা। নবলক্ষ্মী সন্ধ্যার নির্ব্বাক ছায়ার মত কখন যে আসিল, কখন যে আমার গাঁজার কল্কেটি হইতে সেই কটা উল্কিপরা পেত্নিটির দুর্ব্বাক্যগঞ্জনা অবধি সমস্ত ভারটুকু মাথায় করিয়া কুড়াইয়া লইল, তাহা আমরা কেহ টের পাইলাম না! শুধু দুইটি ভাব স্পষ্ট হইয়া আমাদের এতকালের পাতা উচ্ছৃঙ্খল সংসার ভরিয়া রহিল ; একটা অন্তঃসলিলা চোরা ফল্গুর মত স্বস্তির ভাব, সেটা আমার মনে। আর একটা নিজের ঘরে হঠাৎ কোথা দিয়া কেমন করিয়া পর হইয়া পড়ার ভাব, তাহা আমার বর্ম্মী স্ত্রীর মনে। আগে আমি তায়ার মন জোগাইয়া আড়ষ্ট হইয়া চলিতাম, জুয়ার আড্ডায় আড্ডায় রঙ্গীন লুঙ্গিপরা চুলে রেশমী রুমাল বাঁধা বর্ম্মা ইয়ারদের সহিত নিশি ভোর করিতাম, আর "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" চাকুরী করিতাম। আমার বর্ম্মী গৃহিণী মোটা থপথপে দজ্জাল স্বাধীন জেনানা, স্বাধীন—কারণ সে বেতের আসবাব তৈয়ারী করিয়া যা রোজগার করিত, তাহাতে আমায় ও পুষিত। আমার চাকুরীর সেই একশ' বিশ টাকা মাহিনা পাবার ঠিক পরদিনই জুয়ার আড্ডাগুলি দু'চার দান ছক্কা পঞ্জায় গ্রাস করিত, শেষটা

গাঁজার জন্য কি খোসামোদটাই না করিয়া যে তায়ার কাছে নাজেহাল হইতে হইত, তাহা আমিই জানিতাম। নবলক্ষ্মী আসার পর হইতে দিব্য আরামে একশ' বিশ টাকা উড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া নেশা তো অযাচিতভাবে পাইতামই, উপরন্তু অনেক দিন পর সেই আম-কাঁঠাল কলার গাছে ঘেরা শান্ত সবুজ বাঙ্গলা দেশের চচ্চড়ি সড়সড়ি ভাজা মাছের ঝোল আর ভাতে মনের সুখে এ কামনাদগ্ধ—শ্রান্ত দেহটাও জুড়াইতাম।

নবলক্ষ্মী যে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে তায়াকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পাসে সরাইয়া দিয়া তাহার গেঁজেল লম্পট অপদার্থ স্বামীধনটির সহিত সমস্ত সংসারের ঝাঁট রান্না সেবাটুকু অবধি অধিকার করিয়া অটল ঘর-জোড়া গৃহিণী হইয়া বসিল, তাহা বর্ম্মী বেচারী বুঝিতে পারিল না। সে চেয়ার তৈয়ারি করিত আর দিবারাত্র চিল চেঁচাইয়া ঝগড়া করিত। কিন্তু নির্ব্বাক্ শান্ত কঠোর হইতেও কঠোর সেই সিন্দুরশোভনা বধূরূপটিকে এক চুলও নড়াইতে পারিত না। তবু তায়া যাইত না, কারণ সে বনের পশুর মত করিয়াই আমায় ভালবাসিয়াছিল।

[৩]

তবু আমি নবলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া চাহি নাই, কে চায়? খোলা মাঠের ঠাণ্ডা কোল আর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসটুকুর মত এমন করিয়া জন্মাবধি অক্লেশে কিছু পাইলে কে তার মর্ম্ম বোঝে? লক্ষ্মীর সেবা না হইলে আমার চলে না তাহা বোধ হয় বিকারে অচেতন রোগীর মত না বুঝিয়াও শুশ্রূষার প্রেমস্পর্শটি বুঝিতাম, কিন্তু তখন হাতীর দাঁতের চৌকো কালো কালো দাগওয়ালা জুয়ার দানার পড়তিই শয়নে স্বপনে জাগরণে চক্ষে দেখিতেছি, আর তায়ার ব্যস্ত-ব্যাকুল টানাটানি বকাবকি হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতেছি। লক্ষ্মী যে নরম দুধের মত শয্যায় আমায় শোয়াইয়া প্রত্যহ ভিন্ন শয্যায় একটা তুচ্ছ মাদুরে মাটিতে শোয়, আর সকালে সন্ধ্যায় শুচিস্নাতা হইয়া তুলসীতলায় অতক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করে, তখন আমাকেও ছোঁয় না, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার সময় আমার ছিল না। তাহাকে তো কখন আপন বলিয়া কণ্ঠহার করিয়া তুলিয়া লই নাই, সুতরাং বঞ্চিত হইবার দুঃখ আমায় বিঁধিবে কি করিয়া? এখন মনে হয় লক্ষ্মী কিন্তু সেই আসন্ন কালরাত্রি টের পাইয়াছিল, নহিলে এমন পতিগতপ্রাণা এত সাধ্বী এ রকম শক্ত মেয়ে নিজের হাতে গাঁজার কল্কে সাজিয়া আমায় দেয়, জুয়া খেলিতে অমূল্য চরিত্রধন পাঁকে ফেলিতে একবারটি বারণ করে না! শেষে বুঝিয়াছিলাম সে নীচের আদালত ছাড়িয়া দিয়া একেবারে হাইকোর্টে তাহার নালিশ পেশ করিয়াছিল। তাই তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই এমন নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী আসিয়া আমি খপ করিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিয়া দাঁড়াইলাম। লক্ষ্মী চৈতন্যভাগবতের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার ঘোরে সেই জীবন্ত সন্ধ্যার বিগ্রহটি তেমনি আশার প্রতীক্ষায় ভয়ে স্তব্ধ। যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে সহজ গলায় আমি বলিলাম, "ওগো, চট্ ক'রে খানকতক কাপড় আর টাকাকড়ি একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নাও তো।" লক্ষ্মী ক্ষণেক থম্‌কিয়া রহিল, তাহার পর আমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। আমি নড়িতে পারিলাম না, ভয়ে উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট উৎকর্ণ হইয়া ঠিক তেমনিই বসিয়া রহিলাম।

তায়া পাড়ায় বেত কিনিতে বাহির হইয়াছিল, কিছুই টের পাইল না। লক্ষ্মী তুল্‌সীতলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুঁটুলিটি হাতে আমার সঙ্গে চিরজীবনের মত সেই দিন পথে বাহির হইল। যদি বুঝিতাম সে আর ঠিক সংসারী হইয়া ফিরিবে না, তাহা হইলে জেলে যাইতাম, কিন্তু পলাইতাম না।

সে শ্যাম রাজ্যের সীমানার ১২ মাইল এ দিকে, তখনও ইংরেজ-রাজত্বের এলাকায়।

চারিদিকে বন বন আর বন, আরাকানের জটাকুটের বিরাট বেড়ে ছায়াশ্যাম কানন ভূমি। ঘন বনে বাঘ ভাল্লুকের রাজ্যে বাঙ্গালীর মেয়ে এমন অকুতোভয় হয়, সে জ্ঞান আমার এই প্রথম হইল। পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া অর্দ্ধাহারে নেশার অভাবে কঙ্কালসার আমার তখন বিষম জ্বর। লক্ষ্মীর কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছি, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অবধি ইচ্ছাটি নাই। এত দুঃখে এত পরিশ্রম ও ক্ষুধায়ও নবলক্ষ্মীর যৌবনশ্রীভরা কমনীয় দেহলতা ঠিক তেমনি সরস পেলব সুপুষ্ট সুশীতল, সে শ্যামবর্ণ এখন আরও উজ্জ্বলশ্যাম, আরও বিপদে পড়িলে দ্বিগুণ অভাবের মধ্যে বোধ হয় গৌরাঙ্গী পটে আঁকা বীণাপাণিটি হইয়া উঠিবে। দুঃখ এমন সুখদ কেমন করিয়া হয়?

দুই একবার, বন খস্ খস্ করিল, তাহার পর লক্ষ্মীর বাহু দুইটি আকুল আগ্রহে আমায় জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম চারিদিকে লাল পাগড়ী পুলিশ, একজন ইউরোপীয় ইন্‌সপেক্টর টুপি খুলিয়া রাঙ্গা মুখের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিতেছে, ইউ সন্ অব্ এ বিচ্। হোয়াট্ ডেভিল্‌স্ ড্যানস্ ইউ হ্যাভ্ লেড্ আস্, ইউ নো?" লক্ষ্মীর মাথায় কাপড় নাই, সেই আয়ত অশ্রুসজল ভাবউদাস চক্ষু দুইটি সাহেবের মুখে রাখা। সকলে মিলিয়া বোধ হয় লাথি ঘুঁসায় অস্থির করিয়া আমায় উঠাইয়া দাঁড় করাইত, কেবল সাহেব হাত তুলিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইয়া ডুলি আনিতে বলিল। আমায় থানায় লক্ষ্মী কোলে করিয়া লইয়া গেল, কি পুলিশে ধরিয়া লইল বুঝিতে পারিলাম না।

যে দিন জ্ঞান হইল, সে দিন দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘরে লোহার খাটে নরম বিছানায় শুইয়া আছি, সারি সারি তেমনি খাটে আরও আশে পাশে কত রোগী। শুনিলাম এটা মুলনীনের জেল হাঁসপাতাল, লক্ষ্মী রোজ আসিয়া দুই দণ্ড আমার পায়ের কাছে বসিয়া যায়। তখনই সে আসিল, পায়ের ধূলা লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অঝোর অশ্রু ধারায় আমায় পা ভিজিয়া গেল। আমি বড় কষ্টে বলিলাম, "ওগো! আফিং আছে?" লক্ষ্মী এদিক ওদিক চাহিয়া খোঁপার মধ্য হইতে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। সে দিন আর সে দাঁড়াইতে পারিল না, থর থর করিয়া সে লাবণ্যে মাখা প্রেমশীতল দেহখানি তার কাঁপিতেছিল।

[৫]

আমার নামে দুই হাজার টাকার সরকারী তহবিল তছরূপের মোকদ্দমা হইল। তিন মাস আদালত আর হাজত করিলাম ; সেই সময় সব হারাইয়া আমি লক্ষ্মীকে পাইলাম। আগে হইতেই পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আহা! এমন সম্পদের অধিকারী আবার জীবনে আর কিছু চায়? নবলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, কিন্তু তখন সে নারীর অঙ্গে সেবার করুণাস্পর্শ ও নয়নে অনুপম সান্ত্বনার প্রেমস্নিগ্ধ চাহনী জাগিয়া রহিয়াছে। সে তাহার জগৎ ভুলান সম্মোহিনী শক্তিতে পুলিশ প্রহরীদের "মাঈ" হইয়া বসিয়াছিল, নবলক্ষ্মীকে অদেয় তাহাদের কিছুই ছিল না ; তাই সে আদালতে ও জেলে আমার সেবা প্রাণ ভরিয়া আসা মিটাইয়া করিতে পাইত। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পাপে ও নেশায় শীর্ণ দেহে অকালবৃদ্ধ আমি নবলক্ষ্মীর প্রেমে পড়িলাম ; মরণাপন্ন হইয়াও আফিং ছাড়িয়া দিলাম। সে আমাকে খাওয়াইত, বাতাস করিত, ধোয়াইয়া আঁচলে দু'খানা পা মুছিয়া দিত, আর আমি সব ভুলিয়া তাহাকে দেখিতাম। খোঁপার মধ্য হইতে কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া নবলক্ষ্মী নিত্য সাধিত, আমি মাথা নাড়িয়া বলিতাম, "না"। সে হাসিয়া তাহা সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছে লুকাইয়া রাখিয়া দিত। আমার ভাবান্তর দেখিয়া সে এত দিন পর প্রফুল্লমুখে হাসিয়াছিল, হাসিলে তাহার বয়স বোধ হয়ত বার কি তের!

নবলক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া আমি আত্ম অপরাধ স্বীকার করিলাম, আমার পক্ষের উকিল চটিয়া গেল, নবলক্ষ্মী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে আপন গহনা বেচিয়া আমার পক্ষে উকিল দিয়াছিল, এতদিন আমার আফিং ও আহার যোগাইয়াও নিত্য নিরাভরণার স্ত্রীধন অলঙ্কার কয়টি তখনও শেষ হয় নাই। অপরাধ স্বীকার করিলে সাজা হইবে, নবলক্ষ্মীকে পাইব না ; এমন করিয়া পাইয়াও হারাইব। কিন্তু সে কমনীয় তেজে শান্ত কত নয়নবিমোহন অথচ কত কঠোর মাধুর ছবি দেখিয়া মিথ্যা মুখে আসিল না, আজন্ম পাপের ব্যবসায়ী আমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র শুচি হইবার সাধ হইল।

আমার তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারপতি বলিলেন, অপরাধ স্বীকার না করিলে এ গুরুতর অপরাধে সাত বৎসর সাজা অধিক হইত না। সাত ও তিন বৎসর তো দূরের কথা, সে অবস্থায় সাত দিন আমার জীবনলক্ষ্মীকে চক্ষের আড় করিলে আমার যে গুরুদণ্ড হয়, তাহার উপযোগী গুরুতর পাপ বুঝি ইহসংসারে নাই। সে কাঁদিল, দরবিগলিতধারে আ-কবরীকম্পিতা দশায় তবু হাসিয়া বিদায় লইল, আমায় সাহস দিবার জন্য তাহার এ হাসি! লক্ষ্মীর সীমন্তের ডগডগে সিন্দুর রেখা দেখিতে দেখিতে অন্ধ ঝটিকা বুকে রুধিয়া শুষ্ক রক্তচক্ষে আমি বিদায় লইলাম। জেলে গিয়া আছড়াইয়া লুটাইয়া পড়িলাম, ক্ষোভে ক্রোধে নিরাশায় পাগলের মত বিধাতাকে অজস্র অভিসম্পাত দিলাম। উঃ বাসনার কি দাহ! এমনি করিয়া চাহিয়া এই রকম বঞ্চিত হওয়াই বুঝি কুম্ভীপাক নরক!!

[৬]

জেলে আর সব কয়েদী খাটে, খায়, কঠিন প্রাণ আরও কঠিন করিয়া পাপাচরণ করে আর নরকে বসিয়া নির্লজ্জ হাসি হাসে। সে ব্যর্থতার অবনতি কি করুণ! মনের দুয়ার দিয়া সে কি মর্ম্মস্পর্শী আত্মঘাত!! সেখানে আমিই একা বিদ্রোহী। কাজ করি না, প্রায় খাই না, কেবল বেত, বেড়ি, হাতকড়ি, একান্তবাস, এমনি সাজার পর সাজা ভোগ করি, আর মানুষ দেখিলে অভিসম্পাত করি। জেলের দারোগা সিপাহী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে লইয়া হারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, এত সাজা দিয়া আমার জেদ ভাঙ্গিতে না পারিয়া তাহারা আমাকে রেঙ্গুন জেলে বদলী করিল। সেখানে আসিয়াও আমার সেই ভাব ; উপরন্তু আমি আবার আফিং ধরিলাম, যতদূর উঠিয়াছিলাম ততদূর পড়িলাম। আমায় বেত মারিলে আমি হাসিতাম, মাংস কাটিয়া রক্ত পড়িত, আর আমি তারস্বরে 'এক' 'দুই' 'তিন' করিয়া গুণিতাম ; কত বেত মারা হইল জল্লাদের মারের সঙ্গে সঙ্গে বড় হাবিলদারের গুণিবার কথা, তাহার স্বর ডুবাইয়া দ্বিগুণ চিৎকার করিয়া আমিই গুণিতাম। হাতকড়িতে বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিলে অশ্লীল কদর্য্য ভাষায় গালি পাড়িতাম। এইরূপে একবৎসর কাটিল।

দ্বিতীয় বৎসরে আমি ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া মৌন নিলাম। মনের বিদ্রোহ নিস্তেজ হইয়া আসিল, হাওয়ার সহিত লড়াই কত দিন আর চলে? একদিন ডাকে নবলক্ষ্মীর পত্র পাইলাম। ছাপ রেঙ্গুন পোষ্ট আফিসের! তবে সে এখানেই আছে!! সে লিখিয়াছে, "আমি তোমার কাছে কাছেই আছি, তোমাকে এখানে এনেছে, আমিও এসেছি। তুমি ভাল হও, কাজ কর, তা হ'লে আমাদের দেখা হবে। তুমি সাজায় আছ, আমি তাই কোন উপায় করিতে পারিনে।" সেই দিন আমি আবার আফিং ছাড়িলাম, আবার নিত্য নিয়মিত খাইতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পর কাজ চাহিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সুমতি দেখিয়া এত খুসী হইলেন, যে, পায়ের বেড়ি কাটিয়া একেবারে নিজের আপিসে রাইটারের কাজে আমাকে লইলেন। তাহার দুই মাস পর আবেদন করিয়া অনুমতি পাইয়া নবলক্ষ্মী আমার সহিত দেখা করিতে আসিল।—আমার স্বর্গের রুদ্ধ দুয়ার আবার খুলিয়া গেল। সে দিন কথা বেশী বলিতে

পারিলাম না, শুধু আমার দুই চক্ষের এক আনন্দোৎসব গেল। সে দেখা ফুরায় না, ফুরাইবার ভয়ে বড় অস্থির করে।

এক বৎসর বিদ্রোহ, এক বৎসর মৌন, এমনি করিয়া দুই বৎসর গিয়া আমার সুখের দিন আসিল। আমার সাজার এই শেষ বৎসর। জানি না কেমন করিয়া, বুঝি শুধু নবলক্ষ্মীকে অতৃপ্ত চক্ষে দেখিয়া দেখিয়া আমি সব চেয়ে বড় শিক্ষা শিখিলাম। বাসনায় বড় দুঃখ, শুধু একান্ত ভাবে মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াই সুখ, সে সুখের সিন্ধুকে প্রতিদানের বিন্দু এক রতিও বাড়াইতে পারে না। আমি মৌন সুখে মহা ধ্যানে বাকি এক বৎসর কাটাইয়া দিলাম। শুনিলাম নবলক্ষ্মী গহনা বেচিয়া রেঙ্গুনে দোকান দিয়াছে, একজন চীনা মেয়ে সে দোকানে বেচাকেনা করে ; দু'জনে নাকি সই। নবলক্ষ্মী তুলসী মূলে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করে, শুদ্ধাচারে তপস্বিনীর মত থাকে, আর দুই বেলা জেলে আমার সংবাদ লয়। আমি যে দিন রেহাই হইলাম, সে দিন নবলক্ষ্মীর সহিত দেখা না করিয়া রেঙ্গুন ত্যাগ করিলাম। যাইবার সময় পত্র লিখিয়া গেলাম, "আমি এ অশুদ্ধ দেহ লইয়া তোমার ঘরে উঠিব না—ও ঘর আমার তীর্থ। আমি তীর্থের বাসের পুণ্য সঞ্চয় করিতে চলিলাম। লক্ষ্মী, আমি এবার তোমায় পাইয়াছি, আর হারাইবার ভয় নাই। শুধু আশীর্ব্বাদ করিও তোমার সাধ পূর্ণ করিয়া তোমারি মনের মানুষ হইতে পারি।"

তার পর যখন দু'জনে দেখা, সে দশ বৎসর পরে। জগন্নাথে সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য যেখানে নীলের পায়ে আপনাকে ডালি দিয়াছিলেন সেইখানে। আমি মনের সব বোঝা নামাইয়া তখন বড় আরামে মুক্তির আনন্দে আছি, জগৎ আমার কাছে নবলক্ষ্মীর ছবি। হৃদয়ে অপরিমেয় প্রেম, মধুর মগ্নতা, আপ্তকাম শান্তি, ও অপরাজেয় সুখ। এ সাধনা আমায় কে শিখাইল কিছু না দিয়া এত দানে আমার বুক কে ভরিয়া নিল? বলিব? নবলক্ষ্মী। কবে জান? তবে বলি শোন। তখন আমরা পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছি—শ্যামরাজ্যের পথে। অত দুঃখ আমি কখন পাই নাই, পাপের ব্যবসায়ী সুখের পতঙ্গ আমার দুঃখ সহিবার সামর্থ্য আদৌ ছিল না। দুঃখের কশাঘাতে আমার ক্ষণিক চৈতন্য হইয়াছিল। একটা গ্রামে আমরা দুই মাস ছিলাম ; আমার ফুঙ্গীর (সন্ন্যাসী) বেশ দেখিয়া সকলে বড় ভক্তি করিত। একদিন হৃদয়বৃত্তির জ্বালা সহিতে না পারিয়া এক কু-স্থানে গিয়াছিলাম। শেষ রাত্রে বাহির হইয়া দেখি দুয়ারে নবলক্ষ্মী, পাছে আমার কলঙ্ক হয় ভয়ে সে দুয়ার আগুলিয়া সারা রাত্র বসিয়া আছে। হঠাৎ মনে হইল গলিত শব কোলে বেহুলার কথা। আমি এত বড় পামর, তারপরও নবলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিয়াছিলাম। একদিন সে তুলসী প্রণাম করিতেছিল, আমার ডাক শুনিতে পায় নাই। আমি তাহাকে ও তাহার ইষ্টদেবতাকে লাথি মারিয়া সে দিন রাগের জ্বালা মিটাই। নবলক্ষ্মী আমার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমার দেবতা তোমার ডাক শুনি নি, লাথি মেরে জ্ঞান দিয়েছ বেশ করেছ।" তুলসী গাছকে লাথি মারিয়াছিলাম সে জন্য সে বড় কান্না কাঁদিয়াছিল ; তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সেই দিন জীবনে সেই প্রথম আমি তুলসী মূলে ঠাকুর প্রণাম করি। জেলে বসিয়া বসিয়া এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া আমি যাহা শিখিবার শিখি, নবলক্ষ্মী নামে আমার স্ত্রী, কখন আমার সত্যকার স্ত্রী হয় নাই। কিন্তু সে আমার কে বল দেখি? এমন সুন্দর চূড়ান্ত অনুপম ভাষায় অধিক কিছু আর কাহারও আছে কি? এখন আমরা দু'জনেই সংসারী। কিন্তু এ সংসার বুঝাইবার নয়, আমরা এ উহাকে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডের মধ্যে পাইয়াছে। এ আমাদের ত্যাগ ভোগ মোক্ষ ও বন্ধনের সঙ্গমতীর্থ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

নন্‌-কো-অপারেশন

প্রফুল্লময়ী দেবী

কর্ম্ম ত্রস্ত, সদাব্যস্ত কলিকাতা সহরে বেলা প্রায় ১১টা বাজে। রাস্তায় টাইমের ভাত খাইয়া, কেহ বা অভুক্ত অবস্থায় যে যার কাজে যাতায়াত করিতেছে।

পুত্রের দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠের পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া বর্ষীয়শী মাতা মৃদুস্বরে পুত্রবধূকে ডাকিতেছিলেন "সুধা, অ-সুধা!"

ভিতর হইতে বধূ সুধা কণ্ঠস্বরে অনেক খানি বিষ ঢালিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেলা দুপুরে গিল্‌তে বসেও স্বস্তি আছে। দিনরাত "সুধা" আর "সুধা"। বিনি মাইনের বাঁদী আর কি।"

বিধবা সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। সাহসে ভর করিয়া আবার বলিলেন, "খোকা ঘরে আছে কি!"

"কি আক্কেল মার আমার! বল না অমল, ওঁর বুড়ো খোকা কি এখনও ঘরে বসে আছে! কাছারী নেই নাকি আজ!"

১৪ বছরের পৌত্র অমল বাহিরে আসিয়া দেখিল মার সুধামাখা সম্ভাষণে ঠাকুরমা ম্লান মুখে নীচে ফিরিয়া যাইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই সে এ দৃশ্য দেখিয়া থাকে। তথাপি আজ নূতন করিয়া ঠাকুরমার এই অপমানিত ব্যথিত মুখভাব দেখিয়া বড় বেদনা বোধ করিল। চাপিয়া ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা তো বাড়ীতে নেই! কেন ডাকছিলে ঠাকু'মা।"

ঠাকু'মা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পোড়া পেটের জ্বালায় দাদু, ঘুঁটে নেই, ঝি বল্‌ল, 'পয়সা চেয়ে আন, তবে তোমার উননে আগুন পড়্‌বে।' থাক আজ আর খেয়ে কাজ নেই।"

অমল আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। স্কুলের বই গুলি লইয়া বাহিরে আসিয়া ঝিকে ডাকিয়া পয়সা দিয়া গেল। ঠাকুরমাকে বলিয়া গেল, "রাঁধ ঠাকু'মা, আমি এসে তোমার পাতে খা'ব।"

[২]

বিকালে অমল মা'কে লুকাইয়া ঠাকুরমার পাতের প্রসাদ খাইত! মা'র কঠোর শাসনে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঠাকুরমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না। অমল বড় হইয়াছে, সে মা'কে অত ভয় করিত না। আজ পাতের ভাত খাইতে বসিয়া দেখিল, শুধু ভাত।

সে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি আজ কি দিয়ে খেয়েছ ঠাকুমা।"

ঠাকু'মা বলিলেন, "বিধবার খাওয়া, একটু সন্ধব আর এক পো' আলো চালেই হয় রে, অমু! তুই যদি মার কাছ থেকে একটু দুধ মিষ্টি আন্‌তি, ভাত কটি খেয়ে নিতি।"

বুদ্ধিমান পৌত্র বুঝিল, হতভাগিনী ঠাকু'মা ঘুঁটের পয়সা চাহিতেই সাহস পান নাই, তা'র ডাল তরকারীর পয়সা চাহিবেন কি! আজ তিনি নুন তেঁতুল দিয়াই পেটের জ্বালা নিবাইয়াছেন। অমল বলিল, "কেন ঠাকু'মা ভাঁড়ারে কত তরকারী থাকে, তোমাকে কেন দেয় না মা!"

ঠাকু'মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে সব যে তোমাদের মাছ মাংস মাখা থাকে, অমু, আমাকে দে'বেনা কেন, আমিই তা পাই না।"

"তুমি কেন ভাঁড়ার দেখ না ঠাকু'মা।

"ভাঁড়ারের চাবি যে আমি তোমার জন্ম থেকেই তোমার মা'কে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি তোমাদের শুধু ঠাকু'মা হ'য়ে থাক্‌ব গঙ্গাস্নান কর্‌ব, আর শিব পূজো কর্‌ব দাদা, আমার গিন্নিপনার আর দরকার কি! সুধা এখন বুঝতে শিখেছে!"

ঠাকু'মা নীচেই থাকিতেন। উপরের ২ খানা ঘরের একখানাতে পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র বৈঠকখানা করিয়াছিলেন, অপর খানি শয়ন কক্ষ। বিলাসিনী বধূর পরামর্শে মাতার উপরে স্থান হইত না। নির্ম্মলচন্দ্র কাছারী হইতে ফিরিয়াছিলেন। একবার ভাবিলেন "অমু মার কাছে বসে কথা কইছে, আমিও যাই।" অমনি দেখিলেন বেথুন স্কুলের সুশিক্ষিতা পত্নী সুধা হাকিম গৃহিণীর উপযুক্ত "পজিশন" বজায় রাখিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতেই নীচে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে। আর মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎরূপ দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না, তিনি উপরে ধাবিত হইলেন।

অমু বলিল "আজ ভাত খেয়েই আমার পেট ভরেছে, ঠাকু'মা আমার জল খাবারের পয়সা দিয়ে তোমার খাবার আন্‌ব। কি আন্‌ব আমায় বলে দাও না, ঠাকু'মা।"

ঠাকু'মা আজ অনেক সহিয়াছিলেন, কিন্তু এই মাত্র পুত্র অগ্রসর হইতে হইতে যে ফিরিয়া গেল, সেই ক্ষতের উপর পৌত্রের স্নেহের প্রলেপটি আর সহিতে পারিলেন না, অঝোরে চোখের জল ঝরিতে লাগিল ; তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "দাদু, দাদু, আজ খোকা আমার পর হ'য়েছে, আজ সে নির্ম্মল বাবু হ'য়েছে, একদিন সেও তোর মত আমার আঁচলধরা ছিল। পাঁচ মাসের ছেলে কোলে নিয়ে একাদশীর উপোস করেছিলাম। আধ পেটা খেয়েও তাকে তা'র বাপের ভিটেয় নিয়ে ছিলেম। শেষে তার কাকার চক্রান্তে তাকে নিয়ে বাপের বাড়ী আসি। কত করে ভাই ভাঁজের মন জুগিয়ে তাকে "ডবল এমে" পাশ করিয়েছিলুম, তা আমি জানি আর উপরওয়ালা জানে রে! বিধবার সম্বল খোকা যখন এন্ট্রান্স পাশের জলপানির পয়সা দিয়ে আমার খাবার ছানা চিনি আন্‌তো, সে যেন অমৃত খেতাম। আর আজ বড় লোকের শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে হাকিম হ'য়ে নির্ম্মল আমার দিকে ফিরে চায় না। একটা পয়সার আলু ভাতে দিয়ে খেতে চাইলে সুধা আমায় বলে, 'বিধবার অত নোলা কেন', তা'তে আমার খেদ নেই, ভাই! তোমরা ভাল খাচ্ছ, ভাল পরছ তো! অভাগীকে যে আমার খোকা মা বলে ডেকে খোঁজ নেয় না, সেই খেদেই আমি মরে আছি!"

অমল ভাবিল "এই কি উচ্চ শিক্ষার পরিণাম!"

[৩]

দুই দিন পরে নির্ম্মল বাবু আহারান্তে ধড়া চূড়া পরিতে উপরে যাইতেছিলেন। পথে পাইয়া মাতা একটা কথা কহিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। বলিলেন, "নির্ম্মল, রামদীনকে বলে যে'ও আমার আলোচা'ল ফুরিয়েছে, আধমণ চা'ল এনে দিতে।"

নির্ম্মল চন্দ্র মাতার প্রতি বধূর ব্যবহার অনেকটা জানিতেন, তথাপি সুধা কি ভাবিবে, বলিয়া চাউল আনাইবার লুপ্ত কর্ত্তৃত্বটুকু হাতে লইতে সাহস পাইলেন না। বলিলেন, "আজ আমার বড্ড তাড়াতাড়ি ; সুধাকে বলগে, সেই তো চা'ল ডা'লের খবর জানে।"

নির্ম্মল একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, দেখিলেন সেখানে সুধা তাঁহার বেথুন স্কুলের "ক্লাস ফ্রেণ্ড" মিসেস্ অমিয়া মিত্রের সহিত মিঃ গান্ধির বক্তৃতার অন্যায্যতা প্রমাণ করিতে মহা তর্ক বাধাইয়া দিয়াছেন। নির্ম্মল স্মিত মুখে অমিয়া মিত্রকে নমস্কার কবিয়া পাশের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদ্‌লাইতেছিলেন। সহসা নীচে যেন কিছু পড়িয়া গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় ছুটিয়া আসিতে দেখিলেন, চেতনহীনা মাতা ধুলায় লুটাইতেছেন, অমল তাঁহার মাথাটী কোলে লইয়া অস্থির ভাবে ডাকিতেছে "ঠাকু'মা গো, ঠাকু'মা!"

নির্ম্মল বলিলেন, "একি, মার কি হ'ল, অমু!"

অমল বলিল, "সইতে পারেনি, বাবা, ঠাকু'মা অতটা সইতে পারে নি! আমি নিজের চোখে দেখেছি, পরশু শুধু নুণ ভাত খেয়েছে, কাল একাদশী করেছে, আজ চা'ল নেই বলে মাকে সকালে বলতে গিয়েছিলেন, মা' এতশিগ্‌গির চা'ল ফুরোল কেন বলে রাগ করতে লাগলেন। তোমাকে চালের কথা বলতে তুমি আবার মা'কে বলতে বললে! অত হেলা ফেলা বুড়ী যার সইতে পারেনি, মনের খেদে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেছে!"

ঠাকুরমা চোখ মেলিয়া অমলকে দেখিয়া বলিলেন, "অমল, আমার খোকা কাছারি চলে গেছে।"

নির্ম্মল হাঁটু পাতিয়া মার কাছে বসিয়া বলিলেন "মা, ওমা, এই যে আমি, আমায় মাপ কর মা।"

মা বলিলেন, "ডাক খোকা, আবার ডাক ; আমি এখনো, তোকে খোকা ডাকা ভুলতে পারিনি, তুই কি অপরাধে মা ডাক ভুলবি, খোকা! তুইত আমার সোহাগের স্মৃতি নোস্, তুই যে দুঃখিনীর ধন বাবা।" উপরে নির্ম্মল চন্দ্রের মেয়ে সুর করিয়া পড়িতেছিল।

"মা আমার কত ভালবাসেন আমায়
আছে কি তুলনা মোর মায়ের মায়ায়।"

* * *

উপরে গিয়া অমল ভগ্নী "বেবি"র চুলের ফিতা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, বলিল, "আর তোমাকে বিবি সেজে স্কুলে যেতে হ'বে না।"

"আঃ! ছেড়ে দাও দাদা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে,...না গেলে fine হবে যে"!

"না বেবি, তুই আর আমি Non-co-operation করব।"

নির্ম্মল বিস্ময়ে বলিলেন, "সেকিরে অমু, তোর আবার হ'ল কি, Non-co-operation আমার বাড়ী চলবে না।"

অমল গম্ভীরভাবে বেবির বইগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "তোমার বাড়ীতেই আগে আরম্ভ হ'বে, বাবা, নইলে এই শিক্ষা দীক্ষা শেষ হ'লে ১৫ বছর পরে আমিও যে তোমাদের খেতে দেব না, ঠাকুমার মত মা'কেও যে আমার বউ-এর খোসামোদ করে খেতে হ'বে! বেবিটাকেও বাড়ীতে আমরা পড়াব, নইলে পর শ্বশুর ঘরে গিয়ে এই রকম বিবিয়ানাই কর্‌বে, গেরস্তের সর্ব্বনাশ করবে। কাঙ্গাল জাতের জন্যে তো এ শিক্ষা নয়, বাবা! আমি মুটে মুজুরি করে খা'ব সেও ভাল ; তবু অমনতর সভ্য হয়ে বাপ মা হারাতে চাই না। যদি সুশিক্ষা দেশে আরম্ভ হয় তো আবার পড়ব ; নইলে আমিও আজ থেকে মহাত্মা গান্ধীর দলে যোগ দেব, হাকিমের ছেলে, "Non-co-operation' করব।" নির্ম্মল নির্ব্বাক!" অপর কক্ষে সুধা অর্দ্ধমুর্চ্ছিতা!!

বৈশাখ, ১৩২৮

এক ঢেবুয়া

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গরীবের ঘরে জন্মেছিল ছেলেটী—বেচারী ছিল জন্মদুঃখী। পড়শী তাদের জমাদারের বউ টাট্‌কা টাট্‌কা ভাতের মাড় আর ক্বচিৎ বা কাঁচ্চাটাক ছাগলের দুধ সলতে করে চুষিয়ে মা-বাপ-হারা, একরত্তি একলা সে দুমাসেরটুকুকে বাঁচিয়েছিল। তারো আর কেউ ছিল না—আলাই বালাই আপন কি দোস্‌রা। গতর খাটিয়ে, ঘুঁটে কুড়িয়ে, গম পিষে দিনান্তের দু ঢেবুয়া যা জমাদারণীর রোজগার হতো তাই নিঃশেষে খরচ করে আন-আগুনের বাবুয়া—এইটিকে আপন বুকের আনন্দের মত মমতায় মমতায় বাড়িয়ে তুল্‌লো। পালা ছেলে তার এখন ভোর বিহানে আপনি উঠে ছাগলটাকে বার করে মাঠে নিয়ে খোটা পুঁতে দিয়ে আসে, রোদ্দুরে ছড়িয়ে দেওয়া ঘুঁটে কুচি ঝাড়া করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে মাইয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—বাজার থেকে গমের দুটো টুক্‌রীর ছোটটী মাথায় ব'য়ে বাড়ী নিয়ে আসে, জমাদারণী, সন্ধ্যেটীতে রোজ ভুজা ভাত ছাতু রোটী যা জোটে খাইয়ে খেয়ে ছেলেটারে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমোয়।

কাঙালের ছেলের এমন করে দিন কাটবে—তা কি দেবতার সয়! চট করে তিনি মৃত্যুর পরোয়ানা জারি দিতে যমের দূতকে পাঠিয়ে দিলেন—তিন দিনের জ্বরেই বুড়ীয়ার দুনিয়ার দিক্‌দারী মিটে গেল।

অনাথ ছেলেকে আশ্রয় দিতে আজ আর কেউ ঘরে ডেকে নিলে না। এক মুঠো মকই কি চানাও তো হতভাগার কপালে জুটলো না আজ! সারাদিন উঠোনটীতে প'ড়ে আছাড়ি পিছাড়ি ক'রে সে কাঁদলো। সন্ধ্যেটীতে আজ কুঁড়ের কোণে টিনের ডিবিয়াটী আর কে জ্বেলে দেবে, অন্ধকারের ভেতরে চালার মেজেয় লুটিয়ে প'ড়ে 'মাইয়া গে, এ মাইয়া' বলে সে কি তার কলিজাকাটা ছাতিফাটা কান্নাকাটী! অনেকক্ষণ এমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়লো।

পেটের "ক্ষিদে" মনের ব্যথায় ভুলে থাক্‌তে পারে আর কদিন? তাও এই শিশু। তিন দিনের দিন সকালে সে উঠোনের বাইরে এসে দাঁড়ালো, পা টল্‌ছিল—পারলে না খাড়া থাক্‌তে ভুঁই-এর ওপর লুটিয়ে প'লো। জগ্‌মোহন তার টোকনী পূরে মকই-এর খই নিয়ে খেতে খেতে চলেছিল—গঁহু-ক্ষেতে। ডেকে তাকে একগাল ভুজা যে চেয়ে নেবে তাও বেচারী পারলে না—ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছলো—ভাষা কি কথা ফুটছিল না মুখে। অনেকক্ষণ ঐ টোক্‌নীর পানে বসে-যাওয়া দুটো চোখের মৌন মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে শীর্ণ দু'খানা হাতে সেই কালি কিষ্টি নেংটী খানার আধ-ঝোলা আঁচলটাকে বাড়িয়ে ধর্‌লে। জগমোহনা ব'ল্‌লে, "ভাগ্‌-বুড়্‌বগ্‌।"

ক্ষুধার্ত্তের অভিমান আঘাত লেগে টাটিয়ে উঠে চোখফাটা জলের ধারা শুকিয়ে সিঁট্‌কে লাগা গালের দুধারি ধরে লহর ব'য়ে গড়িয়ে এলো—কিন্তু চেঁচিয়ে কাঁদতেও পার্‌লে না বেচারী—কণ্ঠে বল নেই।

আপন মনে ব'য়ে ব'য়ে বেলা তার দিন-হাজিরার পাকা খাতার পাতায় পাতায় সকল নিকাশ ঠিকঠিক নাবিয়ে দিয়ে এগিয়ে চ'ল্‌লো—ক্ষুধাহতের পেটের গুরু তাগিদও সঙ্গে

সঙ্গে বিষম হ'য়ে নেহাৎ হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌লো—কোথায় কি পায় আশাহীন, নিরুপায় পেটের তার এই দাউ দাউ ক'রে জ'লে-ওঠা তীব্র জ্বালা মেটাতে প্রয়োজনে অগত্যা উপায় আবিষ্কার হ'লো—চিনিয়ার চাচীর কাছে মেঙে—দুমুঠো ভাত তার সেদিন মিল্‌লো। তারপর থেকে রোজই "ফজিরে" বেরিয়ে "সাম" যখন ঝাকড়া গাছ পালার তলায় তলায় কালো হ'য়ে আস্‌তো—ছেলেটী তখন বাড়ী ফির্‌তো—ঐ কুঁড়েখানার দোরে। বারো বাড়ীর সাত মিশালী চাল, বুড়িয়ার ছেড়ে যাওয়া দুশো তালির ধারিটাঁকা মোটা সূঁচের ডাগর সেলাইয়ে সেলাইয়ে কাঁথার মত সে লুগাখানার কোনায় বেঁধে। কিন্তু আগুন জ্বেলে হাঁড়িতে চাপিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিতে তো সে জান্‌তো না—কাঁচা চালই চিবিয়ে খেয়ে ঢকর ঢকর ক'রে এক লোটা জল গিলে একলাটী প'ড়ে থাক্‌তো জমিনে ছেঁড়া চেটাই-এর ওপর ভাঙা চালাখানার নীচে। একদিন কি হ'ল—কাল বৈশাখী করাল হ'য়ে এসে দমকা ধাক্কায় ঐ চালা খানিও ফেলে দিয়ে গেল—শিশিরে স্যাঁৎসেতেই শ্যাওলা ধ'রে ধ'রে ঝুরি হ'য়ে সে চালার শেষ যা ছিল খড় খুঁটি মাটী, হ'য়ে গেল। একেই বলে বুঝি একান্ত নিরাশ্রয়। পাতা-ঝাঁকড়া আম গাছটার নীচে প'ড়ে থেকেই এবার নিরাশ্রয়ের রাত্তির কাট্‌তে লাগ্‌লো। ঝড় যেদিন দিগন্ত ঝাপ্‌সা ক'রে বিদ্রোহীর মত অসংযত আস্ফালনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আস্‌তো—ছেলেটা প্রাণপণে তার সরু গলায়—"মাইয়া গে, এ মাইয়া" ব'লে একবার চীৎকার ক'রে উঠে গাছের গুঁড়িটার আড়ালে স'রে গিয়ে বস্‌তো—তারপর বাদল যখন নেহাৎই পাগল হ'য়ে ঢলে ধারে নেবে আস্‌তো নিরুপায় তখন দৌড়ে গিয়ে মীনা মসজিদের ছাদের নীচে মাথা গুঁজে দাঁড়াতো। জল ছাড়্‌লে আবার ফিরে আস্‌তো-গাছতলায়—নয়ত ঐখানেই রাত্তির কাটাতো কোনো মতে কাত হয়ে ভয়ে ভয়ে—কি জানি যদি মসজিদের মুন্সী জান্‌তে পেরে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দে'য়।

এমনি ক'রে শীত এসে তুহিন হেনে তার ত্বকে ত্বকে শিউরে উঠ্‌লো। বুড়ীয়ার ফেলে যাওয়া যা ছিল লুগা কুর্ত্তা সে সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ হ'য়ে গেছে। কি ক'রে আর পারে হতভাগা এই হিমে পড়ে মেঙে খেয়ে? কিন্তু উপায় ও তো আর কিছু নেই—কেউই যে নেই তার দিন দুনিয়ায়। আহা! যদি কিছু উপায় থাক্‌তো মাইয়ার কাছে যাবার, তবে ছুটে যেতো সে এক দমে মুখ বুঁজে—মাইয়ার কোলখানার ভেতর গিয়ে প'ড়্‌তো মাথা গুঁজে। কিন্তু কি করে কোথায় যে সে চ'লে গেল—শিশু যে আজ ভাল করে তাও বোঝে না।

হাওয়া বুঝি সেদিন বরফের টুকুরো ভেঙে ভেঙে নিশ্বাসে নিশ্বাসে তার হিমানী বৃষ্টি ক'র্‌ছিল। রাস্তার পাশে গাছ তলায় গরুর গাড়ীর চাকায় লোহা আঁটা মিস্ত্রীরা আগুন জ্বেলে সেঁকে সেঁকে চাকার তাদের বহর বানিয়ে নিয়েছিল—জায়গাটা তখনো ছিল আঁচে আঁচে গরম। ছেলেটী আর পারছিল না—কন ক'নে শীতের ভেতর ঠির ঠির ক'রে কাঁপছিল—ছুটে এসে গাছটার তলায় দাঁড়ালো—পায়ে-গায়ে যদি বা একটু তাপ লাগে। নোংরা তার নেংটীখানা কোনো মতে গুঁজে রেখেছে—উদ্‌লো গা পিটি এ ভিখিরীকে কে আর এক টুক্‌রো নেক্‌ড়া দেবে—এই শীতে পিঠখানা তার ঢেকে বাঁচাতে? ঐ আগুনের গরমে কি আর অমন সে শীত কমে—হাতের ওপর হাত আড়া আড়ি ক'রে বুকের উপর যোড়া হাতের শক্ত চাপ চেপে চেপে বুকের হিমটা কমিয়ে নিতে চাইছিল—কিন্তু সে হিম কি কম্‌বার!—পাগলের মত সে মরিয়া হ'য়ে রাস্তার পাশ দিয়েই তিন চারবার ছুটাছুটি ক'রে এসে আবার গাছতলায় দাঁড়ালো। এবার গাটা একটু গরম লাগলো বটে কিন্তু পা দুখানা তার মনে হ'ল বুঝি খ'সে গেল। এদিকে পেটে ক্ষিধে—মাথা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে, কানের ভেতর বুঝি লাখো হাজার ঝিঁ ঝিঁ পোকা এক সঙ্গে ডাক্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। খানিকটা অসাড়ের মতন নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—গাছ তলায়,—"ক্ষিধের" কষ্টটা এইবার বড় ভারী হ'য়ে—বিষম হ'য়ে লাগলো—সঙ্গে

সঙ্গে শীত—কাঁপুনির ওপর কাঁপুনি কাঁপিয়ে ছেলেটার দেহের উপর দিয়ে কম্পনেরই বুঝি একটা তড়িৎ তরঙ্গ তরতরিয়ে তুললো।

রাস্তা দিয়ে একটী বাবু যাচ্ছিলেন—ষ্টেসনে গাড়ী ধ'র্তে বুঝি। পশমিনা পায়জামার উপর কোঁচা কোঁচানো মিহি ধুতি তিনি প'রেছেন। গায় ছাটা তিনটে খাটো খোটো জামার ওপর ফ্লানেলের কামিজটীর ঝুল ঝুলিয়ে দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু টুইলের শিকার-কোট টাইট করে লাগিয়েছেন—ঘাড়ের ওপর শালখানা—ভাঁজ ক'রে ফেলা আছে, বাঁহাতের ওপর দিয়ে আদ্ধেকটা জামা ঝুলিয়ে নামিয়ে দিয়ে বিলিতী কারিকরের কাটা চেকনাই-চমকানো চেষ্টারফিল্ড ব'য়ে চলেছেন—গায় দিতে হবে রাত্তিরে বড্ড শীত। বাঁহাতে কোঁচা আর ছড়িখানা। দেখে ছেলেটার ভরসা হ'ল, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে—না খেয়ে না খেয়ে সেই কান্নার মত ক্যানকেনে মিহি তারস্বরে ব'ললে,—"বাবু একটা পয়সা—একটা পয়সা দিন্ না বাবু"। একবার বাঁচোখের বাঁকা ভুঁরুটী কুচিয়ে কুঁচকিয়ে এনে ছেলেটীর মুখের দিকে তাকিয়ে—বাবু ব'ললেন—"যা যা, পয়সা পথে প'ড়ে থাকে আর কি।" হতাশ হ'য়ে বেচারী ফিরে এল গাছ তলাটীতে—রাস্তায় চেয়ে গাছের নীচেটা বুঝি তবু একটু গরম।

পেছনেই একটী ঠাকরুণ যাচ্ছিলেন পুরু রূপোর পরতে ক'রে খাবার সাজিয়ে দাসীর মাথায় দিয়ে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে দেবীর ভোগ দিতে। তাঁর দোরে ধন্না দিয়ে ছেলের পাশের জন্য মায়ের প্রসাদ মেগে পূজোর নির্ম্মাল্য মাথায় ক'রে নিয়ে আসবেন—হতভাগাটা দেখেই ব'লে উঠ্লো—"এক মুঠো খাবার দে-মা,—সারাদিন কিছু খাইনি—"

"কোথাকার হতচ্ছাড়া গো মা—স'রে আসুন, সরে আসুন গা গিন্নি ঠাকরুণ"—ব'লে দাসী তার মনিবাণীকে সাবধান ক'র্লে—খবরদারিতে হুঁস হ'লে—গিন্নি লম্বা পাখানা লাফানোর মতন ক'রে হেঁচকা হেঁচড়ে টেনে ফেলে সরিয়ে এনে ব'ল্লেন,—"ওমা,—ছুঁবি—ছুঁবি—সর্ সর্"—।

কঙ্কালসার হাতখানা তুলে ক্ষুধার্ত্ত হতভাগা তার চোখের কোণাটা মুছে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। বুকের স্পন্দনটা ভাল ক'রে না ক'ম্তেই সোঁ ক'রে কখানা মোটর এসে ঐখানটাতেই ঠিক থাম্লো...ঐখান থেকে গাড়ী খানা ঘুরিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় যেতে হবে। ভিখিরীর কি লজ্জা অভিমান আছে,—সে অম্নি দৌড়ে গিয়ে মোটরের পাদানি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাত পাতলে—"এক ঢেবুয়া—বড়া সাহেব, ভরদিন কুছ খায়া নেহি"—

সাহেব হীরা বসানো আংটী-আঁটা আঙুলটা তুলে রাস্তার পাশটা দেখিয়ে দিতে দিতে গন্ধমাখা রুমালখানা বার ক'রে তাড়াতাড়ি নাক ঢাক্লেন—সোফার চাকাটা ঘুরিয়ে দিতেই ঝাঁ ক'রে একটা "জার্ক" দিয়ে মোটার সাঁৎ করে বাঁদিকের রাস্তায় ছুটে চ'ললো—। একজন ইস্কুল মাষ্টার আস্ছিলেন—তাঁর বাঁ বগলে একরাশ খাতা তার সঙ্গে লম্বালম্বি ক'রে চেপে ধরা আধ-ছেঁড়া ছাতিটী—ডান হাতে একখানা নেকড়ায় বাধা আলু, বেগুন মাছ তরকারী লাউএর দুটো ডগা নেকড়ার কোণা দিয়ে লম্বালম্বি বেরিয়ে ঝুলে নেবেছিল—ইস্কুল থেকে ফের্বার বেলা বাজার ক'রেই আস্ছিলেন –তিনি দূর থেকেই প'ড়তে প'ড়তে আস্ছিলেন—ঐ মোটারখানার পিছনে মস্ত প্ল্যাকার্ডের ওপর বড় বড় হরফে স্পষ্ট ক'রে লেখা ছিল—"মিষ্টার চাউডুরীকে ভোট দিন। দীনের দুঃখ বারণ করিবার জন্য, নিরন্নের অন্ন সংস্থানের জন্য স্বদেশের সকল শ্রীবৃদ্ধির জন্য জননী জন্মভূমির কৃতী-সন্তান প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি মিঃ চাউডুরীর শাসন সংস্কার কৌন্সিলে প্রথম আলোচনার বিষয় হইবে—গ্রাজুয়েট শিক্ষক চাউডুরীকে ভোট দিন"—! মাষ্টার মনে মনে ঠিক ক'রে গেলেন--যে তাঁর ভোট রিজার্ভড রাখবেন না, মিঃ চাউডুরীকেই দেবেন।—

একটা পাকা সিগারেট-খোর বকাটে ছেলে যাচ্ছিল মাষ্টার মশাইএর সঙ্গে সঙ্গেই—সে

নাকটা একটু টেনে টুনে একটা কিসের গন্ধ বেশ অনুভব ক'রে নিয়ে মনে বললে, "কোথায় থেকে আস্‌ছেরে গন্ধটা? খাঁটী ওয়েষ্ট মিনিষ্টার টুবাকোর মস্‌গুল গন্ধ যে—ওঃ—ওখানা মিঃ চাউডুরীর মোটর না?—হ্যাঁ মোটর থেকেই গন্ধটা এসেছে—তাইত বলি—আর কে এখানে ও সিগারেট খাবে,—"

এমন সময় আবার একখানা ঘোড়ার গাড়ী—ছুটে এলো তারও গায় লম্বা কাগজ আঁটা—লেখা আছে "মি চাউডুরী দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ চাউডুরীকে ভোট দিন।"

হতভাগাটা উঁকী মেরে দেখতে যাচ্ছিল গাড়ীর ভেতর কে আছে—কোচম্যান সপাং ক'রে একটা চাবুক ক'সে দিয়ে ব'ললে—"হঠ যাও, উল্লুক" আর গাড়ীর ভেতর থেকে বড় বাবু থু ক'রে খানিকটা থু-থু ফেললেন বাতাসে উড়ে এসে তা প'ড়লো ঐ বেচারীর মুখে চোখে।

দুটী সহুরে তরুণ যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে কূটতর্ক বিরাট রকম জমাট ক'রে দস্তুর মত হল্লা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে। তারা দেশের নতুন ডাকে জেগেছে—শুধু তর্ক করতে, বুদ্ধির ছকা নক্‌শায় তাদের অগাধ বিশ্বাস। একজন বল্‌ছিল ঃ—

"বড় গলায় যে চেঁচাচ্ছো Non Co-operation. কিন্তু ভেবে দেখেছ একবার যে সেটা ফাঁকা কি নিরেট? কতকগুলো বয়াটে ছেলের হৈ চৈ—হুজুগে মাতোয়ারা হ'য়ে খুব নাচানাচিটাই আরম্ভ ক'রেছ।"

অন্য ছেলেটী বল্লে—"সে সব ভেবে দেখবার এখন সময়ও নেই, দরকারো কিছু আছে ব'লে মনে হয় না—দেশ মাতৃকার অন্তরের এ ডাক—সাড়া পেয়েছি—নাচানাচিই বল আর ছেলেখেলাই হ'ক প্রত্যেক সন্তানকে মায়ের ডাকে যোগ দিতেই হবে।"

"তা' দিলে তো বাঁচি, কিন্তু গান্ধী বা দাসের মত সবাই দিই কই? তুমি আমি তো দিই নি। যারা কাজে নেমেছে তারা তো তবু একটা কিছু কর্‌ছে। কিন্তু যারা গান্ধীর আদর্শ মুখে বল্‌ছে কিন্তু কাজে করতে পারে নি তারা?'

ছোকরার সঙ্গীটী এবার হো হো ক'রে হেসে উঠে ব'ল্‌লো—"ওঃ—এ আমাদের Logic এর লোহা লক্কড়-বন্দী যুক্তি-তর্ক Deliberation? দেশের ডাকে Logic এর জায়গা নেই হে"—

ভিক্ষুক হতভাগাটা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে গাছতলাটীতে ঠির ঠিরিয়ে কাঁপছিল, সন্ধ্যেও তো প্রায় এল—তার কাজল আঁচল দুনিয়ার বুকের ওপরে টেনে টেনে বিছিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আঁধার ঘন হ'য়ে গাছের নীচে জমাট বেঁধে গুমোট লেগে উঠ্‌বে যখন কি হবে আর তখনো ঐ পথিকহীন বির্জন বাটের ধারে দাঁড়িয়ে ভিখিরীর হতাশায় ; তাই হতভাগা ফেরার পথে পা বাড়াতেই অন্যমনস্কে পড়া একটা মরম-টোটা, কলিজা-ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে শুক্‌নো কাঠের মত ঠোঁট দুখানার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল—"মাইয়া গে—এ মাইয়া।" নিজের মনে যারা তর্কের ঝোঁকে চেঁচিয়েই চ'লেছিল তাদের দ্বিতীয় ছেলেটা বন্ধুর কথায় এবার বিলক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে উত্তর দিলে—"দেখ্‌বে তোমরা—আমাদের এই ধ্বংসের ওপরেই আকার পাবে একটা বিরা:ট—গ'ড়ে উঠ্‌বে একটা স্বর্গ...ওপর থেকে নেবে আস্‌বে—এই নিপীড়িত দেশের জন্য চিরন্তন কল্যাণ। দেশ আজ এই ধ্বংসই চাইছেন...সেই মাতৃ পূজায় নৈবেদ্যের মত এই তরুণ প্রাণগুলো—তাদের যত কিছু সুখ দুঃখ, যা কিছু বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে"—

এমন সময় শীতার্ত্ত সে হতভাগার ক্ষুধা-শীর্ণ, কঙ্কালসার কণ্ঠে তার এই দীর্ঘ দিনটা-ভরা "দাও দাও" চাওয়ার ব্যাকুল কাকুতি ব্যর্থ হ'য়ে বেড়ে ওঠা একটা ব্যথা আর্ত্তনাদে আড়ষ্ট

হয়ে জড়িয়ে গিয়ে—অস্পষ্ট, শীর্ণ একটা স্বরে শুধু বেরিয়ে এল বাষ্পজড়িত হ'য়ে—"মে-এ-এ-ই-য়া-য়া"—এই কথাটায়।

ছেলে দুজন এবার কাছাকাছি হ'য়ে পড়েছিল—চকিতে চ'মকে উঠে ব'ললো ঃ—"কিরে?"

এবার ফিরে যাচ্ছিল হতভাগা তার-আবরণ-আচ্ছাদন-হীন, নীল-আকাশের নীচে নগ্ন আশ্রয়—ঐ বুড়ীয়ার বাড়ীর হিমে ভেজা ভুঁইটুকুর পানে হতাশায়। ভাবছিল—স্যাৎসেঁতে সেই গাছতলায় মাটীটুকু আঁক্‌ড়ে প'ড়ে শীতের সমস্ত রাতটা ক্ষুধার ক্ষোভে, শিউরে শুকিয়েই কাটাতে হবে আজ ঐ "কিরে" তার কানে গিয়ে সে ফিরে দাঁড়ালো। আশা!—তবু আশা—হারে বেচারী!!

ছেলেদুটীর সাড়া পেয়ে ভিখিরী কষ্টে চেষ্টায় আরো দু-পা এগিয়ে গিয়ে বললে—"একঠো ঢেবুয়া, বাবু,—হুকুম হোক, হুজুরের এক ঢেবুয়া।" পকেট থেকে একটা পয়সা তুলে তাদের মধ্যে একজন ছোঁড়াটার দিকে ছুঁড়ে দিল। রাস্তার বনের ভেতর সেটা গড়িয়ে গিয়ে প'ড়লো—বুকভরা আশায় সবটুকু তার বলে হতভাগা ছুটে গিয়ে পড়লো সেইখানে—কিন্তু সুরকি ধূলোয় তামাটে সে পথের পাশে কোথায় সেটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছে—আগ্রহে-ব্যগ্রতায় হাতড়িয়ে হাতড়িয়েও পেলে না তো হতভাগা সেটা। অনেকক্ষণ খুঁজলো আশায় আশায়—না, মিললো না পয়সাটা ; এবার হতাশায় ব'সে প'ড়ে সেখান থেকে আর উঠ্‌তে পার্‌লে না বেচারী—"ক্ষিদেয়"—তেষ্টায়" হিমে হাওয়ায় অসাড় হয়ে আস্‌ছিল তার সকল অঙ্গ, স্থির হ'য়ে আসছিল বুঝি তার বুকের স্পন্দন, কাত হয়ে লুটিয়ে প'লো সে সেইখানে ;—তার্কিক দুজন কখনই তো চ'লে গেছে তাদের মত—আর এখানে এ দেশের ছবি নেতিয়ে নিথর হ'য়ে পড়লো ভুঁইএর ওপর—মরণ এতক্ষণ কোন্ কোণায় তার কঙ্কালের পায়ে রুদ্র তাল বাজিয়ে নাচছিল এই ফাঁকে সে ছুটে এসে দাঁড়ালো—ঐ হতভাগা ভিক্ষুকের শক্ত শ্রীহীন অসাড় মুখখানার পানে অপলক তার দৃঢ় দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ক'রে।

বৈশাখ, ১৩২৮

সঙ-সার

বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী

[১]

তাঁতির ছেলে তারিণীচরণ, স্ত্রীর সহিত যেমন মধুর ব্যবহার করিত, বুড়া বাপ মায়ের সহিত কিন্তু তেমন ব্যবহার করিত না। একমাত্র ছেলে তারিণী যখন স্কুলে পড়িত, পিতা তখন আদর করিয়া মনের মত, একটি টুক টুকে বউ ঘরে আনিয়াছিলেন। এখন সেই বউ বড় হইয়াছে, ছেলেও স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাপড়ের দোকান করিতেছে। জাত ব্যবসায়ে তারিণীর বড় লজ্জা বৃদ্ধ পিতা কিন্তু জাত ব্যবসার উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। আশা ছিল তারিণীচরণ লেখা পড়া শিখিয়া দু পয়সা আনিবে, বুড়া বুড়ীর এ কষ্টের লাঘব হইবে। বুড়া তখন তাঁতের কাজ ছাড়িয়া পায়ের উপর পা দিয়া তামাক টানিতে টানিতে সুখে কাল কাটাইবে।

বুড়ার মনের কথা জানিয়া অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ হাসিলেন, তাই তার সে সাধের আশায় ছাই পড়িল ; দোকান করিয়া তারিণীচরণ বেশ দু পয়সা উপায় করিতেছিল, তাহাতে বুড়া বুড়ীর কিন্তু কিছুই সাশ্রয় হইল না। তারিণীর শ্বশুরবাড়ী তারিণীর গ্রামের নিকটেই। তারিণীর বউ প্রায় বাপের বাড়ীতেই থাকে, কাজেই তারিণীও থাকে সেইখানেই। মাঝে মাঝে বউ তারিণীর বাড়ী আসে। তার বাপের অবস্থা ভাল, কাজেই এখানে আসিলে কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হয়। তারিণীর মার সঙ্গে বউয়ের বনে না। বউকে এক কথা বলিলে বউয়ের হইয়া তারিণী মাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, মা নীরবে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছেন। এমনি করিয়াই সুখের সংসারে দিনের পর দিন কাটিতে ছিল।

[২]

বৈশাখের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে যেন মাটী ফাটিয়া যাইতেছে। বাহিরে পাখীরাও কলরব থামাইয়া যে যাহার ছায়া খুঁজিয়া লইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুরন্ত কাকের সকাল দুপুর নাই—তারা অনর্থক কাকা চীৎকার রব যেন প্রখর রৌদ্রতাপকে খরতর করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত জগৎ যেন নিস্তব্ধ।

ঘরের দাওয়ায় খাঁচায় টাঙ্গান টিয়া পাখীটা হাঁ করিয়া, গা হেলাইয়া, চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। আর তারিণীর বাপ অন্য ঘরের ভিতর বসিয়া আপন মনে সুতা কাটিতেছিল। তারিণী তখন দোকানে। পাশের ঘর হইতে শ্বশুর ডাকিয়া বলিল, "বৌমা, টীয়াটাকে একটু জল দিয়ে এস মা।" তারিণীর বৌ নিত্যকালীর সেদিকে গ্রাহ্যই নাই। সঙ্গিনীদের সহিত হাসির ধুমে তখন ঘর ফাটিতেছিল। শ্বশুর বার বার ডাকিয়া বলায় বউ হাতের খেলা রাখিয়া বলিল, "কি আপদ, বুড়ো নিজে উঠে জল দিতে পারে না, তবে ও আপদ পোষে কেন? আমি ও সব পারি নে, বাপু। এমন সুন্দর বাজী এবার হাতে পড়েছিল। ঠাকুর ঝি, এবারে কিন্তু তোমাদের হারতে হত। এবারে ছক্কা—ছক্কা" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া টিয়ার জল দিতে যাইয়া বৌ চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওলো-ঠাকুর ঝি, দেখে যা, টিয়াটা কেমন দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে।" হা-হা করিয়া নিত্যকালী হাসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল।

তারিণীর মা জগৎময়ী পাশের বাড়ী ধান ভানিতে গিয়াছিল। ধান ভানিয়া বাড়ী আসিতে পথ হইতেই বধূর কথা শুনিতে পাইয়া কহিল, "বউ মা কি হ'ল—ওমা কি হ'ল?" বধূ হি-হি করিয়া হাসিতেই লাগিল। তারিণীর মা ধানের ধামা ফেলিয়া রাখিয়া খাঁচার নিকটে গেল, খোঁচা দিয়া দেখিয়া, পরে খাঁচা খুলিয়া টীয়াটা হাত দিয়া নাড়িয়া তারিণীর মা কাঁদিয়া উঠিল, "ওমা একি হল?" ঘর হইতে তারিণীর বাপ বাহির হইয়া বলিল, "আরে হল কি,—কাঁদ কেন?" তারিণীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন সব অলক্ষণে লোকও বাড়ী থাকে, মা! জল না খেয়ে গলা শুকিয়ে মারা গেছে, মা, তা কেউ একটু জলও দেয় নি।" বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল। তারিণীর বাপ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া টীয়াটার দিকে চাহিয়া বলিল, "বউমা, একটু জল আন ত, দেখি বেঁচে আছে কিনা।" বউ রাগিয়া গর গর করিতে করিতে ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, "তা বালাই গেছে, বাঁচা গেছে, আমার উপর এত কথা কেন বাপু? সব দোষ যেন আমারই।" তারিণীর মা কাঁদিতেই লাগিল। তারিণীর ছোট একটী ভাই ছিল। বার তের বছরের ছেলে বছর তিনেক হইল মারা গিয়াছে। তারই পোষা এই টিয়া পাখীটা। তারিণীর মার টিয়ার শোক ও ছেলের শোক এক হইয়া নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল।

[৩]

সন্ধ্যায় তারিণীচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিত্যকালী নানা ছাঁদে ঢালিয়া, নানাবিধ, করিয়া শ্বাশুড়ী কত কথা বলিয়াছেন, বড় কষ্ট পাই ইত্যাদি কথায় কান্দিয়া তারিণীর গোচর করিল, একেই তো তারিণীচরণ পিতামাতার উপর প্রসন্ন নয়, তাহার উপর মার এই অন্যায় ব্যবহারে সে একেবারে রাগিয়া অজ্ঞান হইল। জল যখন নিজে দিয়া যাইতে পারে নাই, তখন বৌকে গালি দিবার সে কে?

তারিণী দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা শুনে যাও।" মা তখন রান্না করিয়া স্বামী পুত্রের জন্য ভাত বাড়িতেছিল, বলিল, "তারিণী, ভাত খেতে আয় বাবা?"

উদ্ধত ভাবে ছেলে উত্তর করিল, "না, তুমি শুনে যাও।"

তারিণীর বাপ পিঁড়ির উপর বসিয়া পুত্রের অপেক্ষা করিতেছিল—বলিল, "যাও না, শুনেই এস, কি বলে!" তারিণীর মা বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি রে।" তারিণী গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজ থেকে আমি পৃথক্ হলেম। তোমার ওখানে আর খাব না।" তারিণীর মার চোখের জল তখনও শুকায় নাই, বুক ফাটা চোখের জল লইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, "কেন, বাবা"?

তারিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কেন নাকি আবার বলে দিতে হবে? যাও, আমার বিয়ের যা জিনিয পত্র আছে, সে সব এখনি বের ক'রে দাও। আজ থেকে আমি পৃথক।" আর কারও কথার অপেক্ষামাত্র না করিয়া তারিণী ঘরে ঢুকিল। তারিণীর মা কাঁদিয়া বলিল, "ওরে, তারিণী অবিচার করিস্ নে বাপ, বউয়ের কথাই কি সব শুনবি, মার কথা কি কিছুই শুনবিনে? আজকের মত খেয়ে যা, কাল থেকে না হয় আর খাস্‌নে। "তারিণী ভিতর হইতে বলিল, "যাও, ঘ্যান ঘ্যান, করো না?"

অভুক্ত অবস্থায় বুড়া বুড়ী কাঁদিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে জাগিয়া তারিণীর বাপ শুনিতে পাইল, পুত্র ও পুত্রবধূর কলহাস্য, বাসনের ঝন ঝনানি। বুড়া মনে করিল গিন্নি জাগিয়া নাই তো? আমার প্রাণে সব সয়। সে যে স্ত্রীলোক।" তারিণীর মা তখন টিয়া পাখীর স্বপ্ন দেখিতেছে, আর সেই কোলের ছেলে আসিয়া যেন বলিতেছে, 'মা' এই নাও আর একটি টিয়াপাখী, আর তুমি কেঁদ না।" টিয়াপাখী মনে করিয়া তারিণীর বাপের হাতখানা তারিণীর মা বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল।

[৪]

এমনি দুঃখেই দুই বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, তারিণী স্ত্রী লইয়া বেশ সুখেই কাল হরণ করিতেছিল। ইতি মধ্যে তারিণীর একটি পুত্রও হইয়াছে। সে একপা আধপা হাটিতে পারে, দুটী একটী আধ আধ কথাও বলে।

তারিণীর পিতার অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধ এখন আর কাপড় বুনিতে পারে না, বৃদ্ধাও আর ধান ভানিয়া দুপয়সা সাশ্রয় করিতে অক্ষম। বৃদ্ধ চলৎশক্তিহীন হইয়াছে। ঘরে বসিয়া নিষ্কর্ম্মা জীবন বহন করিতে যখন একান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল, বিধাতা তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া আর একবার হাসিলেন, আর তারিণীর ছেলে হইল। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ বৃদ্ধ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বৃদ্ধের সংসার আর চলে না। তাহারা দুই জনে যে দিন অভুক্ত থাকে, তারিণীর ঘরে সে দিন মহা ধূম! এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন সেই টিয়াপাখীটি জল না পাইয়া মারা গিয়াছিল, গত বৎসরও তারিণীর মা সেই দিন সেই খাঁচার বাটীতে জল দিয়া শূন্য খাঁচা দর্শনে চোখের জল মুছিয়াছিল। আজ সেই দিন। তারিণীর মা ভাবিল, "না, আর কাঁদিব না, তারিণীর ছেলের অকল্যাণ হইবে। তারিণীর পৃথক হওয়ার কথাও ধীরে ধীরে অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তারিণীর মা আসিয়া ছেলে কোলে লইল।

ছেলে তারিণীর মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "দাদু—দি-দি।" তারিণীর মা সে সুন্দর মুখে চুমো খাইল।

কোথা হইতে ঝড়ের ন্যায় নিত্যকালী ছুটিয়া আসিয়া তারিণীর মার কোল হইতে ছেলে ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "ডাইনি বুড়ি, শুকনো মুখে আমার ছেলে নিলে, ছেলের আমার হাড় মাস খেয়ে ফেলবে," বলিয়া ছেলে লইয়া ঘরে উঠিয়া গেল। তারিণীর মা দাঁড়াইয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল। ঘরে সেদিন একমুঠা চালও ছিল না।

[৫]

বৈকালে তারিণী বাড়ী আসিয়া দেখিল ছেলে ঘুমাইতেছে। তাহার মাথায় হাত দিয়া তারিণী আঁৎকাইয়া উঠিল। বউ নানা ছাঁদে শুক্‌নো মুখে ডাইনি বুড়ী ছেলে কোলে লইয়াছিল, তাই ছেলের গা গরম হইয়াছে, এই সব কত কথা বলিল। ক্রমেই ছেলের গা বেশী গরম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর তারিণী ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া ভরসা দিয়া গেল বটে, কিন্তু রাত্রি গোটা বারর মধ্যেই মার কোলে শিশু চির কালের তরে শয়ন করিল। তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিল। তারিণীর চীৎকারে বুড়া বুড়ী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারিণী দৌড়িয়া আসিয়া একহাত বাপের পায়ের উপর রাখিয়া আর একহাত মায়ের পায়ে রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বল—একবার বল কি পাপে আর আমার এই শাস্তি হ'ল।

বৃদ্ধ অট্ট হাস্য করিয়া বলিল, "আমাকে কষ্ট দেওয়াই তোর এ শাস্তির মূল, তো উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কিন্তু এ শাস্তি তোর ভগবানের হাত দিয়েই এসেছে তারিণী, আমার হাত দিয়ে আসেনি।

তারিণীর মা ছেলের শোকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

খেয়ানী

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[১]

হরি খেয়া দিত।

ছোট নদী, অগাধ জল তাহাতে প্রখর স্রোত। নদীর অনতি দূরে পল্লীতে হরি থাকিত। সে সেই সকালে বৈঠা আর লগী লইয়া নৌকায় যাইত, দুপুরে ঘরে আসিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিত, আবার নৌকায় গিয়া বসিত। এই তার কাজ। হরি একলা মানুষ—কোন দায় চিন্তা তার ছিল না। দিনমানে নৌকায় বসিয়া মানুষজন পার করাই তাহার কর্ম্ম ছিল। খেয়া দিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই হরির দিন গুজরাণ হইত। পয়সা জমাইবার চিন্তা তাহার ছিল না। পয়সা জমাইবার কথা উঠিলেই হরি গান ধরিত—

যখন ছিলাম মা'র উদরে
অন্ধকারে ঘোর কারাগারের—(হায় রে)
তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে
কে আমায় বাঁচালে—

সুতরাং কেহ হরিকে আর সে প্রশ্ন করিত না। কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—"দু'মাস ছ'মাস বেয়ারাম হয়ে যদি পড়ে থাক"—হরি গায়িত,—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে, হরে কালভয় হবি পার, ভবজলধি।"

হরি খেয়া দিত, কেহ তাহাকে কড়ি দিত, কেহ পয়সা, আধ্‌লা দিত ; কেহ ধান চাউলের বার্ষিক চুক্তি করিত। কেহ কেহ কড়ির কড়ার করিয়া পার হইত, পরে কড়ি দিত না, আবার আসিত, আবার পার হইত এবং কড়ি দিতে ভুলিয়া যাইত। এই দলের মধ্যে ভদ্রলোকেরই আধিক্য। দেশের ভদ্রলোকেরা যাহা পরিপাক করিতে পারেন, সাধারণে তাহা পারে না।

হরি অক্ষমের নিকট পয়সা লইত না। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা ভিক্ষুকের নিকট কখনো কড়ি চাহিত না। ইহারা পয়সা সাধিলে সসম্ভ্রমে জিভ কাটিত।

হরির বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। তাহার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, ভাবে ঢলঢল সরল মুখখানি, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান কেশদাম দেখিলে হরিকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। তাহার সরল সুমিষ্ট কথায় সবাই মুগ্ধ হইত। হরির সুমিষ্ট গলা ছিল,—অনেক সময়ই গান করিত, যে শুনিত, সেই আরো শুনিবার জন্য দাঁড়াইত। হরি তাহা লক্ষ্য করিত না, হয় তো একটা বেশ জমাট গান—মধ্যখানেই শেষ করিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। হাসিটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল।

হরি কাহাকেও উঁচু কথা কহিত না। পান বা তামাকের নেশা তাহার ছিল না। হরির কোন শত্রু ছিল একথা কেহ বলে না। সে সুখ দুঃখেরও ধার বড় ধারিত না। বাজে কথায়, বাজে দরবারে, তাহাকে কদাচিত পাওয়া যাইত। সমাজের বিচার, পঞ্চায়েতী কারবার, নিষ্কর্ম্মার তর্ক, গাঁয়ের সই সালিশীর ছায়ায়ও হরি পা দিত না। সে নৌকায় বসিয়া গান গায়িত,—

বাহাত্তর বছরের পাড়ি,
বেলা আছে দণ্ড চারি,
কেমনে হইবে পার (মন আমার)

কখনো বা বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস বিহ্বলে গায়িত,—

দিন যাবে দিন রবে না,
দীনের দিন যাইবে হরি,
রবে কেবল ঘোষণা।

কোনদিন বা হরি ভরসার সুরে গায়িত—

এ ভব সাগর, হবে বালুচর
হাটিয়া হইব পার (নামের গুণে)।

[২]

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজী হরির নৌকায় পার হইয়া যাইতেন। বাবাজীর উপর হরির অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি নৌকায় আসিলে হরি নিজের আঁচল দিয়া খানিকটা জায়গা ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসাইত। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিত,—"প্রভু একটু দয়া কর্‌তে হচ্ছে।" বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেন,—হরি হাঁ করিয়া শুনিত। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত। কোনদিন বাবাজী গায়িতেন,—

"তারা, কোন অপরাধে'এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসারে গারদে থাকি বল।
দিয়া মায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে
... ...
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।"

জীবন চক্রবর্ত্তী নৌকায় ছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কি বাবাজী "হরি ছেড়ে যে তারা বুলি—"

সহাস্যে বাবাজী কহিলেন—সবই এক রে বাবা—সবই এক। মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বলে গেছেন—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবাই আমার এলোকেশী
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।"
ভেদজ্ঞান ছেড়ে দাও বাবা"

বাবাজী গান ধরিলেন—

দূরে যাবে সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ
শত শত শত বেদ, তা'রা আমার নিরাকারা।"

চক্রবর্ত্তী কি ভা'বিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

[৩]

বাগ্দীদের অনেকই ছিল গরীব। তারা হাট বাজারে দোকান লইয়া যাইত। পাড়ার বৌঝিদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশী তারা বেসাতি লইয়া গাঁয়ে যাইত। এ রীতি এখনো এ দেশে আছে। তখন একটু বেশী ছিল। বেশী রকম ঠেকার পড়িলে সোমত্ত মেয়েরাও গাঁ করিত।

তখন দেশে আইনের কড়াকড় না থাকিলেও মানুষের দেহে প্রচুর শক্তি ছিল, দৃষ্টি সরল ছিল, ধর্ম্মের দিকে একটিবার চাহিয়া সকলেই কাজ করিত। তখন পাপের শাসন ছিল বেজায় কড়া আর ধর্ম্ম ছিলেন সহস্র চক্ষু। মানুষ ছোট বড় সবাই ধর্ম্ম আর পাপ দুটার ভয়ে তটস্থ থাকিত। রাস্তা ঘাটে মেয়েদের মর্যাদা সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

তখন মেয়েরা আবশ্যক মত গাঁয়ের হাটেও বেসাতি লইয়া যাইত। একবারে একটু পাশ কাটিয়া একটু জড় সড় হইয়া তাহারা বসিত। সেখানে ক্রেতারা প্রয়োজন মত যাইত ভিড় করিত না। সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত।

যে সব মেয়েরা বেসাতি লইয়া ওপারে যাইত, তারা একটু সকাল সকাল আহারাদি করিয়া দিনমানের জন্য বাহির হইত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠী স্বজনের নিকট সে পারের কড়ি লইত না।

মেয়েরা সন্ধার আগেই ফিরিয়া আসিত। হরি তাহাদিগকে পার করিয়া আনিত। পট্‌লি আসিত সকলের পরে, সে তার আয়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইত প্রহরী স্বরূপ। তার ভরা যৌবন ফুটন্ত চাঁপার রূপ তাহার একাকী যাওয়া ভাল বোধ হইত না। বুড়ী বেশী হাঁটিতে মজবুত ছিল না, কাজেই গাঁ ঘুরিয়া আসিতে পট্‌লির বিলম্ব হইয়া যাইত। সন্ধ্যার সূর্য্য যখন আধখানা নদীর ঐ পশ্চিমের মাথায় ডুবিয়া যাইত, তখন পট্‌লি নদী তীরে দাঁড়াইয়া মধুর কণ্ঠে গায়িত—

"হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো—
পার কর আমারে—"

হরি পট্‌লিকে পার করিয়া আনিত। পট্‌লি নৌকায় পশরা নামাইয়া গায়িত—

"আমি দীন ভিখারী, নাই গো কড়ি
দেখ ঝোলা ঝেড়ে।"

হরি স্মিতমুখে কহিত, পট্‌লি, তোরা যে আমার নায়ে পার হয়ে দুটা পয়সা করিস এই আমার পুণ্যি। এই আমার বাপ দাদার আশীর্ব্বাদ। আমি কড়ি চাই না—দরকার কি? তারপর গুণ্ গুণ্ স্বরে গাইল—

"সম্পদে হারালেম্ মোক্ষফল।"

পাড়ে আসিয়া পট্‌লি হাত মুখ ধুইত। হরি নৌকা বাঁধিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে তুলিয়া দাঁড়াইত। পট্‌লি ছিল তার শেষ পারের যাত্রী। পট্‌লিকে সন্ধ্যাবেলা একাকী নদীর ঘাটে ফেলিয়া যাওয়া হরি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিত না। কারণ তাহার শুনা ছিল "সন্ধ্যার বাতাসে ভর করিয়া নানা দুষ্টু জিন পরী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই-ইত ভদ্রলোকের মেয়েদের হিষ্টিরিয়ার বেরাম হয়।"

হরি পথে গায়িত—

"তাঁরা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল।"

[৪]

পাড়ার গণেশ আসিয়া ডাকিল—"হরিদা?—ও হরিদা—কি কর—" বলিতে বলিতে সে আঙ্গিনায় উঠিয়া আসিল।

হরি তখন তুলসী তলায় ধূপ দীপ দিয়া একমনে নাম জপিতে ছিল—কোন উত্তর দিল না। গণেশ আসিয়া তুলসী তলায় গড় করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

আপন কার্য্য শেষ করিয়া হরি গণেশকে লইয়া ঘরে গিয়া বসিল।

গণেশ কহিল "এখন কি কর্‌বে দাদা?"

"কি আর করব—তুমি বস খানিকটা গল্প গুজব করি বা কীর্ত্তন গাই! রামায়ণটাও পড়তে পারি। তার পর যদি মন রোচে চাট্টি চাল চড়াব—আর মাল্‌সী গাইব।"

"আচ্ছা দাদা, তুমি নিত্যি দিন রেঁধে খাও—একটা বিয়ে কর না কেন?"

"দরকার কি?"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গণেশ কহিল—"বল কি দাদা, বিয়ের দরকার নাই?—আশ্চর্য্যি করে দিয়েছ কিন্তু! আচ্ছা একটীবার ভেবে দেখেছ?"

"ভাবি নি—ভাববার মতন কারণও পড়ে নি।"

"আশ্চর্য্য কথা বটে—কোন দিন এটা ভাব নি?"

"একবার ভেবেছিলাম পনর বচ্ছর আগে—যখন মা ছিলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে একবার কথাটা মনে উঠেছিল। সহসা মা চলে গেলেন,—কথাটাও পাথর চাপা রইল। আর মনেও উঠে নি।"

যাক্—একটিবার ভেবে দেখ না কেন?

"কেন ভাই। সখ করে জীবন ভরা একটা নীরস গোলামীর চেয়ে স্বাধীন বন বিহঙ্গের মত গেয়ে দিন কাটিয়ে দিই—এটা কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়?"

"এই গোলামী স্বীকার ক'রেই তো দুনিয়ার জীব বিয়ে করে আস্‌ছে—তাই রীতি।"

"তা দেখেই আমার হুঁস হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা দাদা, বিয়ে না কর—দেখে শুনে একটা কণ্ঠি বদল টদল করে নাও না।—রাঁধা বাড়ার হেঙ্গামাটা একটু বাঁচবে।" গণেশ অনুকূল উত্তরের ভরসায় আশ্বস্ত ভাবে হরির মুখ চাহিল।

হরি তেমনই সরল উত্তর দিল—"ভায়া তোমার মতলব এই—যে একটা মুখবাঁধা বোঝা ঘাড়ে রাখ্‌তেই হবে—তা সেটা সোনায় ভর্ত্তিই হউক আর মাটী ভরাই হৌক—এই তো?"

"তবে মেয়ে মানুষ জন্মায় কেন?"

"অত ভাবি নি দাদা। আমি আমার বিবেচনায় যা আসে—তেমনই ভাবে কাজ করি—যুক্তি তর্কের ধারেও যাই না ; কারণ সেটা আমার ধাতে সয় না।"

"আচ্ছা দাদা, তোমার রামচন্দ্রজী তো সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।" বিজয়ী বীরের মত গণেশ হরির মুখে দৃষ্টি সংযোগ করিল।

হরি দিব্যি সহজ সুরে কহিল—"তাই তো প্রভুর আমার জীবনভরা চক্ষের জল শুকাল না। তাঁর জীবনে কি দুঃখের ওর ছিল রে ভাই?"

গণেশ হতাশ ভাবে কহিল—"নিত্যি দিন রাঁধা, দুঃখু হয় না?"

গণেশের কথা শুনিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—"মেয়েরাও তো রাঁধে।"

গণেশ দুই ঘাট চড়াইয়া কহিল—"মেয়েদের তো সয়—ওইই তো ওদের কাজ। কথায় বলে মেয়ে জন্ম।"

হরি ততক্ষণ গান ধরিয়াছে—

"দিয়ে মায়াবেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে।"

গণেশ মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

[৫]

নিঝুম দুপুর বেলা, মাঠে মানুষ নাই! পশুপক্ষী পাতার আড়ে চুপ—বাহিরে রৌদ্র অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। এ হেন সময় হরি ভাত চড়াইয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটী।
ছুটাছুটি করে ভূমণ্ডল—"

দুয়ারে দাঁড়াইয়া পট্‌লি জিজ্ঞাসা করিল—"কি গেরস্ত, এখনো খাও নাই?"

"এই হলো আর কি।"

পট্‌লি সহানুভূতির সুরে কহিল, এই ভয়ানক গরম, সাম্‌নে আগুন—বাইরে মাটীপোড়া রোদ—এত কষ্ট কি পুরুষের সয়?"

হরি বিস্ময়ের সহিত কহিল—"বলিস্ কি পট্‌লি—আজ খুব গরম বুঝি,—ইস্ সত্যিই তো গা-ময়, ঘাম ঝর্‌ছে।—তা এ সময় রাঁধতে পুরুষের যা কষ্ট মেয়েদেরও ঠিক তেমনি হয়,—না?" এই বলিয়া হরি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পট্‌লির নিটোল গাল দুখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, মেয়েদের ওসব সয়। কারণ মেয়েদের তো এই কাজ। হরি ততক্ষণ ভাতে কাঠি দিয়া ভাত টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছে,—

"আর, বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই।
ফণী ধরে খাই হলাহল।"

পট্‌লি দরজার পাশে পিঠ ঠেকাইয়া এক দৃষ্টিতে হরির ভাতরাঁধা দেখিতেছিল।

হরি একখানা কাল পাথরের থালায় ভাতগুলি ঢালিয়া লইল। পট্‌লি গালে হাত দিয়া কহিল, "একি করেছ,—মাথা না মুণ্ডু। কতকগুলো পুড়ে গেছে কতক গলে গেছে, আর কতকগুলো আধা চাউল। এ নাকি মানুষে খায়?"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে পট্‌লির মুখের দিকে চাহিয়া সহজ সুরে হরি কহিল—"পেটে আগুন থাক্‌লে সব হজম হয় পট্‌লি! আর আমার নিত্যি দিন খেয়ে এ রকমটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"তরকারী কি রাঁধবে।"

"আজ একটু নুন আর তেল মেখেই এইগুলো উঠাব।"

আবার সেই হাসি হাসিয়া হরি বাম হস্তে তেলের তাড়ি নামাইয়া লইল।

পট্‌লি কহিল "তুমি বারান্দায় বাতাসে একটু বসো, আমি এক লহমার মধ্যে খানিকটা তরকারী রেঁধে দিই।" পট্‌লি দু পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

হরি ততক্ষণ ভাতের উপর টাট্‌কা তেল খানিকটা ঢালিয়া নুন লঙ্কা মাখিতে আরম্ভ করিল এবং আনন্দিত মনে বিল্ব প্রমাণ গ্রাস মুখে তুলিয়া দিল।

পট্‌লি বিরক্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

[৬]

তখনো ফরসা হয় নাই। হরি বিছানায় শুইয়া "রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায়" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতেছিল। সহসা বাহিরে পট্‌লি খুব তাড়ার কণ্ঠে ডাকিল—"ও গেরস্ত, গেরস্ত—ওঠো দিকিন শীগ্‌গীর!"

"কে, পট্‌লি?"—রঘুনাথায় নাথায়—

"আরে ওঠোই শীগ্‌গীর! জমিদার বাবুদের বাড়ীর ছোট বউর বায়না আছে, এক্ষুণি যেতে হবে—ওঠো শীগ্‌গীর!

"উঠি—দাঁড়া—" "রামং লক্ষ্মণ পূর্ব্বজং" পাঠ করিয়া হরি ধীরে সুস্থে দরজা খুলিল। পট্‌লি ততক্ষণ গুণ্‌গুণ স্বরে গাইতে ছিল—

"তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা।
ডাকি হে তোমারে।"

"কি পট্‌লি এত ভোরে বেসাতি মাথায় চল্লি কোন দিকে?"

"রায় বাবুদের ছোট বউ যাবেন বাপের বাড়ী! তাঁর ফরমাসি জিনিষগুলি আজই দেবার কথা—তিনি তাড়া দিয়েছেন—তাই।"

"তিন মাইল পথ এই সকাল বেলা যাবি, তোর ঝি কোথা রে?"

"সে খেয়া ঘাটে গিয়ে বসে আছে, চল শীগ্‌গীর।"

হরি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া তুলসী তলা লেপিয়া ফেলিল। তারপর একটু ধূপ জ্বালাইয়া তুলসী প্রণাম করিয়া লগী বৈঠা ঘাড়ে লইল। পট্‌লি আগে আগে গুণগুণ গাইতে গাইতে চলিল—"বড় দয়ার আধার সে কর্ণধার পারের কড়ি চায় না।"

হরি খাইতে বসিয়াছে—দুপুর উৎরে যায়—সহসা পট্‌লি আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। ভিজা কাপড়,—অঞ্চল কোমরে জড়ানো। পিঠে দীর্ঘ কেশদাম বাহিয়া জল ঝরিতেছে। পট্‌লি কাঁপিতেছিল।

বিস্ময়ে শিবনেত্র হইয়া হরি জিজ্ঞাসা কবিল, পট্‌লি নৌকা এ পাড়ে যে—"তুই এলি কি করে?"

"সাঁতার কেটে এসেছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে হরির গলা অবধি কাঠ হইয়া গেল। সুতি নদী সাঁতারে পার হইতে সাহস করে, হরি ছাড়া তেমন ব্যক্তি তো এ তল্লাটে কেউ নাই। "পট্‌লি ভাগ্যিস্ ডুবে মরিস্ নি!"

ডুবে মরার পথেই গিয়েছিলাম। প্রায় আধমাইল ভাঁটিতে উঠেছি। মলেও দুঃখ যেতো না। তোমাকে বলতে বেঁচে এসেছি।"

"এর অর্থ কি পট্‌লি? হয়েছে কি?"

"আমি বাঘের মুখে পড়েছিলাম। দিন রাতের কর্ত্তা, ধর্ম্মের মালীক ঠাকুর আমায় রক্ষা করেছেন! তুমি এখন বিবাহ কর—

"ব্যাপার খানা কি পট্‌লি বাঘ কোথায়।" হরির হাত ভাতেই সংযুক্ত রহিল। তাহার খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"শোন। আজ ক'দিন থেকে রায়দের বাড়ীর ঝি মেঘার মা আমার জিনিস পত্রের ঘনঘন ফরমাস দেয়। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। ছোটবাবু এসে আমার সামনে দাঁড়ান, দর কসাকসি করেন। আজ ছোটবাবুকে দেখিনি। মেঘার মা অনেক বলেকেয়ে আমায় তার বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানে বলে ছোটবাবু নাকি আমার জন্য"—পট্‌লি আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরির চক্ষু গরম হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তারপর তারপর"—

চক্ষু মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় পট্‌লি কহিল "আমি ভাবলাম বড়লোকের বাড়ীর কথা—বিপদ ঘটতে বেশী সময় লাগবে না। তাই তাড়াতাড়ি মেঘার মার বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। কদমতলার জঙ্গলের ধারে এসে দেখি ছোটবাবুর ঘোড়া নিয়ে একজন দাঁড়ালো। আমার গাঁ কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি সেই পথ ছেড়ে সাহাপুরের পথ ধর্লাম। হঠাৎ চেয়ে দিখি জঙ্গলের ধারে ছোটবাবু আর দুটা পেয়াদা। বাবুর হাতে বন্দুক। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছেন। পেয়াদা দুটা আমার দিকে আস্‌তে লাগল। আমি তখনি প্রাণপণে ছুট্‌তে ছুট্‌তে নদীতীরে এসেছি। আমার জ্ঞান ছিল না। জানি না কোথায় সেই বেসাতি কোথায় বুড়ীটা।"

হরি গর্জ্জন করিয়া কহিল "দেশে এ পাপও ঢুকেছে—উচ্ছন্ন যাবেরে সব উচ্ছন্ন যাবে। এ পাপ তো দুনিয়া সয় না! হাঁ—তারপর?"

"তারপর নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে এসেছি। ভাবলাম তোমায় ব'লে এর বিচার করাব। আমি জানি তুমি লাঠী ধর্‌লে এ দেশে এমন লেঠেল নাই যে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়। তুমি যাও—ইতরের বিচার কর।"

হরি উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্ক ভাবে পাতের ভাতগুলি কুকুরের সামনে মেলিয়া দিয়া আঁচাইতে গেল। একাকী কি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল মধ্যে মধ্যে "ছোটবাবু বড় পাপ—সাবধান" শোনা গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া—লগী বৈঠা লইয়া হরি নৌকায় গেল। তাহার মেজাজ ক্রমে একটু নরম হইয়া আসিল। অপরাহ্নে হরি বৈঠায় মাথা রাখিয়া অলস কণ্ঠে গায়িল,

"হরি তুমি বিচারের মালীক
আমি শুধু দেখব লীলাখেলা।"

পরদিন পট্‌লী যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌লে তবে ঐ পশুটার বিচারের?"

"কি আর করব?"

"একদিন রাতে কেন ওর বাড়ী লুট করে মাথা ভেঙ্গে দাও না। না হয় যেমন তোমার মতলব ঠাহর হয় তাই কর।"

"আমি কেন পট্‌লি বিচার করে নিজে আর একজনের বিচারের অধীন হতে যাব? বিচার কর্ত্তা ভগবান ছোটবাবুর বিচার কর্ব্বেন—তিনি অতবড় রাজ্যেশ্বর—রাবণের পর্য্যন্ত বিচার করেছিলেন।"

[৭]

পাড়ায় গুরুদেব আসিয়াছেন। বিকাল বেলায় বাগ্দীরা মেয়ে পুরুষে জমায়েৎ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে কত কাহিনী শুনে। রাম রাবণের কথা, রাধাকৃষ্ণের বৃত্তান্ত, অভিমন্যুর বীরত্ব—কত গল্প তাহারা শুনিয়া আনন্দ ও পুণ্য লাভ করে! বাগ্দীরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। দুই একজন মাত্র ছেলে বেলায় বাবাজী ঠাকুরের আখড়ায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হরিই ছিল সেরা পড়ো। সে রামায়ণ পর্য্যন্ত সুরকরিয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু নদী পার হইতে লোকের দুঃখ দেখিয়া হরি প্রায় সারাদিনের নৌকায় কাটাইত। কাজেই তাহার মুখে রামায়ণ শোনা কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটিত, গুরুদেব আসায় পাড়ার পিপাসু নরনারী কত পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাইতেছে। তাহাদের আনন্দের আজ ওর নাই!

সেদিন সকালবেলা পরাণমগুলের আঙ্গিনায় সকলেই গুরুদেবের "ছিচরণ" দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে। পুরুষরা গুরুদেবের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়াছে, মেয়েরা কেহ রোয়াকে, কেহ বেড়ার সাম্‌নে বা পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এদের তেমন আব্রুর আটকা নাই! ঘরের মেয়েরা পুরুষদের অনতিদূরেই বসিয়া পুণ্যকথা শুনিবার জন্য আকিঞ্চন করিতেছে।

এমন সময় হরি ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"কে, হরি" এসো এসো বসো ; তা ঘর সংসার করেছ—না তেমনই আছ?"

নাথু সর্দ্দার কহিল আজ্ঞে কর্ত্তা ঐ আমাদের দুঃখ। গাঁয়ের মাঝে ঐ একটা মানুষ তার কি দুর্ম্মতি হলো, বিয়েথা কর্লে না ; তবে কর্ত্তা ধূলো দিয়েছেন আপনাগোর আজ্ঞা কেউ না শুনে তো পার্ব্বে না—"

গুরুঠাকুর হরিকে ঘর সংসার করিতে আদেশ দিলেন, ভাল পাত্রী দেখার ভার পাড়ার "মাথা উঁচা" সর্দ্দারগণ গ্রহণ করিল। কিন্তু হরি যোড় হাতে মিনতির সুরে কহিল "দোহাই কর্ত্তার শ্রীচরণের। আমি বেশ আছি, আমার সুখ শান্তি নষ্ট কর্‌বার আজ্ঞা কর্‌বেন না।

আমার দুঃখের বোঝা বইবার মুটে বানাবেন না। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্‌ব না স্পষ্ট বলে দিলাম কর্ত্তা দোহাই।"

পাড়ায় মেয়ে পুরুষ অনেকেই হৈ চৈ করিয়া উঠিল! আ সর্ব্বনাশ গুরুবাক্য।

হরি সকলকেই মিনতি জানাইল। গুরুর পায়ে কত নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ তাহার কাতর প্রার্থনার কর্ণপাতও করিল না। ঠাকুর আজ্ঞা করিলেন "চতুর্থ দিনে বিবাহের লগ্ন আছে, তোমরা মেয়ে দেখ, আমি বিবাহ দিয়ে তবে যাব।" সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

হরি অগত্যা রুখিয়া দাঁড়াইল। সে দৃঢ়স্বরে কহিল "সেকি কথা! আমার স্বাধীনতার ভার তোমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছ কেন গো! আমি স্বয়ং রামচন্দ্রজীর হুকুমেও আমার কথার অন্যথা করতে রাজী নই—"

গুরুদেব কয়েকঘাট নামিয়া হরিকে বিবাহের আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় পাড়ার একদল মেয়ে বৌ ঝি আসিয়া ঠাকুরের পায়ে গড় করিয়া তফাৎ দাঁড়াইল। এই দলে ছিল পট্‌লি।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিধবা মেয়েটী কার রে—

ভোলা যোড় হাতে নিবেদন করিল—"কর্ত্তা এটী পরাণমণ্ডলের মেয়ে।" দশ বছরে নগাঁয়ের সাধু সর্দ্দারের ছেলে মাধুর সাথে ওর বিয়ে হয়, দুমাস না যেতে যেতেই তার কপাল পুড়ে গেল! আজ আট বছর ধরে মেয়েটা—আঃ কি কষ্ট কর্ত্তা! মেয়েটা কণ্ঠি বদলও কর্লে না আবার বিয়েও কর্লে না—"

গুরুজী আনন্দে কহিলেন, বেশ এক কাজ কর। দেখে শুনে মেয়েটীর বিয়ে দাও। তোমাদের তো বিধবার বিয়ে হচ্ছেই। আহা মেয়ে তো নয় যেন মা দুর্গা। রাজার ঘরে জন্মালে ঠিক হতো। আয় তো মা আমার কাছে—"

পট্‌লি আবার আসিয়া গুরুদেবের পায়ে প্রণিপাত করিল। গুরুজী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন "মা ভগবানের কৃপায় তোর দুঃখ দূর হোক আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—"

পট্‌লি নতমুখে দাঁড়াইয়া কাপড়ের যে স্থানটা হাতে উঠিল—তাহাই পাকাইতে লাগিল।

গুরুজী সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওহে একটা কাজ কেন কর না—হরির সঙ্গেই তো পট্‌লির সম্বন্ধ হতে পারে। বাঃ বেশ হবে। সোণায় সোহাগা—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! যেমন বর তেমনি মেয়ে।"

পট্‌লির মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। সে ধীর পদক্ষেপে কোথায় সরিয়া গেল। উপস্থিত জনগণ একবাক্যে। গুরুজীর প্রস্তাব সমর্থন করিল। পরাণ মণ্ডলকে গুরুজী মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরাণ জোড়হাতে কহিল "—কর্ত্তা, হরি আমার ছেলের মত। তাকে মেয়ে দিতে আর কথা কি? আপনি দিন করুন,—আমি হরিকে মেয়ে দিব। কেমন হরি—"

হরি যে কোন সময় উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

[৮]

সেদিন সবাই। নিত্যকার মত বেসাতি লইয়া গ্রামে গেল। গেল না কেবল পট্‌লি। তার মনটা আজ ভাল ছিল না। সে তার সইয়ের ঘরে মুট্‌কা মারিয়া পাড়য়া রহিল।

গুরুদেব বাড়ী ফিরিবার পথে হরির নৌকায় অনেকক্ষণ বসিলেন। হরিকে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন,—"বাপু, তোমরা শিষ্য—তোমরাই আমাদের ভরসা। তোমরাই

আমাদের সম্পত্তি তোমরা বিয়ে কর্লে দুটা পয়সা আমাদের হয়—তোমাদের বংশ থাক্‌লে আমাদের আশা—বুঝলে বাপু—"

হরি মাথা নোয়াইয়া নৌকা বাহিতেছিল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন! ঠাকুরজী অপর পারে গিয়াও নৌকায় বসিয়া হরিকে বৃথা সাধ্য সাধনা করিতেছেন। এমন সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গান ধরিলেন—

"বৃন্দাবনের ধুলোয় কবে গড়াগড়ি দিব—
ব্রজের রজে লেপি অঙ্গ
যমের আশা করব ভঙ্গ
শ্যাম ত্রিভঙ্গে দিবানিশি মহানন্দে নেহারিব।"

হরি কহিল—কর্ত্তা ও পারে লোক দাঁড়াইয়া—ওঁকে পার কর্ত্তে হবে। অগত্যা গুরুজী নামিয়া গেলেন। হরি যেন অন্ধকার কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুক্তির আনন্দে নিশ্বাস ফেলিল।

বাবাজী নৌকায় উঠিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"পরে হবে রে ঘোর অন্ধকার
আয় কে যাবি ভব নদীর পার—
ওরে দিন থাকিতে চল সে পথে
করিগে পায়ের যোগাড়"

হরি কথা কহিল না—বাবাজী পার হইয়া গেলেন।

পট্‌লি দুই চার বার জল লইতে আসিয়াছিল, বড় অন্যমনস্ক। কাহারো সহিত কথাটীও কহে নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিল,—হরি আজ দুপুরে বাড়ী যায় নাই,—রাঁধাবাড়া হয় নাই,—সুতরাং আহারাদিও ঘটে নাই। পট্‌লির গা জ্বালা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হরি বাড়ী গিয়া তুলসীতলার কাজ সারিয়া দীপ নিবাইল পট্‌লি তাহার সই তুফানীর ঘরে বসিয়া দেখিল হরির ঘরে আলো নাই। তখন সে সইকে ধরিয়া পড়িল—"সই, মানুষটা সারাদিন উপোসী—বোধ হয় কিছু খাবে না। তুই যা কিছু খাবার দিয়ে আয় না।"

তুফানী সকালবেলার ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল ;—সে পট্‌লির গালা টিপিয়া দিয়া কহিল—"ইস্ ভারী দরদ দেখছি যে! কথায় বলে যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

পট্‌লি তুফানীকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—"তুই মর্—বাঁদী।"

"তাতে তোর লাভ লোকসান কি? আর আমি মলে তোর মনের ঠাকুরকে খাবার দিয়ে আস্‌বে কে?"

"যাঃ—"

"যাব—যাব—যাব—ত্রিসত্যি কর্লাম। বাপরে—একটু তর সইছে না। যাব তো, কিন্তু ওযে খাবে তার প্রমাণ? খাবারই বা কি নিয়ে যাব?"

"তোর ঘরে চিড়ে টিড়ে নেই কি"।

"হাঁ, চিড়ে আছে আর একছড়া মোটা কলা আছে—তাই নিয়ে যাই। কিন্তু খাবে কি।"

গিয়ে বলিস—"ওগো তোমার তুলসী দেবতার মানস এনেছি—নিবেদন করে দাও।" নিবেদন হয়ে গেলে বলো "প্রসাদ লও,—সে ফেল্‌তে পারবে না।"

তুফানী কলসী হইতে চিড়া বাহির করিতে করিতে কহিল" তোর এত বুদ্ধিও যোগায়? আচ্ছা সই চল্ না, তুইও খাবি।"

"না, আমি ওদের বাড়ী রাতকাল কেন যাব? তুই যা। আমায় হয় তো এক্ষুণি মা ডাকবে।"

তুফানী সের তিনেক চিড়া আর গণ্ডা পাঁচেক কলা লইয়া হরির আঙ্গিনায় গিয়া ডাকিল—"দাদা ও দাদা—ঘুমিয়েছ না কি?"

"কে রে—তুফানী?" হরির স্বর একটু ভার ভার।

"হ্যাঁ দাদা, প্রদীপটা জ্বাল তো দেখি।"

"কেন রে?"

"আর কেন? আজ তোমার তুলসী তলায় কিছু মানত ছিল,—সেটা ভুলেই গেছিলাম। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখ্লাম কি—ইস্ এখনো গা কাঁটা দিয়ে উঠে—"

হরি চক্‌মকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বাহিরে আসিল। তুফাণী তুলসী তলায় চিড়া কলা রাখিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

হরি নিবেদন করিলে তুফাণী এক চিম্‌টী চিড়া কপালে ছোঁয়াইয়া কহিল "দাদা, তুমি তুলসীর প্রসাদ গ্রহণ কর,—আমি চল্লাম্।"

"তুফাণী—তুফাণী—" তুফাণী ততক্ষণ ঘরে চলিয়া গিয়াছে। পট্‌লিও ঘরে গিয়া নিশ্চিন্তে শয়ন করিল।

[৯]

পরদিনও বেলা আড়াই প্রহর উৎরে গেল, হরি ঘাটে নৌকার বসিয়া ভাঙ্গা সুরে টানিতেছে—

"আর কি ছার মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না"

পট্‌লি দু'দিন বেসাতি নিয়া গাঁয় যায় নাই,—তার শরীর নাকি ভাল নয়। কিন্তু দশবার ঘাটে জল নিতে আসিয়াছে। হরির মধুর কণ্ঠ আজ ধরা ধরা—শুনিয়া পট্‌লির কষ্ট হইল। খানিক এদিক সেদিক করিয়া দু একবার কাশিয়া পট্‌লি কহিল—"বলি আজ কি খাওয়া দাওয়া নাই,—বেলা যে যায়।"

"বেলা যায়?—অ্যাঁ—কি বল্‌লি পট্‌লি বেলা যায়? এতক্ষণ আমার হুঁস ছিল না—তুই বড় সময় মত এসেছিস্—হাঁ আমিও তৈরি হয়ে নি—বেলা যায় এ খেয়াল তো আমার ছিল না—! এখুনি যাচ্ছি—কি কর্‌তে পারি দেখি গিয়ে!"

পট্‌লি কথাগুলো শুনিয়া অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল। হরি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল—যাহারা পারে গিয়াছে, তাহাদের আবার আনিতে হইবে তো?

পট্‌লি সন্ধ্যা বেলায় জল নিতে আসিয়া শুনিল, হরি গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল—

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন,
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন"

পট্‌লি কলসীতে জল লইতে লইতে কহিল,—"বাড়ী যাবে না?"

"হাঁ—যাব—" হরি ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিল। পট্‌লি আগে আগে যাইতেছিল—সে শুনিতে পাইল হরি উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছ,—

"আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ তায়—
ভুলিয়ে মোহমায়ায়—হারায়েছ—তত্ত্বজ্ঞান।"

পট্‌লি আঙ্গুল মট্‌কাইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল ঐ মড়া বাবাজীটা এই সব বাজে গান শিখায়। যত কুজ্ঞান—ঐ মড়ারই পরামর্শ।

রাত্রিতে হরি পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বেড়াইয়া গল্প করিয়া আসিল। গণেশ কহিল—"হরিদা, আজ তো তোমার সেই হাসিটা দেখ্‌ছি না।" হরি কোন উত্তর দিল না।"

পরদিন সকালে সকলেই শুনিল হরি গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহার দরজার বেড়ায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল, মোটা মোটা হরপে লিখিয়া হরি তাহার যা কিছু গুরুদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে।

পট্‌লি তুফানীর বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল দেখিয়া তুফানী বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। পট্‌লি ঠোঁট উল্টাইয়া ভাঙ্গাসুরে কহিল মড়া বৃন্দাবনে গেছে ঠিক। আর যেন কারো সেখানে যাবার সাধ হ'তে নাই। মড়া যাবি তা আর যে যে যেতে চায় তাদের নিয়েই যা—

ক্রমে প্রকাশ পাইল হরি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। শুনিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী গান ধরিলেন,—

"আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
যারা, পিছে এল আগে গেল, আমি রৈলাম পড়ে।"

[১০]

কৃষ্ণদাস বাবাজী আর গুরুজীর সঙ্গে গাঁয়ের অনেক স্ত্রী পুরুষ বৃন্দাবনে চলিয়াছে। নকড়ি, পরাণ, সাধুর মা, গুণী, তুফানী,—পট্‌লি সবাই বৃন্দাবনের পথে। কৃষ্ণদাস বাবাজী মনের আনন্দে মধুর হরি নামকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অসংখ্য যাত্রী বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছে।

যমুনার তীরে তীরে অগণিত চটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীরা—সেই সকল চটীতে বাসা করিয়া রহিয়াছে। স্নান, দান, গান, গল্প কোলাহলের অবধি নাই।

বিকাল বেলা পট্‌লি আর তুফানী এই সকল চটীর যাত্রীদের মধ্যে বেড়াইতেছিল। তুফানী নানা গল্প হাস্য পরিহাস করিয়া পট্‌লিকে মধ্যে মধ্যে চিম্‌টী কাটা কথাও বলিতেছিল। পট্‌লি একটু চিন্তান্বিতা একটু গম্ভীর। তুফানী কহিল—"সে বৃন্দাবনে কোথাও আছে, এসেছে আট দশদিন আগে,—

"ওগো ওদিকে যেওনা—ওলাউঠা গো—নিশ্চয় ওলাউঠা! আহা কোন্ অভাগীর পুত গো ; না জানি কোন অভাগীর সোয়ামী! অমন সোনার বরণ যেন কেমন হয়ে গেছে।—সঙ্গে কেউ নেই গো—"

পট্‌লি কান পাতিয়া কথাগুলো শুনিল। তার বুকের হাড়গুলি যেন খড়্ খড়্ করিয়া নড়িয়া উঠিল—দম আট্‌কিয়া আসিল। তার ইচ্ছা হইল,—তুফানীর সঙ্গ ছাড়িয়া একবার লোকটাকে দেখিয়া আসে।

সেই জনসমুদ্রের মধ্যে পট্‌লির আশাপূর্ণ হতে বিলম্ব হইল না। সে কোমরে আঁচল জড়াইয়া—আকুল আগ্রহে সেই কলেরাক্রান্ত রোগীর চটীতে প্রবেশ করিল। তখন রোগী অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছে, পট্‌লি বাহুবেষ্টনে আপন বুক বাঁধিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল

বড় যোগাড় যন্ত্র করিয়া পট্‌লি গুটী ত্রিশেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একটা খাট্‌লী আর একজন চিকিৎসক সংগ্রহ করিয়া আনিল। তারপর অনন্য কর্ম্মা হইয়া রোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিল।

এদিকে চটীতে চটীতে কলেরা লাগিল।—কে কার সন্ধান লয়।—পট্‌লি রোগীর ঘরে বসিয়া আছে। পরাণ অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া আছাড় পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সকলে দেশে যাত্রা করিল। তুফানী দেশে গিয়া কহিল—যে ভয়ানক মারী লেগেছিল। ওর মধ্যেই পট্‌লি মরে গেছে।

হরি আরোগ্য লাভ করিল। কে তাহাকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিয়াছে,—তাহা সে জানিল না। কে তাহাকে বৃন্দাবনে, এই কোঠায় এই বিছানায় আনিয়াছে, কে তাহাকে পথ্য দিতেছে—কিছুই জানিল না। একটা কথা শুধু তাহার মনে পড়ে,—কে যেন তাহার মরণশয্যার পাশে বসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিত "শ্যাম ত্রিভঙ্গ না দেখে তুমি মরবে না।" সেই কণ্ঠ যেন পট্‌লির।

[১১]

"বাবাজী! ও বাবাজী!"

"কা'কে ডাক্‌ছেন?"

"আপনাকে।"

"আমাকে? আমি তো বাবাজী নই—তাই উত্তর দিতে গৌণ করেছি। মাফ করবেন। কেন ডাক্‌ছেন আমাকে?"

"এই পাশের ঘরে একটী মেয়ে মানুষ রুগ্না সে আপনাকে একটীবার দেখ্‌তে চায়।"

"আমাকে? আপনি ভুল কর্‌ছেন বাবু।"

"ভুল করিনি গো—ভুল করিনি। উনি আপনাকেই ডাকছেন। আসুন একটীবার—লোক্‌টা মরতে যাচ্ছে"—

"শ্রীহরি শ্রীহরি—দেখুন মহাশয়, আমায় মাপ করুন আমি যেতে পার্ব্ব না—আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।"

"সাধু পুরুষ, আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু শ্যাম ত্রিভঙ্গ তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন না। পথে চটীতে যখন বিসূচিকায় মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েছিলে, তখন কে অনিদ্রায় অনাহারে দিন রাত্রি তোমার শুশ্রূষা করেছিল? কার অর্থে তোমার ঔষধ পথ্য চলেছিল? কার অর্থে মানুষ তোমায় মাথায় করে এখানে এনে রেখেছে? কার অর্থে এখানে তোমার খরচ চল্‌ছে? সাধু পুরুষ, অনিয়মের সঙ্গে যুদ্ধ করে সপ্তাহ পরে সেই করুণারূপিনী মা আমার মৃত্যু শয্যায়! আজ তুমি তাকে একটী বার দেখা দিতেও রাজী নও, আশ্চর্য্য! তোমার এক এক খানা হাড় খুলে দিলেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আজ দুদিন শ্যাম ত্রিভঙ্গ দেখে জীবন সার্থক কর্‌ছ কার প্রসাদে? আমি তোমার চিকিৎসা করেছিলাম, বুঝেছিলাম করুণাময়ী মা তোমার কেউ হবেন। পরে জান্‌লাম তিনি তোমার কেউ নন! আমার চোখের ঠুলি খুলে গেল। ত্রিশ বৎসর চিকিৎসা করেছি,—অর্থ উপার্জ্জন ঢের করেছি,—এ পুণ্য দৃশ্য দেখে আমি নূতন মানুষ হয়ে তাকে মা বলে ডেকে পবিত্র হয়ে গেছি। আজ দু সপ্তাহ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মাকে বাঁচাতে পার্লাম না। আজ দু সপ্তাহ প্রতি মুহূর্ত্ত মা তোমার সংবাদ শুন্‌ছেন। তুমি নিজে হেঁটে গোবিন্দজী দর্শন করেছ শুনে হেসে এক আনন্দের নিশ্বাস ত্যাগ কর্লেন। তার পর হতেই তাঁর জীবনী শক্তি কমে আস্‌ছে। সাধু পুরুষ—সেই মাকে দেখা দিতে তোমার আপত্তি?—"

হরি কুণ্ঠিত হইয়া যোড়হাতে কহিল, "অপরাধ করেছি মহাশয়, চলুন তাঁকে দেখে আসি।

"আপনি আমার জীবন দিয়েছেন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করেছেন, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি—একটীবার চক্ষু—"

রুগ্না চক্ষু মেলিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল "তোমার পা তুলে আমার মাথায় ঠেকাও—"

হরি জিভকাটিয়া কহিল এমন আদেশ কর্‌বেন না। আপনি হয়ত আমায় জানেন না। আমি জাতিতে বাগ্দী।

"আমার চিন্‌লেনা আমি পটলি। দাও আমার মাথায় তোমায় পা, তুমি আমার উপাস্য দেবতা—দাও তোমার চরণামৃত—একবিন্দু, প্রাণ শীতল করি।"

"পট্‌লি! তুই আমার জীবন দান করে আজ নিজে মর্‌তে পড়েছিস্‌। একটু থাক্‌—আমার ঘরে গোবিন্দজীর নির্ম্মাল্য, চরণামৃত আছে এনে দিচ্ছি।"

পট্‌লি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। খানিক পরে হরি চরণামৃত আনিল পট্‌লির মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল "পট্‌লি এমন অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে তোর অন্তর পরিপূর্ণ ছিল? পট্‌লি অন্ধের জননীর মত তুই যে চিরদিনই আমায় সজাগ পাহারা দিয়ে আস্‌ছিস্‌ তা আজ বুঝতে পেরেছি। মার কথা মনে বড় পড়ে না! আজ মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তোকে মা বলে ডাক্‌ছি মা—মা—"

পট্‌লি চক্ষু মুদিয়া শুনিল—তারপর কহিল "দাও গোবিন্দজীর চরণামৃত আমার মুখে! খেয়ানী হরি, আজীবন সকাল সন্ধ্যায় খেয়া নৌকায় নদী পার করে দিয়েছো, আজো আমায় পার করে দিচ্ছ। আজীবন তোমার অনুসরণ করে চলেছি! গুরু তুমি আমার! গুরু, আজ বড় আনন্দ বড় শান্তি। এখন নামগান একবার শোনাও যা পথের শেষ পর্য্যন্ত নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়।"

হরি পট্‌লির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া প্রেমানন্দে গাইল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

চিকিৎসক হরিকে ডাকিয়া কহিল, "উঠুন, মা চলে গেছেন।" সম্মুখের পথদিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন—

"এই হরিনাম নিদান ঔষধি
এতে হরে কালভয়, হবি পার ভব জলধি।"

আশ্বিন, ১৩২৮

মৃণ্ময়ী

হেমন্তকুমার সরকার

[১]

ডিনারের পর ড্রইং রুমে বসিয়া মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ীতে নানারকম গল্পগুজব চলিতেছে। ইউজেনিস্‌ক হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেলের dialectic পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতেছিল। বিলাত না গেলে যে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না সমস্ত আলোচনার পর সকলেই একবাক্যে এই সিদ্ধাতে উপনীত হইল্লেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ ঋতেন বাবু। ভদ্রলোক এদেশের ইউনিভার্সিটির এম, এ, হইলেও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তাঁহার ছিল না। আর তিনি যত বড়ই বিদ্বান হোন না কেন—সেদিন সবার সামনে এমন একটা accent ভুল উচ্চারণ করিলেন যে না হাসিয়া কেহই থাকিতে পারে নাই। তারপর ঋতেন বাবুর স্থানাস্থান জ্ঞান নাই, একদিন পাখানি একবারে ন্যাংটা ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের partyতে এসে হাজির—আমরা তো লজ্জায় মরে গেলাম। আমাদের অন্যান্য—young lady friends কি মনে করলেন জানি না—তবে আমাদের সঙ্গে যেন পরিচয়ই নাই এইরূপ ভাব দেখিয়ে কোন রকমে সে দিন মান রক্ষা করি।

[২]

পর দিন সকাল বেলা ৯টার সময় সকলে চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। আজ এত কাজ—মিস্ মুখার্জ্জির Engagement ceremony—তাই সকলেই একটু সকালে উঠিয়াছেন। ছেলেটি বিলাতে পড়িত। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। আর যখন বিলাতের পাশ, তখন বিশেষ দেখিবারই বা কি আছে। মুখার্জ্জি সাহেবের নগদ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা—একমাত্র কন্যা। এই সংবাদ পাইয়াই বিলেতী নারীর প্রতি প্রেম হঠাৎ স্বদেশ অভিমুখী হইয়া মিঃ বানার্জ্জিকে এখানে আনিয়াছে। আচার্য্য আসিয়া প্রার্থনা করিয়া গেলেন—নবীন প্রেমিকযুগলের মঙ্গলকামনা করা হইল। অঙ্গুরীয় দানও হইয়া গেল!

[৩]

আজ বিজয়াদশমী। মিঃ বানার্জ্জি মিস্ মুখার্জ্জির সহিত রাত দশটার সময় ড্রাইভের পর বাড়ী ফিরিলেন। ঋতেন বসিয়াছিল। মিস্ মুখার্জ্জি ঋতেনকে নমস্কার করিয়া একটা শিকার পাওয়া গিয়াছে, খানিকটা সময় আমোদে কাটানো যাইবে—মনে করিয়া বড় খুসী হইয়া তাহাকে একটী ১৮৲ টাকা ডজনের সিগারেট offer করিলেন। ঋতেন সিগারেট খাইত না। ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক—সে মেয়ে লোকের সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মিঃ বানার্জ্জি হো হো করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, "ঋতেন বাবু বোধ হয় shocked হ'য়ে গেছেন আমাদের বিলেতে কিন্তু অহরহ এই কাণ্ডটাই ঘটছে—আপনি তো সেখানে গেলে মূর্চ্ছিত হ'য়েই মারা যেতেন।" ঋতেন আর কোন কিছু না বলিয়া লিলি মুখার্জ্জি ও তাহার প্রণয়ীর কাণ্ড দেখিয়া আর আসিব না মনে করিয়া উঠিতে যাইতেছিল।

মিস্ মুখার্জ্জি একটু অপ্রস্তুত গোচের হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঋতেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন--আমি একটু রহস্য করছিলাম, আপনি বুঝলেন না। বসুন এক কাপ কফি খেয়ে যান।" গ্রীষ্মকালে রাত দশটার সময় ভাত খাওয়ার পর এক পেয়ালা কফি খাওয়া একটা নতুন জিনিষ মনে করিয়া ঋতেন বসিল। Boy—কে ডাকা হইল। একটি দীর্ঘশ্মশ্রু ৪৫ বৎসর বয়স্ক বৃহদাকার পাঠান আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কফির হুকুম দেওয়া হইল। সে একটু পরেই কফি আনিয়া লিলি বাবার সামনে ধরিল।

লিলি বলিল—আজ ঋতেন বাবুদের বাংলা কবিতার একটু আলোচনা করা যাক। বিজয়া দশমীর দিন—ঋতেন এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়াছিল। তাহা হইতে ব্যর্থ-বোধন বলিয়া একটা কবিতা পড়িল। তাহার শেষ লাইনটি—"চিন্ময়ী থাক চিত্তের তলে মৃণ্ময়ীরূপে এস না আজ।"

কবিতা পড়া শেষ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঋতেন বাবু সব তো বুঝলাম মৃণ্ময়ীর বাংলাটা কি হ'ল? ঋতেন বল্‌ল আপনিই বলুন না কেন। লিলি ভাবিলেন আমার ডাক নাম লিলি, কিন্তু ভাল নাম মৃণ্ময়ী, অতএব চেঁচাইয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়ী মানে Lotus—" ঋতেন হো হো করিয়া হাসিয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিল।

বিবাহের কয়েকদিন পরেই লিলি সূতিকাজ্বরে আক্রান্ত হয়। তাহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়াছে। সে রূপলাবণ্য কোথায় গিয়াছে। যৌবনের ফুল্লশ্রী আজ বিষাদের কালিমায় লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রায় সব সময়েই শয্যাগত থাকে। মিঃ বানার্জ্জি টাকাগুলি হস্তগত হওয়ার পর বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। সেখানেই একটি সঙ্গিনী খুঁজিয়া লইয়া বসবাসের আয়োজন করিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জির মৃত্যুর পর হইতে ঋতেনই লিলির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে জীবনে বিবাহ করে নাই—লিলিকে যখন চাহিয়াছিল পায় নাই আজ তাহাকে এক প্রকারে পাইয়া কতকটা তাহার মন শান্ত হইয়াছিল। সে অবাক হইয়া ভাবিত মিঃ বানার্জ্জির ব্যবহারের কথা—একদিন লিলির কাছে হাঁসিয়া বলিতেছিল, তোমাদের সমাজের সবই উল্টো যে কারণে অত বড় দাড়িওয়ালা পাঠানটা হ'ল Boy আর তোমার মত সুন্দরী যুবতী হ'ল "বাবা"—সেই কারণেই বোধ হয় আজ তোমার এমন অবস্থা।

পৌষ, ১৩২৮

নারীর ভাগ্য

প্রফুল্লময়ী দেবী

পিতা তারাকান্ত বাবু পুত্র নিশিকান্তের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আরতো দেরী করা চলে না নিশি, তোমার মার প্যানপেনি দিন দিনই বাড়চে"—

নিশি "রোমান্‌ল" এক খানি টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "কিসের দেরী বাবা!"

শীতকাল। তারাকান্ত বাবু গায়ের কাপড় খানা টানিয়া গায় দিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "আর কিসের দেরী বাবা! মাধুরী যে মস্ত বড় হ'য়ে পড়েছে দেখচো না! এই মাঘ মাসে ১৪ পূর্ণ হ'য়ে পনেরতে পড়বে। বিদেশে আছি তাই রক্ষে, নইলে যে বাড়ন্ত মেয়ে, দেশ হ'লে এদ্দিনে একঘরে কর্‌ত। দাদা তো ফিরেও তাকান না।"

নিশি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যতবড় ভাব্‌চেন বাবা, মাধু ততবড় হয়নি কিন্তু! ওটাতে আমাদের সংস্কারও আছে খানিকটা বার বছরে যদি বিয়ে না দেওয়া গেল, আমরা নিজেরাই মনে করি মেয়েটা যেন হাতী হ'য়ে উঠেছে, পাড়াপড়শী বল্‌বে তাতে আর কথা কি? বেশ পড়ছিল, ইস্কুলও ছাড়িয়ে দিলেন!"

অন্য সময় হইলে পিতা বর্ম্মা সিগার ধরাইয়া এই বিষয় লইয়াই মস্ততর্ক জুড়িয়া দিতেন, এবং যতক্ষণ সেই তর্কের আদিম বস্তু মাধুরী আসিয়া খুল্লতাতকে একরূপ টানিয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ না করাইত, ততক্ষণ তর্ক কিছুতেই থামিত না। কিন্তু আজ আর তিনি তর্কের দিকে না গিয়া বলিলেন, "না, ও বেশ হ'য়েছে! Fourth class এই ইস্কুল ছাড়ান উচিত ছিল। যাক্‌গে যা হ'য়েছে বেশ হয়েছে। অগ্রাণের শেষেই এবার কন্‌কনে শীত পড়েছে। আমারও সর্দ্দি কাশিটা যাচ্ছে না। তা নাহ'লে, বুঝতে পেরেছ নিশি, আমি নিজে গিয়ে সম্বন্ধটা ঠিক করে ফেল্‌তুম।" নিশি বলিল, "অকুলীন যে"! জ্যেঠামহাশয়ের কি পছন্দ হবে?" তারাকান্ত বাবু শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "তাঁর কথা ছেড়ে দাও। গরজ তো তাঁর নয় গরজ আমাদের। আমি বলি একদিন পরে বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হবে। তুমি গিয়ে দেখে শুনে ঠিক করে এস। মাধুরীর সেদিনকার তোলা ফ'টো নিয়ে চলে যাও।" নিশি সোৎসাহে বলিল, "বেশত, আমারও এই Occasionএ ঢাকা বেড়িয়ে আসা হবে। আচ্ছা আমি মার সঙ্গে পরামর্শ করে আসিগে।"

নিশিকান্ত বাড়ীর ভিতর গেল তাঁহার জননী ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া বধূ সুমতির সাহায্যে ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়িগুলি রৌদ্র হইতে ঘরে আনিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখিতেছিলেন। উপরে বসিয়া মাধুরী তাহার পিতা তারাকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদা বাবুকে "মেঘনাদ বধ" কাব্য পড়াইয়া শুনাইতেছিল। বালিকার কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত "মধুসূদনের" মধুর কবিতাবলী নিশিকান্তের কাণে যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। নিশিকান্ত ভাঁড়ারে ঢুকিয়া বলিল, "মা জননী।" মাতা বলিলেন, "কেন বাবা, এখন খেতে দেব? আসন দেওতো বৌমা।"

সুমতি একটু ঘোমটা টানিয়া আসন পাতিয়া দিল। আসনে বসিয়া নিশি বলিল, "না মা জননী, এখন খেতে আসিনি। মাধুরীর বিয়ের পরামর্শ ক'ত্তে এসেছি। এমন মেয়ে জ্যেঠামহাশয় পাড়াগেঁয়ে দোজবরে দিতে চাচ্ছেন।" মা জননী একমুখ হাসিয়া কতগুলি বড়ি কৌটায়

তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এর চেয়ে ভাল কোথায় পাচ্ছ নিশি? কুলীনের ঘরের ভাল বরের যে বড্ড দাম। ২৫ বছ্রের ছেলে তার আর দোজবর কি?" নিশি বলিল, "ঢাকার ছেলেটি মন্দ কি?" মাতা বলিলেন, "মন্দ হবে কেন, সবই তো ভাল। কিন্তু তোমার জ্যেঠামশায়ের যে অকুলীনের বেজায় আপত্তি। শেষ সন্তান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর বিয়ে দিতে পার্‌বে না। মিছি মিছি ঢাকায় গিয়ে কি হবে।" নিশি বলিল, "তাতে, ভাবিয়ে দিলে যে।"

[২]

নিশি যখন দেড় বছরের শিশু তখন গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছিল। দুই বছর বয়সে বিমাতা ওরফে মা জননীকে পাইয়া মায়ের অভাব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিমাতা বলিয়াই হয়ত নিশিকে চিরদিন পুত্রবৎস্নেহ করিতেন। মাতাপুত্রে সংসারের পরামর্শ হইতে College এর strike পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের ও অকাজের কথাবার্ত্তা হইত। নিশিকান্তের জ্যেঠাই মা যখন বহু সন্তানের মধ্যে মাধুরীকে তিন মাসের শিশু রাখিয়া ইহ লোক হইতে বিদায় নিয়াছিলেন, তখন নিশির মা জননী তাহাকে বুকে তুলিয়া নিয়া তাঁহার যে সন্তান হয় নাই সে জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। হায় রে, যে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিতে হয়, তাঁ'র তো তাই নাই তবু মাধুরীকে নানা কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধের অভাব বুঝিতে দেন নাই। অনেক বড় হইয়া মাধুরী বুঝিয়াছে, যে সে কেন "মা"কে বলে "মা" আর "বাবা"কে বলে "কাকা"!

অন্নদা বাবুকে লোকে বলিত, একটু বাতিকের ছিট আছে। বস্তুতঃ সেটা অনেকটা সত্য, তাঁহার উপার্জ্জন যে কত ছিল, তাহা কেহই জানিত না জীবন ভোর পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়া তিনি নিজের ব্যতীত পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন নাই অথচ কোন বদ খেয়ালও ছিল না। পরিবার পালন করা কাজটী ছিল ছোট ভাইটীর। এই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব পরিণতবয়স্ক ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে মনের অথবা মতের কোনই ঐক্য ছিল না। দুইটী মেঘের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাত সচরাচর নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দুজনের দেখা হইলেই বাক্যালাপ ব্যাপারটী কলহে পর্য্যবসিত না হইয়া যাইতই না। ইদানীং অন্নদাবাবু ভ্রাতার উপর রাগ করিয়া বারাসত গিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে বলিত সেটী তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কেন না নিকটে থাকিলেই মাধুর বিয়ের পণের টাকা ভাইটী তাঁহার কাছ থেকে আদায় করিতে কতক্ষণ!

নিশিকান্ত মেদিনীপুরে গিয়া জ্যেঠামহাশয়ের পছন্দসই সেই কুলীন পুত্র সুখময় রায়কে দেখিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল, "এটা তো একরকম ঠিক করে এসেছি, ছেলেটী "সেটেলমেণ্ট" এ ঢুকেছে শীগগিরই "কানুন গো" হবার আশা আছে। কিন্তু দেশে সেই মোটা ভাত কাপড়। ঢাকার ছেলেটী ও শুন্‌লুম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু জ্যেঠামশায়—"

কথা শেষ হইতে না হইতে জ্যেঠামহাশয় মাধুরীকে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকার ছেলেটীর কথা শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। "তোকে পই পই করে বারণ কর্‌চি তারা, তুই মাধুর বিয়েতে সর্দ্দারি কর্‌তে আসিস্‌ না।"

"কে তবে কর্‌বে দাদা, তুমি তো ফিরেও চাওনা মেয়েতো এখন ছোট নয়, সর্দ্দারি কাজেই যে কর্‌তে হয়।"

"আহা হা, "মার পোড়ে না পোড়ে মাসী, ঝালখেয়ে মরে পাড়াপড়শী," এও হ'য়েছে তাই! বড় মেয়েটাকে অকুলীনে বিয়ে দিয়েছিলি, বেশ হ'য়েছে মেয়ে মরে আমার লজ্জা ঘুচিয়েছে।"

তারাকান্ত বাবু শান্তস্বরে বলিলেন, "তাইতো দাদা, রাজার ঘরে তাকে দিয়েছিলেম, ভাগ্যে সইল না! মাধুকে কুলীনে, হাভাত ঘরে দেবে এই তোমার মত? মেয়েটা না খেয়ে মরুক্‌!"

"না খেয়ে মর্‌বে কেন, যত অলক্ষুণে কথা।"

"না খেয়ে মরবে না তো কি! কুলধুয়ে জল খাবে! এত পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন বেনাবনে এই মুক্তো ছড়াই, যেমন মেয়ের ভাগ্যি তেমনি তো বাপের মতি হ'বে।"

"তুই চুপকর্ হাম্বাগ, হতভাগা, আমার মেয়ে, আমি যা খুসী কর্‌ব। আমার সঙ্গে কেউ লাগতে এস না।"

উত্যক্ত হইয়া তারাকান্ত বাবু রুক্ষ্মস্বরেই বলিলেন, "বটে, তা বেশ, আমার বাসায় বসে নয়, বারাসতে গিয়ে যা খুসী করগে, নয়ত দেশের বাড়ী পড়ে আছে।"

অন্নদা বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, "এখনি চল্লুম, দে, আমার মেয়ে দে—"

"মেয়ে যায়তো এখুনি নিয়ে যাও না—"

"মাধু ও মাধু—"

নিশিকান্ত ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চাপিয়া কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের অভিমুখে চলিল "মাধু খেতে বসেছে জ্যেঠামশাই! আপনিও ঝপ্ করে 'চান্' করে নিন্ তারপরে সম্বন্ধের কথা বল্‌ব সব।"

"না এখুনি যাব, তোর বাবা আমাকে গরীব বলেইতো অপমান ক'রেছে। বউমাকে বল্‌গে আমি মাধুকে নিয়ে যাব। তোদের বাড়ীর দাসীবৃত্তি কর্‌তে আর এখেনে রেখে যাব না।"

বলিতে বলিতে, জুতা জামা পরিতে পরিতে ভিতরে গিয়া দেখিলেন, মেয়ে সত্যসত্যই খাইতেছে। নিশির মাতা তা'র পাতে "চিতলের কোল" ভাজা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আস্তে আস্তে খাস্‌রে মাধু, কোর্‌মা নাব্‌ল ব'লে।"

রবিবার; একটু "ভালমন্দ" আহারের ব্যবস্থা হইত। ক্রুদ্ধ জ্যেঠামশায়ের সাড়া পাইয়া বধূ সুমতি তৈল গামছা হাতে লইয়া সম্মুখে আসিল। জুতাজামা একপ্রকার জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল, তিনি একবার মুখে বলিলেন, "না মা না, আমি মাধুকে নিয়ে এখনি চলে যাব"

সুমতি তৈল মাখাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তা বই কি, যাবেন বই কি, মা বল্লেন, আপনি এলেন বলে তিনি নিজে কোর্‌মা আর গল্‌দাচিংড়ি দিয়ে কফি দিয়ে রাঁধ্‌লেন তাড়াতাড়ি 'চান্ করে নিন্, ভাতকটা জুড়িয়ে যাবে নইলে।"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে স্নান আহার শেষ করিয়া উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। তখন ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বুঝাইল "কুলীনের ঘরেই বিয়ে হবে, আপনি মাত্র ১৫০০্ টাকা পণের দরুণ যোগাড় করুন্, আর সব আমরা চালাব।"

দুইটী বৃদ্ধ যে কলহটীকে বর্ষার মেঘের মত নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, ভ্রাতৃবধূ তাঁহার পাক পাত্রের মায়ামন্ত্রের প্রভাবে তাহাকে শারদাকাশের সুশুভ্র অভ্র খণ্ডের মতই লঘু করিয়া গগনপ্রান্তে ভাসাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু বলিয়া গেলেন, "আমি ২/১ দিনের মধ্যেই টাকাটা নিয়ে আসব। ১৪ই মাঘ তো দিন? ঢের দেরী আছে।"

[৩]

অন্নদা বাবু সেই যে পলাইলেন, আর ১৪ই মাঘ বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপেক্ষায় কোন কাজই বাকি ছিল না, কাজেই তিনি সোর গোল করিয়া এঘর ওঘর করিয়া নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতাদের, জানাইতে লাগিলেন, "মাধুর বিয়ের পণের টাকা আমি এনেছি।" কিন্তু নির্জ্জনে ভ্রাতার হাতে ৮০্ টী টাকা দিয়া বলিলেন, "এর বেশী ধার পেলুম না।"

তারাকান্ত বাবু যদিও এই আত্মসর্ব্বস্ব ভ্রাতাটীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন, তথাপি আশা করিয়াছিলেন, এই শেষ সন্তান ও একমাত্র বাৎসল্যের আধার ইহার বিবাহে অন্ততঃ ৩০০্

টাকা দিবেনই। এখন ৮০৲ টী টাকা গুণিয়া দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, একবার মনে হইল, টাকাটা দাদার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলেন, "বেরোও আমার বাড়ী থেকে, আমি একাই মাধুর বিয়ে দেব।" কিন্তু আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরা, বিশেষ এখনও বিবাহ হয় নাই। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া টাকা কয়টী পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও নিশি তোমার জ্যেঠামশাই মাধুর বিয়েতে ভিক্ষে দিয়েছেন, আজ রাখ, কাল ফিরিয়ে দেব।"

অন্নদা বাবু টাকা ভিন্ন আর একটি উপকার ভ্রাতার করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশ হইতে দুইটী বিধবা, জাতি সম্পর্কে খুল্লতাতপত্নীকে মেয়ের বিবাহ দেখাইতে অনেক মাথার দিব্য দিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়াই তারাকান্ত বাবুর প্রদত্ত দানসামগ্রী ও কন্যার অলঙ্কার দেখিয়া নাকসিঁটকাইতে লাগিলেন। "পাগল হউক যাহাই হউক এতগুলো টাকা অন্নদা তারার হাতে দিয়েছে। তারা তো কই দানসামগ্রী তেমন দেয়নি। ৮০০৲ টাকার গয়না দিলেও তো কেমন হ'ত। আহা, মেয়েটার মা নেই, কে কি করে গা? ছোট বউতো ছেলে মানুষ, কি মানুষই ছিল বড় বউ!"

বিবাহের গোলে বিশেষ এই আচার-নিষ্ঠাপরায়ণা নবাগতাদের আহারের আয়োজনে সুমতি ও গৃহিণী নিতান্তই ব্যস্ত ছিলেন। তাই ইত্যাকার টীকা টিপ্পনি শ্রবণ করিয়া তাঁদের কর্ণকুহর তৃপ্ত হইতে পারিল না। কিন্তু তারাকান্ত বাবু আভ্যুদয়িক কর্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিতৈষিণীগণের সুধামাখা বাক্য শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া একবার সমীপবর্ত্তী ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র।

তারাকান্ত বাবু বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় একটি স্কুলে মাষ্টারি করিতেন। তাহাতে মাহিয়ানা ১০০৲ টাকা আর টিউসাঁনি করিয়া ২৫৲ টাকা পাইতেন। ছেলে পড়াইয়া নিজের সংসার চালাইয়া হাতে বড় বেশী কিছু থাকিত না। নিজের মেয়ে নাই তথাপি ভ্রাতুষ্পুত্রীরদিকে চাহিয়া তিনি প্রতি মাসের প্রথমেই ১০৲ টাকা Post officeএ রাখিয়া আসিতেন। মাধুরীকেও তিনি Bethune schoolএর 2nd class পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এখন সেই ৫০০৲ টাকা উঠাইয়া এবং কিছু ধার করিয়া মাধুরীর বিবাহের ক্রুটি হইতে দিলেন না। যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল।

[৪]

বাসি বিবাহের দিন রাত্রে মাধুরী শ্বশুরবাড়ী হরিপুরে আসিয়াছিল। বধূ দেখিয়া শ্বাশুড়ী ও কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ যত তুষ্ট হইয়াছিলেন, শ্বশুরালয় দেখিয়া বেথুন স্কুলের পুরস্কারপ্রাপ্তা ছাত্রী মাধুরীলতা তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ঘোমটার ভিতরে মনে মনে ভাবিতেছিল, "মাগো মা, কাকামণি যেন আমায় বনবাস দিয়ে'ছে। বইতে পড়্তেম, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা" রবি বাবুর পল্লীবাটটী ভাল লাগে। চোখে দেখে, বিশেষ বড় হয়ে থেকে কি ওসব ভাল লাগ্‌দে পারে? বিকেল বেলা বেড়াতে বেরুলে, বাঁশ বাব্‌লা খেজুর গাছের পাতের আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত আভা দেখতে মন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে নাহতে' ওরে বাস্‌রে' কি ভীষণ ঝিঁঝিঁর ডাক। দুত্তোর কবির ঝিল্লিমুখরিত সন্ধ্যা এরচেয়ে কলিকাতার মটরের প্যাঁ পোঁ ট্রামের ঘড়্ ঘড়্ অনেক ভাল।" সে যাত্রায় অল্প কয়েক দিন থাকিয়া বেচারার ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নিশি আসিয়া জামাই সুখময় ও মাধুরীকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সুখময় সেখান হইতে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মাস দেড়েক পরেই মাধুর শ্বশুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া নিশিকান্ত আবার সাশ্রুনয়না মাধুরীকে মায়ের স্নেহের কোল হইতে নিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আসিল। আসিবার সময় সুখময়ের মাকে বলিল, "আপনি এখন মাধুর মা।" অল্প বয়সে মা মরে যাওয়াতে আমরা ওকে ঘরের কাজকর্ম্ম

কিছুই শেখাইনি। আপনি ওকে শিখিয়ে নিবেন। এতদিন লেখাপড়া নিয়ে ছিল কিনা, তাই আমরা, বুঝতে পেরেছেন।" ইত্যাদি।

তিনিও "তা হ'ক শিখিয়ে নেব বইকি বাবা" ইত্যাদি বলিয়া নিশিকে বিদায় দিলেন।

নিশির কথাটি যে শুদ্ধ বিনয় উক্তি নয়, তাহা তিনি দুএক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন। সংসারের দুএকটি কাজ ধীরে ধীরে নববধুর হাতে দিতে লাগিলেন। ঘরে ঝি চাকর ছিল না, তাহার মধ্যমবধূ সুরমা সংসারের সমস্ত কাজই করিত। তাহার কার্য্যনিপুণতা দেখিয়া মাধুরী মনে মনে অবাক হইয়া যাইত। সে দিন সকালবেলা মাধুরীর কনিষ্ঠ দেবর জ্যোতির্ম্ময় মাছের চুবড়িটি মাটিতে রাখিয়া হাঁক ছাড়িল, "মেজবৌদি, জল্‌দি কর বড্ড খিদে পেয়েছে। দেরী হলে আজ আর ভাত খাব না। সুরমা রাঁদিতেছিল। সে মাধুরিকে বলিল, "ছোড়দি ভাই, তাড়াতাড়ি আমাকে দুটো মাছ কুটে দাও না, নইলে ছোট টাকুরপো এসে আজ হাঁড়িকুড়ি চুরমার কর্‌বে।" মাধুরী সে কথা অবিশ্বাস করিল না। সে দেখিতেছিল, দুরন্তপনায় তাহার ননদ দেবরের জুরি মেলা ভার। সে তাড়াতাড়ি মাছ ও বঁটি নিয়া মাছ কুটিতে বসিল। কিন্তু দশ মিনিট ধরিয়া চিন্তা করিয়াও জীবন্ত কইমৎস্য ছেদনের প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিল না। অবশেষে বঁটীর উপর বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে ১০ বছরের বয়সেই "ডাকাত" আখ্যাধারী জ্যোতির্ম্ময় ওরফে "জ্যোতি," ছোট বোন ননীকে লইয়া স্নানের ঘাটের পথে যাইতে যাইতে আর একবার পাকের তাড়া দিতে আসিয়া "নতুনবৌদির" ভাব খানা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল। এক মিনিটেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও মেজবৌদি, মজা দেখবে এস, এসনা এদিকে"! নুতনবৌদি মাছ কাট্‌তে জানে না! লজ্জায় বসে কাঁদ্‌চে, হ'য়েছে মশাই হ'য়েছে, এতো আর class promotion নয়, যে রাত্তির জেগে পড়া মুখস্ত করলেই হ'ল! এতে বিদ্যে লাগে! সত্যি বৌদি, তোমার মহাকালী পাঠশালায় পড়াতে পারেনি। সেখানে নাকি রান্না বান্নাও শেখায়।"

মাধুরী লজ্জায় ঘৃণায় যেন মরিয়া গেল, ছোটমার উপরে যত রাগ হইতে লাগিল। কেন তা'কে আদর করিয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম শেখায় নাই।

এমন করিয়া দিনের পর দিন খোঁচা খাইয়া মিষ্ট অনুযোগ শুনিয়া মাধুরী একে একে সকল কাজই শিখিয়া লইল। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীতে সারা দিনই কাজ, সন্ধ্যার পর আহারান্তে অবসর। সেই সন্ধ্যাটি তাহার কাছে আগে যতই বিভীষিকাময় ছিল এখন অনেক সরস হইয়াছে, কেন না এই "উল্টো রাজার" দেশে সন্ধ্যাবেলায় ডাক আসে। দাদা, বৌদি, ছোটমা, কাকামণি, প্রায় প্রতিদিনই তাহার কাছে পত্র লিখিয়া থাকেন। দিনের কর্ম্মশ্রান্ত দেহমন সন্ধ্যাবেলার সেই অমৃত প্রলেপে যেন জুড়াইয়া দিত। কিন্তু সম্পর্কে ছোট অথচ পূর্ব্বে বিবাহিতা এই 'জা' টির সহিত মাধুরী ভাল করিয়া মিশিতে পারিল না। দেবর সুধাময় পত্নীর কাছে প্রতিদিনই প্রায় সুদীর্ঘ পত্র লিখিত। সে কলিকাতায় থাকিয়া B. A classএ পড়িতেছিল। কিন্তু মাধুরীর কাছে সুখময় পত্রলেখা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। একদিন সুরমা ৫।৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র পাইয়া রান্নাঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, মাধুরী মৃদুহাসিয়া ক্ষুদ্র পরিহাস করিয়া বলিল "বাপরে, ছোড়দি, চিঠিতো নয় এটীযে প্রবন্ধ।"

সুরমা অর্থপূর্ণ বক্রহাসি হাসিয়া বলিল, "হু, প্রবন্ধই বটে। তুমি তার কি বুঝবে ভাই।"

মাধুরীর বুকের ভিতরটা যেন ছাঁত করিয়া উঠিল! বুঝিবেনা! মাধুরী বুঝিবে না! কেন, সেওতো মুর্খ নয়।

সুরমা যেন তাহার গূঢ় অভিমানের ভাবটি বুঝিতে পারিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "লেখাপড়া জানলে কি হয় দিদি, সোয়ামীর সোহাগ পেতে বরাত চাই। নইলে রূপওতো আছে, বিদ্যেয়ও তো শুনি সরস্বতী, তবু বট্‌ঠাকুরের মনে ধরেনি কেন!"

তদবধি, মাধুরী নিজেকে জোর করিয়া সুরমার নির্জ্জনসহবাস হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। অবসরের সময় বরং দেবর ননদের লেখাপড়ার সাহায্যে যাইত, ঠাট্টা শুনিত ঠাট্টা করিত তবু স্বামী সোহাগিনীর সমালোচনার মধ্যে যাইতে চাহিত না। শাশুড়ী যে যখন তখন পাড়া পড়শীর কাছে বড়বধূর "বিদ্যের ব্যাখ্যা" করিতেন, শ্বশুর ও যে বড় বউমার সেবার পক্ষপাতী হইয়া ছিলেন সেটা পল্লীদুহিতা অশিক্ষিতা সুরমার বড় হিংসার কারণ হইয়াছিল।

[৫]

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমকাঁঠালের তত্ত্ব লইয়া অন্নদা বাবু মেয়েকে নিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সুখময়ের আসার কথা ছিল বলিয়া বৃদ্ধ রসিক বাবু বৈবাহিককে একাই ফিরাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু একে রসিক বাবুর বাড়ীতে মেয়েকে দিনরাত কাজ করিতে দেখিয়া চটিয়াছিলেন, তার পরে মেয়ে না পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সুখময় ছুটি পাইল না, সুধাময় ভ্রাতাকে দেখিয়া বাড়ীতে আসিল।

মাধুরী তাহাদের প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়া মাঝে মাঝে বুঝিত, তাহার জীবনে আর সব পাইয়াছে, কিন্তু যে জিনিসটী যে পরশ কাঠিটী পাইলে জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হয়, সব লোহা সোনা হইয়া যায়, সে তাই পায় নাই, তাই সব পাইয়াও সে বঞ্চিতা, সে দুঃখিনী।

দুপুরে সুধাময় শুইয়া "ভূদেবগ্রন্থাবলী"র পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইবার চেষ্টায় ছিল। সুরমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর মুখে দুইটী পান গুঁজিয়া দিয়া পাখা হাতে লইয়া বিছানায় বসিল। "ও! তুমিও ওই ঘোড়ার ডিম পড়চ না আছে গল্প, না আছে কিছু!"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "তুমিও মানে কি আর কেউ পড়ে নাকি"? "পড়ে না আবার? আমাদের মাষ্টারনি পড়েন যে ; তাঁরইতো বই!" "মাষ্টারনি কি রকম?"

"হাঃ হাঃ, তাও জাননা, এদ্দিন এসেছ ছোটদি দুপুরে ঠাকুরপো আর ননীকে পড়ায় কি না, তাই তারা ওকে মাষ্টার বলে।"

"তা তুমি একটু লেখা পড়া শিখলেই পার সুরমা,"

"আমার বয়ে গেছে ছোটদির কাছে শিখতে"

"ছি সুরমা, তুমি জাননা, উনি ভাল লেখাপড়া শিখেচেন! তুমি বোধ হয় ওঁর সঙ্গে ভাল করে মিশে কথা কও না, তাই বৌদি যেন সর্ব্বদা একটু বিষণ্ণ"।

"না গো না, বটঠাকুর মোটেই চিঠি পত্তর লেখেননি কি না, ওতো বিদুষী বিদ্যেভুষিতে, অথচ ৫।৬ পৃষ্ঠা চিঠি আসে মুরুখ্যু আমার কাছে, মানিনীর মানে ঘা লেগেছে বোধ হয়।"

"তা হ'বে, লেখাপড়া শিখেচেন একটু Sentimental হতে পারেন। আচ্ছা বৌদি তোমার কাছে সে কথা নিয়া দুঃখ্যু করেছেন নাকি।"

সুরমা এবার রাগিল, "খালি 'বৌদি' আর 'বৌদি' অত পছন্দ হ'য়েছিল তো নিজে বিয়ে করলেই হ'ত।"

সুধাময় হাসিয়া, "তুমি তো আর মরনি, বৌ মরল যে দাদার, আর বিয়ে করব আমি! একা রামে রক্ষা নেই, আবার বিয়ে! তবেই হয়েছে! কিন্তু সুরমা, মেয়েরা বড্ড হিংসুক! কোথায় দাদা ও বেচারার খোঁজ খবর নেননা বলে দুঃখ করবে, না আমি দুটো জিজ্ঞাসা করতে মুখখানা হেসেলের হাড়ির মত কালো আর ভারি করলে! লেখাপড়া না শেখার অশেষ দোষ।" এবার সুরমা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, সুধাময় হাসি মুখে তাস খেলিতে বাহির হইল! কিন্তু তাহার মনে ভ্রাতার ব্যবহারে একটা সন্দেহ জন্মিতেছিল। কয়েকদিন পরে সুধাময় পিতাকে বলিল, "বাবা, দাদার একা একা বড় কষ্ট হয় দেখে এসেছি নিজে রেঁধে খান, আমি বলি বৌ-দিদি ননীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকুন। রসিক বাবু

নিতান্তই ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন, "তা বটেইতো, কষ্ট হচ্ছে বই কি, তা' এক কাজ কর সুধা, তুমি বৌমাকে বাপের বাড়ী রেখে এস, দেব বলেছি ভদ্রলোককে কিনা! মাসখানেক পরে ননীকে নিয়ে সুখের কাছে ওদের রেখে এস!" মাতাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রাজি হইলেন। আহা বাছা আমার একা থাকে! কি খায় না খায় কে জানে!" হায়রে মায়ের প্রাণ।

মাধুরী শুনিল তাহাকে মেদিনীপুরে যাইতে হইবে! শুনিয়া যেন অভিমানিনীর সমস্ত দেহ মন বাঁকাইয়া বিদ্রোহী হইয়া বসিল, ছি! ছি! ছি! তিনিতো ডাকেন নাই। হয়ত তাহাকে তাঁহার মনেই ধ'রে নাই, তাই অমন নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব! তবু সে যাচিয়া তাঁহার কাছে যাইবে?

সুরমা মুখের হাসিতে মনের হিংসার বিষ লুকাইয়া বলিল, "লোকে বলে মেঘ না চাইতেই জল, ছোড়দির হ'য়েছে তাই! যাই বল ভাই, ডবোল প্রমোশন পেয়েছ!"

মাধুরী কলিকাতায় গেল। ৫ মাস পরে যেন বন্দী আলোকের মুখ দেখিল! কাকা বলিলেন, "রোগা হ'য়ে গিয়েছ মাধু!" মাধু বলিল, "না কাকা, রোগা হইনি, মনটাই বড় কেমন করত। তারাবাবু হাসিয়া বলিলেন "দু বছর পরে আমার এই মা'টীর মত হ'বে মা, বুড়ো বাপ নিতে এলে আস্‌তে চাইবে না।" মাধু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কখ্‌খনো না, বৌদিদিটা খাঁটি পাথর! মায়া মমতা নেই! ও শুধু তোমাকে আর ছোট মাকেই ভাল বাসে।" পরস্পর বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া মা ও কাকা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।"

ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর রঙ্গস্থলে প্রবেশ! ভ্রাতৃবধূ ভিতরে পলাইলেন। তিনি মাধুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মাধু এলি? বেশ! তোর কাকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! এর চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেই হ'তো!"

তারাকান্তবাবু অবাক হইয়া চাহিলেন—"কি রকম দাদা!" আরও গরম হইয়া দাদা বলিলেন, "রকম আবার কি! জ্ঞাতি শত্তুর! এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছিস্ যে একবেলা ভাত জোটে তো একবেলা উপোস!"

এবার তারাকান্ত বাবুর ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল। বালকের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন, "চুপকর, কুটুমের ছেলে বাইরে বসে আছে, ওঁর জ্বালায় লোক লৌকিকতাও যাবে দেখ্‌চি!"

"ওঃ! ভারিতো পাড়া গেঁয়ে কুটুম, তার আর লোক আবার লৌকিকতা! কালাছেলের নাম পদ্মলোচন!"

"বৌমা, ভদ্রলোক যতক্ষণ এখানে আছেন, দাদাকে রান্নাঘরে পিঠে পায়েসের তদন্তে রাখগেতো!"

সুধাময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেআঁচড়াইতে দুই ভ্রাতার বাক্যালাপ শুনিতেছিল। সহসা একটু হাসিয়া, একটু কাশিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তালুই মশায়, আমরা পাড়াগেঁয়ে অসভ্য বটে, কিন্তু অতিথির অসম্মান করিনা।"

তারাকান্তবাবু ব্যাকুলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি চা খাবে ওঘরে চল বাবা, ওর কথা শুনো না।"

স্থিরভাবে স্নিগ্ধস্বরে সুধাময় কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, একটু সবুর করুন, একটা কথা বলে যা'ব, তালুই মশায় আপনি দাদার কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তা আমি দেখেছি, ছেলের শ্বশুর দূর হোক্ মেয়ের শ্বশুর অমন চিঠি লিখলে আমরা তাকে 'ছি' 'ছি' বল্‌তুম। তা পাড়াগাঁয়েও এখন এই সব দেখে লোকে শিখবে। ছোট তালুই মশাই একবার পত্র খানা দেখুন তার পর ছিঁড়ে ফেলি। ওকি বৌদি হা করে শুনচ কি? তুমি ওঘরে যাও।" ঘরের কোণে বজ্রাহতের মত স্তব্ধভাবে মাধুরী বসিয়াছিল, দেবরের কথা শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া কপাটের আড়ালে গেল।

তারাকান্ত বাবু পত্র পড়িলেন পত্রখানি এইরূপ—

কল্যাণবরেষু।

এবার তোমাদের দেশে মাধুরীকে আমি আনিতে গিয়াছিলাম। তাহার প্রতি তোমার পিতামাতা যেরূপ ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যতদিন তুমি পরিবার পালন না করিতে পার, আমি কলিকাতায় মাধুকে রাখিতে স্বীকৃত আছি। যখন সুবিধা হয়, তাহাকে তোমার কাছে নিয়া রাখিও। আমার শিক্ষিতা মেয়ের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে এখন তোমাকে অনুরোধ যত শীঘ্র পার, তাহাকে তোমার কাছে নিও।"

তারাকান্ত বাবু বলিলেন, "উনি তো পাগল, কিন্তু তুমি তাতো জান্‌তে না! এ চিঠি বেয়াইকে দেখিয়েছ কি বাবা।"

"না তালুই মশায়, কেউ দেখেনি।"

"বাবা, তুমি আমার মাথা রেখেচ কি আর বলব আমি, তুমি আজই মাধুকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"না, না, আপনি চা খাবেন চলুন। ১মাস পরে আমি বাবার কথামত ওঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যাব। আপনি অত ব্যস্ত হ'বেন না, দিন্, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলি।"

[৬]

১টা মাস যেন মাধুরীর কাছে ১দিনের মত কাটিয়া গেল অবশেষে মেদিনীপুর যাইবার দিন আসিল। সুধাময় আবার এই ফাঁকে বাড়ীতে গিয়া দুই দিন থাকিয়া ননীবালাকে লইয়া আসিলেন। মাধুরী মাকে প্রণাম করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাকার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ষ্টেশনে চলিল। তারাকান্ত বাবু মাধুকে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি বড় হ'য়েছ, তোমাকে বুঝান কষ্ট হ'বেনা একটা কথা সব সময়ে তুমি মনে রেখ, ওই যে কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে লিখে গেছেন "পতিকূলে তব দাস্যমপি শ্রেয়ম্," মেয়ে মানুষের পক্ষে অমন কথা আর নেই মা! নিজের ঘরকন্না কর্‌তে কি অপমান আছে! লেখাপড়া শিখেচ, শুধু টেবিলে বসে শেলি বায়রণ মুখস্থ কর্‌তে নয়, সংসার যাত্রা ভালকরে চালাতে, আদর্শ স্ত্রী হ'তে, আদর্শ মা হ'তে! সরস্বতীকে প্রণাম কর্‌তে হ'লেই যে রান্নাবান্না ছেড়েছুড়ে দিতে হ'বে, তারতো মানে নেই! আর তোমরা অন্নপূর্ণার জাত, তোমরা যদি পদ্মহস্তের পরমান্নের থালা ছুঁড়ে ফেলে, দিনরাত বীণাপাণির বীণা বাজাও, লোকের কান জুড়োবে বটে, কিন্তু পেট ভরবে না যে মা! সবই চাই, ভরা পেটে সব ভাল লাগে। তোমরা ঠিক না হ'লে আমরা যে মা মিথ্যে!"

* * *

রাত্রি ১ টার সময় সুধাময় ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সুখময়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনো সুখময় নাকি বাড়ী ফেরেন নাই। একদণ্ডে সুধাময়ের কাছে যেন সমস্ত তিক্ত হইয়া গেল। চাকরটাকে কাঁচাঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া তুলিল, "হতভাগা বেটা, বাবু তোকে বলে নি যে আমরা আস্‌ব?"

সে হাঁউমাউ করিয়া বলিল, "হাঁ বলেছে বটেতো, বাবু তো রোজ দুপুর রাতে এসেন আমি কি কর্‌ব।"

সুধাময় তাহাকে ধমক দিয়া তাহার সাহায্যে দাদার ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল্। ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা হারমোণিয়ম্, এক পাশে আলনায় কতকগুলি কোচান কাপড় ও জামা ঝুলিতেছে, তিন চার জোড়া ডসনের "সু" তে আলো ঠিকরাইতে ছিল। এক পাশে খাটপাতা মেজের কোণে ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। পাতা বিছানার উপর তাহার পত্রখানি পড়িয়া আছে। মেজেতে চাকরের সাহায্যে ১খানি বিছানা করিয়া সুধাময় বৌদিও ননীকে শোওয়াইল ; এবং নিজে পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিজেও টের পায় নাই ; সহসা শেষ রাত্রির দিকে বমির শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভ্রাতার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে গেল। দেখিল দাদা বমি করিয়া ভাসাইয়াছেন বৌদিদি মাথায় জল দিয়া বাতাস দিতেছেন। মদের দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

সুধাময় কতক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত বলা যায় না, সে ভাবিতেছিল, "এই কি আমার সেই দাদা! যে পানটী খাইতে জানিত না! অমন অধঃপতন হইয়াছে, তাই বৌদিদির কাছে পত্র লিখিতে ভরসা হয় নাই! কিন্তু এই যে সেবাপরায়ণা অর্দ্ধবগুণ্ঠিতা নারী এই যে মুখের দিকে চাহিয়া আছে, উদ্বেগের সীমা নাই, চিন্তা নাই, হায়রে পুরুষ দেবতা তুমি, না দেবী ওই নারীটী! তোমার এই পতনে কি ওর ঘৃণা হয় নাই, তবু তেমনি প্রেমে তেমনি স্নেহে তোমাকে আগুলিয়া বসিয়া থাকিবে যুগ যুগ, জন্ম জন্ম।"

মাধুরী বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি ঘুমোন্‌গে"। সুধাময় বলিল, "বৌদি, আমি এই নরকে ফেলে দিতে কি তোমায় এনেছি? ভোরের গাড়ীতে তোমাকে কল্‌কাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই চল, উনি টেরও পাবেন না।"

দাদাকে দাদা বলিতে সুধাময়ের ঘৃণা হইতে ছিল! মাধুরীর বিবর্ণ মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। হাসি তো নয় যেন ঠোঁটের কোনে জমান অশ্রুর নীরব ভঙ্গী ফুটিল! মরি মরি, বেদনা না দিলে কি নারীর নারীত্ব ফোটে! না ঘষিলে কি চন্দনের সুগন্ধ ভোগ করা যায়।

মাধুরী বলিল, "আপনি নরক ভাব্‌চেন, তাই মুখে অমন কথাটা বেরিয়ে গেল। আমি কোথায় যাব ঠাকুরপো, মনে নাই সন্ধ্যে বেলা কাকাবাবু শিখিয়ে দিলেন, "পতিকূলে তব দাস্যমপি শ্রেয়ম্‌।"

সুখময় তড়িদাহতের মত উঠিয়া বসিল। আবেগে বলিল, "নরক রে সুধাময়, খাঁটি নরক! কুসঙ্গে আমি নরকে গিয়াছি! ওকে নিয়ে যা ভাই, ওকে কলকাতায় নিয়ে যা আমি মার কোলে ফিরে যাই।"

মাধুরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "একা কি তোমার মা? তিনি যে আমারও মা! আমিও যাব তা হ'লে।"

সুখময় বলিল, "তাই চল, তবে তাই চল। যদি আমাকে মদের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তাই চল! আমার আর গায়ের রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে বড় মানুষী করে কাজ নেই। চাক্‌রীও যাক্‌ মদও যাক্‌। আমি দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাই, যা পাই তাতে তো নিজের পেট ভরিয়ে বাপ মাকে আধ পয়সা দিতে পারি না। এবার দেখি, দেশের লাঙ্গলে হাত দিলে বাবার দুঃখু ঘোচে কি না, কিন্তু তুমি কি আমাকে মাপ করবে মাধুরী!" মাধুরীর মুখ লাল হইয়া উঠিল! একটু সাম্‌লাইয়া, মাধুরী মৃদু হাসিয়া দেবরের দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল, "মতি যদি ফিরেছে ঠাকুরপো, আর দেরী না, আজই চল্‌তি।"

ঠাকুরপোও হাসিয়া বলিল, "চল্‌তি তো বটেই কিন্তু তোমার বাবাকে"—শান্তস্বরে মাধু বলিল, "হাঁ আমার বাবাকে একটা চিঠি দিয়ে যেতে হ'বে যা আজ আমি এই ৩/৪ ঘণ্টায় বুঝেছি, "man to work and woman to weep". নারীর এই ভাগ্য এবং শুধু ভাগ্য নয় ঠাকুরপো পরম ভাগ্য! নারী অমন প্রাণভরা প্রেমে কাঁদতে পারে, পুরুষ তা পারে না! তাই সর্ব্বদেশেই বুঝি নারীর সেই ভাগ্যটুকু পুরুষের ভাগ্যটীকে জয় করেছে ভাই! আমরা বুঝতে পারি না, তাই নারীর ভাগ্যের নিন্দা করি। বাবাকে এটী আমি বুঝিয়ে যাব, এই নারী হৃদয়ের, নারী ভাগ্যের বিচিত্রতা।"

পৌষ, ১৩২৮

সৈনিক-সীমন্তিনী

বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায়

প্রতি বৎসর বর্ষার অপগমে শরৎ যেমন তাহার সুষমা-সম্ভার লইয়া আসে, এ' বৎসরও বর্ষান্তে সে তেমনই আসিয়াছে। গগনে বর্ষার সে ঘনঘটা—সে হাঁকডাক আর নাই। ঘাট বাট আর তেমন পঙ্কিল নহে। এখন নির্ম্মল সলিলে শোভে বিকচ কুমুদ কহ্লার, উপবনে হাসে বন-শোভন স্থলপদ্ম। এমনই সুন্দর শরতে প্রতিবৎসর বঙ্গে রমণীয় শারদীয়া পূজার ঘটা। এ' বৎসরও মায়ের শারদীয়া আগমনীর দিন সমাগত। তিন দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বোধন হইয়া গিয়াছে। গতকল্য সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস ছিল। আজ সপ্তমী পূজা।

সময় সময়,—কি জানি কাহার প্রভাবে,—"মরা গাঙে" জোয়ার আসে, শুষ্ক তরু "মুঞ্জরিত" হয়। বুঝি তাঁহারাই প্রভাবে প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মৃত বঙ্গে অকস্মাৎ প্রাণের গঙ্গা জোয়ারে বয়,—দারিদ্র্যদীর্ণ, রোগ-শীর্ণ, কঙ্কালসার, মলিন বাঙ্গালীর মনে একটা স্ফূর্ত্তির 'কলকল ছলছল্' ভাসিয়া উঠে। আজ এই সপ্তমীর সন্ধ্যামুখে কলিকাতা-নগরীর এক দ্বিতল কক্ষের সুন্দর অলিন্দে সেই শারদীয় আনন্দের হিল্লোল কূল ভাসাইয়া ছুটিতেছে। চম্পকবর্ণা, তন্বী, নবোঢ়া এক লোলনয়না ললনা পূজার রমণীয় পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া স্বহস্তে কেশ-প্রসাধন করিয়া মুকুরে আপন তাম্বুল-রঞ্জিত অধরশোভা নিরীক্ষণ করিতেছে, আর আপন উল্লাসে আপনি হাসিতেছে। তাহার মঞ্জুকেশে, সুগৌর ললাটে, লোল নয়নে, প্রফুল্ল আননে, বিলাস বসনে, সুচারু ভূষণে, অলক্তক চরণে বিভ্রম-চলনে কি এক চাঞ্চল্যময় আনন্দলহর—শুধু হাসি শুধু হাসি। রমণী আপন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি আপনহারা। তাহার প্রাণের উল্লাস, তাহার সসীম দেহ প্লাবিত করিয়া অলিন্দ ভাসাইয়া বুঝি শারদনীলে—তরঙ্গ তুলিতেছে। এমন সময় সেখানে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিল। কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের ছোট,—তাই তাহাতে ও তাহার দিদিতে সখীজনসুলভ সরল সরস আলাপের ঘটা। আজ তাহার এই উচ্ছসিত উল্লাসের মাঝে দিদিকে পাইয়া সে মৃণাল বাহুতে তাহাকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিল এবং আনন্দ অবশ নয়নে বয়োধিকার মুখে চাহিয়া পাগলীর মত বলিয়া উঠিল,—"আয়, দিদি, আজ এই পূজোর আনন্দের দিনে তো'কে ভাল সাজে সাজিয়ে দেই, আর তোর চুলের নদীতে খোঁপার বাঁধ বেঁধে দেই।" বয়োধিকা গাম্ভীর্য্য-মন্ডিত মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"রাণী, তুই সাজ ; তোকে বেশ মানায়।" কনিষ্ঠা ছাড়িবার পাত্রী নহে,—সে বলিল "না দিদি, আমার মাথা খা', তোকেও বেশ মানায়।" দিদির হাত ধরিয়া টানিয়া রাণী তাহাকে আয়নার কাছে আনিল এবং আপনার চিরুণী লইয়া তাহার কেশ প্রসাধনের উপক্রম করিল। জ্যেষ্ঠা শান্তভাবে কনিষ্ঠার হাত ধরিয়া বলিল—'এমনই সময় সুদূর দেশে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুঝছেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁর জীবন যেতে পারে ; এমন সময় কি আমার বেশবিন্যাস কর্‌তে আছে, বোন্? 'ছেলে মানুষি' করিস্ নে। তুই নিজে সাজ। তোকে বেশ দেখাবেখন।" রাণী হো হো করিয়া হাসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"ছোট মা,—ছোট-মা, শীগ্‌গির এখানে এস। দিদিমণি বোনাই বাবুর জন্যে কাঁদ্‌ছে গো কাঁদ্‌ছে। দেখ্‌বে এস।" রাণী চিররঙ্গময়ী। তাহার রঙ্গরহস্যে বাটীর সকলেই অস্থির, সকলেই তটস্থ, —ছোট-মাও রাণীর হাসির লহরের সঙ্গী। রাণীর হাসি শুনিয়া এবং তাহার উল্লাস-চঞ্চল

আহ্বানে ছোটমা একগাল হাসিতে হাসিতে ক্ষিপ্রচরণে অলিন্দে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাণী এক হস্তে দিদির অঞ্চল ধরিয়া অন্যহস্তে চিরুণী লইয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর সাবিত্রীবালা শান্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে বাটীর সকল বালক বালিকা, কিশোরী যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে আসিয়া অলিন্দে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রাণী সকলকে বুঝাইয়া দিল যে এই সপ্তমী পূজার আনন্দের দিনে তাহার দিদি পূজার নূতন পরিচ্ছদ পরিবে না, চুল বাঁধিবে না, কারণ তাহার বর যুদ্ধে গিয়াছে। সকলে শুনিয়া তো হাসিয়া আকুল। একি সৃষ্টিছাড়া কথা! স্বামী কি কাহারও কখনও বিদেশে যায় না? স্বামী নাই বলিয়া এমন দিনে মেয়েরা একটু সাজ পোষাক করিবে না! সকলেও হাসিয়াই আকুল, —সাবিত্রী কেবল নীরব—গম্ভীর। ছোট মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হাঁ লো সাবি, আমি তো তোর মায়ের মত ; আচ্ছা আমি বল্‌ছি এই পূজোর দিনে তুই পোষাক পর, —তাতে জামায়ের অমঙ্গল হবে না।" রাণী হাতে তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাসিভরে বলিয়া উঠিল—"এইবার!" উপস্থিত আত্মীয়ার দল বলিল,—"হ্যাঁ, এর পর আর কথা কি! ছেলে বেলায় তোদের মা মরে যায়। তখন ছোট বউইত তোদের মানুষ করেছে লো, বিয়ে থা দিয়েছে,—এ' তোদের মায়ের বাড়া আত্মজন। মায়ের কথাই আশীর্ব্বাদ। এইবার সাজগোজ কর, সাবি।" ছোটমা পুনরায় বলিলেন,—"কি সাবি? পর।" সাবিত্রী এতক্ষণ নীরব ছিল, সে অগত্যা বলিল,—"ছোট মা, মা কেমন তা' মনে পড়ে না, তোমাকেই মা বলে জানি, —কখনও তোমার কথার অবাধ্য হইনিক। আজ মা, তুমিও আমায় ও কথা বলো না। তিনি এখন বাসোরায়। মা, আমার কপালে কি ঘটেছে কে জানে। তিনি আমায় যে কাপড়ে রেখে গেছেন, তাই পরেই আমায় থাক্‌তে দাও।" সাবিত্রী গম্ভীর মুখে ছল ছল চোখে ছোট মায়ের পদধূলি লইল। ছোট মা তখন রাণীকে বলিলেন,—"দে, রাণু, ওকে ছেড়ে দে। জামাই এসে ওকে সাজ পোষাক পরাবেখন্"। ছোটমা হাসিমুখে—"পাগলী মেয়ে আমার" বলিয়া সাবিত্রীবালাকে লইয়া গৃহকর্ম্মে প্রস্থান করিলেন। বহু দিন হইতে জগৎটা অত্যন্ত পুরাতন বোধ হইতেছিল, কোনও বিষয়েই আর নূতনত্বের আস্বাদ পাইতেছিলাম না। হৃদয়ের অবসাদ একটু দূর করিবার জন্য গৃহশীর্ষে বসিয়া শারদ সন্ধ্যায় শারদীয়া পূজার দূরাগত বাদ্যধ্বনি শুনিতেছিলাম। এমন সময় রণগত-ভর্ত্তৃকা বঙ্গবধূর ব্যবহারটি লাগিল বেশ। যেন বৈচিত্র্যবিহীন নীরস পৃথিবীর বুকে এক মনমজান বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিল। এই কি—মধুবাতা ঋতায়তে, মধুং ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ?

যে যাহাতে একবার সুখ পায়, সে আবার তাহাই খোঁজে; পুষ্পলোভী ভ্রমরের এই ধারা। সঙ্গীতের সুরে একবার যে প্রাণের অন্তস্তল রাগমুখর করে, সে প্রাণ সেই সুরের লাগি বুঝি তাই পাগল হয়। সপ্তমী পূজার সন্ধ্যায় সাবিত্রীবালার ব্যবহারটি আমার নিরানন্দ প্রাণে সেই রাগমগ্ন সাধ জাগাইয়াছিল। অষ্টমী পূজার দিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমাদের বাটীর মেয়েরা ও রাণীদের বাটীর মেয়েরা একত্রে ঠাকুর প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই আমাদের এখানে উঠিলেন। বাটীখানি, মুহূর্ত্তে বেশ একটু আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। হাসির তুফানে বুঝিলাম, রাণী আসিয়াছে। চন্দ্রবদনে চারু বসন চাপিতে চাপিতে, হাস্যচঞ্চল বঙ্কিম নয়নে চাহিতে চাহিতে, বিলাস-বিভ্রম চরণে রাণী আসিয়া অনতিবিলম্বে আমার কক্ষে উপস্থিত হইল। বুঝিলাম উদ্দেশ্য আমাকে প্রণাম করিবে। কিন্তু সোহাগে, আদরে, লজ্জায়, আহ্লাদে সে এমনই বিবশা, যে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, সুরভিত রুমালে স্বীয় মুখ আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহার হাসিতে হাসি মিশাইয়া আদরভাবে বলিলাম—যা যা, তোকে আর প্রণাম করতে হবে না। চিরদিন এমনই হেসে খুন হ'—এই আশীর্ব্বাদ বিনাপ্রণামেই করছি।"

আমার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া আরও হাসিতে হাসিতে সে কক্ষ হইতে পলাইয়া যাইতেছিল। আমি বলিলাম,—"বোস্ না রাণু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে যে।" সে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কোন প্রকারে বলিল—"বলুন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোর দিদি ঠাকুর-প্রণাম করতে যায় নি?" আমার প্রশ্ন শুনিয়াই রাণী তো হাসিয়াই কুটপাট। অনেকক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সে বলিল,—"যাবে না কেন? ঐ তো ও ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। দিদির ঠাকুর দেখার কি ঢং।" রাণীর মুখের কথা আর বুঝা গেল না—তাহার হাসির ঢেউয়ে সব ভাসিয়া গেল। আমি বলিলাম—"হেসেই খুন তা কথা বলবি কি। হাসি রেখে খুলে বল্না ব্যাপারটা কি?" কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থা হইয়া সে বলিল সে ঢঙের কথা মনে পড়লে যে আর হাসি থামে না গো, তা সে কথা আপনাকে বলি কি করে, কাকু।" তাহার পর আনন্দাকুল কণ্ঠে, কখন হাসিয়া কখন থামিয়া, কখন চক্ষু তুলিয়া কখন চক্ষু ফিরাইয়া রাণী যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—কত সখীরা সাজিয়া গুজিয়া একগা গহনায় রূপ দেখাইতে আসিয়া ঠাকুর দেখার ছলা করিতেছিল। রাণীর দিদি তাহাদের কাহারও সহিত হাস্য পরিহাস রঙ তামাসা করে নাই। ঢুলীদের সেই নাচিয়া নাচিয়া দুলিবার মজার ভঙ্গী কেবা দেখে! পুরুত ঠাকুরের দীর্ঘ টিকির ফুলে একটা দুষ্ট ছেলে কেমন হাত দিতেছিল তাই কি দিদি একবার দেখিল। আর বাঙ্গাল বউদের বাঙ্গালে কথা—সে যা রগড়! দিদি কেবল দুই হাত জোড় করিয়া ঠাকুরের চরণের দিকে এক নয়নে চাহিয়াছিল। বোধ হয় মনে মনে ঠাকুরের কাছে বরের জন্যে—" রাণীর হাসির বাণ আবার ডাকিয়া আসিল। সে ঢং আমি যদি দেখিতাম তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে পেটের ভাত তুলিয়া ফেলিতাম। দিদির যা ঢং—যেন দোল পূজার সং। রাণী চলিয়া গেল। ভাবিতেছিলাম—রাণী যাহাকে ঢং বলিল সে ঢঙের ঢঙী কি আবার বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে?

কিছু দিন হইতে আমার একটু অসুবিধা যাইতেছে। এই সহরে আমোদ আহ্লাদ তো বার মাস ত্রিশ দিন লাগিয়াই আছে ; আর ছাই যত তামাসা কিনা রাত্রিকালে! বাটীর মেয়েরা সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি মুখে দু'টা ভাত গুঁজিয়া হেলিতে দুলিতে বেশভূষায় জগৎকে মাতাল করিয়া আহ্লাদ করিতে যান, আমি সন্ধ্যায় আহার করিতে পারি না বলিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ঠাণ্ডা, শুষ্ক অন্নব্যঞ্জন কোনও প্রকারে উদরস্থ করি। এই ভাবে অন্য সকলের পৌষ মাসে আমার সর্ব্বনাশ অর্থাৎ কি না উপবাস ও নিরানন্দ। "রেতে উপোসে হাতী পড়ে"—আমি তো দুর্ব্বল মানুষ। আজ এই নবমীর রাত্রিতে সেই ভয়প্রদ উপবাসের আসন্ন সম্ভাবনা দেখিতেছি। কারণ, আজ সহরে ভয়ানক ব্যাপার। আজ নাকি রঙ্গমঞ্চে চতুঃপ্রহররজনীব্যাপী অভিনয়ের বিপুল আয়োজন! সন্ধ্যা ছয়টায় যার আরম্ভ, কাল বেলা আটটায় তার অন্ত। সন্ধ্যায় "পেয়ারে নজর", রাত দুপুরে "চাঁদে চাঁদে", তাহার পর "মানে মানে" "কণ্ঠহার" ও রাত্রি শেষে "প্রেম পরাজয়" সর্ব্বশেষে "জয়দেব"। রাত্রির এই ছয়খানি নাটকের নৃত্যগীতের তরঙ্গ আমাদের বাটীতে এই দিবা তিনটার সময়েই বেশ উত্তাল ঢেউ তুলিতেছে। কেহ আজ পোষাক পরিতেছেন, কেহ এঘর ওঘর করিয়া হাসি মুখে ঘুরিতেছেন, কেহ ক্ষীণ কটিতে রেসমী রুমাল খানি ভাল করিয়া গুঁজিতেছেন, কেহ বা হাসিতে হাসিতে পান সাজিতেছেন, আর আমার মুখ শুকাইতেছে—আজ আমার ভাগ্যে বুঝি নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা। একবার একটু সাহসে বুক বাঁধিয়া মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলাম—"সন্ধ্যায় তো অভিনয়ের আরম্ভ হবে, তা যা' হক দু'টো ডাল ভাত রেঁধে খেয়ে গেলে হত না?" অমনই আমার দুই কিশোরী ভাগনী ছুটিয়া আসিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল—"তাহলে জায়গা পাওয়া যা'বে না যে। টিকিট—কাটা আরম্ভ হ'য়েছে সেই সকাল বেলায়, তার খবর রাখ কি?" আমার অপরাধ গুরুতর!—সকাল বেলায় যে টিকিটকাটা আরম্ভ হইয়াছে তাহাও কিনা আমি জানি

না। কি করি—সেই অবধি মহা অপরাধীর ন্যায় নীরব বসিয়া আছি। এক ঠোঙ্গা বাজারের লুচি ও তরকারী হাতে করিয়া আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধু আসিয়া বলিলেন,—"সেজ ঠাকুর-পো, একটা রাত বৈতো নয়, এই খাবার খেয়ে কাটিয়ে দাও। যে পাপ হয় সে আমার!" তিনি জানেন আমি জীবনে কখনও বাজারের খাবার খাই নাই, তবুও দয়া করিয়া আমার পাপ স্বীয় স্কন্ধে লইয়া আমাকে উহা খাইবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না বলিয়া হাসিমুখে খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া বলিলাম—"তা' বৈকি, বৌদিদি ; এক রাত্রি বৈতো নয়, কেটে যাবে এখন।" মুখে তো বলিলাম, "এক রাত্রি বৈ তো নয়" কিন্তু মনে বড় ভয় হইতেছিল,—আমার বড় ক্ষুধা, উপবাস করিতে বড় কষ্ট হয়। বধু ঠাকুরাণী আমাকে রাজী মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে কণ্ঠহার দোলাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আমার ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া উপবাসের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে নবমীর বাজনা শুনিতে লাগিলাম। "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।" শীঘ্রই দুই খানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। ছেলেরা ছুটিয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিল। মেয়েরা উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখি হাসির রাশি রাণী আসিয়া আমার কক্ষের দ্বারে উপস্থিত। সে হাসিয়া হাসিয়া অপাঙ্গে চাহিয়া কোন মতে বলিল—"কাকু, দিদি বড় কিপ্পিন হয়েছে। পয়সা খরচ হ'বে বলে আমাদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেল না। আমি কিন্তু অমন নই। কাকু, আপনি আমায় বেশী ভাল বাসিবেন।" স্থির হইয়া সকল কথা বলিবার সময় রাণীর ছিল না,—বিলম্ব হইলে রঙ্গালয়ে ভাল জায়গা পাইবে না। ঐ টুকু বলিয়াই সে রঙ্গভরে ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ঘড় ঘড় শব্দে শকট দুই খানি চলিয়া গেল। একটু নির্জ্জনতা পাইয়া সাবিত্রীবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাবিত্রীবালা, তুমি গেলে না?" সে মাটির দিকে শান্ত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"না, কাকা বাবু। যে পোড়া টাকার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়েছেন সেই টাকা অমন ভাবে নষ্ট করতে প্রাণ সরল না।" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সাবিত্রীবালা নিঃশব্দে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সাবিত্রীর কথাগুলি আলোচনা করিতে করিতে নবমীর বাজনা বড়ই মধুর লাগিতে লাগিল। আনন্দে ছাতে গেলাম। সুনীল গগনে নবমীর চাঁদ—সেও মধুর, জগদ্ব্যাপিনী জ্যোৎস্না মধুময়ী। আজ ক্ষুধায় কষ্ট বোধ ত হইলই না,—তবে সে বধূ ঠাকুরাণীর বদান্যতা-প্রভাবে নহে, সে সাবিত্রীবালার "কৃপণতা"-গৌরবে।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে নলিনীদলগতজলবৎ সকল সুখই চিরচঞ্চল। আলোকের সহিত ছায়ার ন্যায় হাসির সহিত রোদন নিত্য-বিজড়িত। গত রজনীতে আমার যে সুখ ছিল, আজ এই অপরাহ্নে আর সে সুখ নাই। বিজয়ার সহিত আমার সেই সুখের বিজয়া হইয়া গিয়াছে। আজ যখন সকলে বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গ সাজাইতেছিল, তখন সাবিত্রীর স্বামীর দেওয়া সে তুচ্ছ লাল সাটী খানিরও বুঝি বিসর্জ্জন হইয়া যায়। কিছু পূর্ব্বে সাবিত্রীর ভাই আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে বাসোরা হইতে জনৈক সৈনিক দেশে ফিরিয়া নাকি বলিয়াছে যে চন্দ্রনাথ তুর্কীর সহিত সমরে নিহত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ আমাদের সাবিত্রীবালার স্বামী। কেন এমন হইল? সাবিত্রী সতীত্বের গৌরবে মৃত পতির প্রাণ ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আমাদের প্রতিপ্রাণা সাবিত্রীবালার প্রাণপতি চন্দ্রনাথ কেন তবে মরিবে? তবে কি যমরাজ আর অধুনা ধর্ম্মরাজ নহেন? কতক্ষণ যে এ দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলাম, জানি না ; দেখি সাবিত্রীর ভাই বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাবিত্রী কি শুনেছে?" সে বলিল—"হ্যাঁ"। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনে কি বড় কাঁদছে? "না, খুকী কাঁদছিল, তাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে।" এই কন্যা যখন জননী-জঠরে তখন কন্যার পিতা যুদ্ধে যাত্রা করেন। স্বামীর দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া সাবিত্রীবালা না কাঁদিয়া সেই কন্যাকে শান্ত করিতেছে!

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। বিজয়ার বিষাদ-মিলনের পর বাঙ্গলায় এই প্রথম সুখ-সম্মেলন।

আজ ভিতরে ও বাহিরে আনন্দ। বহির্জগতে আনন্দের সীমা নেই, আর অন্তর্জগতের আনন্দও অকূল—ঊর্দ্ধে সীমাশূন্য। নীরেন্দ্রপ্রতিমনীল নভোমণ্ডলে পরম রমণীয় সুধাকর। সুধাকরের রজত-ধবল সুধাধারায় বিশ্বজগৎ পরিপ্লাবিত। সে সুনীলে ও সুধাধবলে যে মধুরোজ্জ্বল শান্ত শোভার রচনা করিয়াছে, মানব-মনও সেই শোভায় শোভাময় হইয়া অমল ধবল হইয়া গিয়াছে। আর সুমার্জ্জিত, ধূপ-গন্ধসুরভিত, পূত কক্ষে চিরচঞ্চলা কমলা দেবীর চারুহাসিনী মূর্ত্তি। জননীর নয়নে, আননে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লহর লীলা করিতেছে। সেই আনন্দ লহরে ভক্তের প্রাণ হিল্লোলিত। গৃহদ্বারে, পুষ্পপতাকাশোভিততোরণ তলে বসিয়া সানাইদার তাহার বাঁশের বাঁশরীতে স্বর্গের সুর তুলিতেছে। অমল আকাশে, শুভ্র সুধাকরে, চারু চন্দ্রিকায়, কমলার কোমল মূর্ত্তিতে সুস্বর সানাইয়ের সুরে আমার জগৎ ভরপুর। বাড়ীর উৎসব-চঞ্চল বালক বালিকার নৃত্যের তালে তালে এই বৃদ্ধের মনও নৃত করিতেছে, তাহাদের ছুটাছুটিতে এই জীর্ণ ভগ্ন বীণাও ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছে। এ' যেন এক নূতন জীবন,—এ' যেন বার্দ্ধক্যেই পুনর্যৌবন। বুঝি এইরূপ তরঙ্গেই শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বুঝি এইরূপ চাঁদের আলোকেই "মরা গাঙে বাণ" ডাকে! আমার এ' ভগ্ন বীণায় আবার এই মধুর ঝঙ্কার কেন উঠিতেছে, জান? আমার এই শুষ্ক তরু আজি আবার মুঞ্জরিত কেন, জান? আমি অন্তরের অন্তরে এমন করিয়া হাসিতেছি, নাচিতেছি, গাহিতেছি কেন, জান? ঐ সুনীল আকাশ, ঐ চারুচন্দ্র ঐ আনন্দময় বালক, ঐ উল্লাসময়ী বালিকা—ইহারাও আমার নিকট তবু কিছু পুরাতন। আমার আনন্দের কারণ বলি। এই কোজাগরী মাধবী-ধবল জ্যোৎস্না মাখিয়া রাণী আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—বসোরা হইতে সংবাদ আসিয়াছে—চন্দ্রনাথ ভাল আছেন। "বল্‌তে লজ্জা করে, কাকু, চন্দ্রনাথ বাবু সেই সেপাইয়ের হাত দিয়ে দিদিমণিকে ভালবাসার চিহ্ন দুইখানি মোহর পাঠিয়ে দিয়েছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার দিদিমণির আজ খুব আনন্দ। তিনি এখন বেশ হেসে হেসে বেড়াচ্ছেন?" রাণীর হাসির তরঙ্গ ঠেলিয়া আমি কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারিলাম, যে সাবিত্রীবালা কমলার চরণে মোহর দুইটি রাখিয়া যথাপূর্ব্ব নীরবে ও গম্ভীরে পূজার আয়োজন করিতেছেন। রুমালে মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া ধরা আনন্দে ভাসাইয়া রাণী চঞ্চলচরণে চলিয়া গেল। তদবধি আমি আনন্দসাগরে ভাসিতেছি ; তবে ত জগৎ একেবারেই পুরাতন নহে, তবে ত জগৎ অসার, অসুন্দর নহে! ঐ এক নূতন আশা! এ' এক নূতন সুখ! এ' যে আমার নবযৌবন!!!

বর্ষা যখন নামে তখন বৃষ্টির পর বৃষ্টি, বৃষ্টির পর বৃষ্টি,—যাবৎ শুষ্ক পৃথিবী না প্লাবিত হয় তাবৎ আর তাহার নিবৃত্তি হয় না। শুষ্ক হৃদয়কে সরস করিবার জন্য যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন ধারার পর ধারা, ধারার পর ধারা—যাবৎ হৃদয় না প্লাবিত হয় তাবৎ আর সে অনুগ্রহবর্ষণের অন্ত থাকে না। সেই সপ্তমীর দিবাবসানে লালসাটীর সুখ, সেই অষ্টমীর রজনীতে দেবীদর্শনের সুখ, সেই নবমীর নিশায় কৃপণতার সুখ, সেই কোজাগার পূর্ণিমায় সুসংবাদের সুখ,—আমার হৃদয় এখন সুখে পরিপূর্ণ। আমার প্রকৃতিই এই,—যখনই হৃদয়ে কোন সুখ উপস্থিত হয়, তখনই সেই সুখ যে সুখের সামান্য আবেশমাত্র, সেই পরম সুখের কথা মনে পড়িয়া যায়, আমি সেই পরম সুখের আভাষ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক পরমানন্দময় রাজ্যে উপস্থিত হই। কোথায়ও কেহ নাই—ক্ষুদ্র কক্ষটি বেশ নীরব, শান্ত ; আমার প্রাণও বেশ নীরব শান্ত। এই নীরবতা ও শান্তভাবের মধ্যে যখন আপন-হারা হই, তখন উন্মুক্ত দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভাল করিয়া চাহিতে না চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে সাবিত্রীবালা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে সেই লাল সাটী, হস্তে শাঁখা, সীমন্তে সিন্দুর, আর চরণে অলক্তক। যেন কোথায় যাইতেছে মুখে এই ভাব। সাবিত্রী সতত গৃহকর্ম্মেই নিরত, থাকত, অবসর তাহার বড় একটা হয় না,—আজ হঠাৎ তাহাকে আমার

কক্ষে দেখিয়ে আমি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াতেই না দাঁড়াতেই ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করিল। আমি করযোড়ে মনে মনে সাবিত্রীবালাকে প্রণাম করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি সাবিত্রীবালা আমার সম্মুখে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু যেন চলিয়া যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক। জিজ্ঞাসিলাম "তুমি কি কোথায় যাচ্ছ?" সাবিত্রীবালা কি উত্তর দিত তাহা জানিবার সুযোগ আমার আর হইল না। মুহূর্ত্তে হাসিতে হাসিতে রাণী আসিয়া আমার নীরব কক্ষ মুখর করিয়া ফেলিল। রাণীর হাস্য পরিহাস ও চাপল্য দেখিয়া সাবিত্রীবালা ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। রাণী আসিয়া সাবিত্রীর সহিত ত আমাকে আলাপ করিতে দিলই না, নিজেও গল্প করিবার অবসর পাইল না। তাহার দিদির বর চন্দ্রনাথ বাবু আর সে চন্দ্রনাথ বাবু নাই, —তাঁহার এখন প্রকাণ্ড শরীর, তাঁহার এখন সেনার পোষাক! আমি যদি সে ঢঙ দেখিতে চাহি তাহা হইলে আমাদের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পারি ; রাণীর এখন আর আমার নিকট দাঁড়াইয়া সকল কথা বলিবার সময় নাই, এখনই বাসোরার গোলাপ চলিয়া যাইবেন, বিলম্বে তাঁহাকে আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইবে না—এই কথা বলিয়া রাণী ছুটিয়া চলিয়া গেল। কক্ষমাঝে রহিল রাণীর রুমালের হেনার গন্ধ আর তাহার হাসির ঔজ্জ্বল্য। ক্ষিপ্রগতিতে আমি আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইলাম। সাবিত্রীবালা স্বামিসঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাইতেছেন,—এই দৃশ্য দেখিব না তো দেখিব কি? এ' যে চিরপুরাতন তবু বড়ই নূতন ; সাবিত্রী-সত্যবান—উপাখ্যানের জীর্ণ কঙ্কালে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত হইতেছে,—এ' যে গভীর আঁধারে উজ্জ্বল আলোক, এ' যে গভীর নিরাশার মাঝে পরম আশা। ইহা দেখিব না তো কি দেখিব? তাই সেই সুখ-স্বরূপের স্পর্শানুভবের নবতরঙ্গে আমি সাবিত্রী সত্যবানের পুনর্জীবন দেখিতে বাতায়নে আসিলাম। ক্ষণপরে অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা সাবিত্রীবালা নববধূর ন্যায় লাজ-জড়িত-চরণে যানপার্শ্বে দেখা দিল! সৈনিক চন্দ্রনাথ পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন ; শঙ্খ-শোভিত হস্তে ঘটিকা-জড়িত হস্তের মিলন, এ যে বঙ্গদেশে একটু নূতন! সৈনিক চন্দ্রনাথ শকট আরোহণ করিলেন। শকট চালক ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া শকট চালাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে সাবিত্রীবালা ও চন্দ্রনাথ নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। হঠাৎ তখন আমার পুরাতন প্রাণে একটু নূতনত্বের সাড়া পড়িল,—একটা পুরাতন সঙ্গীতের এক কলি প্রাণ হইতে ছুটিয়া অধরপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। বাতায়নে গাহিতে লাগিলাম—

"তাপসেরই বামে ব'স লো রূপসী,
রাজভূষণ ত্যজ্য করে হও লো সন্ন্যাসী।"

অগ্র-বৈশাখ, ১৩২৪-২৫

কি দেখা

চিররঞ্জন দাস

আমি তখন সুদুর পশ্চিমে চাকরী করি। বৈশাখ মাস, চারিদিকে, গাছ-পালাগুলি যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। সারাদিনের খাটুনির পর একটু বিশ্রামের জন্য সামনের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। চাকর তামাক দিয়া গেল, আপনার মনের গম্ভীরতার সঙ্গে গুড়্‌গুড়ির গম্ভীর আওয়াজে চারিদিক বেশ জমিয়া উঠিতেছিল ; এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া তিনখানি চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল। একখানা, সরকারের কাছ হইতে আমার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, আর একখানা কয়লাওয়ালার হিসাব, তৃতীয়খানা আমার বাল্যবন্ধু উ...র কাছ হইতে। উ...ও আমি এক সঙ্গেই পশ্চিমে আসি। আজ ছয় সাতদিন হইল, হঠাৎ উ...দুই মাসের ছুটী লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা কেহ জানিত না, আমাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই। আমার প্রথমে বন্ধুর ব্যবহার একটু অদ্ভুত লাগিয়াছিল, এই চিঠিটা পাইয়া আমারও মনে হইল, উ...ও যেন মরিয়া বাঁচিয়া আছে।

উ...র পত্র।

প্রিয়—

তুমি যে আমাকে কি ভাবিতেছ জানি না। আমি কোন কারণে হঠাৎ এখানে চলিয়া আসিয়াছি। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, কাহাকেও কিছু বলিব না, তোমাকেও না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। একজন ব্যথার ব্যথী না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইব। আমি এই পত্রের সঙ্গেই সরকারের কাছে কাজ ছাড়িবার আবেদন পত্র পাঠাইতেছি, আমার আর কাজ করিবার বাসনা নাই। এ পত্র তুমি যখন পাইবে, তখন আমি যে কোথায় থাকিব তা জানি না। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না, আর কারও সঙ্গে দেখা করিব না, তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। তবে শোন,—আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার লক্ষ্ণৌতে আসি, তোমার বোধ হয় মনে আছে। তখন এখানে একজন ধনী মুসলমানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একদিন আমার নূতন বন্ধুটি তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলাম। দেখিলাম, খালি খাওয়া নয়, গান-বাজনার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সেখানে আমি মতিয়াকে প্রথম দেখি। মাতিয়া সে সময় এই প্রদেশে নামজাদা বাইজী ছিল, তুমি বোধ হয় জান। আমার তখন ৪৩ বৎসর বয়স, মতিয়ার ১৯ বৎসর। কিন্তু জানি না কেন সে রাত্রে আমি বাড়ী আসিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না। আমার খালি মনে হইতে লাগিল, ঐ দুটী চোখের ভিতর যেন কি দেখিয়াছি। কি যে দেখিয়াছি, তাহা জানি না। সারারাত প্রায় এমনি করিয়া কাটিল, ভোরের বেলায় ঘুমাইয়া পড়িলাম, কিন্তু তবুও ঐ দুটি চোখের হাত এড়াইতে পরিলাম না। স্বপ্নে দেখিলাম, মতিয়া কাঁদিতেছে, আমি তাহাকে সান্ত্বনার জন্য কত কথা বলিতেছি, কিন্তু সে মানিতেছে না। কতক্ষণ যে মতিয়া কাঁদিল, তা জানি না, হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"বাবুজি, এরা খালি আমার গান শোনে, আমার নাচ দেখে, আমার প্রাণের ব্যথার খোঁজ কেউ নেয় না। আমি ওদের মন রাখবার জন্য কত সাজ করি, কত রসের গান গাই, কত হাব ভাব কত রং

ঢংয়ে ওদের ভোলাই, ওরা দেখে ভুলে যায় অথচ ভাবে আমার প্রাণ নেই। কিন্তু আজ আপনি কেন আমার দিকে অমন ক'রে কেন চেয়েছিলেন? আপনি কি বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, আমাদের বাইরেরটা আমাদের ভেতরের নয়?" এই বলিয়া মতিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাথা ভয়ানক ভার ঠেকিতে লাগিল, বুকের ভিতর যেন কিসের একটা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। চাকর জলখাবার দিয়া গেল, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। কতক্ষণ যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখিলাম, যেখানে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, গাড়ী সেইখানেই আছে, আর গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম ; সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল ; "কোথা যেতে হবে?" আমি বলিলাম, মতিয়া বিবির বাড়ী।

গাড়ী মতিয়ার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দরজায় একজন দাড়ীওয়ালা দরোয়ান বসিয়াছিল, সে আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে মতিয়া বিবির ঘর দেখাইয়া দিতে বলিলাম। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। মতিয়ার ঘরে গেলাম, দেখিলাম, সে ঘরের ভিতর একটা ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। আমি ঘরে ঢুকিতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। আমাকে বসিতে বলিল, আমি বসিলাম। কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ মতিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি হঠাৎ এই সময়?" আমি বলিলাম,—মতিয়া, কাল যখন প্রথম তোমার গান শুনি, তখন থেকে আমার সব যেন কি রকম হয়ে গেছে। কাল সারারাত্রি আমি ঘুমুই নি, তোমাকে এমন ক'রে নষ্ট হ'তে আমি দেব না। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস, আমি তোমাকে বিবাহ করিব। মতিয়া হাসিল, আমি কাঁদিলাম। মতিয়া বলিল,—"বাবুজি, আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু ; আমাকে নিকা করিলে যে আপনার জাত যাবে।" আমি বলিলাম, —"আমি জাত মানি না।" মতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না, আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা মন আবার কেমন করিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের মত মতিয়ার ঘরে গিয়া বসিলাম, মতিয়াকে আবার সেই কথা বলিলাম। মতিয়া আবার হাসিল, আমি আবার কাঁদিলাম। এমনি করিয়া যে কতদিন গেল জানি না। অবশেষে একদিন মতিয়া আমার কথায় রাজী হইল। আমি মুসলমান হইয়া মতিয়াকে বিবাহ করিব ঠিক করিলাম ; বিবাহের দিন অবধি ঠিক হইয়া গেল। বিবাহের দুইদিন আগে সকালবেলা আমি মতিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গিয়া যা দেখিলাম তাতে আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, মতিয়া কাঁদিতেছে, তার হাতে একখানা চিঠি। আমি কাছে যাইতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মতিয়া চিঠিখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চিঠিখানা মতিয়ার মায়ের লেখা। আমি চিঠিখানা—একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম। চিঠি কাশী হইতে আসিতেছে। মতিয়ার মায়ের চিঠিখানা আমি এখানে তুলিয়া দিতেছি, তা' না হইলে তুমি সব বুঝিতে পারিবে না।

কাশী।

মা!

তোর কাছে একটা কথা বল্‌বো ব'লে আজ এই চিঠি লিখছি, তোর কাছে একটা কথা এতদিন লুকিয়ে রেখেছি। যা জান্‌বার সকলের অধিকার আছে আমি তা তোকে জান্‌তে দিই নি। তুই চিরকাল জেনে এসেছিস্ যে, তুই মুসলমানের মেয়ে। আমিও কখন ও কথাটা তোর কাছে খুলে বলি নি। কিন্তু আমার দিন ফুরিয়েছে! আমি তো চল্‌লুম। আমার যাবার

পর যদি কখনও কোন বিপদে পড়িস্, কি কোন সাহায্য দরকার হয় তো নিচে যে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা দিলাম, তার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার নাম বলিস, তা হ'লেই তিনি বুঝতে পার্‌বেন। উনিই তোর জন্মদাতা।..." দেখিলাম, আমার নাম ঠিকানা ওখানে, লেখা রহিয়াছে। মতিয়া কাঁদিতেছিল, আমি মতিয়াকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে গেল না। সে আমার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি, এখান থেকে চলে যান্। আমার কোন খোঁজ আর নেবেন না।" আমি এক বন্ধুকে মতিয়ার খোঁজখবর লইবার ভার দিয়া, তোমাদের কাছে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। এই গত দুই বৎসরে মতিয়ার খবর বড় বেশী কিছু পাই নাই। আমি ছুটি লইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধুর এক পত্রেতে জানিলাম, মতিয়া মৃত্যুশয্যায়। আমি তখনি লক্ষ্ণৌতে তার করিলাম ; তার উত্তরে শুনিলাম, মতিয়া আর ইহজগতে নাই। আমি, তোমাদের কিছু না বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, মতিয়ার সৎকারের জন্য। মতিয়ার বন্ধু-বান্ধবেরা কবরের বন্দোবস্ত করিতেছিল, কিন্তু আমি গিয়া তাহার দেহ সৎকার করিয়াছি। আমি যখন এখানে আসি, তখন ভাবিয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া যাইব, কিন্তু মতিয়ার সেই মরামুখে যেন একটা নূতন কি দেখিয়াছি, তাহা যতদিন না বুঝিতে পারি, ততদিন আর ফিরিব না।

ইতি
উ...

বৈশাখ, ১৩২৫

গানের কথা

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

সেইবারকার পূজার ছুটীতে এলাহাবাদে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। হঠাৎ মধ্যপথে কোন দুর্ঘটনার জন্য গাড়ী থামিয়া গেল। শুনিলাম সে দিন আর গাড়ী চলিবে না। ষ্টেশন নিকটেই। সুতরাং ব্যাগটি হাতে লইয়া তদুদ্দেশে ছুটিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, ইতিপূর্ব্বেই তথায় অনেক যাত্রী সমাগত। বিছানা, বাক্স ও মালে ক্ষুদ্র স্থানটি একেবারে স্তূপাকার।

ষ্টেশন-মাষ্টারটি অতিশয় ভদ্রলোক। যাত্রীদের যাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট না হয়, তিনি তাহা দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমাকে একটু ভদ্র যাত্রী দেখিয়া তিনি নিকটে আসিলেন। আমার আগমন ও গন্তব্যস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "এ দিকে আসুন।" পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিষপত্রগুলি কোনক্রমে সরাইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। অপরিসর একখানি ঘর দেখাইয়া তিনি বিনয় সহকারে কহিলেন, "আজ রাত্রের মতন এইখানটাতেই বিশ্রাম করুন।"

আমি তো হাতে স্বর্গ পাইলাম। হিম জিনিষটাকে আমি ছেলেবয়স হইতেই অত্যন্ত ডরাই। সুতরাং ষ্টেশনে টিনের সেডের নীচে রাত্রি কাটাইতে হইবে না জানিয়া আমি যে বিলক্ষণ খুসী হইয়া গিয়াছিলাম, ইহা বলাই বাহুল্য। মাষ্টার মহাশয়কে বিধিমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কুলীদের নিকট হইতে খানকতক চট সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ব্যাগটি মাথায় দিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। লোকটি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "মাপ করবেন, আপনাকে কি বিরক্ত করলাম?"

যদিও তাঁহার প্রতি আমার মনের অবস্থা নিতান্ত প্রীতিকর ছিল না, তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "না, বিরক্ত হব কেন?" ভাবিলাম, তিনিও বোধ হয় আমার মত বিপদ্‌গ্রস্ত এক যাত্রী ; অন্যত্র স্থানাভাবে এখানে আসিয়াছেন। চটের কিয়দংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিলাম।

একেই তো যাত্রাপথে ও বিদেশে লোকের সহিত অতি সহজেই পরিচয় হইয়া থাকে, তাহার উপর অতি অল্পক্ষণেই বুঝিলাম, নবাগত ভদ্রলোকটি অত্যন্ত গল্পপ্রিয় ও বেশ অমায়িক। আমাদের সদ্যস্থাপিত সৌহার্দ্দ্য ক্রমশ জমিয়া উঠিল।

কথায় কথায় জানিলাম, তিনি আমাদের স্বদেশীয়। ছেলেবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় কার্য্যোপলক্ষে অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিমে কোন রাজ-সরকারে চাকরী পাইয়া, আমাদের সঙ্গে এক ট্রেনে সেখানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা।

সে দিন বেশ চাঁদনী রাত্রি। ক্ষীণ চন্দ্রালোকের একটুখানি, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে এই সময় কে গান ধরিয়াছে। সঙ্গীতের প্রতি কোন কালেই আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না ; উপরন্তু আজকাল কেহ গান গাহিলে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিতাম। কারণ, গান আদর করিবার ক্ষমতা আমার কোন কালেই ছিল না। স্কুল ও কলেজের পরীক্ষা দিতে

দিতে আমার প্রাণ তো একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষান্তে যখন দেখিলাম, আমি মিউনিসিপ্যালিটীর ষাট টাকা মাহিয়ানার এক কেরাণী, তখন হইতে কলাবিদ্যার উপর মনের ভাব কিরূপ হইল, আর বলিতে হইবে না।" কিন্তু কি জানি কেন, যদিও গানটির অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই (কারণ, উহা উর্দ্দু ভাষায় রচিত এবং আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর) সেইদিন গানটি বড় মিষ্ট শুনাইল। চতুর্দ্দিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোমলকণ্ঠে সঙ্গীত। তখন প্রায় সমস্ত যাত্রিগণ গভীর নিদ্রামগ্ন। কেবল আমরা দুইটি প্রাণী অন্ধকারের ষ্টেশন-কক্ষে গল্প করিতেছিলাম।

গানটি শুনিয়া আমার বন্ধুটি বলিলেন, "এই গানের সঙ্গে যে করুণ ইতিহাসটুকু আছে, আপনি সেটা জানেন কি? ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমে এই গানটি আরও দুই তিন বার শুনিয়াছি,কিন্তু ইহার সঙ্গে যে কোন বিশেষ ইতিহাস জড়িত থাকিতে পারে, তাহা আগে ধারণা ছিল না।"

"কৌতূহলপূর্ণস্বরে বলিলাম, "না, জানা নেই!"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন।

মীর আলি তরুণ কবি। শিশুর মতন তাহার সরল হৃদয়, অতি সুন্দর ও কোমল। সে ছিল সৌন্দর্য্যের উপাসক। যেখানে সৌন্দর্য্যের তিলমাত্র প্রকাশ, সেইখানেই তাহার মন ছুটিয়া যাইত। কুৎসিত বা কদর্য্য তাহার নিকট একেবারে অসহ্য। বিশ্বের মলিনতা তাহার তরুণ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই সে অর্দ্ধোন্মেষিত পুষ্পের মত কোমল, প্রভাতের শুভ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু তাহার রচনা কেহ পড়িত না। কৃপণের ধনের মত সেইগুলি তাহার গৃহাভ্যন্তরে জমা থাকিত। সে দিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। সে সৌন্দর্য্য পাগল, ভাবে বিভোর। সে কেবল রচনা করিয়াই ক্ষান্ত।

মীর আলির পিতৃব্য এতদিন তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। সহরে তাঁহার রেশমের মস্ত কারবার। কত ধনী সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। একদিন তিনি নিতান্ত বিষয়ী লোকের মত মীর আলিকে বলিয়া পাঠাইলেন, হয় তাহাকে কাব্যরচনা দ্বারা টাকা আনিতে হইবে, আর নয় তাহাকে রেশমের কারবারে যোগ দিতে হইবে। বৃথা বাজে কাব্য লিখিলে আর চলিবে না। মীর আলি ভাবিল, তাহার কাব্য যে অর্থকরী নয়, সে জন্য কি করিবে? সে তো তাহার দোষ নয়। আর কারবার? সেও তাহার দুচক্ষের বিষ। কি করিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সে কিছু সময় ভিক্ষা চাহিল।

সে দিন তাহার মন ভাল ছিল না। পিতৃব্যের এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত পৃথিবীর উপর ঘন বিষাদের কঠিন ছায়া চাপিয়া বসিয়াছে। ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। সে পথে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তার এক প্রান্তে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া এক কিশোরী বালিকা ভিজিতেছিল। অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপ-কুঁড়ির মতন সুন্দর, কেবল শীতের প্রারম্ভকালে, তুষার-কণার নিষ্ঠুর আঘাতে কিঞ্চিৎ মলিন। দারিদ্র্যের কঠোর সংঘাতে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ। যৌবনের আগমন-সংবাদ বোধ হয় তাহার নিকট সবে পৌঁছিয়াছিল, তাই বালিকাসুলভ সরলতার উপর একটু সলজ্জ আভা।

মীর আলি তাহার নিকটে গিয়া কবির মত বলিল, "তোমাকেই তো আমি এতদিন

লজ্জাবশতঃ বালিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমাকে?"

মীর আলির কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। আলিরও বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে তাহার সৌন্দর্য্যের আদর্শ আজ পাইয়াছে। আজ তাহার আত্মা পরিতৃপ্ত।

আবেগপূর্ণ স্বরে সে বলিল, "হাঁ তোমাকে!"

সে কিছুই বুঝিল না। অবাক্ হইয়া মীর আলির দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া সে ব্যঙ্গ করিতেছে। মীর আলি কিছুই লক্ষ্য করিল না। তাহার প্রবল ক্ষুধা মিটিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নতমুখে মধুরকণ্ঠে কিশোরী বলিল, "আমার নাম দলিয়া। মীর আলি ভাষা শুনিল কি বীণার ঝঙ্কার শুনিল, ঠিক করিতে পারিল না। কেবল তাহার কানের কাছে বাজিতে লাগিল, 'দলিয়া দলিয়া।'

উন্মত্তপ্রায় তরুণ কবি কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে?" দলিয়া দেখিল, অকুল সমুদ্রে একটু ঠাঁই মিলিল। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে যে বৃদ্ধার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল, সেও আজ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অপরাধের মধ্যে সে যথেষ্ট ভিক্ষা আনিতে পারিত না। এখন সে সংসারে একেবারে একলা, একেবারে আশ্রয়হীন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া 'হাঁ' কথাটা বলিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। অথচ দারুণ অভাববোধ একটু একটু করিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে অতিকষ্টে মৃদুস্বরে সে বলিল, "হাঁ যাব।"

মীর আলি আনন্দে অধীর। না সে আজ একেবারে পাগল। বাড়ী পৌঁছিয়াই পিতৃব্যকে লিখিয়া দিল, সে আর তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী নয়, আজ থেকে সে নিজে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

সন্ধ্যার সময় মীর আলি তাহার বন্ধু কাশিমকে লইয়া ফিরিল। কাশিম তাহারই মত নবীন, তাহারই মত সংসারানভিজ্ঞ। সে এক পুরান বইএর দোকানে কাজ করিত। আর অবসর সময়ে মাঝে মাঝে গানে সুর দিত। দুই বন্ধুতে দলিয়ার এখন নিত্য-সহচর। সহজ কথায় দুই জনে একসঙ্গে দলিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী! কিন্তু কাহাকে যে দলিয়া বিজয়মাল্য দিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

কাশিম বলে, "আমি দলিয়াকে পূজা করি।"

মীর আলি কহে, "অনেক দিন পরে আমার আদর্শ পাইয়াছি।"

এ দিকে তাহাদের হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তাহা ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। কাশিম ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে, মীর আলির মাসহারাও বন্ধ হইয়াছে।

সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া একদিন দলিয়া বলিল, "আমাকে সহরে নিয়ে চল, সেখানে গান গেয়ে আমি পয়সা উপার্জ্জন করব।"

দুইবন্ধু স্থির করিল, তাহারা দলিয়ার জন্য কিছু একটা—বড় গোছের কিছু করিবে। তাহাকে যদি গানই গাহিতে হয় তো সে একেবারে নবাবের সম্মুখে গাহিবে। সকলকে একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিবে।

দুই জনে কার্য্যে লাগিয়া গেল। মীর আলি এক অভূতপূর্ব্ব গান রচনা করিবে, আর কাশিম তাহাতে সবচেয়ে ভাল সুর দিবে। সেই গান দলিয়া নবাবের দরবারে গাহিবে। কিন্তু গান তৈয়ারী হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইতে লাগিল।

দলিয়া দুই একবার কেবল উপহাসছলে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, গান কই?"

হৃদয়ে তাহার অপরিসীম আশা ; সে ভাবে,—রূপে ও গীতে সে একদিন বিশ্ব জয় করিবে।

এখন মীর আলি ভাবে কেবল গান আর গান। দিবসে নিস্তব্ধ উদ্যানে বসিয়া ভাবে গান। রাত্রে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে সে নিজকক্ষে বসিয়া ভাবে কেবল গানের কথা।

অবশেষে সেই গান-রচনা শেষ হইল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়া, আত্মার সমস্ত করুণ-রস মিশাইয়া মীর আলি তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে। ছন্দের ভিতর দিয়া যৌবনের উদ্দাম প্রাবল্য, প্রাণের মত্ত ব্যাকুলতা, হৃদয়ের কারুণ্য প্রকাশিত।

কাশিমকে ডাকিয়া সে কহিল, "ভাই, ধৈর্য্য ধর, এবার আমি জিতিলাম!"

আর কাশিম? কয়েকদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহার সুর ঠিক হইল।

আনন্দে অধীর হইয়া কাশিম বলিল, "এবার আমার জীৎ। এমনি করিয়া দুইজন সমস্ত প্রাণ দিয়া দলিয়ার জন্য গান প্রস্তুত করিল। লোকে এখন মীর আলির ও কাশিমের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। আছে শুধু তাহাদের গান ও দলিয়ার বিলাস আর উচ্ছৃঙ্খলতার কলুষ-কাহিনী।

তার পর সকলে মিলিয়া সহরে আসিল। লোকারণ্য নগরীর সাজসজ্জা দেখিয়া দলিয়া আশ্চর্য্য, মুগ্ধ। সে ভাবিল, দরবারে গান গাইতে যাইলে সে একেবারে মূর্চ্ছা যাইবে। দুই বন্ধুতে তাহাকে অনেক প্রবোধ দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবাব-দরবারে প্রবেশলাভ চেষ্টায় মীর আলি তাহার পিতৃব্যের এক ধনী বন্ধুর নিকট গেল। বন্ধুটি তো তাহার প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি মীর আলির কথায় রাজী হইলেন। দরবারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার দলিয়াকে দেখিতে চাহিলেন ; দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, দলিয়া একদিন তাহার রূপে পৃথিবী বশ করিবে। তিনি অবিলম্বে সমস্ত কথা নবাবকে খুলিয়া বলিলেন।

অতিশীঘ্রই মীর আলি সদলে নবাবের খাঁস দরবারে যাইবার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল। ইতিমধ্যে সারা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, কোথা হইতে দলিয়া নামে এক ওস্তাদ গায়িকা আসিয়াছে। কি তার রূপ আর কি তার গলা! শীঘ্রই সে নবাবের খাস দরবারে গাহিবে। সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু কোথায় আছে, কেহই জানে না।

আজ রাত্রে নবাবের প্রাসাদে খাস দরবার বসিল। সকলের মুখে কেবল দলিয়ার কথা। কাশিম ও মীর আলি কিছু অর্থ কর্জ্জ করিয়াছে। তাহাতে তিন জনের দরবারোপযোগী সাজসজ্জা তৈয়ারী হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে মীর আলি বলিল, "দলিয়া, আজ বড় আনন্দের দিন, আমরা যেন দিগ্বিজয় করিতে চলিয়াছি। দেখো, সেখানে যেন ভয় পেও না।"

একটি ছোট 'না' বলিয়া দলিয়া চুপ করিল। অন্তরে তাহার আশা ও ভয় যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যাশেষে তিন জনে দরবারগৃহে প্রবেশ করিল।

কক্ষটি বিলাসের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অসংখ্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ সুদীর্ঘ ছাদটিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সুবৃহৎ স্বর্ণখচিত দীপাধারগুলি সুগন্ধি প্রজ্বলিত আলোক বিকীর্ণ করিতেছে ; হর্ম্ম্যতলে বহুমূল্য কোমল গালিচা বিস্তৃত। চারিদিকে নীল রঙ্গের মখমলের পর্দ্দা ঘেরা। সম্মুখে ঈষদুচ্চ প্রস্তর-মঞ্চের উপর স্বর্ণ-সিংহাসনে নবাব আসীন। সুসজ্জিত পারিষদ্ ও সভাসদ্‌গণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। ফুলের সৌরভের সহিত হেনা ও গোলাপের সুগন্ধ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। কাশিম ও মীর আলি এক কোণে আশ্রয় লইয়াছে। আজ তাহাদের আনন্দ অপরিসীম। আজ যে তাহাদের প্রাণের দলিয়ার বিজয়যাত্রা।

নবাবের ইঙ্গিতে দলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। জরীর কারুকার্য্যখচিত ফিরোজা রঙ্গের পেশোয়াজ ও ওড়নায় তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল। ঠিক প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মত, কিন্তু তাহাতে কেবল মাদকতা, আছে, তীব্রতা নাই।

গায়িকার রূপ দেখিয়া সভাসদেরা চমক মানিল। যথারীতি অভিবাদন করিয়া দলিয়া কম্পিতকণ্ঠে গান আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সঙ্গীত খাদ হইতে অন্তরায় উঠিল। তখন তাহার লজ্জাটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গানে সে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিল। প্রসুপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার

সুললিত কণ্ঠস্বর উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল। সুমধুর স্বর কক্ষের প্রত্যেক প্রস্তরখানি স্পর্শ করিল,—চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে কাঁপাইয়া তুলিল। সমস্ত কক্ষখানি তাহা আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে নবাবের পদতলে ব্যাকুলভাবে লুটাইতে লাগিল।

নবাব নিজ কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া লইয়া দলিয়াকে পরাইয়া দিলেন।

সেই দিনকার মত দরবার ভঙ্গ হইল।

পরদিন মীর আলি ও কাশিম দলিয়াকে তাহার কক্ষে খুঁজিতে আসিল। কেহই নাই। কেবল শূন্যহর্ম্ম্য তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল।

একখানি পত্রখণ্ডের উপর দলিয়া লিখিয়া গিয়াছে, "আমার আশা সফল, আজ হইতে নবাবের অন্তঃপুরে আমার স্থান। তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাইও।"

হায়!

দুইজনে কক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

গান ও গল্প কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে নবাবের অভ্রভেদী শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ ভাসিতেছিল। আর দলিয়ার বিজয়দৃপ্ত আরক্ত মুখখানি ও প্রেমিকদ্বয়ের নিরাশমূর্ত্তি।

সহসা ভোরের শীতল বায়ু স্পর্শে আমার কল্পনাস্রোত থামিয়া গেল। দেখিলাম, আমার নবপরিচিত বন্ধুটি কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। ভাবিলাম, লোকটা আমাকে একটা বাজে প্রেমের গল্প বলিয়া বোকা বানাইয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

প্রেমে কত প্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

তারকদের গ্রামখানি বর্দ্ধমান জেলায়। বাড়ীর পাশে ঝোপ ঝোপ কলাগাছ; পথে কত ডোবা, পুষ্করিণী আমবন ; পথের ধারে বেড়ার তলায় তলায় কচু কালকাসন্দা দোপাটি লজ্জাবতীর ভিড়করা ঘাসবন। সদগোপ কৈবর্ত্ত গয়লাদের খড়ে ও হোগলায় ছাওয়া মেটে ঘরগুলি নিকান পোতান দিব্য ঝরঝরে। পদ্মদিঘীর তীরে বাবা মকরনাথের মন্দির, দেয়াল তার ফাটা, মাথায় অশ্বত্থ গাছ।

এইখানে গ্রামের শান্ত নীড়ে শষ্পহরিৎ কোলটুকুতে তারক আর তরীর স্বপ্ন—শৈশবকাল খেলা ধুলায় কাটিয়াছে। তখন তরী ডুরে সাড়ী পরা এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে, ডানপিটে তারকের খেলার সাথী। তারকরা ব্রাহ্মণ, আর তরীরা বদ্দি। অতটুকু বয়সে মায়ের কোল ছাড়িতে না ছাড়িতে তার খেলার পুতুলঘর ভাঙিতে ভাঙিতে, কবে যে তরী হতভাগীর কপাল পুড়িয়াছিল, স্বামী যে কি ধন, তাহা শিখিবার জ্ঞান না হইতেই —পুণ্যলোভী বাপের গৌরীদানের ফলে মেয়ের সীঁথার সিঁদুর হাতের শাঁখা ঘুচিয়াছিল, তাহা না তরী, না তারক, দুই জনের কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যেদিন তাহা বুঝিল, দু'জনে এক সঙ্গেই বুঝিল ; এ উহার মুখ চাহিয়া অন্তর দেখিয়া বড় সুখের বিনিময়ে বুঝিল।

তাহার পর তারক গ্রামছাড়া হইয়া কলিকাতার তেড়ি কাটিয়া, নোট মুখস্ত করিয়া, অকর্ম্মণ্য বাবু-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আসিল; আর শৈশবের পুতুলখেলা সারিয়া, কৈশোরের সেই সাথীটির অনাবিল সঙ্গসুখটুকুও হারাইয়া, বনের মেয়ে বনেই বাড়িতে লাগিল। ছেলেবেলা তরী লুকাইয়া তারকের মার কাছে আসিয়া জোর করিয়া তারকের পাতে মাছ খাইয়া যাইত; এখন সে স্বপাক হবিষ্যান্ন খায়। আগে এতটুকু দুধের মেয়ে বলিয়া মা অনেক কাঁদিয়া কাটিয়াও প্রাণে ধরিয়া তাহার হাতের চুড়ি নাকের নোলক খুলিয়া লইতে পারেন নাই, এখন সে নিরাভরণা বিষাদ-প্রতিমার সর্ব্ব অঙ্গ প্রকৃতিরাণীর দেওয়া গহনায় ভরা।

তারক মুক্ত কর্ম্মবহুল পুরুষ-জীবনে সব ভুলিতে পারিয়াছিল ; তরীর বঞ্চিত সঙ্কীর্ণ নারী-জীবনে ভুলিবার বড় কিছু ছিল না। ভগবান মন গড়িয়াছেন, আর মানুষে সমাজ গড়িয়াছে ; সবার পরিত্যক্ত এমন যে বৈধব্যের শ্মশান, সেখানেও মধুঋতুর স্পর্শ সকল কিছু ছুঁইয়া সবুজ করিয়া দেয়, একি বিড়ম্বনা!

তারকের মা তরীর রূপ দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইত ; তরীর মা ছলছল চোখে অঞ্চলে সইএর চক্ষু মুছাইয়া বলিত, —"ছি বোন্! করবি কি বল্? ওর পোড়া অদেষ্ট, আর এই কসাই সমাজ। নে ভাই, আমায় আর কাঁদাস নে।" তাহার পর দুঃখিনী পোড়াকপালী মেয়েটা রান্নাঘরের ভিজে দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়াছে দেখিয়া দুই সই বসিয়া বসিয়া মনের সুখে কাঁদিত।

যে বৎসর তারক ডাফ কলেজ হইতে বি এ. পাশ দিয়া গ্রামে আসিল, তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে কলেরায় তরীর মা মরিয়াছে ; এখন সে ভাই হরিপদর সংসারে বিনা মাহিনার দাসী। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ঘর নিকায়, বাসন মাজে, জল আনে, রাঁধে, দাদার ও বৌ-এর প্রাণ -পাত করিয়া সেবা করে, আর দিনান্তে একবার দু'টি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খায়। তবু পোড়ারমুখীর রূপ আর ঘোচে না ; এত অবহেলায় দুঃখেও ছিন্নকন্থা পরা দেহে "ঢল ঢল

কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।" যেখানে যাহা আদৌ দরকার নাই, সেইখানে কি ছাই তাহাই এমনতর অপর্য্যাপ্ত ঢালিয়া দিতে হয়। এ জগল্লীলার রঙ্গরাজের রঙ তামাসাই কি এমনি!! পাঁক, শ্যাওলা, কাঁটা আর সাপের রাজ্য, তাহার মাঝে রূপের খনি মধুসুগন্ধভরা কমলের সৃষ্টি ; নীল জলের অতল তলে যেখানে কেউ দেখিবে না, সেইখানে কিনা মুক্তা ও প্রবালের রাশি ; কালো কয়লার বুকে হীরা! জগতের ঠাকুর অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় ; তাহার লীলাও আবার তেমনি।

তখন গ্রামে জায়গায় জায়গায় আখ মাড়াই হইতেছে। দ্বিপ্রহর বেলা ; গ্রাম-খানি আলস্যে শ্রান্ত, আধ ঘুমে নিশুতি বিজন। পাঁজর-কণ্ঠা-বাহির-করা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হাভাতের মত হরিপদর ইটজিরজিরে পাকা বাড়ী খানিতে বোধ হইতেছে যেন কেহ কোথায়ও নাই। তারক আজ প্রাতে আসিয়াছে, বাড়ীতে দু'মুঠা ভাত কোন রকমে মুখে গুঁজিয়া বড় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছে। ইচ্ছা গ্রামখানি একবার ঘুরিয়া দেখিবে, আর যে কি ইচ্ছা, সে বলিয়া কাজ নাই। অনেক দিন পর আজ তাহার মনে পড়িয়াছে। হরিপদর বাড়ীতে অন্দরের উঠান বাহিয়া এক পাশের ঘরটিতে উঠিতে হয়, সেইটিই বৈঠকখানা ; নামিতে উঠিতে গলা খাঁকারী দিয়া না আসিলে, যাইলে, মেয়েরা পলাইয়া লুকাইবার সময় পায় না। হরিপদর বিবাহে তো তারক আসেই নাই, আজ সাত বৎসর পর গ্রামে তাহার এই প্রথম আসা। বাল্যের পুরাতন বড় পরিচিত, তবু আজিকার এই নূতন পাতা অজানা সংসারে সে কাহাকে ডাকিবে? বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল ধরিয়া সে এক আধবার কাঁপা চাপা গলায় ডাকিল, —"হরিপদদা" বাড়ী আছ?" হরিপদ তখন জমিদার শশীবাবুর কুমারদের আড্ডায় তাস খেলিতে ব্যস্ত, ঘরে বৌ খোকাকে লইয়া মাদুর পাতিয়া ঘুমে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতেও তারক ফিরিতে পারিল না। বাল্যের সুখস্মৃতি অনেক দিনের পর আজ এই ইটবাহির করা জীর্ণ ঘর খানি হইতে স্নিগ্ধ অনাহূত পুষ্পগন্ধের মত তাহার মন প্রাণ আকুল করিয়া বইতেছিল। কলিকাতার ফুলবাবুর বিলাস-মন্থর নিরর্থক তামস জীবন, তাহার পর এ যেন প্রথম সচন্দনবিগ্রহে উজ্জ্বল পবিত্র দেউলখানিতে পদক্ষেপ ; কত কাল রৌদ্র সাহয়া ধূলা আবর্জনা ঠেলিয়া এ যেন ঈপ্সিত গঙ্গায় শীতল স্নিগ্ধ অবগাহন। হউক ভাঙ্গা জরাজীর্ণ, হউক বনে বনময় সবার পরিত্যক্ত, তবু এ গ্রামের কোল ঠাণ্ডা ভরাট শান্তির ভাবে কেমন নিথর ও মন জুড়ান, তাহার উপর আবার সেই নিষ্কলঙ্ক সুখের স্মৃতি এমন মধুকেও মধুর করিয়াছে। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তারক দেখিল, একটি মেয়ে সেই বাড়ীতে আসিতেছে। নিরাভরণা মেয়েটির মাথায় কাপড় নাই, ভিজে এলো চুল, সর্ব্বাঙ্গভরা তরতরে যৌবন আর রূপের নদী, অসঙ্কোচ দীর্ঘ কালো চোখে বড় সাহস ততোধিক কৌতূহল। তাহার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিতে চাহিতে কাছে আসিয়া তরীর পা আর চলিল না, মুখ গণ্ড সব রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ উদ্ভিন্ন হইয়া কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। তারকের মন বসন্তের অলির মতো গুঞ্জরিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, —"সেই এই হ'য়েছে।" এদিক ওদিক দেখিয়া সহসা নত হইয়া ঢিপ করিয়া তারকের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া দুই হাতে পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তরী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। তারকও পলাইল।

তারক বার্ডসাই খাইত ; পায়রার খোপের মত সোজা তেড়ি কাটিত, গিলে কোঁচান মিহি ধুতি চাদর পিরাণ পাম্প-সুতে পাতলা কালো দেহখানিকে বড় যত্নে ফতো বাবু করিয়া সাজাইয়া তুলিতেছিল। আজ সব ভুলিয়া, বাড়ী গিয়া, উঠানে মায়ের কাছে বসিল। মা মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া মুখে গুল দিয়া সুপারি কাটিতে বসিয়াছিলেন ; ছেলেকে দেখিয়া

বলিলেন, —"গাঁ ঘুরতে গেলি, এত শিগ্‌গির এলি যে? ক্ষান্তপিসির ওখানে গিছিলি? আর হরিপদদের ওখানে—?" ছেলে হেঁট মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, কোন উত্তর করিল না। তারকের মা দুর্গামণি বড় বুদ্ধিমতী; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আহা তোর সেই খেলার সাথী তরী—এখন আর ওকে চোক মেলে দেখা যায় না। পোড়া বিধি বড় পাষাণ রে, এমন মেয়ের কপালে এত দুঃখুও লেখে! কিছু বুঝলে না দেখলে না, এই বয়েসে অমন সোণার পিরতিমে যোগিনী সাজলে। হাঁ রে তারক, বিদ্দেসাগর না কে নাকি বিধি দিয়েছে, বিধবার বে হয়? সিদিনকে চন্দনার মিত্তিরদের বিধবা মেয়ে জগদম্বার বে হ'লো। ওহ্! মা গো মা! সে কি ঘোঁট পাকান, সারা গাঁটা ভরে কি কোঁদল। নিন্দেয় কাণ পাতবার জো নেই, মাগী মিন্‌সেদের না খেয়ে খেয়ে কেবল ঐ কথা ঐ কুচ্ছো! বাপরে বাপ, পরের দুঃখে কোথায় সহায় হবে, না এত ঝাঁটা নাতিও মাত্তে পারে। ধন্যি তোদের সমাজ। তোরা ছাই পাঁশ কি নেকা পড়া শিখিস রে? এই ঘোঁট পাকানর একটা হিল্লে কত্তে পারিস্ নে?"

আমাদের হিন্দু সমাজে মেয়েরাই আচার নিষ্ঠার রক্ষী; কিন্তু প্রেম ও স্নেহ বাঁকা মনকেও সরল করে; বুদ্ধি দিয়া অনেক বিচার করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, প্রেমে সে জ্ঞান সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত! দুর্গামণি সইএর মেয়ে তরীকে আপন পেটের মেয়ের মত ভালবাসিয়াছিল; তাই তাহার দুঃখ সে কেমন বুঝিত, আর কেহ তেমন বুঝিত না। তরীর কিন্তু কোন দুঃখ নাই; পিঞ্জরের পাখী তাহার সেই লোহাঘেরা বাঁধনটুকুকে ভালবাসিয়া ফেলে; পাখীটাকে বাহির করিয়া পিঁজরার দ্বার বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া সেই বন্ধ দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়। অবাধ অনন্ত নীল মুক্তি তাহার কাছে ভয়ের সামগ্রী ; বন্ধনটা বেশ পরিচিত—সহজ, তাই শান্তিময়। তরী দিবারাত্র মনের সুখে খাটিত, খোকা কোলে পায়ের উপর পা দিয়া বৌদি'র ঝাঁঝাল তর্জ্জন গর্জ্জন হাসি মুখে সহিত, থপথপে মোটা সাদাসিধা ভোলানাথ গোছের দাদাটিকে প্রাণ দিয়া যত্ন করিত ; কিন্তু নিজের জীবনে যাহা নাই তাহার দুঃখ বুঝিত না। স্নেহময়ী দুর্গামণি কিছু বলিলে, তাহার ব্যর্থ যৌবনের দুঃখে কাঁদিলে, সে লজ্জা পাইত; তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িত। তাহার বউদিদি কেষ্টকালী বড় সেয়ানা মেয়ে, সেই গৌর গোলমাল বর্ত্তুলের মত দেহটি আর চঞ্চল তীব্র চক্ষু দুইটি ভরিয়া তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি নাচিয়া ফিরিত। ভালমানুষ হরিপদকে সে চিনিত ; তাই ঠাকুরঝিকে শাসন করিবার লোভ সে কর্ত্তা বাড়ী থাকিলে সংযত রাখিত, গলায় মধু ঢালিয়া ডাকিত, "ঠাকুরঝি, খোকার দুধটা দিয়ে যাও না, ভাই।" স্বামীর কাছে দাঁড়াইয়া রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বা বলিত, "আহা! ঠাকুরঝিই যেন খোকার পোষ মা হয়ে বসেছে গো, কি যত্নটাই না করে।" স্বামী কিন্তু না থাকিলে, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিত,—"ওমা! থালা রাখবার ছিরি দেখ? বাসন কোসনগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গলে।" আর কোন ছুতা না পাইলে বলিত, —"ভাই বাপু বোনের কথায় অজ্ঞান! আমি না উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।" পানে চুনে মিশে গেল, বরজের বোঁটা বরজে রইল। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, এ সব মেয়ের হাতে পায়ে কথা কয়। সোয়ামী তো জন্মে এস্তক খেয়েছে, এখন আমাদের খেলেই হয় আর কি।"

তরী রান্না ঘরে বসিয়া ভ্রাতৃবধূর এই গঞ্জনা কটূক্তির সহিত ভাইএর আদরের ভাত খাইত, আহারান্তে সব গুছাইয়া রান্না ঘরে শিকল দিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া হাসিমুখে বলিত,—"বৌদি" তুমি একটু ঘুমোও, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে আনি।" বউদিদি তেলে জলে পুষ্ট নধর দেহখানি মাদুরে ঢালিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিত, "তবু যা হোক, আমার দরদ দুঃখু মনে পড়লো। আমি বলি আজ আর হাত আজাড় হবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তরী ছেলেবেলা হইতে হরিপদর কাছে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃতর আপনাভোলা কান্ত ভাবের মাধুর্য্য তাহার সহজে প্রেমপ্রবণ চিত্তকে আরও কোমল আরও প্রেমোন্মুখ করিয়াছিল, যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শোধনে এ প্রেম ভগবানে আপনা আপনি অর্পিত হইয়া যায়, তাহা সে সংসারের দুঃখ কষ্টে—এই সবেমাত্র শিখিতেছিল। শেখা সম্পূর্ণ না হইতেই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতির সুখাবেশ লইয়া তারক অতর্কিতে তাহার মনোজগতে আসিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের সমাগমে লতার অঙ্গে রস, ফুলের বুকে ফুটিবার আকুলি ব্যাকুলি আপনি আসে; শীতের সংযমে যোগিনী বনরাণী মাথা নাড়িয়া শাখা কিশলয় দোলাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কোন মতেই হরিত যৌবনজোয়ার রুধিতে পারে না। তরী অধীর হইয়া ভয়ে বিস্ময়ে কণ্টকিত শরীরে ভাবিতেছিল, "হে ঠাকুর! এ আমার কি হ'লো? ওগো, রক্ষা কর।" তারককে দূর হইতে শুধু একবারটি দেখিলেই অমৃতসিঞ্চনে তাহার সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া যায়, 'আরও একটু কাছে পাইলে জ্ঞান থাকে না, ভয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। সে প্রাণপণে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইত, পারতপক্ষে তারককে দেখা দিত না।

তারক গ্রামে বসিয়া বসিয়া কয়েক দিন গালে হাত দিয়া কি ভাবিল। সেই কৈশোরের নির্ম্মল খেলাধুলাটুকু সারিয়া কলিকাতা যাওয়া অবধি সে আর কখন পরের জন্য এমন করিয়া ভাবে নাই। বাসনা আর নিঃস্বার্থ দয়ার আজ এ কি সংগ্রাম! নীরব তারকের বুকের মধ্যে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নামাখা নিশায় কালবৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল। কালো মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে কামনার রক্ত বিদ্যুজ্জিহ্বা আর গর্জ্জন, আবার সেই তাল তাল কালোর ধারে ধারে করুণার চাঁদিনীর আঁকা শাদা জ্বলজ্বলে জরির পাড়। হরিপদদা'র সহিত একদিন তাহার এ সম্বন্ধে আলাপ হইল ; সব কথা শুনিয়া শিহরিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া হরিপদ বলিল, — "আরে সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়? বিধবার বিয়ে! আমাদের তরীর— আরে ছ্যাঃ।"

তা। যার মনে জ্ঞানে কখন স্বামিগ্রহণ হয় নি সে যে কুমারী। তুমি হিন্দু, ধর্ম্ম আচরণ কর, লোকে যা' খুসি বলুক না।

হরি। আমায় যে একঘরে করবে?

তা। তা' কি করে করবে, এ যে হিন্দু সমাজে চলে গেছে।

হরি। কৈ আর চলেছে, সে তো দুই একটা। আর তাদেরও কি কম লাঞ্ছনাটা হয়?

তা। দু' একটার বেশী যে হয় না, সে তো তোমার আমারইদোষ। লাঞ্ছনায় ভয় কর, তুমি পুরুষ বাচ্চা নও?

হরিপদ ধমক খাইয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে বসিয়া ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

তারক যাহাকে তরীর বর ঠিক করিল, সে খেড়োর রামকমল সেন, সবে বি এ পাশ দিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। ঘরে বুড়ায় দল নাই, সেই কর্ত্তা ; তাহারা বেশ বড় লোক, সুন্দরবনে তালুক আছে। শুনিয়া হরিপদের লোভ হইল, কিন্তু ভয় হইল ততোধিক। কথাটা যেই রটিল, গ্রামে আগুন লাগিয়া গেল আর কি! ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ কুব্জ দেহখানি লইয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চটি পায়ে আসিয়া তারককে বলিলেন, "কি হে ছোকরা, একেবারে গোল্লায় গেছ? নিজে নরকস্থ হবে, গ্রামশুদ্ধ নরকস্থ করবে দেখতে পাচ্ছি ; তোমাকে চটি পেটা করে আক্কেল দেয় এ রকম, কেউ এখানে নেই?" বুড়ার ঠোঁট বার্দ্ধক্যের বশে স্বভাবতই কাঁপিত, এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তারক সংযত হইয়া থাকিলেই ভাল

হইত, কিন্তু জুতা পেটার কথায় ইংরাজি পোড়ো ইয়ং বেঙ্গল তাহা সহ্য করিতে পারিল না ; নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "অপধর্ম্মের রক্ষক জুতো হাতে বামুন ছাড়া আর কে হবে?"

ভব। (চিৎকার করিয়া) বেহায়া বেল্লিক পাজী, নিজে ম্লেচ্ছ হয়ে হিন্দুর জাত ধর্ম্ম নষ্ট করতে এসেছ? তোমায় আমরা দেখে নেব। আর হরিপদর হুঁকো নাপিত বন্ধ না করাই তো আমার নাম ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ নয়।

মেয়েদের হাসি টিটকারী গঞ্জনায় তরীর ঘরের বাহির হওয়া দায় হইল। যে বৌদিদির বাক্যবাণ সে আশীর্ব্বচনের মত শিরোধার্য্য করিত, আজ ধৈর্য্য হারাইয়া তাহা বিষবোধ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রে অন্ধকারে আসিয়া সে তারকের মায়ের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া বড় কান্নাই কাঁদিল। দুর্গামণি অনেক বুঝাইলেন, শেষে তারককে ডাকিয়া দিয়া রান্নাঘরে গিয়া বসিলেন, বলিয়া গেলেন, "বাবা! আমি তো আর পারি নে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে গেছে। তোর ও খেলার সাথী, তুই যা' হয় কর্।" তরী আজ মরিয়া হইয়া আসিয়াছিল, তারকের সকল কথায় কেবল অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। শেষে সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তারক চলিয়া যায় দেখিয়া সে মাথায় কাপড় ফেলিয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারক বলিল "তরী! লক্ষ্মী দিদি আমার—।' তরী বাধা দিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোন রকমে বলিল,—"তুমি কলকেতায় চলে যাও, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, যাও।" সে দৃষ্টতে দুই জনের কাছে দুই জনের মন ধরা পড়িয়া গেল, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বলিতে আর বাকি রহিল না।

এ কথায় তারকের মনের কোথায় ঝন্ করিয়া যেন একটা শিরা ছিঁড়িয়া গেল। যাহার সুখের জন্য সে সব করিতে পারে, তাহার হিত করিতে গিয়া সেই কিনা এমন মর্ম্মন্তুদ দুঃখের মূল হইল। তারক শেষরাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল। রেলওয়ে স্টেসন সেখান হইতে দশ মাইল দূর, পথের মধ্যে পাঁচাল পাড়ার বিল আর আম বন, কাছেই কেশার মাঠ। অত সকালে বিলে বুনো বেলে হাঁস আর চকাচকি ডাকিতেছে। যাহাকে সুখী করিতে এত উদ্বেগ, এত কঠিন আত্মঘাতের কল্পনা, আপনার কলিজা, টানিয়া ছিঁড়িয়া পরকে দিবার চেষ্টা, তাহাকে না জানি কত কালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে। তবু তারকের বুকের মধ্যে একটা শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী পিণ্ড মন প্রাণ জুড়াইয়া বিরাজ করিতে ছিল। এ বিরহেও সুখ, বুঝি মিলনের অধিক সুখ ; কারণ সে আর পর হইয়া যাইবে না। আর সেই দৃষ্টি—অশ্রু সজল মনকাড়া বুকের গোপন ভাষাভরা ভাবস্তব্ধ প্রেমকরুণ সেই দৃষ্টি! মুখের কথায় আর মানুষ ইহার অধিক কি বলে! তরীর অত প্রেমের ধারা এক নিমেষে তারকের চিত্ত ধুইয়া বিমল করিয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে এত পাইয়াছে, যে আর চাহিবার কিছু নাই; সমাজের নিয়মে তরী চিরদিনই তাহার পর, কখন আপনার হইবার নয়। কিন্তু দেহ কতটুকু? মন যে ভূমা, সেই ভূমা মহান্ অনন্তের কোলে যে চিরমিলন হইয়া গিয়ছে।

সুখে মাতাল তারক ঊষার আধআলো আধছায়ার ঘোর বনের কোল দিয়া টলিতে টলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ একটা ইট আসিয়া তাহার মাথায় প্রচণ্ডবেগে লাগিল, চক্ষে আগুনের হল্কা জ্বলিয়া জ্ঞান হারিয়া লইল। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে মাটিতে সেই ঊষার ভিজা ঘাসে পড়িয়া আছে, আর তাহার সর্ব্বাগ্রে অবিশ্রাম কয়েকটা লাঠির মার পড়িতেছে। যে জ্ঞান এক মিনিটের জন্য হইয়া ছিল, তাহা নির্দ্দয় প্রহারে তখনি আবার গেল। দুই ঘণ্টার পর আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন সে সেইখানে রক্তে ভিজিয়া তেমনি পড়িয়া আছে,

খেড়োর রামকমল ঝুঁকিয়া তাহার মুখ দেখিতেছে। রামকমল বলিল, —“দাদা, একি? তোমার এ দশা কে করলে?” তারক হাসিল, বড় সুখে হাসি পাইয়াছিল, বলিল,—“ভাই আমার বড় আত্মজনে করেছে।” উঠিতে গিয়া তারক পড়িয়া গেল। রামকমল ডুলি আনাইল, তারকের কাকুতি মিনতিতে তাহাকে আর খেড়োতে লইয়া গেল না, কোলে করিয়া রেল পথে কলিকাতায় লইয়া আসিল। রামকমল অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বলিয়াছিল,—“দাদা, তোমার এ দশায় মা ছাড়া আর কার কাছে নিয়ে যাব, কে সেবা করবে?” তারক উত্তরে বলিয়াছিল, —“ভাই, সেবা আমার শ্রীহরি কর্‌বেন, আমি এ যাত্রা মরছি নে। তুমি একবার প্রকৃত সুহৃদের কাজ কর, আমায় কলকেতায় পৌঁছে দাও।”

রাম। তারা শুনলে কি ভাববে?

তা। তারাই আমায় কলকেতায় যেতে বলেছে, তরীর কাজেই যাচ্ছি।

রাম আর কিছু বলিল না; তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল, এবং দুই মাস থাকিয়া নানা চিকিৎসা করাইয়া তারককে সুস্থ করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,—

আমি এখানে আছি; কারণ গ্রামে এ পোড়াকপালীর ঠাঁই নেই। লোকে যা’ বলে, তা’ আমি নই এ কথা তো তোমাকে ব’ল্‌তে হবে না; সেই সাহসে পত্র লিখলাম। তোমার ছেলেবেলার খেলার সাথী তরী আজ অনাথিনী, কিছু টাকা পাঠাও এই ভিক্ষা ; পরের কাছে অনেক চেষ্টা করেও চাইতে পারি নি। নরহরির ঘাট, তুলসী বৈষ্ণবীর বাড়ী, এই ঠিকানায় পাঠালেই পাব। ইতি প্রণতা তরী।

পত্র পড়িয়া তারক অশ্রু রুধিতে পারিল না, ব্যাগে কাপড় চোপড় দু’চার খানা গুছাইয়া লইতে জলভরা চক্ষে দেখিয়া লওয়া কঠিন হইল ; বড় কষ্টে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ব্যাগটা হাতে বাহির হইয়া পড়িল। তারক এখনও ফুল বাবুটি, পাম্প সু, ব্যাঁকা তেড়ি, এসেন্স, ছড়ি, ঘড়ি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। এত তাড়াতাড়িতে এত বেদনা-কম্পিত দশায় যাই যাই করিয়াও এত দিনের অভ্যাসে হাত পা আপন মনে চুলাসই করিয়া চাদর কাপড় গুছাইয়া পরিয়া লইল।

তারক নবদ্বীপে কখনও যায় নাই, শুধু নবদ্বীপ কেন স্বগ্রাম ছাড়া সহরে কূপমন্ডুক সে বাঙ্গলার মাটি কোথায়ও মাড়ায় নাই। তাহার উপর তুলসীর সেই ভিজা গোবরনিকান ঘুঁটের ধুঁয়ায় ভরা ঘর ; অত সকালে তখন তরী স্নান করিয়া আসিয়া সিক্ত বস্ত্রে মাটিতে ঠেকাইয়া গোবিন্দ প্রণাম করিতে ছিল ; মাথা তুলিয়া তারককে দেখিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া জড়সড় ভাবে পলাইল। তুলসী আখা ধরাইয়া উঠান নিকাইতেছিল ; সে গোবর মাখা হাতে কোমর বাঁধিয়া তেমনি প্যাঁট প্যাঁট করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; হতভম্ব তারককে উস্‌খুস করিতে দেখিয়া বলিল, —‘তুমি কে গা? মেয়ে নোকের বাড়ী ধড়মড় করে ঢুকে পড়?” ততক্ষণে কাপড় ছাড়িয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরী আসিয়া তারকের পায়ের ধুলা লইল ; দাওয়ায় আসন বিছাইয়া দিতে দিতে অধোমুখে বলিল,—“ও ভাই আমার দেশের নোক, তুমি চট্‌ করে রান্না চড়িয়ে দাও গে, তিন জনের চাল নিও।” মুচকী হাসিয়া তুলসী চলিয়া গেল, তরী মরমে মরিয়া এতটুকু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারক ঊর্দ্ধনেত্রে বিহ্বলভাবে এতদিনের কামনার বস্তু দেখিতেছিল, বলিল, —“তরী! তুমি এখানে এমন দশায়?”

তরী পদনখে মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি তো টাকা চেয়েছিলুম।"

তা। টাকা এনেছি।

সে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দিল, তরী খুলিয়া তাহার দুইখানি লইয়া বাকি মাটিতে তারকের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিল, সসঙ্কোচে বলিল, —"আমার এতেই হবে।"

তা। সে কি?

"তুমি সন্ধ্যের গাড়ীতে যাবে তো? যাই, তোমার জল খাবার আনিগে" বলিয়া আস্তে ব্যস্তে তরী চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে আঁচলে মেঝে মুছিয়া জল ছড়া দিয়া তরী একখানি রেকাবীতে মুড়কি ও বাতাসা দিয়া গেল। তারক হাত পা ধুইয়া সেই গরীবের তুচ্ছ জল খাবার কতক খাইল, রোজ সন্দেশ রসগোল্লায় তৃপ্ত রসনা আধপথে জবাব দিয়া বসিল, গুড়ের মুড়কি তাহার অচল। দ্বিপ্রহরে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি, থোড়ের ডালনা ও বড়ি ভাজা দিয়া বুকড়ি চালের মোটা মোটা ভাত তারক আনমনে আধপেটা খাইল। আজ তাহার মধ্যে দুইটা মনের ঠেলাঠেলি বাধিয়াছে। একটি মন এ কুঁড়ে ঘরে অর্দ্ধাশনে এত দুঃখেও বড় তৃপ্ত, বুঝি সংসারের রাজার সুখেও উদাসীন ; আর একটি মন সে জমজমে আনন্দের মেলায়, কিছু বলিতে পারিতেছে না, কেবল পেছু পেছু খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ফিরিতেছে।

সন্ধ্যার সময় তুলসী হাটে গেলে, তরী আসিয়া তারকের শুইবার ঘরের দরজায় বসিল। তারক এতক্ষণ মনের কথা বলিতে না পাইয়া কণ্টকশয্যায় ছিল, এখন এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমার কাছে চল। এখানে এই দুঃখে তোমায় কি করে রেখে যাব?" তরী কিছু বলিল না, শুধু শান্ত মুগ্ধ চক্ষে বড় তিরস্কারের করুণ দৃষ্টি লইয়া চাহিল। তারক তাহাও সহিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। সমাজ যাহাকে এমন মরণের বাড়া কলঙ্ক দিয়াছে, তাহার সমাজের কাছে কি বাধ্যবাধকতা আছে? অনেকক্ষণ তরী কিছু বলিতে পারিল না। শেষে ভাবিল, এখনি তুলসী আসিয়া পড়িবে ; হয়তো উত্তর না পাইলে তারক আজ যাইবে না। তরী লজ্জার মাথা খাইয়া হেঁটমুখে বলিল, —"ছি! তোমার মুখে এই কথা! ওরা মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে, তাই সত্যি ক'রবো? তাদের মুখের চুন কালী তোমার মুখে—"

তারক স্তব্ধ হইয়া রহিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া এ উহার দিকে চাহিতে পারিল না। শেষে তারক জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল?"

তরী। গুরুজনের কথা, কি করে এ পোড়া মুখে বল্‌বো? একদিন রাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেছে। গাঁয়ের বগলা পিসি আর বৌদি' দাদাকে বল্‌লে, "ও চিঠি তরীর।" সবাই ঘুমুলে আমি রাত্তিরে একবস্ত্রে চলে এসেছি। বড় পোড়া কপাল, মরতে গিয়েও মরণ হ'লো না।

তা। কেন, যার চিঠি তার নাম বল্লেই পারতে।

তরী দাঁতে জিব কাটিল, বলিল, "ছি! তাও কি হয়। সে এয়োস্ত্রী, দাদার সংসার পুড়ে ঝুড়ে ছাই হয়ে যেতো। আমার আর জীবনে কি বাকি আছে, বল? দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নিতেই তো বিধবার জীবন।

তা। গঙ্গায় ডুবতে গেলে কেন?

তরী। তখন কিসের জন্যে আর বাঁচবো?

তা। এখন কেন বেঁচে আছ?

তরী। দেবতা ছুঁয়ে দিয়ে গেছে,—তারপর থেকে বুকটা ভরে রয়েছে। তুমিও যেও ; গয়ায় রামশিলায় থাকেন, গেরস্তনোক।

তারক মনে মনে বড় রাগিয়াছিল ; প্রেমের প্রথম রূপ বাসনাত্মক ; সে দয়িতের মনের বৃন্দাবন বুঝে না ; বাঘের মত লোলুপ হইয়া আহারের জন্য ঘোরে; কেবলি আত্ম উদর

পূর্ত্তির লালসায় গ্রাস করিতে চায়। যে লোভী, সে না পাইলেই হিংস্র পশু হয়। ক্রোধ-বিকৃতকণ্ঠে তারক বলিল, —"সে সাধু, ভালবাসার সে কি জানে?"

তরী। ছিঃ! সাধু নিন্দে কর্‌তে নেই। ভালবাসা আমরাই শিখি নিক, বাবাই ঠিক প্রেম জানেন। তিনি বলেন,—"প্রেম কি গলি বড়ি শাখরি" (সরু বা সঙ্কীর্ণ),সব না ছেড়ে একেবারে আপনা ভুলতে না পার্‌লে সেখানে যাওয়া যায় না।

তা। বিধবার কি বিয়ে হয় না? বিদ্যাসাগর—

তরী। বিধবার হয় জানি, কিন্তু বামুন বদ্দি! ছিঃ! আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, ওগো আমায় অমন তর কথা সব বোলো না।

আরক্ত মুখ ঢাকিবার জন্য তরী মাটিতে সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। তারক তখন নির্ম্মম, সে বলিল,—"কেন? তোমার আমার ভালবাসা পাপ নয়, মনে জ্ঞানে তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে?" তরী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কষ্টে বলিল, "সমাজের মুখ দেখ্‌বে না, আমায় এমন দুঃখ লজ্জা দেবে? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।"

তার। (উচ্চৈঃস্বরে) সমাজ! মানুষের গড়া শেকল, অবিচার অনাচার! ভগবান তোমার জন্যে আমায় গড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তুমিও তাই।

তরী। সমাজের মুখের চুণ কালী নিজের মুখে মাখবে, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা হেঁট করো না, চির দিনটা মনে হবে—

তারক ধূল্যবলুণ্ঠিতা তরীর সে অশ্রুসিক্তা দশা আর দেখিতে পারলি না, কাছে গিয়া হাত ধরিল। তাড়িতস্পৃষ্টার মত তরী উঠিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তে অশ্রু মুছিয়া বিবর্ণা অবলা ভিক্ষাকাতরা তরী কোমর বাঁধিয়া দৃপ্তা রণচণ্ডী হইয়া দাঁড়াইল ; ঘৃণায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল, —"ছিঃ। তুমি না পুরুষ! দেহটা কি এতই বড়? এই তোমার ভালবাসা? যার বড় সুখ আর কিছু নেই। মানুষকে যা' দিতে পারলে মন ভরে উঠে, নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির বোধ হারিয়ে যায়, যাও সেই ধর্ম বাবার কাছে শিখে এস। যাও, এখান থেকে যাও গো যাও ; ওরা গাঁয়ে আমায় যা' বলেছে, তুমি আমায় তাই ভাব, নইলে এমন করে কি নিতে আস্‌তে পার্‌তে?"

তারক কশাহত পশুর মত পলাইল। তরীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ লালসার ক্রোধ তাহাকে ত্রিতাপের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। সে ডুবিতে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঁড়ে ঘরখানা পোস্তার ধারে। সামনে তরতরে গঙ্গা,—বাঙ্গলার সেই সাগরসঙ্গমোন্মাদিনী হিন্দুর মনপ্রাণহরা ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা। আর কূল হইতে একটু দূরে পথের ওপারে রাঙা খুড়োর হোগলার ঘর। রাঙা খুড়ে পাকা আমটী, যৌবনে তাহার মত দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা এ অঞ্চলে ছিল না, এখন খুড়া কেবল সিদ্ধিখোর। একদিন খুড়ার দৌরাত্ম্যে পোস্তায় মানুষ বিব্রত সশঙ্কিত ছিল, ত্রিসন্ধ্যা গোপনে ঘুরে দ্বার দিয়া তাহাকে গালি না পাড়িয়া কেহ অন্ন জল গ্রহণ করিত না।

তাহার পর একদিন সাদাপাগড়ি পরা একজন পশ্চিমা লোক খুড়ার দাওয়ায় আসিয়া বসে। খুড়া নাকি নেশার ঝোঁকে সে লোকটাকে লাঠি দিয়া মারিয়া পাট করিয়া শোয়াইয়া ফেলে। মারিতে মারিতে নেশা ছুটিয়া গিয়া নিরস্ত হইয়া খুড়া দেখে লোকটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তাহার শান্ত স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটি ভরিয়া অপার প্রেম। লোকটি কাহার নাম করিতেই

খুড়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মতো কাঁদিয়াছিল। সেই হইতে খুড়া নীরব নিতান্ত নিরীহ মূক হইয়া বসিয়াছে।

সেই হইতে লোকে দেখিয়া আসিতেছে দাওয়ায় যেখানে এই অচিন্ত্য কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সেই থানে দিনের পর দিন খুড়া উপু হইয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় করিয়া তামাক টানে। যখন তামাক টানে না, তখন চুপচাপে একমনে বসিয়া মুখ নাড়ে, যেন ছাগলে চক্ষু মুদিয়া জাবর কাটিতেছে। খুড়া বড় স্বল্পভাষী, নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে এক কথায় জবাব দেয়। ব্রাহ্মণ দেখিলে খুড়া প্রণাম করে না, রক্তচক্ষে মারমুখী হইয়া কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে।

পাড়ার বামা আসিয়া নিত্য খুড়ার রান্নাঘর দাওয়া তুলসীতলা নিকাইয়া দু' বেলা দু'টি রাঁধিয়া দিয়া যায়। বামা এ পাড়ায় ছেলে বুড়া সকলের চিনি মাসি ; বড় বদরাগী ও কুঁদুলে; মুড়ো ঝাঁটা হাতে তাড়া করিয়া গেলে এমন জোয়ান পুরুষ বাচ্চা এ অঞ্চলে নাই, যাহার মনে মনে পগার ডিঙাইবার একটা অদম্য ইচ্ছা না হয়। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, তাই বামার নাম চিনিমাসি।

বামা নাকি খুড়ার অতীত জীবনের অনেক কথা জানে ; কিন্তু সে বড় চাপা মেয়ে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শণের নুড়ি চুল এলাইয়া হাত ঘুরাইয়া ছানাবড়ারমতো চক্ষু পাকাইয়া মেছনীর ভাষায় চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া ছাড়ে। সকাল সন্ধ্যা একবার করিয়া আসরে না নামিলে বামার চলে না; তাই সে সদাই কলহের ছুতা খুঁজিয়া ফেরে। আর কিছু না পাইলে রাস্তার মানুষ ডাকিয়া দাওয়া হইতে রণরঙ্গিণী বেশে আরম্ভ করিয়া দেয়, "ওরে, ও চোকখাকীর পুতরা! তোদের কি মাগ ছেলে নেই, আমারি আস্তাকুড়ে দিয়ে জুতোপরে ঐ গে খড়র মড়র করে যাবি আসবি, আর আমি মাগী বুড়ী হাবড়ী ছুটে ছুটে কে এল গে তাই দেখতে দোর খুলে দিতে আসবো। না?—" ইত্যাদি। যাহার কপালে এ মধুসম্ভাষণ ঘটে, সে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে সরিয়া পড়ে, পালটী জবাব বড় একটা দেয় না। কারণ বামা প্রায় জগদ্বিদিতা।

খুড়া বড় একটা বাদ যান না। বামা রান্না করে, খুড়ার তামাক সাজে, সন্ধ্যা কালে তুলসী তলায় ও ঘরে সন্ধ্যা দেয় আর কাজ কর্ম্ম না থাকিলে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া মনের সুখে নিরীহ খুড়ার বিষ ঝাড়িয়া দিয়া যায়। সহিষ্ণুতার অবতার খুড়া নীরবে নির্ব্বিবাদে জড়ের মত বসিয়া সে অনর্গল আশীর্ব্বচন শোনে ; বামা বড় বাড়াবাড়ি করিলে অগত্যা মরা ছাগলের মত চক্ষু ফিরাইয়া এমন চাহনীতে বামার দিকে চায়, যে বামা তাহা সহিতে না পারিয়া তড় তড় করিয়া পলাইয়া গিয়া বাঁচে। খুড়ার সহিত বামার কি যে ঝগড়া, পাড়ার লোকে তাহা বড় একটু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ঝগড়ার মধ্যে কেবল ঐ এক কথা, —"বল্ছি চ' বাপু, তিথি ধম্ম করে আসবি, তাকেও একবার চোখের দেখা দিয়ে আস্‌বি, না ঐখেনে দিবে নেই, রাত্তির নেই, উপু হয়ে বসে আছেন। এমন নোড়ে ভোলাও সাত জম্মে দেখিনি, ষাঁড়ের নাদ গো, ষাঁড়ের নাদ, ন দেবায় ন ধম্মায়।"

সে দিন কাকজ্যোৎস্না রাত। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে স্নিগ্ধ আলোর ঝিলিমিলি জাহ্নবী চাঁদে চাঁদময়। ঘাট বাট ভরিয়া ফুটফুটে আলো, সুখস্তব্ধা নিশার হাসিতে বুঝি আজ বান ডাকিয়াছে। বামা আঁচল বিছাইয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় এত বড় হাঁ করিয়া ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় রবে নাক ডাকাইতেছিল; বাহিরের দাওয়ায় রাঙা খুড়া যথাবিধি অচল অটল স্থাণুবৎ বসিয়াছিল। তখন গভীর রাত্রি, সব নীরব বিজন, কেবল দূরে গঙ্গার বুকে কোন্ হিন্দুস্থানী মাঝি গান ধরিয়াছিল।

"বংশী চোরায়ে রাধা প্যারী
কোই দেখো লোগা বংশী চোরায়ে—

কোন্ বংশে তেরো বঁশলী
কোন্ সখী চোরাই?
বন্‌শী চোরায়ে মনহারী।”

কার বাঁশী চুরি গিয়াছে, তাই তার জীবনের গান আজ মূক; সেই খেদে তার এত ক্রন্দন। খড়ারও অন্তর বাহির আজ কত কাল মূক, তারও বাঁশী যৌবনের প্রথম ফাল্গুনে চুরি গিয়াছিল। খুড়া নিঃশব্দে উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সেই ঝুরি নামা বুড়া বটগাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটা মিট মিটে আলোর সামনে বাবা বসিয়া গঞ্জিকার সেবা করিতেছিল, বাবার লোল চর্ম্মখানি কণ্ঠা ও গণ্ডের অস্থির উপর জিলজিল করিতেছে, মুখখানি রূপী বাঁদরের মত। হাসিলে দুই চক্ষুর কোণ হইতে ধনুকের মত কত রেখাই যে চোখের দুই কোণ অবধি জাগিয়া উঠে, সমস্ত মুখখানা রেখায় রেখায় ভাঙ্গিয়া গঙ্গার ঢেউকাঁপা বুকের মত দেখায়। খুড়া পায়ের ধুলা লইয়া বসিলে, বাবা সহাস্যে বলিল,—“কেয়া বেটা বঁশলী মিলা?” খুড়াও হাসিল। খুড়ার এ হাসি এই বাবা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না। সে হিন্দিতে বলিতে লাগিল, বাঁশী যার চুরি যায়, ওগো ছেলে, সেই বাঁশী বাজায় ভাল। দুঃখ হ'লো যমুনা তীর, ওঁহা বসে নন্দদুলাল, তোমার বাঁশলী পাওয়া গেছে।”

খুড়া মাথা নাড়িল। গৃহস্থবেশী এ অপূর্ব্ব সাধু তাহার চামচিকার ডানার মত অস্থি-চর্ম্মসার হাত দিয়া খুড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, —“হাঁ হাঁ, বাঁশলী মিল গিয়া, —দুখ যমুনা তট, ত্যাগ বৃন্দাবন, বাহিরের যে জন বন্‌শী চুরি করেছিল, অন্তরে সে জন ফিরিয়ে দিয়েছে। যাও, এবার বাজবে ভাল।” চড় খাইয়া খুড়ার এক অদ্ভুত ভাবান্তর হইল; সে উঠিয়া টলিতে টলিতে নদীর ঘাটের দিকে চিলল। যেন কানা, হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া যাইতে হয় ; যেন গড়াইয়া এখানে পড়িতে ওখানে পড়ে। তখনও গায়ক নৌকার ছইএর উপর লম্বা হইয়া গাহিতেছিল।

“লাল বরণকে চুড়িয়া শোভে
নীল বরণ্‌কে সাড়ী,
ওহি সখি বন্‌শী চেঁরাই।”

ঘাটে কে মেয়ে বসিয়া ছিল, উঠিয়া খুড়ার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। খুড়া টলিতে টলিতে তাহার মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিল। পায়ের উপর তেমনি পড়িয়া থাকিয়া সেই মেয়ে বলিতে লাগিল, —“আমায় বড় কলঙ্ক দিয়ে গাঁয়ের লোকে ভিটে ছাড়িয়েছিল। তোমার তরী কি মন্দ হ'তে পারে? তোমায় ভাল বাসতুম, তাই যে আমার মস্ত রক্ষাকবচ ছিল। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই, আজ যে আমার সাধ আকাঙ্ক্ষা অত ভালবাসা আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি অবধি কৃষ্ণে অর্পিত হয়ে গেছ। তুমি টাকা পাঠাতে, নবদ্বীপে বসে তাই খেতুম, আর সমাজ ও আত্মজন মিলে আমাকে যে দুঃসহ মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিল, সেই কলঙ্কে সত্যিকার দুখী মেয়ে যারা সেখানে আসতো, তাদের সেবা করতুম। আমায় দেখে আমার বুকের দানটা পেয়ে সবার পায়েঠেলা সেই দীন দুঃখী মেয়েগুলো শুধরে যেত ; আমার কথায় কত জন যে ভাল হয়েছে,তার হিসেব কিতেব নেই। কিন্তু নিজে সুখ সোয়াস্তি পাই নি ; এক ভয় ছিল তুমি—” বড় বাধ বাধ করিয়া অনেক কষ্টে তরী কথা শেষ করিল, —“তুমি আমার কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করেছিলে।”

আজ তারকের সেই সব কথা তুলসী বৈষ্ণবীর ঘরের সেই নিষ্কাম সতীরূপ মনে পড়িতেছিল। সে তরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, “সে দোষ আমার বুঝেছি, তরী; তুমি গুণে আমার অনেক বড়।”

তখন তরী মাথা তুলিল, তাহার সে অনিন্দ্য রূপ এত দুঃখেও তেমনি আছে; কেবল এক

মাথা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যেন সে কালো কুন্তল তরঙ্গে কে চুণ ঢালিয়া দিয়াছে। বিধবা তরীর বেশ সধবার, হাতে শাঁখা, মাথায় রক্ত জ্বলজ্বলে সিন্দুররেখা। মাথা তুলিয়া সে হাসিল, বলিল,--"আমি যে তোমার বলেই তা' পেরেছিলুম, তোমার বড় কি আমি হ'তে পারি। বাবা এখানে এয়েছেন? না?" খুড়া অঙ্গুলি দিয়া অদূরে বট গাছ দেখাইয়া দিল। তরী সেই দিকে উদ্দেশ করিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বার বার প্রণাম করিল, বলিল, —"নবদ্বীপে আমার সব দুঃখ জ্বালার ভার তুলে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে তোমার কাছে এসে আছেন। অমন শিবের মত মানুষ কি আর হয়? আমরা কি ভাগ্যি করেছিলুম বল দেখি যে এমন মানুষের সঙ্গ পেলুম?"

সে নিশা যে কোথা দিয়ে কাটিল, সেইখানে তেমনি উপবিষ্ট দু'জনের একজনও বুঝিতে পারিল না। সকালে তরী যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে নবদ্বীপের উদ্দেশে চলিয়া গেল ; যাইবার সময় পায়ের ধুলা লইয়া চক্ষের পাতাভরা অশ্রু চাপিয়া কাঁপা গলায় বলিয়া গেল, —"আমায় না পেয়ে তবু তুমি সুখে ছিলে, কিন্তু পরে সমাজের হাতে আমার লাঞ্ছনার বাজ তোমার বুকে যে কি রকম বেজেছিল তা' আমার বুঝতে বাকি ছিল না। তাই যখন শুনলুম তুমি পোড়া বিধির ওপর রেগে এমন সোণার বাটীতে কি ছাই পাঁশগুলে খাচ্চ, তখন তোমায় দুষতে পারি নি, কেরমাগত পড়ে পড়ে কেঁদেছি। বাবা আমার কান্না দেখে এলেন, তখন সাহস হ'লো, বুঝতে পারলুম, এ হতভাগীর চোখের জলে তোমার পাপ ধুয়ে গেছে। মন আর দেহটা আসবার জন্যে কাঁদতো, কিন্তু কে যেন শক্ত করে চুলের মুঠি ধরেছিল, —আসতে দেয়নি, তখন এমন করে বুঝিনি যে, এ সাধ আশা কি অবধি মুছে ফেলে তোমায় কত বড় পাওয়ার মধ্যে পাব।"

খুড়া এক বুক ঝড় লইয়া তরীর মুখের পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল। তরী বড় আনন্দে অবলীলাক্রমে নবদ্বীপের পথে চলিয়া গেল তাহার মনে হইতেছিল, আর না দেখা হইলেও চলিবে; এ মিলন ভাঙিবে না। বিধবা তরীর সীঁথায় সিন্দুর তখন সতীর পুণ্যে জ্বল জ্বল করিতেছিল।

খুড়া বাড়ী ফিরিয়া সংসারের কাজে ব্যস্ত বামার কাছে আসিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সে আনন্দ মন্থর মূর্তিখানা, নিস্পন্দ ভাবে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বামা হাতের ঝাঁটাগাছটা ফেলিয়া দিল; খুড়ার কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বরে অপার স্নেহ ঢালিয়া বলিল,—"আহা! এয়েছেল?" সে কথায় খুড়ার দুই চক্ষু বহিয়া ধারা নামিল। বামা সেইখানে মায়ের মত তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিল; এত বড় কুঁদুলে মেয়ের কণ্ঠে চেষ্টা করিয়াও কথা বাহির হইল না।

শ্রাবণ, ১৩২৭

স্নেহের টান

শ্রী-----

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমার প্রথম যৌবন। অল্প দিন হইল ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পশার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু সে জন্য বিশেষ ভাবনাও ছিল না। সংসারে তখন আমার আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও শরীরে এবং মনে যথেষ্ট শক্তি ছিল। অর্থের অভাবই তখন সুখ বলিয়া মনে হইত। আজ জীবনের এই সন্ধ্যায় এক একবার মনে হয় যে, যদি কেহ আমার সেই প্রথম যৌবনের শরীর না হউক মনটাকে অন্ততঃ, ফিরাইয়া দিতে পারিত, তবে আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ সানন্দে তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিতাম।

নদীর ধারে ছোট একখানি বাঙ্‌লা ভাড়া লইয়াছি। পূর্ব্বে ইহা-এক জন নীলকর সাহেবের কুঠী ছিল। বাঙ্‌লার সম্মুখে তাহারই বিস্তীর্ণ নীলের ক্ষেত বর্ত্তমানে তিন চারিখানা পল্লীর খড় জোগাইতেছে। বাঙ্‌লার পশ্চাতে নদীর সম্মুখে বাগান—ছোট একটি বাগান, সেই প্রস্তুত করিয়াছিল। বহু কাল অযত্নে থাকিলেও দুই একটি ফুল গাছ তখনও বোধ হয় আপনার পালন-কর্ত্তার উদ্দেশে দুই একটী ফুল প্রসব করিত। বাগানের মধ্যে ইজি-চেয়ারে বসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমি কবিতা পড়িতাম, মাঝিদের সারিগান শুনিতাম, নৌকার যাত্রীদের কথা ভাবিতাম, ওপারে কৃষকদের ঘরকন্না দেখিতাম—আবার কখনও বা শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় কৃষক ঘরে ফিরিত ; কৃষকপত্নী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত। কৃষকপত্নী গরুকে জাব দিত, কৃষক তামাক খাইতে খাইতে নিবিষ্ট মনে তাহা দেখিত। মাঝিরা "পরের জন্য কাঁদেরে আমার মন" বলিয়া গান গাহিয়া কোনও অজানা বিরহীর বেদনা প্রচার করিত। আকাশে চাঁদ উঠিত, তারা ফুটিত।

সে দিন রাত্রি কিছু বেশী হইয়াছে ; অষ্টমীর চাঁদ ডুবু ডুবু। কৃষক-দম্পতীর গৃহের ক্ষীণ আলোক অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে। দুরে জঙ্গলের মধ্যে সারমেয়ের চিৎকার আরম্ভ হইয়াছে এবং পল্লীর কুকুরগুলি তাহার যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর দিতেছে, এমন সময় বাহির দরজায় কে ডাকিল "ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু"।

"কে" বলিয়া আমি ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। বারাণ্ডায় দরজার সম্মুখে একটি বালিকা আমার অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এক পাশে দাঁড়াইতেই ঘরের আলোকরশ্মি একখানি সুন্দর মুখের উপর গিয়া পড়িল। বালিকা আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আমার মায়ের বড় অসুখ—আপনি শীগ্‌গীর আসুন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অনুনয়, দৃষ্টিতে একটা ভয়, একটা কেমন যেন ব্যাকুলতা মাখান ছিল। নিশীথে এই নির্জ্জন স্থানে বালিকাকে একাকী দেখিয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। নদীর ওপারে কৃষকপল্লী, এপারে বিস্তীর্ণ মাঠ। অথচ বালিকাকে ভদ্রঘরের বলিয়া বোধ হইল। তাহার পরিধানে একখানি জীর্ণ ঢাকাই সাড়ী। সাড়ীখানি বহু পুরাতন। আজকাল মেয়েরা অমন কাপড় পরে না। হাতে দু'গাছি বালা, বোধ হয় সোণার; তাহার স্থানে স্থানে গালা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বালিকা বোধ হয় বহু দুর হইতে আসিয়াছে—পথশ্রমে দুশ্চিন্তায় তাহার সুন্দর মুখখানি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল। জগতে তাহার আপনার বলিতে কেহ

থাকিলে, এ রাত্রিতে এমন স্থানে তাহাকে একাকী আসিতে হইত না, তাহা নিশ্চিত। সীমন্তে সিঁন্দুর আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। ঢাকাই সাড়ীর এক প্রান্ত বালিকার মাথায় ছিল. তাহার কতকটা স্থান রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া "তোমার মাথায় কি হয়েছে দেখি" বলিয়া হাত বাড়াইতেই বালিকা একেবারে তিন হাত পিছাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিল "ও কিছু না।" তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া অনুনয়ের সঙ্গে বলিল "বড্ড দেরী হয়ে যাচ্চে ডাক্তার বাবু, একটু শীগ্‌গীর চলুন।" নির্জ্জন স্থানে যুবকের স্পর্শের ভয়ে বালিকা সঙ্কোচ বোধ করিল, অথবা মাতার অসুখের জন্য—নিজের আঘাত তুচ্ছ করিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আর পীড়াপীড়ি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের বাড়ী কোথায়"? ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বহু দূরে আকাশের গায় একখানি গ্রাম দেখা যাইতেছিল, বালিকা সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "বনপুর"। "বনপুর? সে তো অনেক দুর" বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই বালিকা কাতরভাবে বলিল, "বেশী দূর নয়, মাঠের রাস্তা দিয়ে গেলে খুব শীগগীর যাওয়া যায়।" আমি আর দেরী না করিয়া তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পোষাক পরিয়া লইলাম। আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধ লইবার লোক থাকিলে বালিকা এই রাত্রিতে একাকী আসিত না—সুতরাং কিছু ঔষধ সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। তখন দুরে নৌকার উপর কোন সৌখীন যুবা গাহিতে ছিল—

না জানি কোন্ দূর দেশে
কোথায় চলেছি ভেসে
ধু ধু করে দুই পাশে
বিজন বেলা।

রাস্তায় বাহির হইয়া বালিকার ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। দুই পাশে কাশের বন। তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্য গমনাগমনে ছোট একটু পথ হইয়াছে, তাহাও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। আমার বুটের তলায় কাঁটা গুলি মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। বালিকাকে আমার পিছনে যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কণ্টকাবৃত গুল্মগুলি তৃণবৎ দলিত করিয়া তীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক একবার ফিরিয়া ব্যাকুল ভাবে আমার মুখের দিকে চাহে—আবার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। আমার মনে হইতে লাগিল যে এমনি একটি দিনের প্রতীক্ষায়ই আমি এত দিন এখানে বসিয়া ছিলাম। আমার ডাক্তারী পড়া সার্থক মনে হইতে লাগিল।

আমার এখন ব্যাধিতে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থচিন্তায় মুখশ্রী কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছে। আমাকে দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না যে, আমার এ শরীরে এক দিন বল ছিল, মনে পবিত্রতা ছিল, মুখে এমন একটা সরলতা মাখান ছিল যে সম্পূর্ণ অপরিচিত শিশুও আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দ্বিধা বোধ করিত না। আর আজ? আজ আমার নিজের সন্তানেরাও আমাকে দেখিলে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। এখন নিজে মরণের ভয়ে আকুল অথচ তখন প্রত্যহই জীবন দানের সুযোগ আসিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম।

অনেক দূর আসিয়াছি। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, গাছের আগায় এখনও একটু একটু আলো আছে। মাঠ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে আসিলাম। সমস্ত রাস্তা বালিকা আমার সঙ্গে কোনও কথা বলে নাই, আমি কিছু বলিলেও উত্তর দেয় নাই। এক খানি বহুপুরাতন বাড়ীর সম্মুখে গিয়া বালিকা বলিল, "ডাক্তার বাবু এই আমাদের বাড়ী" ; বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীখানির অবস্থা এককালে খুব ভাল থাকিলেও বর্ত্তমানে যথেষ্ট শোচনীয়—চর্তুদিকের ইষ্টক স্তুপের মধ্যে দুইটী কক্ষ কোন গতিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই একটী ঘরের কাছে গিয়া বালিকা আমাকে চুপিচুপি বলিল "মা এই ঘরে আছেন, আপনি ভিতরে যান।"

অনেকক্ষণ মাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, ভিতরে গিয়া কি দৃশ্য দেখিবে, ভাবিয়া বালিকা সহসা ভিতরে যাইতে সাহস করিতেছিল না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের মধ্যে রোগীর শিয়রের কাছে একটী মৃন্ময় প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, একখানি জীর্ণ তক্তপোষে মলিন একখানি কাঁথা বিছাইয়া অস্থিচর্ম্মসার একটী রমণী শুইয়া আছেন। তিনি প্রৌঢ়া কিম্বা বৃদ্ধা প্রথম দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্যের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে দুই একটা জিনিস গৃহস্বামিনীর পূর্ব্ব-বৈভবের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। ঘরের দেওয়ালে একখানি মূল্যবান ধূলিধূসর তৈলচিত্র। চিত্রখানির চারিদিকে একটা শুষ্ক গাঁদা ফুলের মালা; মধ্যে একটী যুবকের প্রতিমূর্ত্তি। মুখাবয়বে বুঝিলাম উহা বালিকার পিতার। আমার নড়াচড়ার শব্দে জাগরিত হইয়া রমণী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব মৃদু করিয়া উত্তর দিলাম, "আমি ডাক্তার।" রমণী পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে বলিলেন "ডাক্তার আপনি? চিকিৎসার প্রয়োজন আমার অনেক দিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। আমাকে আর বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন না, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" তারপর একটুক্ষণ থামিয়া আমায় বলিলেন, "এমন সময় আপনাকে কে এখানে লইয়া আসিল?—একজন মানুষকে জীবনের শেষ কথা না বলিয়া যে আমি মরিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম "আপনার মেয়ে আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

"আমার মেয়ে?" বলিয়া রমণী আশ্চর্য্য ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর চক্ষু নামাইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আজ দশ বৎসর হ'ল এই পাশের ঘরের একটা কড়িকাঠ তার মাথায় পড়ে তা'তেই সে'—বলিয়া রমণী চুপ করিলেন, তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি বিস্ময়ে বলিলাম, "সে কি? একটী মেয়ে যে আমাকে এখানেই নিয়ে এল। বাইরেই সে দাঁড়িয়ে আছে। তারও মাথা ফেটে গিয়েছে। পরণে একখানি ঢাকাই সাড়ি, হাতে দুগাছি সোণার বালা।" ব্যগ্রভাবে রমণী বলিলেন, "একবার দেখান, ডাক্তারবাবু, একবার দেখান, জন্মের শোধ একবার দেখান।" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। ইতস্ততঃ সন্ধান করিলাম, কোথাও জন মানবের চিহ্ন নাই। সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠল। আর বাহিরে দাঁড়াইতে সাহস হইল না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে রমণী আগ্রহে দরজার দিকে চাহিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "পেলেন কি?" আমি বলিলাম "না।" রমণী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ভয় বিস্ময় ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন "না পাবারই কথা, এখনও সে আমার মায়া কাটাতে পারেনি। ওই বাক্সের মধ্যে এখনও তার বালা সাড়ি আছে, আজ দশ বৎসর সেগুলি আমি বুকে করে রেখেছি। পেটে না খেয়ে রেখেছি কিন্তু তা বেচবার কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যেত, আপনাকে—সেগুলি দিলাম, নচেৎ আমার গতি হ'বে না। আমার শিয়রে চাবি আছে" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাক্স খুলিয়া দেখি সেই গালা বাহির করা সোণার বালা আর সেই ঢাকাই সাড়ি, তাহার এক প্রান্তে বহু কালের পুরাতন রক্তের একটী কাল দাগ রহিয়াছে। বিছানার দিকে চাহিয়া দেখি—রমণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণশূন্য দেহ শয্যাতলে লুটাইতেছে।

তারপর বহুকাল অতীত হইয়াছে, সেই দিনটার কথা যেন স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু বালিকার সেই সুন্দর মুখখানি এখনও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়।

আশ্বিন, ১৩২৭

ভিখারী

হেমন্ত কুমার সরকার

[১]

দৈনিক "সন্ধ্যার" স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"নগদ ১০০্ টাকা পুরস্কার, ৪ বছরের একটি ছেলে হারাইয়া গিয়াছে, রং ফরসা চেহারা মোটা সোটা, জোড়া ভুরুর মাঝে একটি বড় তিল আছে, যে সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে ১০০্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

তারা সুন্দরী দেব্যা
৪৯ নং বারীন্দ্র স্কোয়ার, ভবানীপুর।

[২]

রহিম রোজ সকালে "সন্ধ্যা" কাগজখানা পড়িত। বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ চোখে পড়িল। সে ভাবিল—ছেলেটি যদি ফিরিয়ে দিই তা হ'লে নগদ ১০০্ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে আর কদিন চল্‌বে—তাছাড়া শালারা পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে আমার ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিই, কত ১০০্ টাকা আন্‌বে—এ ছেলেকে সেই অবস্থায় দেখলে লোকের দয়া হবেই।"

[৩]

রহিমের মা হীরা বেওয়ার রূপযৌবনে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গুণ্ডামি করিয়া রহিমের সংসার চলিত এবং নেশায় খরচ আসিত। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে শুনিল তাহারই দলের এক বন্ধু তাহার মার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া গহনাপত্র টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছে—কেবল বন্ধুর মা বলিয়া খাতির করিয়া প্রাণে মারে নাই। গুণ্ডামির উপর রহিমের ঘৃণা হইয়া গেল। সে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু জেল-ফেরতের ভাল কাজ আর কোথায় হইবে? অবশেষে কসাইখানার একটা কাজ পাইল। সেখানে থাকিতে থাকিতে হাতের আঙুলগুলি কুষ্ঠরোগে নুলো হইয়া যাওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িতে হইল।

[৪]

রহিম কোকেন খায়, মধ্যে মধ্যে তাহার পিয়ারীর বাড়ী এক একবার যায়—আর এক অভিনব ব্যবসা করে। এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরেই সে তারাসুন্দরীর ছেলেটিকে চুরি করে। একদিন পুরোদস্তুর নেশা করিয়া আসিয়া সে ছেলেটিকে chloroform করিল—এবং তাহার হাঁটুর শির গুলি কাটিয়া ফেলিল এবং চোখ দুটি অন্ধ করিয়া দিল। কি জানি কি কারণে সে এই কাজটি সাদা চোখে করিতে পারিত না—তাই নেশায় বিভোর হইয়া আসিত। তাহার ব্যবসাই হইয়াছিল—ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া তাহাদিগকে অঙ্গহীন করা এবং রাস্তায় বসাইয়া তাহাদের পাওয়া ভিক্ষাতে খরচ চালানো। শিয়ালদহ, হাওড়া, হ্যারিসন

রোডের মোড়, ধর্ম্মতলা, কালীঘাট প্রভৃতি নানা স্থানে সে তাঁহার এই রোজগারের কলগুলি বসাইয়া রাখিয়া যাইত। তাহাদিগকে দু'বেলা বাসায় লইয়া গিয়ে স্নেহ যত্নে খাওয়াইত—আবার রাখিয়া যাইত।

[৫]

রহিমের মা বলিত—"বাবা, কার জন্য এই পাপ করিস, ওকাজ আর করিস নে, ভিক্ষে মেগে খাবো সেও ভাল। তুই তো বাবা, একটা বিয়েও কল্লিনে।" রহিম বলিত—"মা কুলীনের ঝাড় আর বাড়িয়ে কি হবে, আর এখন কে-ই বা বিয়ে দেবে, আর এই যে ছেলে-মেয়ে গুলো এদের তারই বা কে নেবে। মরণ পর্য্যন্ত আমাকে এদের নিয়েই থাকতে হবে। আর মা, এতে পাপই বা কি? চটের কল তো দেখনি, সেখানে হাজার হাজার লোককে পিশে কল-ওয়ালারা পয়সা করছে, গাড়োয়ানি ঘোড়া গরু খাটিয়ে পয়সা করছে—আর মা তোমায় খেতে দেওয়ার জন্য আমি এদের না খাটিয়ে বসিয়ে রেখে দু'পয়সা রোজগার করছি—এতে খোদা আমার উপর চটবেন না। এতে যদি পাপ হয় তো দুনিয়াই পাপে ডুবে আছে।"

[৬]

তারাসুন্দরী একমাত্র পুত্র হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়াছিলেন। দুঃখিনী বিধবা পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার কামনায় রোজ কালীঘাটে মায়ের পায়ে ফুল চন্দন দিয়া আসিতেন। কতদিন কাটিয়া গেল—সন্তানের দর্শন আর মিলিল না। ভাবিলেন মরিয়া গিয়াছে—আর পাইব না। আর মাকে ফুল চন্দন দিয়া কি হইবে? কাল হইতে আর আসিব না। আর মাকে ফুল চন্দন দিয়া কি হইবে? কাল হইতে আর আসিব না। ভিক্ষারীর জ্বালায় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন—তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে দিতে আর কখ্‌নো মন্দিরে আসিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন—এমন সময় কোমল কণ্ঠে একটি বালকের চীৎকার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল—"মা, মা, আমায় কিছু দিয়ে যাও, আমার যে মা, নড়ে খাবার সাধ্যি নেই।"

[৭]

বারবার কাতর কণ্ঠে মা মা ডাক শুনিয়া তারাসুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন— মনে হইল যেন এ চেনা-সুর, অনেকদিন আগের শোনা। ভিক্ষা দিতে কাছে গিয়া মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—সংজ্ঞা হারাইবার পূর্ব্বেই "বাছারে আমার—" এই কথা কয়টি জননীর মুখ হইতে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। বালকের অন্ধ নয়ন গলিয়া মাতার মূর্চ্ছিত ম্লান মুখে পড়িয়া অশ্রুধারার প্রয়াগ রচনা করিল।

আশ্বিন, ১৩২৭

হাত দু'খানি

বিভূতিভূষণ ভট্ট

যদু পোদ্দার একজন জন্ম-শিল্পী। সে যখন বাল্যকালে পরাণশীলের দোকানে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করে তখন হইতে তাহার ভবিষ্যৎ ওস্তাদির সূচনা হইয়াছিল। সে তখন হইতেই যে কাজটী করিত,—তা সে কয়লা জোগানই হউক, আর হাপর দ্বারা হাওয়া দেওয়াই হউক, দোকান ঝাঁট দেওয়াই হউক, আর গয়না সাফ করাই হউক, সবই সে এমন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে করিত, এমন আনন্দের সঙ্গে করিত, যে পরাণশীলের দোকানের প্রধান কারিগর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল যে 'এই ছেলেটী শেষে মস্ত কারিগর হ'বে।'

হইয়াছিলও তাহাই—প্রথম হইতে সুন্দরের দিকে ঝুঁকিয়া, সুন্দর করিয়া রাখা, সুন্দর করিয়া ঢাকা, সুন্দর করিয়া দেখা, সর্ব্বপ্রকারেই সে সুন্দর করিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিত। সে যেন প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল, যে, অলঙ্কার জিনিসটা সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই প্রস্তুত হয়। অতএব এই পোদ্দারী জিনিসটার আগাগোড়াই সুন্দর হওয়ার দরকার। স্বর্ণকারের কার্য্যই যেন সর্ব্বপ্রকারেই সুন্দরের পূজা করা, এই মন্ত্রই যেন কি এক অজ্ঞাত উপায়ে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই আজ, যখন সে পাকা কারিগর হইয়া নিজস্ব একটা দোকান করিয়া বসিয়াছে, তখনও সেই সুন্দরের দিকে, উজ্জ্বলের দিকেই তার ঝোঁক। সে যখন নিজের ক্ষুদ্র দোকানটিতে বসিয়া টুক্ টুক্ ঠুক্ ঠুক্ করিয়া এক মনে সোণার উপর ফুল, ফুলের উপর পাপড়িটীকে ফুটাইয়া তুলে, তখন তাহার মন কোন্ অজ্ঞাত, অদৃষ্ট একখানি সুন্দর হাতের রংটুকু, গোলত্বটুকু কমণীয়ত্বটুকুকে তাহার মনের সোণার উপর কল্পনার হাতুড়ি ঠুকিয়া গড়িয়া তুলে কে জানে?

দোকানটী খোলার অল্পদিনের মধ্যেই সে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সেও আজ প্রায় ৮।১০ বৎসরের কথা। সে গরীবের ছেলে, তাই তাহার বিবাহও তেমন অর্থশালীর ঘরে হয় নাই। কিন্তু সে অন্তরের সহিত সুন্দরকে চাহিত বলিয়াই বোধ হয় ভাগ্যদেবতা কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই একটী কালো কোলো সুস্থ সবল পাকা বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে তাহার জীবনকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতার পক্ষে যাহা কৌতুক মানুষের পক্ষে সব সময় যে তাহা কৌতুকপ্রদ হইবে, তাহা তো বলা যায় না। এ-ক্ষেত্রেও বিধাতার কৌতুক আমাদের যদু স্বর্ণকারের পক্ষে কৌতুকপ্রদ হইল না।

এই দুর্ঘটনার নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ এই ছিল, যে যদুর বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ওরফে বিন্দু, যদুকে যত ভালবাসিত তদপেক্ষা বেশী ভালবাসিত যদুর ডায়মনকাটার ক্ষমতাটিকে। সে চাহিত যদু যে গহনা, যাহারই জন্য গড়াক না কেন, তাহা একবার তাহার কালো অঙ্গে না উঠিয়া যেন কোন গৌরাঙ্গে না উঠে। আর কোনো সুন্দর অঙ্গে উঠিবার পূর্ব্বে তাহার কালো গায়ের স্পর্শ লাভ না করিয়া যেন কোনো অলঙ্কারই যদু পোদ্দারের দোকান না পরিত্যাগ করে।

কিন্তু সুন্দরের পূজারী যদুর ছিল ইহাতে মহা আপত্তি—কত দেবতা ব্রাহ্মণের জিনিস, কত মাঠাকুরাণীদের জিনিস, হয়তো কত দুর্গা ঠাকুরাণীর মত মা লক্ষ্মীর মত প্রতিমাদের

জিনিস, সেই সব জিনিস কি এমনি করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে আছে? কিন্তু উপায় নাই। তাহার চিত্ত যতই বিদ্রোহ করিত, তাহার চক্ষু ততই নত হইয়া মস্তক ততই কার্য্যের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই প্রবলা স্ত্রীর Sacrilegious* কার্য্যে সম্মতি দিত। কিন্তু সবদিনই যে মানুষ নিজের উপর এই অত্যাচার সহিতে পারে তাহা নয়। তাই সে একদিন অসাবধানে একটা ছোটো রকম বিদ্রূপ করিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া সে স্ত্রীর উক্ত প্রকার অসহনীয় কার্য্যও সহ্য করিয়া চলিত। সে ঘটনায় তাহার সমস্ত বিদ্রোহ একেবারে গৃহের বাহিরে পলায়ন করিয়াছিল, সেটি এই—

সে প্রায় চারি পাঁচ দিনের চেষ্টায় এবং মনের সমস্ত কল্পনা শক্তি সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি, প্রাণের সমস্ত আগ্রহ দিয়া একজোড়া বালা প্রস্তুত করিয়া প্রভাতের প্রথম আলোকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিল। ইচ্ছা, কোনো সুন্দর কোমল দু-খানি হস্তে পরাইয়া দেখে, যে তাহার প্রাণের সমস্ত সাধনা কতদূর সফল হইয়াছে। সময়টাও তখন ভাল ছিল না—বসন্ত প্রভাতের শিশির-কোমল আলো তখন সবে মাত্র তরুশির ছাড়িয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলের উপর পড়িয়াছে। নিকটের আমগাছটার আমের মুকুলের গন্ধের মধ্যে কতকগুলা পাখাতেও অকারণে পুলকের কলরব করিতেছিল। এবং পুকুরের ওপারের বাঁধা ঘাটে একটী তরুণী অকারণে আসিয়া হেমবর্ণ পিতলের কলসীতে কাকচক্ষুজল তুলিয়া লইতেছিল। তাহার সুন্দর হাত দু'খানিও অত্যন্ত লোভনীয় ভাবে জলের উপর অপূর্ব্ব পরশ রাখিয়া কলসীটাকে দুলাইয়া জল পূর্ণ করিতেছিল।

যদু আমাদের নিতান্তই কাজের মানুষ। তাহার অন্যদিকে মন দিবার সময় নাই, অথচ আজ তাহার এই বালা দুইটীর জন্য দুইখানি হাতের বিশেষ প্রয়োজন হইল কেন? সম্পূর্ণ মানুষ নয়, কিছুই নয়—শুধু দু'খানি কোমল সুগোল সোণার বরণ হাত—যেখানে যদুর এই এত স্নেহের এত যত্নের সোণার পাতার বালা দু'গাছি উঠিয়া তাহার প্রাণের সুন্দরের পূজার পিপাসা মিটাইবে। ঐ তো চাটুয্যেদের কমলা, উহার হাতে দিয়া কি একবার দেখা যায় না যে কেমন দেখায়? শুধু দেখাই তো? তা কি হয় না? চিরদিন কি কেবল এমনি সুন্দর জিনিষ গুলি তাহার হস্ত হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার কৌটায় ঢুকিয়া অজ্ঞাত অন্তঃপুরে চলিয়া যাইবে? সে কি একবার দেখিতে পাইবে না যে তাহার তিল তিল করিয়া প্রাণের সৌন্দর্য্য দিয়া গড়া জিনিষগুলি কাহার কোমল হাতদু'খানির কমনীয়তা কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে? তাহার সাধনা কতখানি সার্থক হইয়াছে?

না গো না, তাহা হয় না—তাহা হইবার নয়। সে কেবল স্বয়ং আগুনের তাপে জ্বলিয়া, হাত পুড়াইয়া, আঙ্গুলে ঘাঁটা পড়াইয়াই মরিবে, কিন্তু তাহার চক্ষুর সার্থকতা কখনই হইবে না।

সে সেইদিন প্রভাতে জাগিয়া পূর্ব্ব-রাত্রে শেষ-করা ঐ বালা জোড়া হাতে করিয়া কি যে মাথামুণ্ডু ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিকানাই রহিল না। এমন সময় বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া বলিল, "কৈ দেখি, কেমন হ'ল?" যদুনাথ হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া তাহার দিকে চাহিল, এবং তাহার অজ্ঞাতে তাহার হাত দু'খানা বিদ্রোহ করিয়া বালা দু'গাছি পশ্চাতে লুকাইয়া ফেলিল। বিন্ধ্যবাসিনী রাগিয়া বলিল "ওকি লুকুচ্ছ কেন? পরে দেখি, দাও না?"

যদুনাথ মুখ ফিরাইয়া বালা দু'গাছা তাহার হাতে দিল। বিন্ধ্যবাসিনী লোলুপ ভাবে দু'একবার নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে দুই হাতে সেই দুইগাছি প্রবেশ করাইয়া বলিল, "বাঃ বেশ দেখাচ্ছে—দেখ না?" যদুনাথের মতিচ্ছন্ন, কি দুষ্ট সরস্বতীর কারসাজী তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু সে একবার আড়চোখে বালা দু'গাছির দিকে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ খাঁটী সোণা বটে—কষ্টি পাথরের উপর বেশ জলুস্ দিচ্ছে।" আর কোথা যায়! বিন্ধ্যবাসিনীর বিন্ধ্যগিরির ন্যায় অভিমান মাথা

উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে বালা দু'গাছি খুলিয়া গবাক্ষপথে পুষ্করিণীর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আমার হাতে তো খারাপ দেখাইবেই গো—যাও ঐ কমলা বামনীর হাতে পরিয়ে দেখ গিয়ে, —বেশ দেখাবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী দ্রুতবেগে ভিতরে চলিয়া গেল। যদুনাথও ভয়ে দুঃখে এবং আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ছুটিয়া বালা দু'গাছি কুড়াইয়া আনিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর যাইবা মাত্র দেখিল, চাটুয্যেদের কমলা ঘাটে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, "পোদ্দার দা, বিন্দু বৌর কি সোণার বালা সস্তা হয়েছে নাকি, যে, অমনি করে সোণার জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল? যদি ফেলেই দে তো আমরা গরীব পড়সি রয়িছি, আমাদের ছুঁড়ে মারুক না।"

হায় রে আজিকার বসন্ত প্রভাতের বিফল শোভা! হায় রে অন্তরের সুন্দরের জন্য মানব-মনের বিফল বহিরভিসার!! হায় রে স্বর্ণকার যদুর মনের সোণাকে বাহিরে খোঁজা!! যাহাকে সে খুঁজিতে চায়, যাহাকে সে পাইতে চায়, সে কোথাও নাই, কোথাও কখনো ছিল কি না তাহাও বলা যায় না। সোণার হাতে সোণার বালা দেখাও এ জগতে দুর্লভ, যদুনাথ পোদ্দার তাহা দেখিতে পাইবে কি-রূপে?

যাক, এমনি করিয়া তো দিন যায়। এমন সময় একদিন তাহার দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিবাসীর মেয়ে কমলা আসিয়া বলিল, —"পোদ্দারদা, অনেক কষ্টে এই সোনাটুকু জোগাড় হয়েছে; তুমি যদি একটু দয়া কর তো অনেক দিনের একটা সাধ মেটে।"

সাধ! অনেক দিনের সাধ! কার সাধ? কমলার না যদুর? যদু অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দোকান ঘরের দরজার ফ্রেমের মধ্যে সোণার সন্ধ্যায় সমস্ত সোণাটুকু আসিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে নাকি? এই কয়লা, এই ছাই, এই লোহার সিন্ধুক, এই সব ধুলো মাটীর মধ্যে স্বয়ং কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'দয়া কর।' হায় রে দয়া! কে দয়া করিবে? আমাদের যদু না ঐ সাক্ষাৎ সন্ধ্যা লক্ষ্মীর মত তরুণী দেবতা?

কমলা তিন ভরি আন্দাজ কুচা সোনা যদুনাথের হস্তে দিল। যদুনাথ লোলুপ-নয়নে সেই সুগোল গৌরবর্ণ হাত দু'খানির দিকে চাহিয়া নতবদনে বলিল, "কি করতে হবে?"

"দু'গাছা রুলি!"

"কি প্যাটার্নের হবে?"

"সে তোমার যেমন পছন্দ—"

"আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার চাইতে কে ভাল বুঝবে?" আঃ দেবি, বাঁচালে। তুমি জন্ম জন্ম দেবী হয়ে জন্মাও—জন্ম জন্ম পতি পুত্র নিয়ে সুখে থাক, আর আমিও যেন জন্ম জন্ম তোমার হাতের রুলী গড়াতে পাই।

যদুর চক্ষে জল আসিল। এমন কথা সে একদিনও কাহারও মুখে শুনে নাই। সে যে সুন্দরকে চিনে—তার অন্তরে যে সুন্দরের পদচিহ্ন পড়িয়াছে এ কথা আর কেহ তো কখনো বলে নাই। কমলা আজ এই সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর মত আসিয়া তাহাকে বর ও অভয় দুই দান করিল।

"যদুনাথ নত বদনে বলিল "কিন্তু একটা কথা, যদি—"

"কি কথা বল না? বাণী? তা—"

"বাণী? না না তা কেন? তোমার রুলি গড়িয়ে দেব তার আবার বাণী? না—না তা নয়।"

"তবে কি?"

"আমি একবার গড়ান হলে তোমার হাতে পরিয়ে দেখব।" কমলা খুব জোরে হাসিয়া বলিল,—'পোদ্দারদা কি ক্ষেপলে না কি? এই আবার একটা কথা? পরিয়ে তো দেখতেই হবে, নইলে ঠিক হবে কেন? বেশ্‌, তা হলে এই কথা রইল। কিন্তু তিন ভরিতে হবে তো?"

"তা হবে, হতেই হবে, নইলে উপায় কি?"

"হ্যাঁ, আর যে নেই।"

"যদি দু'এক আনা বেশী লাগে, আমি নিজে দিতে পারি কি? দাম লাগবে না।"

"না—না সে কি কথা? তুমি কেন দিতে যাবে? বিন্দু বৌ শুনলে কি বলবে! ছিঃ তা কর না, ওতেই সেরে নিও পোদ্দারদা, নইলে বাবা রাগ করবেন,—তাঁকে লুকিয়ে মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আর যে আমার শ্বাশুড়ী এই গড়িয়েছি শুনলেই কত কথা বলে পাঠাবে। না পোদ্দার দা, আর খরচা বাড়িও না—ওতেই যাহোক করে সেরে নিও।"

কমলা চলিয়া গেল। কিন্তু যদুনাথের মনের কথাটা চিরদিন না বুঝাই রহিয়া গেল। সে কি সত্য সত্যই কমলাকে সোণা দান করিতে চাহিয়াছিল? তা নয়—নয়—নয়। সে যাহাকে নিজের প্রাণের পূজা দিতে চাহিয়াছিল তিনি কি যদুর প্রাণের নিবেদন শুনিতে পান নাই—বুঝিতে পারেন নাই? হয় তো পারিয়াছিলেন, কিম্বা হয়তো পারেন নাই। কিন্তু ভাগ্য দেবতা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বুঝিয়াছিলেন—এবং তাঁহার বুঝা চিরদিনই "উল্টা বুঝিলি রাম" এই নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে।

ঘটিলও তাহাই। যদুনাথও কি জানি কেন রাত্রি জাগিয়া এবং লুকাইয়া লুকাইয়া আপন মনের মত করিয়া রুলী দু'গাছি গড়াইয়া তুলিতে লাগিল। কমলাও প্রতিদিন আসিয়া সকালে সন্ধ্যায় "কৈ দেখি না"—"কেমন হল একবার দেখাও না"—প্রভৃতি বৃথা তাগাদায় তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু কমলার দুই বেলা যাতায়াতের উপর বিন্ধ্যবাসিনীর হঠাৎ ভয়ঙ্কর কুনজর পড়িয়া গেল। সেও সময় অসময়ে দোকান ঘরে প্রবেশ করিয়া সকল জিনিস নাড়িয়া ঘাঁটিয়া কমলার প্রার্থিত বস্তুটীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যদুনাথ এতই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল, এতই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিন্দুর চক্ষু হইতে রুলি জোড়া লুকাইয়া রাখিত যে বিন্দু কোনো উপায়েই সে দুই গাছি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না; কেবল বৃথা আক্রোশে তাহার স্বামীর মনের সমস্ত আনন্দটুকু তিক্তরসে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিত। যদুও যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল যে রুলি দু'গাছি কমলার করকমলে না উঠিয়া কিছুতেই অন্য কাহারো হস্ত স্পর্শ করিতে পাইবে না। তা' সে তাহার স্ত্রীই হউক আর যেই হউক। তাহার চক্ষুর তৃষ্ণাকে, তাহার অন্তরের পূজাকে সার্থক না করিয়া রুলি দু'গাছি কিছুতেই দিনের আলো দেখিতে পাইবে না।

কিন্তু ভাগ্য যেখানে বিরোধী, সেখানে মানুষের শক্তি কতটুকু। ভাগ্যদেবতার দুষ্টামীর কাছে যদুনাথের সমস্ত সাবধানতা বিফল হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি দরজা বন্ধ করিয়া খাটিয়া যদুনাথ দোকান ঘরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। প্রভাতে সেই অলঙ্কার জোড়া কমলাকে দিবার কথা—তাই তাহার রাত্রে নিদ্রা যাইবার অবসর ছিল না। প্রাণের সমস্ত শক্তিটুকু, সমস্ত আনন্দটুকু দিয়া সে গভীর রাত্রে রুলি জোড়া শেষ করিয়াছে। তারপর মাথার শিয়রে সে দু'গাছ রাখিয়া তাহার সে টাটের পাটীর উপরই গুড়ি শুড়ি মারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তারপর কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিল তাহার সমস্ত দরজা খোলা, এবং বিন্ধ্যবাসিনী সেই রুলি জোড়া পরিয়া হাসিয়া বলিতেছে, "কেমন? আমার আগে তোমার গড়া জিনিস কেউ পরতে পাবে? কমলা বামনীর ভারি সাধ্যি। আমার এঁটো সহরের সবাই পরছে তিনি

পরবেন না? ভারি ভক্তি! নাও তোমার ফুঁকো রুলি—এই রুলির জন্যে আবার এত রাত জাগা, এত লুকোচুরী!"

যদুনাথের হাতের গোড়ায় ইস্পাতের অনেক গুলো যন্ত্রই ছিল—হাতুড়ি ছিল, ছেনী ছিল, ডাইস ছিল, হাপর ছিল, এমন কি বাঁশের চোঁঙ্গাটাও ছিল। কিন্তু একটাও কাজে লাগিল না। যাহা কাজে লাগিল তাহা তাহার ডাগর রক্ত চক্ষু দুইটী। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিন্ধ্যবাসিনী একেবারে একবিন্দু হইয়া গেল। তারপর যখন সে চিৎকার করিয়া ডাকিল "বিন্দু!" তখনি বোধ হয় শুকাইয়া বিন্ধ্যবাসিনী একেবারে উবিয়া যাইবার মত হইল।

কিন্তু ঠিক সময়েই কমলা আসিয়া উপস্থিত। তাহার উপর চক্ষু পডিবামাত্র যদুনাথ আবার যে যদু পোদ্দার সেই যদু পোদ্দারই হইয়া গেল। কমলা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল "এই যে বিন্দু বৌ! কি হয়েছে ভাই, পোদ্দারদা অমন করে চেঁচাল যে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তখন আবার বিন্ধ্যবাসিনীমূর্ত্তিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন চেঁচাল তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর না। ভারি তো দু'গাছা ফুকো রুলি, তাই পরিছি তো এত রাগ! নে তোর রুলি নিয়ে ধুয়ে খেগে যা'—এরই জন্যে সকাল নেই বিকেল নেই তাগাদা! এরই জন্যে রাত জেগে দরজা লাগিয়ে খেটে মরা! আমি বলি কিইবা অপূর্ব্ব জিনিস। ও মা কিছু না, দু'গাছি এই রকম রুলি! নে কমলি তোর রুলি নিয়ে পালা।"

কমলারও রাগ হইল। সে বলিল, "তা গরীবের ঐ ঢের। কিন্তু তবু তো ওতেই তোমার লোভ পড়েছিল তোমার যদি এতই ওতে ঘেন্না তো পরতে গিয়েছ কি করতে?"

"আমি কি আগে জান্‌তাম? জানলে অমন জিনিস ছুঁতাম নাকি?"

"না ছোঁও, নেই ছোঁবে, এখন দাও তো আমাকে?" বিন্দু রুলি দুই গাছা ছুড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। কমলার এইবার খুবই রাগ হইল—সেও ঝগড়ায় কম পটু নহে। তাই সেও দু'কথা বেশ শুনাইয়া দিল। তারপর রুলি দুই গাছা তুলিয়া লইয়া বলিল, "না পোদ্দারদা, বেশ হয়েছে, ও যাই বলুক আমার খুব পছন্দ হয়েছে তুমি দুঃখ কর না।"

হায়রে দুঃখ! দুঃখ সুখ এই দুইটী মুখরা রমণীর বৃথা কলহে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রের পরিশ্রম, আশা, আনন্দ সমস্ত বেদনাভরা উদ্বেগ যা' কিছু তাহার প্রাণে জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল সমস্তই এক নিমেষে কোথায় পলাইয়াছে।

যদুনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, পছন্দ হয়ে থাকে নিয়ে যাও, দিদি।"

"তুমি যে বলেছিলে পরিয়ে দেখবে?"

যদুনাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না তা' আর কাজ নেই—তুমি নিজে পরে দেখ, ছোট বড় হয়, ঘুরিয়ে দিয়ে যেও, ঠিক করে দেব।"

কমলা রুলি লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার হাত দু'খানির দিকে যদুনাথ আর চাহিয়াছিল কি না কেহ বলিতে পারে না।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

* Sacrilegious—অপবিত্র কাজ : সম্পাদক।

গুরুদেব

বীণাপাণি দেবী

দরিদ্রা কাদম্বিনীর সম্বলের মধ্যে একটি ছাগশিশু, একটি ময়নাপাখী ও একখানি কুঁড়েঘর, এই লইয়া তার এ বিপুল বিশ্বে বাস। সে যখন আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায়, অবলম্বনহীন জ্ঞান করিয়াছিল, বিধাতা এই ছাগ শিশুটি তখন তাহার একমাত্র অবলম্বন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজিও সেই ছাগ শিশুটিই নিরবলম্বনের অবলম্বন হইয়া তাহার 'কিছুনাই' রূপ সর্ব্বনাশের মধ্যে 'আছে'—বলিয়া তাহাকে অভয় দিতেছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এই কুঁড়ে ঘরখানাই তাহার একমাত্র সম্বল। একখানি মুদিখানা দোকান ছিল, লোক অভাবে সেখানে উঠিয়া গিয়াছে. এমন কি পেটে যে পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা হইয়াছিল, তাহারও একটি নাই।

পাড়া পড়সীর দয়াতেই তাহার এই ভিটার ঘরখানি আছে নতুবা জমীদারের বাকী খাজনার দায়ে কোন দিন বিক্রয় হইয়া যাইত। সংসারে মাত্র নিজের একটা পেটের ভাত যোগাইতে যোগাইতে এখন কাদম্বিনীর হাতে বেশ দু'পয়সা হইয়াছে। এখন আর সে কাহারও ধার ধারে না। তবুও পাড়ার লোক তাহার উপকার বই অপকার করে না।

[২]

ভোরে উঠিয়া কাদম্বিনী ময়নাকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখাইয়া, উঠানে ছড়া ঝাঁট দিল। ঘরের কাজ করিতে যাইতেছে, এমন সময় ও-বাড়ীর মোক্ষর পিসি ডাকিয়া বলিল, "ও দিদি, আজ মুড়ি ভাজতে ও পাড়ায় যাব, তুমি যাবে কি?"

"আমার আর মুড়ি খাবে কে—যে ছিল সে তো আর" —বলিয়া কাদম্বিনী চোখে আঁচল দিয়া ঘরে উঠিল। মোক্ষর পিসি রাসমণি ঘরের দাওয়ায় এক পা রাখিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ছোট্ট একটি নিশ্বাসের সহিত বলিল, "আর যা' হবার তাত হয়েই গেছে—যাক্ যাক্, বেটা পুত কেউ আপনার নয়। আমি বেশ আছি, আর ও যদি ঐ মোক্ষ ছুঁড়ি না থাক্‌তো তবে আমি আরও বেশ থাক্‌তে পারতাম। ও দিদি, দ্যাখ্, দ্যাখ্ তোর ঘরের উপর দিয়ে হাঁড়িচাঁচা ডেকে যাচ্ছে, আজ বা তোর বাড়ী কে আসবে।"

কাদম্বিনী বাহিরে আসিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কাল থেকে দেখ্‌ছি বিড়েলে বোঝা নামাচ্ছে, আর ঐ অলক্ষণে পাখীটা ডেকে ডেকে খুন হচ্ছে। দেখে ভয় হয়।"

"ওমা শোন কথা, ভয় কিসের দিদি?"

"গরীবের বাড়ী কুটুম্ব এলে ভয়ের কথাই বটে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের বাড়ী আবার কটুম্ব কেন?" বলিয়া কাদম্বিনী ঘরে উঠিয়া গেল।

মোক্ষের পিসি রাসমণি একটু হাসিয়া বলিল, "নে, গরীবের বাড়ী গরীব কুটুম এলে তো ভয় নাই—ভয় হল তোর বড় মানুষ কুটুম। আজ আমিই না হয় তোর বাড়ী কুটুম, দে দেখি একটা পান, খেয়ে যাই।"

[৩]

হাঁড়ি চাঁচার ডাকের গুণে কাদম্বিনীর বাড়ী গুরুদেব আসিয়াছেন। চোখের জলে গুরুর

পদধৌত করিয়া কাদম্বিনী তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পায়ের গোড়ায় পড়িল। গুরুদেব কাদম্বিনীর মাথায় ধোয়া মুছা শ্রীচরণ তুলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখী হও।"

মাথা তুলিয়া, গুরুর পানে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কাদম্বিনী বলিল, "কি নিয়ে সুখী হব ঠাকুর? আমার যে কিছুই নেই।"

গুরু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কাদি, তুই অমনিই সুখী হবি, গুরুবাক্য কি নিষ্ফলে যায়? তোর আর কিছুই লাগবে না। হাঁ, কাদি তোর সে ছেলে কই, পেন্নাম তো করলে না।"

কাদি চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর, বার বছরের ছেলে, আমার'—

"মারা গেছে? তা বেশ। মা যারে নেয়, তারে কেউ রাখতে পারে না। কালী মা!"

কাদি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হাই তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ও কাদি, তোর ঐ বাহিরে আঙ্গিনায় যে পাঁটাটা চরে খাচ্ছে, ওটা কি তোর?"

কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া বলিল, "হ্যাঁ ওটা আমারই পাঁটা," —বলিয়া সে আবার চোখে আঁচল দিল।

ঠাকুর মুখখানি কিছু হাসি হাসি করিয়া বলিলেন, "বা দিব্য পাঁটাটি। অনেক দূর থেকে আসছি পাঁটা খুঁজতে। কই কাদি, প্রণামী কিছু দিলিনে?

কাদম্বিনী উঠিয়া ঘরে যাইতেই ঠাকুর বলিলেন, 'থাক, তুমি গরীব মানুষ, ও শিকিটা আধুলিটায় তো আর আমার পেট ভরবে না। তার চেয়ে বরং ঐ পাঁটাটাই আমি নিয়ে যাব। অষ্টমীর দিন একটা নিখুঁত পাঁটার দরকার হবে, অনেক দূর ঘুরে এলাম, নিখুঁত পাঁটা আর চোখে পড়লো না। ভাগ্যে তোর এই নিখুঁত পাঁটাটা চোখে পড়েছে তাই এবারকার মত রক্ষে, নইলে আবার আমায় পাঁটা খুজতে কত রাজ্যি বিরাজ্যি যেতে হত!"

গুরুর মুখের পানে চাহিয়া ভয়চকিত দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া কাদি জোরের সহিত বলিয়া ফেলিল, "ওটা আমি দিতে পারবো না, ঠাকুর!"

ঠাকুর নরম সুরে গলার স্বর কিছু খাটো করিয়া বলিলেন, "সে কিরে—মার পুজোয় লাগবে! এতো আর তুই আমায় দিচ্ছিস নে, মার পুজোর জন্য দিচ্ছিস, দিবিনে কেন?"

কাদম্বিনী বলিল, "মার পুজোয়ও আমি দিতে পাঁরবো না।"

ঠাকুর পঞ্চমে স্বর তুলিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "সকলেই দিল, আর তুই দিবিনে?"

হাত জোড় করিয়া কাদি কাঁদিয়া বলিল, "আর যা' চাও ঠাকুর ; সব দেব, কেবল ঐ পাঁটাটাই দিতে পারবো না।

"তোর আছেও ছাই" বলিয়া ঠাকুর হন হন করিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া কাদি পিছনে পিছনে গেল। বাহিরে আসিয়া ঠাকুর পাঁটাটায় কান চাপিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া কাদম্বিনী ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "ঠাকুর শোন ও পাঁটার বিত্তেন্ত। ও আমার ছেলের পাঁটা। আজ ছয় মাস হল ছেলে আমার মারা গেছে, যাবার বেলায়ও পাঁটার কথা তার মুখ থেকে সরে নি? ঠাকুর, রেখে যাও, পাঁটা আমি দেব না।"

তর্জ্জনী তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোকে মন্তর দেওয়াই আমার বৃথা হয়েছে। তুই ঘোর নারকী, পাষণ্ডী। মার পুজোর লাগ্‌বে আর তুই—" ক্রোধে ঠাকুরের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। গায়ের চাদর খুলিয়া পাঁটাটা বাঁধিয়া লইয়া ঠাকুর রওয়ানা হইয়া গেল। পাঁটাটা ম্যা—ম্যা রব করিতে করিতে পিছনে পিছনে চলিল।

কাদি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, পাঁটার ম্যা—ম্যা তাহার কানে আসিতে লাগিল মা—মা—মা। গুরুর কল্যাণে সে আজ দ্বিতীয় বার নিঃসন্তান হইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

চিত্র

অনাথনাথ ব।

প্রত্যুষ।

আমার এক প্রিয় আত্মীয়ের শবদেহ নিয়ে যখন শ্মশান ঘাটে এলাম তখন সূর্য্য ওঠে নাই। উষার সলজ্জ হাসিটী বাসরের মধুর রাত্রি প্রভাতের হাসিরই মত নির্ম্মল, সুন্দর। কলিকাতার গঙ্গার গর্ভ তখনও শীতের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট।

আমি দাঁড়িয়ে সেই শ্মশানের দৃশ্য দেখছিলাম। আমার সঙ্গীরা চিতায় আগুন দিয়ে একটু দূরে তীরে বসে গল্প কচ্ছিলেন। চারিপাশে চিতার রাশি সাজানো রয়েছে ; কোথাও আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করে জ্বলে সেই প্রথম প্রভাতের অন্ধকার আলোটীকে রক্তরাগোজ্জ্বল করে তুল্‌চে, কোথাও বা সদ্য নির্ব্বাপিত চিতার ভস্ম তুলে আত্মীয় প্রেতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কর্চ্চে। কোথাও একজন বসে গতজীবন প্রিয়ের উদ্দেশ্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে তার চিতার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে সেই মিলন বিরহের করুণ কাহিনীর মূর্ত্ত আকার দেখ্‌ছিলাম।

সেই অতি পুরাতন শ্বাশত দিনের প্রশ্ন আবার মনে জেগে উঠ্‌লো। আমার প্রিয় আজ আমার কাছে বসে আছে; কাল সে কোথায় থাক্‌বে? দর্শন বিজ্ঞান সেটা ত' কোন দিন ঠিক্ করে বল্‌তে পারে নি। কে যে সে কথা আমায় বল্‌বে সেটা যে আমি বুঝ্‌তে পারি না। এত মিলন, এত বিরহ, এত সুখ দুঃখ ত্যাগ আশা এ সবার অবসান কোথায়? এত স্নেহ এত ভালবাসার সমাপ্তি কি ঐ একটী ছোট্ট প্রাচীরে ঘেরা জায়গাটীতেই?

পাশে এসে একজন কে দাঁড়াল। তার দিকে ফিরে চাইলাম্। এ দৃশ্য কি আমি কখনো জীবনে ভুলতে পার্ব্বো? আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন বেশ্যা; তীর তরুণ যৌবন, অরুণবরণরূপ—কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মধ্যেও এমন একটা কিছু ছিল যেটা আমায় বলে দিয়েছিল—এ সৌন্দর্য্য গৃহের শ্রীর নহে—এ পণ্য। তার মুখ একটু শুষ্ক, বিরস। তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল একজন বৃদ্ধা—তার হাঁকডাক শুনেই বুঝতে পারা গেল সে বাড়ীওয়ালী।

সেই ছোট্ট মেয়েটী, —কারণ মেয়ে ছাড়া তা'কে আর কি বোল্‌বো—তার কোলে একটী কাপড়ে জড়ানো কি রয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম সেটা কি? গা শিউরে উঠ্‌লো।

বৃদ্ধা গলার জোরে শীঘ্রই ছোট্ট একটুকু চিতা সাজিয়ে নিল; আমি সরে দাঁড়ালাম্। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটী ঠিক্‌ই ছিল কিন্তু এবার যখন বৃদ্ধা তার হাত টেনে বল্ল—"নে, ওঠ্ এইবার শুইয়ে দে—অনেক দেরী হয়ে গেল"—তখন আর সে পাল্লে না। তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি চোখভরা জল! মনে হল যে একবার সে সেই পুটুলিটাকে মুখের দিকে তুল্‌ছিল, বৃদ্ধা এতক্ষণ অন্যদিকে ব্যস্তছিল, দেরী দেখে যেমন মেয়েটীর দিকে চেয়েছে অম্‌নি সে নামিয়ে নিল। তারপর যখন চিতার উপর শুইয়ে দিল, ওঃ সে কি কান্না—সে কান্নার শব্দ নেই, ছিল শুধু মৌন চোখের জল। ব্যক্তিতেই শান্তি, কিন্তু সে কেমন করে তার বুকের ভিতরে সঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের কান্নাকে ব্যক্ত কর্ব্বে? সে যে বেশ্যা, তার তো কাঁদতে নেই। আর চেয়ে থাক্‌তে পার্ল্লাম্ না; চোখ সরিয়ে নিলাম্।

শুন্‌ছিলাম বৃদ্ধা বল্‌ছিল—“নে, নে ঢের কান্না হয়েছে এইত সবে প্রথম, এমন আরও কত হবে!” কানে আঙ্গুল দিলাম। নারী যখন নারীকে এই জায়গায় এইভাবে বিদ্রূপ কর্ত্তে পারে তখন তার নারীত্ব কতদূরে পড়ে আছে!

কিছুক্ষণ পরে আবার মেয়েটীর দিকে চেয়ে দেখি সে অপলক দৃষ্টিতে সেই চিতার দিকে চেয়ে আছে; চিতা জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—সে যে ছোট একটুকু চিতা—তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে —“কি হয়েছিল বাছা?” উত্তর শোনবার জন্য সেই দিকে কাণ পেতে রইলাম্‌। “বাছা আমার”—তারপর সে যেন বুকের অসীম কান্না প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করলো—“বাছা আমার তিনমাস ধরে ভুগ্‌ছিল”।

আত্মীয়ের আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে যখন বাহিরে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম। তখন সূর্য্যের রক্তকিরণ গঙ্গাবক্ষে বয়ার কাচে প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়ছিল। ও পারে ঘুসুড়ির আর এপারের দূরে গোলাবাড়ীর কলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে বেড়ে উঠছিল। গঙ্গার তীরের মালগাড়ীগুলা ঘণ্টার শব্দ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে যাচ্ছিল।

পাশেই একটী পাণওয়ালার দোকানের দিকে দৃষ্টি পড়্‌লো। সেখানে সেই মেয়েটী আর বৃদ্ধা আর দু' একজন লোক মিলে গোল মাল করে পান সিগারেট খাচ্ছিল।

চেয়ে দেখলাম মেয়েটীর মুখে চোখে কোথাও বিষাদের আভাষ মাত্রও নেই।

মুখ ফিরিয়ে ভাব্‌লাম—এই বিস্মৃতি, এইই কি আদর্শ, না, এইই পতনের লক্ষ্যস্থান?

আষাঢ়, ১৩২৮

ডালিম

চিত্তরঞ্জন দাস

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ- প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই। ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোনো কালেই মানুষ বড় ভালো ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত, কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক রজনীর উৎসবের মতো কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল, কখন শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনোও সুখ হইতে আপনাকে কখনও শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনো সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনোও আফশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভুমির মতো মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত। সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত, আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মতো জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মতো এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল করা ভাব, আর তার চোখ দুটি? —চাহিবামাত্র আমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্‌গদ্‌ করুন ভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধহয়, আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণবাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটি খুব বড়, কটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়িটা পাওয়া যায়। বাড়ির সামনেই একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই শান বাঁধানো লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ির ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোনো অভাব ছিল না। নানারকমের প্রচুর সুরা, নানারকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ মন্দির দিনের মতো জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছতে একুট দেরী হইয়াছিল। কটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো

খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মতো সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটাইয়াছি, কিন্তু সর্ব্বদাই হালকা মনে ফুরতি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়িতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে —"চমকি চমকি যাও।" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, দাদা আ—গিয়া।" একজন বলিল, "দাদা, এই লাও এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর একজন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল —"কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কলঙ্কেরি কুল! ওগো সই কলঙ্কেরি কুল!" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, "দেখ্‌লে তারে আপনহারা হই।" আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন, 'দাদা, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়, ঠিক জানি কখন্ সন্ধ্যা হয়।" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, সারেঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ তবলার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম, অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতিবাগানের নুরী, পুতুল, কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক; কিন্তু সে দিন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল, "ডালিম"। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাস্, ওকে জান না?ও যে ডালিম, সহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানোর মতো চেহারা তো ওর নয়। ও যে এক কোণে ঘ'রে বসে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই তো ওর ঢং, ও অমনি করে লোক ধরে।" আমার মন তাহা জানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে-ও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনিতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না; আমার মনে হইল, সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটি যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম একাট গাও।" আর একজন বলিল, "ডালিম ভালো গাইতে পারে না।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল, —"আমি ভালো গাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও না?" সে একটু সরিয়া আমার সামনে বসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সে গানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোনো গানে পাই নাই। মনে হইল, ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভেজা সেই সুরে, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মতো জ্বলিতেছিল, সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতোই জ্বলিতেছে, ডালিম গাহিতেছিল—

"কেমন ক'রে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখো বঁধু হিয়ায় হিয়ায়।
প্রাণের পাতে ফুলের মতো
রাখব তোমায় অবিরত।
তফাত্‌ থেকে দেখব শুধু, রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখনও গান শিখেছিলে?" সে বলিল, "না ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—"আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক?" সে কোনো কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই গানটি আমাকে একলা একদিন শুনাইবে?" সে কোনো উত্তর দিল না। আমি বলিলাম— "এ সব তোমার ভালো লাগে?" তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল সে কোনো কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের সকলেরই তখন প্রায় মত্ত অবস্থা। একজন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিলো। আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপর, —তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম— "আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম, তারপর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতা-মণ্ডপ গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্‌ধপ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"ডালিম আমার তোমাকে বড় ভালো লাগে, আমার তো এমন কখনও হয় নাই।" সে বলিল—"ও কথা তো সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম—"তুমি তো আমাকে চেনো না।"তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল—"তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম—"জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই। এত দিনের জীবন যাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোনো কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়। আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল? একি সেই আমি! আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোনো অপরিচিত ব্যক্তি, এইমাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের, আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—"হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস, তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া ওঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি।" কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল যাও, তাই আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম—"শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল। আমি শুনিতে লাগিলাম, সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মতো বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে।

সে বলিল—আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে মামার বাড়িতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছ থেকে কখনও ভালো ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামার মামাতো ভাই আমাকে ভালোবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান। তারপর চারি বৎসর পর্যন্ত সে বাড়িতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার না শুনাই ভালো। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তারপর চার বৎসর শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। এই চার বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধহয় ছয়-সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দু'এক দিনের জন্য বাড়ি আসিতেন। বাড়িতে আসিলেও বাহির বাড়িতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছিল। কখনও কথাবার্তা হয় নাই। তাহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখন কখন মারও খাইয়াছি। বাড়িতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ির কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চার বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মতো হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই ছিল। মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বলিয়া পড়িতাম। আমার শাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেইদিন মনে মনে স্থির করিলাম এ বাড়িতে আর থাকিব না।

পাড়ার একটি ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম। চাঁদের আলো ছিল বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—"আমাকে মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পার?" সে বলিল—"কত দূর?" আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—"নৌকায় যাইতে তিন-চার ঘণ্টা লাগিবে।" আমি বলিলাম—"যতক্ষণই লাগে, আমাকে লইয়া যাও।" এই বলিয়া তাহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—"আচ্ছা তুমি এইখানে বসো, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।" সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম, এইবার যমের বাড়ি ছাড়িয়া মামার বাড়ি যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল, কোনো কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল, তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম।

যখন মামার বাড়ি গিয়া পৌছিলাম, তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম, 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর। তোমার বাড়িতে একটু স্থান দাও।' মামী কর্কশস্বরে বলিলেন, 'পালিয়ে এসেছিস কার সঙ্গে?' আমি সে কথার অর্থ তখন ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এর সঙ্গে।' মামী বলিলেন, 'এ কে?' আমি বলিলাম, "জানি না।" মামী বলিলেন, 'আমার বাড়িতে তোমার স্থান হবে না।' 'আমি কোথায় যাব? মামী বলিলেন, 'গোল্লায়।' বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মতো সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিলো না। তখন সে আমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মতো সে যে দিকে লইয়া গেল, সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথা যাইবে?' সে বলিল —'কলকাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মতো আমার মন চমকাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—'আমাকে রক্ষা কর; আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া চল।' সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আচ্ছা' কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম। ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ির দিকে চলিলাম । সে বাধা দিলো না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলো। আমি চীৎকার করিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিলাম আর কোনো সাড়া শব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—'গোল্লায় যাও।' আমি ফিরিলাম দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে আর ঠিক তেমনি

করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠিয়াছে কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার—মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোনো অদৃশ্য-বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তারপর?

তারপর কলিকাতায় আসিলাম। ভাবিলাম সে কোনো জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া দুজনে থাকিলাম। সাতদিন সে আমার গায় গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভালো করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।'

তারপর?

এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। শহরের বড় সড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়িতে সাজ-সজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট হীরার গহনা। বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক পাখা, দাস-দাসীর অন্ত নাই, আলমারী ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা।

আমি কলকাতার ডামিল কিন্তু—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দুহাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশমাত্র নাই। সেই লতামণ্ডপ গাঢ় অন্ধকার ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, আমি সেই অন্ধকারে তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মতো জ্বলিতেছি। বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধহয় কাঁদিতেছিল। তারপর বলিল, "তোমার আমাকে ভালো লাগিয়াছে? তোমার মতো আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন—তোমাকে তো দিবার কিছু নাই।"

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—"আমি আর কিছু চাহি না আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মতো জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল, আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম—সে জগতে আর কেহ নাই। চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম।

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমার কাছে নাই। আমি অস্থির হইয়া গোলম, পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল—"কি বাবা, একেবারে উধাও।" আমি তাহাকে গালি দিলাম, আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোনো সাড়া শব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া?" একজন গাড়োয়ান বলিল,

"হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া।" আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ি গেলাম। শুনিলাম ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মতো ছুটাছুটি করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ি গেলাম, ঝি বলিল, সে শেষ রাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তে হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে তাকে এই চিঠিখানা দিস্। আমি সেই চিঠিখানা লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানা পড়িলাম—

"তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না! মনে করিও আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—আমি মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে বলে সুখ, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মতো জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না, প্রাণসর্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বড়াইও না, এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

—ডালিম"

পৌষ, ১৩২১

স্মৃতি

বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী

[১]

বুড়া বয়সের কথা, অন্যের তৃপ্তিকর না হইলেও নিজের যে তাহাতে তৃপ্তি আনে, তাহা আজ যত আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, বুঝি আর কেহ ততখানি অনুভব করিতে পারিবে না। বুড়ার এই সুখদুঃখের অতীতের কাহিনী শুনিয়া তোমরা কি হাসিবে? যদি হাসিতে পার ভালই, কিন্তু কাঁদিয়া যেন এ বুড়াকে আর কাঁদাইও না।

ফাল্গুনের, দোল পূর্ণিমায় আমার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়াই আমি সে পূর্ণিমা, চাঁদের হাসি, —কোকিলের কণ্ঠ, পাপিয়ার তান ইত্যাদি লিখিয়াও তোমাদের হাসি ফুটাইতে চাহিব না।

ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমা তো প্রতিবারেই আসে যায়, কিন্তু যে বারে আমার ভাগ্যে আসিয়াছিল, তেমনটি তো আর হইল না; সে সর্ব্বনাশা জীবনপ্লাবী আলোর বান তো আর ইহজীবনে আসে নাই। কেবল সে আলোর রাজ্যে যাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম সে কালো।

ঘোরা কৃষ্ণ কামিনী কমলাকে বিবাহ করিতে আমার পুরা আপত্তি থাকিলেও শুভলগ্নে দোল-পূর্ণিমায় কৃষ্ণ সাজিয়া—রাধিকা না হইলেও—কমলাকেই পত্নীত্বে বরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম।

[২]

পিতা তেজস্বী, মাতা অনুগতা, এ কারণ কালো মেয়ে পসন্দ না হইলেও বাধ্য হইয়াই একাজ করিতে হইয়াছিল। মাতার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। পিতা গুণে মুগ্ধ। কি গুণে যে কমলা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তখন বুঝিতাম না, এখন কি তা ভাবিয়া পাই!

বিবাহান্তে বধূ লইয়া ঘরে ফিরিলাম। বধূ বরণ করিতে যাহারা আসিয়া ছিল তাহারা আমার দিকে চাহিয়া, আর বধূর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল। মাতা বধূ বরণ করিলেন না। বধূ দেখিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আরে রূপ দিয়ে কি হবে, গুণ চাই। হাঁ দ্যাখ, আমার মাও তো কালোই ছিলো, কিন্তু তার গুণের জন্য সে সবার পূজো করবার ধন ছিল। আমার বউমাও তাই হবে, আমার মার জায়গা নেবে।" ছোট বোন হাসিয়া বলিল, "কাঁদ কেন মা, বাবা যা বলছেন, তাই হবে।"

[৩]

সকলের ভাগ্যেই সেই ফুলের শয্যা তো জুটিয়া থাকে, ইহাতে এমন বিশেষ কি বিশেষত্ব আছে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। হয়ত আমার ফুলশয্যা হয় নাই বলিয়াই মনটা ফুলশয্যায় এত মধু পায়।

ঘরে গিয়ে দেখি, শয্যার প্রথা রক্ষানুসারে গোটা কতক ফুল ছিটাইয়া শয্যা রচনা করা হইয়াছিল। আর বিছানার এক পাশে মড়ার মত কমলা পড়িয়াছিল। তাহার সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা না থাকিলেও পুরাকালের প্রথা তো আমান্য করিতে পারি না। তাই যে ভাবে তাহাকে, নাড়া দিলে সাড়া পাওয়া যাইবে, সেই ভাবেই নাড়া দিলাম। সাড়া পাওয়া গেল

না, সে কথা বলিল না। তখন তাহার রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম, "যাদের বাইরে কালো, তাদের অন্তরও বুঝি কালো, তাই কাল পেঁচার মত মুখ করিয়া মড়ার মতন পড়ে থাকে, অন্যের কথার উত্তর দেয় না।" কথাগুলি এমন শ্লেষপূর্ণ যে এখন ভাবতে কিন্তু সত্যই লজ্জা বোধ হয়। চিরদিনই মনে মনে একটা ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকই আগে কথা কয়, হাসে, কিন্তু বিবাহ করিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

সেদিন দ্বিতীয়ার চাঁদ হইলেও তাহার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই। ঘরের কোণেও সে হাসিয়া উঁকি মারিতে ছাড়ে নাই। তার উপর আবার সেদিন একটা নব দম্পতির প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাসময়ী রজনী, সেই বা সেদিনটাকে বৃথায় যাইতে দিবে কেন! কিন্তু পোড়া চাঁদ সেদিন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ভাল করে নাই। একটা জীবনের প্রতি আজীবন যে বিদ্বেষ ভাব, ঘৃণা বহন করিতাম, সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ সে নিজের স্নিগ্ধ নির্ম্মলতায় ধুইয়া মুছিয়া লইল। কমলার মুখখানি চাঁদের আলোয় এমন করুণ ও তাহার সেই চোখের জলে এমন স্নিগ্ধ মধুর দেখাইতেছিল যে, আমি সেদিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, মন গলিল।

কমলা কাঁদে কেন? বিনা কারণে ত মানুষ কাঁদে না! মার ঘৃণা, পাড়াপড়সীর নাক সিটকান, রূপের ব্যাখ্যা। আর সর্বোপরি আমার ঘৃণা, সেই শ্লেষবাক্য, কমলা কাঁদিবে না কেন? এমন অবস্থায় মানুষ হাসিতে পারে কি? মনে হইল ঃ—

কে গাহিছে মরি, বিষাদের গীতি, ধরিয়া মৃদুল তান,
বহু দিন পরে, শ্রবণে পশিয়া, উদাস করিল প্রাণ?

সত্যই, কমলার কান্না দেখিয়া মনটা আমার উদাস হইয়া গেল।

[৪]

রমেশের পত্র পাইলাম। "তোমার বিবাহে যাওয়ার ফুরসত পাইব না। তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনে যাইব আশা করি। কবে আসিবে? বৌ কেমন হইল ইত্যাদি।" রমেশ আমার সমপাঠী। একস্থানে না থাকিলেও, উভয়ে যে এক প্রাণেই বাস করিতাম তাহা পূর্ব্বে এতটা বুঝিতে পারি নাই। সে বড় লোকের ছেলে না হইলেও তার যথেষ্ট অর্থ ছিল। আর আমি দরিদ্র। দরিদ্রের সহিত অবস্থাপন্নের যে মিল হইতে পারে, তাহা আমার প্রথম এই দেখা। সে হাসিতে জানে, আর আমি গম্ভীর। সে কথার দ্বারায় লোকের পেটে খিল ধরাইয়া দিতে পারে, আর আমি কথার ঘায়ে লোকের প্রাণে আঘাত দিতে জানি। এইরূপ ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি লোকের সৌহৃদ্য যে কেমন করিয়া ঘটিল তাহা কেহই বুঝিতে পারি নাই।

প্রাণের কোন গোপনে, কি ভাবে প্রেমের বন্যা বহিয়া যায়, মানুষ তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। আমিও বুঝিতে পারি নাই যে, সেই কয়লা—সে কমলাকে সেই প্রথম দর্শনেই কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি নাই; আজ সেই কমলার পত্রের আশায় হাঁ করিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকি। পত্র আসিলে পত্র লইয়া রমেশের বাসায় ছুটি। রমেশকে পড়িয়া শুনাইয়া কত তৃপ্তিই অনুভব করি। ভাবি, জীবনের এই পরিণতি।

[৫]

সেই বৎসরে রমেশ পরীক্ষা না দিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইল। আমিও বিষয় কর্ম্ম দেখিতে বাড়ী আসিলাম। মোটের উপর সাদা কথায় বলিতে, আমি সেবারে বি-এ পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিলাম না। লাভের ভিতর এই হইল, রমেশ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িলাম। প্রাণে আঘাত বোধ হইলেও কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে জ্বালাময় সংসারে প্রবেশ করিতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞায় শ্বশুরগৃহে কিছু কালের জন্য থাকিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন সেইখানে রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "কতদিন পরে?" কমলা আসিয়া নবাগত অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, "এই তো চাই।"

রমেশের ভাই ভগিনী কেহ ছিল কি না জানি না। তবে তাহার সেটা দোষই বল, আর গুণই বল, সে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে বড় ভাল বাসিত। তাহাদের খেলাঘরের সেই মাটীর ঘরে ভাত, ডাল খাইয়া সে কি তৃপ্তিই অনুভব করিত তাহা বলা যায় না। ছোট মেয়েগুলি সবাই তাহার দিদি। পরের ঘরে সে এমনভাবে মিশিতে পারিত, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার চরিত্রের বিশেষত্বই এই।

সেই দেখা হওয়ার পরে আর রমেশের কোন খোঁজ নাই। বিজয়া নিশিতে পকেটে হেনার ফুল গুঁজিয়া, হাতে চাঁপা ফুল লইয়া রমেশ আসিয়া হাজির। কমলার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "মাকে প্রণাম ক'রে আসি, আজ হতে তুমি আমার বোন।" কমলা রমেশের পায়ের গোড়ায় ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিল। হাসিয়া আমি বলিলাম, "আমারটা।" কমলাও মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "সকল দিনই তো আছে। কালো হাতে পায়ে হাত দিলে পা কালো হ'য়ে যাবে যে।" বুঝিলাম, এ খোঁচা, ঘা বুঝিয়াই ঔষধ পড়িয়াছে। তাই এ প্রত্যুত্তর। মুখ ভার দেখিয়া কমলা আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইল।

[৬]

রমেশ আসে, যায়। তাহার প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া যেন আমার প্রতিপত্তির লাঘব করিতে লাগিল। সব সহ্য করিতে পারি কিন্তু কমলার মন অন্য দিকে, ইহা মোটেই সহ্য হয় না। রমেশ আসে না; কমলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "সে কেমন্ আছে—কেন আসে না" ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করায় একটু চড়া সুরেই বলিলাম, "হাঁ কমলা, আমার চেয়েও কি রমেশ বেশী আপন? তার কথাই দিন রাত শুনি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তুমি একটুও খোঁজ খবর কর না, মানেটা কি বলত?" কমলা কোন কথার উত্তর দিন না; নীরবে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রতি সন্ধ্যায় কমলা ছাদে উঠিয়া থাকে সেদিনও উঠিয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যার তো চাঁদ উঠেনা, কিন্তু সেদিন চাঁদও উঠিয়াছিল। কমলা চাঁদের পানে উদাস ভাবে চাহিয়া বলিতেছিল:—

তোমার তো এ সংসারে থাকিলে থাকিতে পারে,
জীবনের অসীম নির্ভর।
জনপূর্ণ এ জগতে আমার জীবন পথে,
একমাত্র, তুমি সহচর।।
তুমি যেতে পার চলে, ধূলি ম্লান ধরাতলে
অনায়াসে দলিয়া আমায়,
আজীবন প্রাণপণে, আমি বাঞ্ছা করি মনে,
থাকিতে ও চরণ ছায়ায়।।
যেখানেই তুমি যাবে জীবনের সঙ্গী পাবে
আমি শুধু রব একাকিনী।
ভাগ্যহীনে করি স্নেহ শুনিবে না কভু কেহ
আমার এ দুখের কাহিনী।"

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, রমেশ কোথায়?

পরদিন রমেশ আসিল। কমলা তাহার সহিত কথা কহিল না। পান দিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলার এই ব্যবহারে আমি অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলাম।

রমেশ চলিয়া গেলে পাশের ঘরে দেখি, অন্ধকারে একা পথের পানে চাহিয়া কমলা দাঁড়াইয়া।

তাহাকে টানিয়া বুকের কাছে লইয়া করুণ সুরে বলিলাম, "কমলা, আমি তো তোমায় অবিশ্বাস করি নাই।" কমলা আমার বুকের কাছে মাথাটি রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস যে বহিয়া গেল, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিতে পারিলাম, সে যেন আমার মুখ দিয়া এই কথাটা শুনিবার জন্যই এ কয়দিন উৎসুক হইয়াছিল।

[৭]

বিশ্বাসেই বল, আর অবিশ্বাসেই বল, এমনি করিয়াই দিনের পর দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল। রমেশ আসে, মাঝে মাঝে আসে না। না আসিলে যে সকলেই ব্যস্ত হয়, ইহা গোপন হইলেও বেশ বুঝিতে পারি।

এবারে প্রায় পনর, বিশ দিন হইবে রমেশের কোন খবর নাই। কমলা যে খবর জানিবার জন্য বেশ একটু ব্যস্ত তাহা চোখ এড়াইতে পারিল না। মুখে চোখে কমলার সে ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি, রমেশ আমারই শয্যায়, আমারই কমলার কোলে মাথাটি রাখিয়া শুইয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।" কমলা তাহার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিয়া কপালটা বার বার টিপিয়া ধরিতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম, "রমেশবাবু যে!" রমেশ সেই অবস্থায় থাকিয়াই বলিল, "হাঁ, এই দেখতে এলাম। আজ যে, "ভাই ফোঁটা!"

অনেক কথার পরে, তাহা বোধ হয়, না লিখিলেও চলে, আমাদের উভয়ের সেই চির প্রচলিত তর্ক বাধিয়া গেল। আমি দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "স্ত্রীজাতিকে এত স্বাধীনতা না দেওয়াই ভাল। যাদের বার হাত কাপড়ে কাছা হয় না, এমন জাতকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্বাধীনতা দেওয়া তো আমি মোটেই পছন্দ করিনে।"

রমেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বটে!" সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই আমি তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলাম। উঃ গা কি গরম! বুঝিলাম তাহার জ্বর হইয়াছে। সে আমার হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেই আমি বলিলাম, "রমেশ, এককথা হয়ে গেছে তাতে রাগের কি আছে ভাই। এমন জ্বর নিয়ে তুমি যেও না।" পাশের ঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন, "রমেশ তুই এখানে আয় বাবা, আজ কমলার 'ফোঁটা' না নিয়ে যাস নে। তুই তো আমার কোলে মাথাটি রেখে শুতে ভাল বাসিস্, আয় আজ আমার কোলে থাকবি।" রমেশ রুদ্ধ গলায় বলিল, "আর দিন ফোঁটা নেব মা। আর একদিন তোমার কোলে থাকবো," বলিয়া কাহারও কথার উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি তাহাকে ধরিবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, নাই, সে চলিয়া গিয়াছে। উদাস মনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। "সে কি ফিরিবে না? কতবার তো এমন হইয়াছে—সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এবার কি ফিরিবে না?"

"ফিরিবে ফিরিবে ঘরে সে একদিন ফিরিবে," বলিয়া কমলা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল। অসাড়ের মত বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

তখন সন্ধ্যা হয়। আমার দেশে যে বৈকালে "ভাই ফোঁটা" দেয়, তাই সে বৈকালেই

আসিয়াছিল। এমন একটা দিনে তাহার প্রাণে আঘাত দিয়া, সে আঘাত নিজের প্রাণেও লাগিল। বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছি, পাশের বাড়ীর গানের সুর উঠিল :—

"আশে রেখেছি প্রাণ সে ফিরে আসিবে ফিরে,
সুখ সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখি নীরে।"

রাত্রি ছটফট করিয়াই কাটিল। সে রাত্রিতে আমি অসুখের অছিলা করিয়া খাই নাই, কমলাও পাতে বসিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল।

[৮]

সেই দিন হইতে একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, রমেশ আসে নাই। আমি ও কমলা বসিয়া গল্প করিতেছি, রমেশ আসিয়া উপস্থিত। কমলা উঠিতেই রমেশ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া সে খান কত তেজপাতা, গোটা দুই ডাল, একমুঠা চাল চিবাইতে চিবাইতে মার কাছে গিয়া হাজির হইল। মা অভিমান-ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন, "কি রে—কি মনে ক'রে?" 'না মা, এই শুধুই এলাম' বলিয়া সে এটা সেটা নাড়া চাড়া করিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলা আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম "রমেশ চ'লে গেল না কি?" "হাঁ" বলিয়া কমলা দ্রুত ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। আমিও তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলাম, "রমেশ, রমেশ" দরোয়ান বলিল, "বাবু বাহির হইয়া গেছেন।" ক্ষুণ্নভাবে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কমলা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "উপরের দেবতা সাক্ষী আর তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, সাক্ষী করে বলছি, তুমি তার জন্য দুঃখ পাও বলেই আমার দুঃখ, আর তার মত দুঃখী কে আছে? যার ক্ষিদে পেলে খেতে দেবার লোক নেই, তৃষ্ণা পেলে জল ভরে নিয়ে খেতে হয়, তার জন্য দুঃখ সবারই হয়। তোমার তো বাপ আছেন, মার অগাধ স্নেহ আছে, বোনের সেবা আছে, তার কি আছে?" আমি কমলার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিলাম, "কমল, তুমি তাকে যত্ন কর, আর আমি কিছু বলবো না।"

[৯]

গত কয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, রমেশ আর আসে নাই, তার কোন খোঁজও নাই। সে পরীক্ষা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাইবার সময় বলিয়াও যায় নাই।

আজ সবারই মুখে হাসি, কেবল আমারই হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। অতীত কথাগুলি মনে হইয়া বার বার হৃদয়ে আঘাত অনুভূত হইতেছে, সে আজ কোথায়? যে কমলার ছেলে নাই তাই বার বার আক্ষেপের সুরে বলিয়াছে, "হাঁরে কমলা, কবে তুই মা হবি? কবে তোর ছেলের সঙ্গে দুধের বাটী বিছানা ভাগ করে তৃপ্তি পাব।" আজ তো সেই কমলার ছেলে হইয়াছে—কমলা এখন মা, সে কই? আর আসিবে না কি?

কত উৎসাহের সহিত আজ খোকার অন্নপ্রাশন দিতেছি। সে যে আসিতে চাহিয়াছিল, ছেলের অন্নপ্রাশনে যাইব লিখিয়াছিল, আসিল না তো? সে কথা কি সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে?

সন্ধ্যার ছায়া তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, আর কিছু চোখে বড় একটা দেখা যাইতেছে না। আমি গা ধুইয়া উপরে উঠিতেছিলাম। সব লোক-জনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, আর একটিও খাইতে তখন বাকী ছিল না।

পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে উপরে উঠিতেছিলাম! চাকর আসিয়া আমার হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া আলোর সম্মুখে অপরিচিত লেখাটা ধরিয়া বার বার এ পিঠ ও পিঠ করিয়া দেখিতেছিলাম, কমলা আসিয়া হাত হইতে খামখানা কাড়িয়া

লইল। খাম ছিঁড়িয়া পড়িয়া সে বসিয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম, লেখা ছিল—

প্রিয় সুরেশ, আজ তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন, আমি যাওয়ার প্রতিশ্রুত ছিলাম। কিন্তু যাওয়া তো দূরের কথা এ পত্রও আমি নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম না, ভাই, মাপ করিও। জীবনের গণা দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তেই এ পত্র লেখা। যদি এখনও শুনিয়া যাইতে পারি, তোমার মনে কোনও অবিশ্বাস নাই, তবে আমার মৃত্যুও শান্তিতে হইতে পারে। জানিবার আর উপায় নাই। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও, দ্বন্দ্ব দ্বিধা, অবিশ্বাস আর যেন তোমায় স্পর্শ না করে। আর রমেশ জুটিবে না, আর জুটাইও না। ইতি। পুনশ্চ—এখনও একবার আসিলে দেখা হয়। ঠিকানা উলিপুর, হাসপাতাল।

চিঠি পড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পিতার নিকটে গেলাম, পত্র দেখিয়া তিনি অনুমতি দিলেন। আগামী কল্য তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন। কমলাও পিতার নিকট বায়না ধরিল, সেও যাইবে। সে রাত্রি যে কি ভাবে কাটিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।

পরদিন প্রাতের ট্রেণেই আমরা সস্ত্রীক পিতার সহিত রওয়ানা হইলাম। কুচিন্তায়, সুচিন্তায় দিন অতিবাহিত হইল। এবার রমেশকে ধরিয়া আনিব, আর যাইতে দিব না। কমলার পাশে বসাইয়া বলিব, রমেশ, আর আমার অবিশ্বাস নাই। এবার আমি মুক্ত। কমলাও হয় তো বলিবে, আমার একটা বৌদির দরকার, তুমি তাই আমায় এনে দাও। খোকাকে কোলে দিয়া বলিবে, দাদা, এবার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—আমার মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর। কমলা এবার তাকে "ভাই ফোঁটা" দিবেই।

ট্রেণ পৌঁছিল। আমার এক আত্মীয়কে তার করিয়াছিলাম, তিনি আসিয়া আমাদিগকে নামাইয়া লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক খানি পথ যাইতে হয়। সেই পথের একপাশ দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। সেইখানেই শ্মশান। "শ্মশানে ও কার চিতা জ্বলে?" কমলা আমায় জিজ্ঞাসা করিল। প্রাণ কাঁদিলেও বলিলাম, "কত জনের জ্বলে।"

বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম রমেশ আর নাই, গত কল্য সে মারা গিয়াছে। ও চিতা কি তবে তারই? কমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আমিও হতচেতন। চৈতন্য হইলে কমলাকে বলিলাম, "কমলা, আর এ শ্মশানে কেন? চল আজকের ট্রেণেই বাড়ী ফেরা যাক্।" রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কমলা বলিল, "বাড়ী তো যেতেই হবে, তবে আগে তার একটা কাজ করে যেতে হবে। সে যে জল বিনা কত কষ্ট পেয়েছে, দুটো ভাতের জন্য না জানি কত কাতরোক্তিই করেছে, তার জন্য কি কিছুই করে যেতে হবে না?"

আমি বলিলাম, "আর কি করবে কমলা?" সে বলিল, "এক গণ্ডুষ জল।"

সে তো গিয়াছে, কিন্তু আছে কি? স্মৃতি? তোমরা কেহ কাঁদ নাই তো? আজিকার মত এ বুড়া বিদায় চাইতেছে. বিদায় দাও। স্মৃতির বোঝা বুকে ধরিয়া আমার মত কেহ আছ কি?—সুখের শৈশব, মধুময় কৈশোর, উন্মত্ত যৌবন, একে একে কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে; আছে শুধু বুড়ার এই হাড়, এই স্মৃতি।

মাঘ, ১৩২৭

কোমল মনের বল

বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী

[১]

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর হইবে। মার মুখে গল্প শুনিয়াছি, সে বছর নাকি পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই বারে রেণুর মা কয়টি ছেলে হারাইয়া এমনকি স্বামীটি পর্য্যন্ত হারাইয়া, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া "খোকসা" গ্রাম হইতে আমাদের গ্রামে,—বোনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হন।

বোনের বয়স যোল কিম্বা সতের হইবে। তখনও তাহার ছেলে পিলে কিছু হয় নাই। মার সহিত আমি তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম, রেণুর সহিত সেই আমার আলাপ হইল, সেই হইতেই সে আমার খেলার সঙ্গীরূপে গণ্য হইতে লাগিল।

রেণুর মাসীর বাড়ী আমাদের বাড়ীর পিছনে। তাঁর অবস্থা বেশ ভাল। বোনকে মেয়ে সহ রাখিতে তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না, বরং আশ্রয় দিতে পারিবেন বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তখন হইতেই বোনের উপরে সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রেণুর মা রান্না বাড়া সংসারের সব কাজ নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন।

[২]

আমার মার কথা বলিবার জন্য প্রাণ যতই উৎসুক হোক না কেন, শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহ তো অন্য কাহারও হয় না। সকলেই হয়ত বলিবেন, "থাক থাক, আমাদেরও তো মা আছেন, অথবা ছিল, অত বাড়াবাড়িই কি ভাল?" সকলের মাই সকলের কাছে সমান। বাপ বেশ্যাসক্ত হইলে, মাতাল হইলে তাহাও বলা চলে, কিন্তু মা দুশ্চারিণী হইলে তাহা কি বলা যায়? লোকে যাই বলুক—আমার মার মত মা আর দেখি না। একাধারে মা আমার লক্ষ্মী সরস্বতী। অতি শৈশবেই আমরা পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হই, সেই হইতেই মা আমাদের লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু এই কর্ত্তব্যের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব ছিল।

পাড়ার মেয়েদের সহিত মার খুবই আলাপ ছিল। বয়স হইলেও দেখিয়াছি মার সহিত কখনও কাহারও কলহ হয় না। মার চোখে সকলেই সমান।

রেণুর মার সঙ্গে মার সম্বন্ধটা কিছু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রেণুর মা আমার মাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। সময় পাইলেই আমাদের বাড়ী আসিতেন, মাও যখন তখন তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন।

লোকে বলিত, "এ ছুটিতে দিব্যি কিন্তু মানায়"; মা স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন। রেণুর মার দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িত। এমনি করিয়াই লোকের মানানোর ভিতর দিয়া, মার বিমল স্নেহের ভিতর দিয়া এই সুকুমার দেহ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়া চাঁদ আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া উঁকি মারিত; হেনার গন্ধে বাড়ীখানি আমোদিত হইত, আর আমি মার কোলে মাথাটি রাখিয়াই দিব্য

আরামে শুইয়া গল্প বলিবার জন্য জিদ ধরিতাম। কোনও দিন বা "দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প, আবার কোনও দিন বা রাজকন্যার একাকিনী বাস, সেই সোণার কাঠি, রূপার কাঠি, সোণার খাট, সেই তেপান্তরের মাঠ, সেই চরকা কাটা বুড়ীর কথা শুনিতে শুনিতে কোন সময়ে মার বুকের ভিতরে মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।"

[৩]

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে রেণুর মাসির বাড়ী, পুবে আমাদের পুকুর। পুকুরের পাড়ে সারি দিয়া বকুলের গাছ। জলে পা দিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথার ধুম পড়িয়া যাইত। কত রাজ্যের কত ছেলে মেয়ে আসিত। কিন্তু আমার খেলার সাথী এক রেণু বই আমার খেলা হইত না।

কে ভাল মালা গাঁথিতে পারে, সে না আমি—না আমার মালাই ভাল হইয়াছে; এইরূপে রোজই প্রায় তার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম আবার ভোর না হইতেই দুই জনের মনের এমন নিখুঁৎ মিলটুকু হইয়া যাইত, যে সে দু'টি কোমল প্রাণের কলি কোথায় ফুটিয়াছিল তাহা ধরা যাইত না।

এমনি করিয়াই সুখে দু'জনের বাল্যকাল ফাঁকি দিয়া কোন এক সময়ে সুকুমার কৈশোরে পা দিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতেও পারি নাই।

মধুময় কৈশোরে পদার্পণ করিতেই রেণুর মা সংসারের এত সাধের দুঃখের মায়া কাটাইয়া রেণুকে ফেলিয়া কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেল। গেল তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু যাইবার আগে আমার হাতে রেণুর হাতখানা দিয়া বলিয়া গেল, "তোমরা দুটীতে সুখে থেক, এই আমার শেষের আশীর্ব্বাদ রইলো।" মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি বড় সাধ ছিল, এই ফাল্গুনেই দুটীতে এক ক'রে দেব, ভাগ্যে তা আর ঘটল না; দিদি, আমার রেণু, বিনু রইল, দু'টীকে তুমি দেখ।" মা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিলেন।"

[৪]

মাসির ছেলে, দেড় বছরের মণ্টুকে লইয়া রেণুর দিন একরকমে কাটিয়া যাইতেছিল। মার কথা বলিলে তার চোখের কোণে জল দেখা যাইত। আমার মা তাকে খুবই আদর যত্ন করিতেন।

সেদিন বৈকালে বকুল তলায় বসিয়া রেণু আর আমি বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিলাম। খুব সুন্দর করিয়া একটা মালা গাঁথিয়া রেণুর গলায় পরাইয়া দিলাম। বলিলাম, রেণু, আজকের মালা খুব ভাল ক'রে গেঁথেছি, এটী তুমি ছিঁড় না। যত্নে রেখ।" "আচ্ছা" বলিয়া রেণু চলিয়া গেল।

পরদিন বৈকালে আবার দুইজনে একত্র হইয়া মালা গাঁথিতে বসিলাম, আমি বলিলাম "রেণু আমার কালকের মালা কই?" সে অধোবদনে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। আমি আবার বলিলাম, "আমার মালা।" মাটী পানে চাহিয়া রেণু আমার কথার জবাব দিল, "সে মালা মণ্টুকে খেলতে দিয়েছিলাম, সে তা ছিঁড়ে ফেলেছে। তুমি রাগ কর না বিনু দা।" আমার বড্ড রাগ হইয়া গেল, ফুল সব ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। "তোমাকে যত্ন করে রাখতে দিলাম, আর তুমি কিনা ভাইয়ের হাতে দিয়ে ছিঁড়িয়ে ফেল্‌লে বেশ।" সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

[৫]

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, বোম্বেতে আমার মামার খুব কাতর টেলিগ্রাম আসিয়াছে। মা মাথায় হাত দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন। কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "মা, ওমা।" মা

বলিলেন, "বিশু, আজ আর বিরক্ত কর না; আজ কিছুই ভাল বোধ হচ্ছে না।" মার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলাম, "মা, তুমি হুকুম কর, আমি মামাকে দেখতে যাই। মা বলিলেন, এমন বাজে হুকুম আমি করতে যাব কেন, তুমি কি সেখানে যেতে পার?" বড় হাসি আসিল, মামা সেখানে যেতে পারেন, আর আমরা পারি না! প্রকাশ্যে বলিলাম, "খুব পারবো, কেন পারবো না মা! আমি যাবই!"

অনেক কথার পরে মার সম্মতি লইয়া বোম্বায়ে রওয়ানা হইলাম। যাত্রা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেই মা বলিলেন, "ও বাড়ীতে দেখা ক'রে যা!" "না মা, ও বাড়ীতে আর দেখা করা হবে না। ও বাড়ীর ও মেয়ের সঙ্গে আমি বিয়েও করব না।" মা বলিলেন, "সে কেমন করে হবে আমি ওর মার কাছে যে কথা দিয়েছি। ওর মা বেঁচে নেই, থাক্‌লে এক কথা ছিল। মেয়েটি বল লক্ষ্মীরে! যেমন রূপে তেমনি—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "মা তোমার এই ছেলেটি বেঁচে থাক্‌লে অমন মেয়ে কত লাখে লাখে আস্‌বে, ওর চেয়ে ভাল রূপ গুণই হবে।"

মা রাগিয়া বলিলেন, "কখন না, ওর জুড়ি আর মিলবে না। শান্তস্বরে পরে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী বাপ, অমন কথা কি বলে, ওর মা নেই!" বলিয়াই মা চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিলেন।

মার কান্নাতেও আমার মন ভিজিল না। এই ফাল্গুনেই আমার বিয়ে, এ কোন মতেই হতে পারে না। রেণুর উপর মালা ছেঁড়ার রাগ তখনও আমার পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল।

বোম্বে আসার পর পরই মার এক পত্র পাইলাম, "রেণু খুব কাতর। একবার ফিরে আয় বাবা, সে বুঝি আর বাঁচে না। তোকে দেখবার জন্যই বোধ হয় তার প্রাণটা এতক্ষণও আছে, একবার ফিরে আয় বিনু!"

একি খবর বার বার করিয়া ঐ একটি কথাই পড়িতে লাগিলাম, "সে বুঝি আর বাঁচে না?" আসিবার দিন তো তার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি নাই," বলিয়াও আসি নাই, আমি বোম্বে চলিলাম। তার সেই অধোমুখ, চোখ ছলছল মনে পড়িল! আরও মনে পড়িতে লাগিল, সেই অন্ধকারে তাকে আমি একা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম।

বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। অন্তরে কে যেন বলিয়া গেল, আর দেখা হয় না বুঝি।

[৬]

দেখা হইল। বাড়ী আসিলাম। রেণু অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিতে লাগিল। আবার সেই হাসি তামাসায় দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। মার মনেও কত শান্তি দেখা গেল।

সেদিন 'ভাইফোঁটা'। আমার তো বোন নেই, কে 'ফোঁটা' দিবে? মাকে বলিলাম, 'ভাইফোঁটা' আমাদের বাড়ী নেই মা? মা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন, না, কে ফোঁটা দেবে?

মনটা সেদিন বড় ভারী ছিল, সকলেই বোনের হাতে ফোঁটা দিতেছে, আর আমি এমনি হতভাগা যে, আমার বোন নাই। বৈকালে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছি। আর সকল বাড়ীর হুলুধ্বনি কানে আসিয়া মনটা আরও ভারী করিয়া দিতেছিল।

মন্টুকে সঙ্গে করিয়া রেণু আসিয়া হাজির। তার পরণে একখানা রেশমী ডুরে। বেশ চকমক করিতেছে। আর তার হাতে দুই গাছি বালা। সে চুলের পরিপাটি করিয়া টিপ পরিয়াছে। চালুন বাতি সাজাইয়া লইয়া সে আমার নিকটে আসিয়া বসিল। আমি বলিলাম "ওকি, তোমার ভাইয়ের ফোঁটা এখানে বসিয়া আমাকে দেখাইয়া দিবে নাকি রেণু?" রেণু একটু হাসিয়া বলিল, না তুমি ঘুরে বস, তোমার কপালেই ফোঁটা দেব।" আমি একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিলাম, সেকি—তাও কি হয়? "কেন হবে না বিনু দা মার কাছে তো আমরা

দুজনেই সমান! তোমারও বোন নেই, আমারও ভাই নেই, আজ ভাইয়ের কপালে ফোঁটা সকলেই দিতেছে, আর আমার বুঝি ইচ্ছা করে না? তুমি ঘুরে বস বিনুদা, আমি তোমার কপালে ফোঁটা দেই।" আমি ইতস্ততঃ করিতে সে বলিল আমার কথা বলবার বড় বেশী শক্তি নেই। আমার হাঁপ আসছে তুমি ঘুরে বস, তাড়াতাড়ি, আমি ফোঁটা দিয়ে যাই।"

তাহার শরীর তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। আমি আর আপত্তি মাত্র না করিয়া ঘুরিয়ে বলিলাম, সে কপালে ফোঁটা দিতে লাগিল ঃ—

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গো-চোনা, গোময় ইত্যাদির দ্বারা আমার কপাল ভরিয়া দিল। খাবার হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল ঃ—

"ভ্রাতস্তবানু জাতাহং ভূঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

আমি বলিলাম, ও মন্ত্রের অর্থ কি, রেণু? সে বলিল, 'কি জানি, আমাদের পাড়াগাঁয়ে শুধু বলে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়োরে পড়ল কাঁটা।" আমি হাসিতে লাগিলাম। মা আসিয়া যে আমাদের এই কাণ্ড কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। মা মুখে হাসি, চোখে জল করিয়া বলিলেন, বিনুর আমার সাধ মিটল। আমি বলিলাম, দেখত মা, রেণু আমার কপালে জোর করে ফোঁটা দিল। মা বলিলেন, বেশ করেছে। আমি বলিলাম, এখন তবে তো ও আমার বোন, ওর বর জোগাড় করতে হয় না মা? মা বলিলেন "হাঁ।" রেণু মাকে প্রণাম করিল। আমিও বুঝিলাম, কায়দায় ফেলিয়া সে এইবার মালা-ছেঁড়া রাগের শোধ তুলিয়াছে। মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল।

ফাল্গুন, ১৩২৭

চাক্‌রের ছুটি

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রি দশটার সময় অবসর পাইয়া সতীশ কাঁধে একখানা ভিজে গামছা আর হাতে হুঁকো কলকে লইয়া ছাদের খোলা বাতাসে আসিয়া যখন একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তখন লোকে যাকে বলে পুনর্জীবনলাভ করা, সতীশ বোধ করি সেই রকমেরই একটা কিছু লাভ করিল। তারপর বসিয়া হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালাইয়া একখানি টিকে ধরাইয়া, বাঁ-হাতটী উঁচু করিয়া টিকেখানি বাতাসে ধরিয়া রহিল, আর ডানহাতের হুঁকাটীর মুখে ফুঁ দিয়া অতিরিক্ত জলটুকু ফেলিয়া দিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে রাজেন আসিয়া সতীশের নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বাঁচা গেল ভাই—ছুটী তো পেলাম!" সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ, বেশ, বাবু কি বল্‌লেন?"

রাজেন—"কি আর বলেন বল, ছ'মাস হ'ল বাড়ী থেকে এসেছি,—ছুটী না দিলে কি ছাড়তাম।"

সতীশ "তা হ'লে কবে যাচ্ছ? কালই নাকি?"

রাজেন "কাল আর কি করে যাই, ভাই, কিনতে কাটতে হবে! পরশু যাব মনে করছি!"

রাজেনের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় কুসুমপুর নামক একটী গ্রামে। কলিকাতায় চাকরী করে বড়বাজারের চিনেপটীতে মহেন্দ্র গোঁএর গদীতে বার টাকা বেতনের একজন 'গোমস্তা'। প্রায় ছয়মাস হইল সে বাড়ী হইতে আসিয়াছে। তাই বাড়ী যাইবার জন্য আজ সে বাবুর নিকট ছুটী চাহিতে গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর, তহবিল মিলাইয়া, আহারান্তে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ীর নল মুখে বাবু যখন 'বিশ্রাম' করেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময়টীতেই বাবুর মেজাজটী কিঞ্চিৎ নরম থাকে। রাজেন ঠিক সেই সময়েই গিয়া তাহার আবেদন জানাইল। সর্ব্বদাই খিট্ খিটে এই বাবুটী গদীর প্রায় সকলেরই উপর কোন না কোন কারণে চটা; কিন্তু এই রাজেনের উপর কোনদিনই চটেন নাই; কারণ তিনি কোনদিন তাহার কাজে বা ব্যবহারে বড় একটা 'ভুলচুক' বা 'খুঁত' ধরিতে পারেন নাই। অধিকন্তু রাজেন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া বাবু তাহাকে একটু ভয় ও ভক্তি করিতেন, কারণ এই দোকানেরই কোন্ এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা। কাজেই রাজেন ছুটী চাহিলে বাবু বলিলেন "তাইত হে,—এ সময় গদীতে লোক জন কম—" পরে গুড়গুড়ীর নলে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাও, কিন্তু ৭ দিনের মধ্যে আসা চাই।" রাজেন ছুটী পাইয়াই আগে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সতীশকে খবর দিতে গেল। সতীশও ঐ এক দোকানেরই কর্ম্মচারী; তার কাজ তাগাদা করা।

শুধু বাবু কেন গদীর প্রায় সকলেই রাজেনকে ভক্তি করিত, এত দারিদ্র্যে জীর্ণ শীর্ণ মানুষ অথচ এত বিশ্বাসী ও সৎস্বভাব খুব কম পাওয়া যায়। রাজেন অনাহারে থাকিত কিন্তু মনিবের টাকা গোরক্ত জ্ঞান করিত। বয়স তাহার আন্দাজ ত্রিশের দুই এক বছর বেশী হইবে। সংসারে মা, দুইটী পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী যেদিন দুইটী পুত্র রাখিয়া মারা যায়, সে আজ চারি বৎসরের কথা। তারপর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ঘটক আসিয়া

রাজেনের মাকে ধরিয়া বসিল। তিনিও বলিলেন, "বিয়ে দিতে হবে বৈকি, ছেলের আমার বয়স কোথা? তবে কি জানেন—মেয়েটী একটু বড় সড় হয়, এসেই ঘরকন্না করতে পারে, এমনি ধারাটী হ'লেই যেন আমার ভাল হয়; দেখ্‌ছেন তো আমি বুড়ো হাবড়া—"। ঘটকমহাশয়ও অমনি "তা বৈকি, তা বৈকি, সেই রকম মেয়েই আমার হাতে আছে—" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নিজের কাজ গুছাইয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। কিছুদিন পরেই একটী চৌদ্দ বছরের মেয়ের সঙ্গে রাজেনের বিবাহ হইয়া গেল। এত দারিদ্র্যে নিস্পিষ্ট রাজেনের আপত্তি করিবারও বুঝি শক্তি ছিল না, সে সকল বিষয়েই নির্ব্বিকার। শ্বাশুড়ী 'ধুলো পায়ে' দিন করাইয়া বৌকে ঘরে আনিলেন। নূতন বৌ আসিয়া ছেলেদুটীকে আদর যত্ন করিতে লাগিল এবং শ্বাশুড়ীকেও বেশ ভক্তি করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ীটীকে আর সংসারের প্রায় কোন কাজই করিতে হয় না, বৌমাই সব করে। তা ছাড়া, এমনি নীরবে সে কাজ করিয়া যাইত, যে পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এই বৌটীর কোনদিন মুখের রা'টী শুনিতে পায় নাই।

*   *   *   *   *

পরশু দিন বাড়ী যাইবে, সুতরাং কাহার জন্য কি লইয়া যাইতে হইবে, সে রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া রাজেন তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ মুখে এখন হাসি ধরে না। স্থির করিল, মায়ের জন্য তো এক জোড়া কাপড় লইতেই হইবে, আর আসিবার সময় তাঁহার হরি নামের ঝোলাটী ছেঁড়া দেখিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার জন্য একটী হরিনামের 'ঝোলা'ও লইতে হইবে। তার পর ভাবিতে লাগিল,—ছেলেদের জন্য কি রকম কাপড়ই বা লইয়া যায়! দুইটিরই রং ফর্সা, কালা পেড়ে কাপড় বেশ মানাইবে, সুতরাং তাদের জন্য এক জোড়া কালা পেড়ে কাপড় লইতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী নারায়ণীর জন্য কি রকম কাপড় লওয়া যায়? পাছা পেড়ে লইব, না বেপাছা সাড়ী লইব? খুব চওড়া হাতীপাড় লইব, না ইঞ্চিপাড় লইব? বিলাতী ভাল হইবে কি, দেশী শান্তিপুরে কি ফরাসডাঙ্গার ভাল হইবে? এইরূপ অনেক কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপর টাকার কথা মনে হইল; ভাবিয়া দেখিল, টাকার অভাব হইবে না, কারণ তাহার দুই মাসের বেতন পাওনা আছে। ২৪ টাকা! সে কি কম, রাজার রাজত্যি!!

পরদিন সকালে রাজেনের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আজকের দিনটা গেলে বাঁচি!" বৈকালে বাবুর নিকট টাকা চাহিয়া লইয়া বাজার সারিল। তারপর গ্রামের একটী লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া মুর্গিহাটা দিয়া যখন ফিরিতেছিল, তখন দেখিল, কয়েকখানা সুগন্ধি তেলের দোকানের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। রাজেনের মনে হইল, নারায়ণীর জন্য একশিশি নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার ভাবনা আসিল, যদি টাকায় না কুলায়! যাহা হউক, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজেন অল্পদামী একশিশি সুগন্ধি তেল স্ত্রীর জন্য কিনিল।

রাত্রিতে রাজেন পুটুলি বাঁধিতেছে, এমন সময় সতীশ আসিয়া পড়িল, বলিল, "বাঃ—রাজেন দা,—তীর্থযাত্রী মেয়েদের মত তোমার পুটুলি তো দেখছি নিতান্ত ছোট হল না। কি এত কিন্‌লে?"

রাজেন বলিল, "ভাই একটা দুটো করতে করতে এতগুলোই হয়ে উঠলো, এখন হাতে পথ খরচা বই আর কিছু নেই। এই ধর না—একখানা লোহার কড়াই কিন্‌লাম; মা পোস্ত ভালবাসেন, সেই জন্যে পাঁচপোয়া পোস্ত কিনলাম। তারপর, ফৌজদারী বালাখানার তামাকও খানিকটা নিতে হল,—বাড়ী গেলেই পাড়ার সবাই এসে বল্‌বেন, "কি হে কলকাতা থেকে এলে, ভাল তামাক টামাক কিছু এনেছ"—

এইবারে সতীশ বাধা দিয়া বলিল,—"তা বেশ, বেশ—কিন্তু কাপড় চোপড় কিনবে বলছিলে, কি কিনলে দেখি। এই বলিয়া সে পুটুলিটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর মোটটী গুছাইয়া বাঁধিতে গিয়া একটা শিশি নজরে পড়ায় সতীশ বলিয়া উঠিল, "ও কি, রাজেন দা, একটা বাসতেলও বুঝি নিয়েছ? তাই বলি, এত বাস বেরুচ্ছে কোথা থেকে। কি তেল দেখি—"

রাজেন তাহার হাত হইতে পুটুলিটী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ওরে চুপ কর হতভাগা, ওঘরে বাবু এখনও জেগে আছেন, শুনতে পাবেন যে।" সতীশ চুপ করিল। তারপর কতকগুলো কাগজ চোখে পড়ায় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, অত কাগজ কিনলে কেন রাজেন দা।"

রাজেন বলিল, 'ভাই বড় ছেলে কানাই পাততাড়ী ছেড়ে কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছে, তাই তার জন্যে দু'দিস্তা কাগজ নিলাম।"

পরদিন প্রাতে সাড়ে ছ'টার সময় ট্রেন। কিন্তু রাত্রি তিনটা হইতে চার-পাঁচবার উঠিয়া রাজেন দেশলাই জ্বালিয়াছে আর দেওয়ালের ক্লক্‌টা দেখিয়াছে। পাঁচটার সময় আর থাকিতে না পারিয়া সতীশকে উঠাইয়া বলিল, "ওরে ওঠ্ না ভাই, এইবারে স্টেশনে যাওয়া যাক্।" "এত তাড়াতাড়ি কেন, যাব তো ভারী এইটুকু"—এই বলিয়া সতীশ আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। রাজেন বলিল, "ওরে বুঝিস না, রেলের কাজ—একটু আগে যাওয়াই ভাল।"

যথাসময়ে রাজেনকে ট্রেনে চাপাইয়া দিয়া সতীশ বাসায় ফিরিল।

* * * * *

রাজেন যখন রসুলপুরে নামিল, তখন বেলা প্রায় দশটা। স্টেশন হইতে তাহার বাড়ী প্রায় সাত আট ক্রোশ। সে প্রথমে একটু মুটের চেষ্টা করল, কিন্তু মুটে যখন কিছুতেই এক টাকার কমে নামিল না তখন সে ভাবিল, 'আমার মাইনে হ'ল মাসে বার টাকা, আমি একটা টাকা মুটেকে দিই কি করে?" এই ভাবিয়া সে নিজেই মোটটী মাথায় করিয়া, সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রে চলিতে আরম্ভ করিল। কথায় বলে, বাড়ীমুখো বাঙ্গালী আর রণমুখো সেপাই—তা'ছাড়া রাজেন আজ ছয়মাস পরে বাড়ী ফিরিতেছে, তাহার কি আর রোদ বৃষ্টি জ্ঞান থাকে!

ক্রোশ দুই আসার পর রাজেন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে মাঠের একটা পুকুরের পাড়ে বটতলায় বসিল। পুকুরে তখন দুই চারিজন বাঙ্গালীর মেয়ে জাল লইয়া মাছ ধরিতেছিল। বেলা বোধ হয় দ্বিপ্রহর। তাহার মনে হইল, "এতক্ষণ হয়ত তাহার স্ত্রীর রান্না শেষ হ'য়ে গেছে, ছেলেরা পাঠশালে গেছে, আর সে' হয়ত মাকে খাওয়াচ্ছে, অথবা, হয়ত দু'জনেরই খাওয়া হ'য়ে গেছে, মা শুয়ে আছেন, আর 'সে' মায়ের মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্চে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজেন অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি কোন রাখাল কৃষাণ সেদিক দিয়া যায়, তাহা হইলে সে একবার কড়া তামাক খাইতে পায়। কিন্তু কেহই যখন আসিল না, তখন সে তাহার পুঁটুলি খুলিয়া তামাক সাজিল এবং তাহার জলশূন্য হুঁকায় টান দিয়া তামাক খাওয়ার সাধ মিটাইল। পরে আবার চলিতে লাগিল।

আরও তিন ক্রোশ আসার পর সে একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িল। একটা পুকুরে স্নান করিয়া লইয়া একটী আমগাছের তলায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল। আবার চলিল। ক্রমে সূর্য্যদেব লাল হইয়া নীচে নামিতে লাগিলেন আর পিছনের দিকে তাকাইয়া যেন বলিতে লাগিলেন, "পথিক সন্ধ্যা হয় হয়, একটু দ্রুত গমন কর।" রাজেন দেখিল, আর তিন পোয়া আন্দাজ রাস্তা বাকী, গ্রামের বাবুদের চিলে, কোঠা দেখা যাইতেছে, তাড়াতাড়ি করিয়া আর লাভ কি?

ক্রমে যখন গা-ঢাকা ঢাকা অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন রাজেন গ্রামের বাহিরে 'রায়দীঘির' পাড়ে পৌঁছিল। এই দীঘির জলই তাহাদের পাড়ার সকলে খায়। রাজেন একটা তেঁতুল তলায় বসিল, ভাবিল এই সময়ই তো তাহার স্ত্রী এই দীঘিতে জল লইতে আসে, আজও আসিবে, সে এইখান হইতে দেখিবে। ক্রমে যখন পাড়ার বৌদ ঝি সকলেই জল লইয়া গেল, অথচ তাহার স্ত্রী আসিল না, তখন তাহার ভয় হইল, অসুখ বিসুখ করে নাই তো! পরে ভাবিল, বোধ হয় আজ বেলা থাকিতেই জল লইয়া গিয়াছে. এই ভাবিয়া দীঘির ঘাটে পা ধুইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল, দূরে দয়াল কাকা তাহাকে দেখিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পরিচিত অনেককেই সে দূর হইতে দেখিতে পাইল, কিন্তু সকলেই পাশ কাটাইতে লাগিল। কেবল যখন রাঙা পিসির সামনে পড়িয়া গেল, তখন তিনি আর পাশ কাটাইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, রাজু যে!" "হাঁ পিসিমা, ভাল আছত!" বলিয়া রাজেন চলিতে লাগিল; তাহার আর কিছু বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইতেছিল না। কেহই ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না দেখিয়া, এক অপ্রত্যাশিত বিপদের আশঙ্কায় রাজেনের বুক কাঁপিতে লাগিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়া সে কিছুক্ষণ বহির্ব্বাটীর দরজায় কান পাতিয়া রহিল, যদি কাহারও কোন কথা শুনিতে পায়। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। কোন্ এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া উঠানে পা দিয়াই সে ডাকিল "মা।"

কে বাবা, রাজু এলি।" বলিয়াই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা, বৌমা আমার নেই রে, আজ তিনদিন হ'ল মাকে আমার হারিয়েছি বাবারে—।" রাজেন সেই খানেই বসিয়া পড়িল; মা কাঁদিতে লাগিল, ছেলেদুটীও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার শব্দে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। তাহারা রাজনের মাকে থামাইল। রাজেন 'গুম খাইয়া' বসিয়াছিল; তাহার বুকটা চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহার বোধহয়, চেঁচাইয়া কাঁদিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চোখের জলে তাহার বুকটা ভাসিয়া যাইতেছিল। অবশেষে কে একজন বুঝাইয়া বলিলেন, "যা বাবা, চান্ করে আয়—সারা দিনটা খাওয়া হয়নি।" "হুঁ যাই" বলিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজেন স্নান করিতে গেল।

সে রাত্রিতে মা রাজনকে একলা শুইতে দিলেন না। তিনিও ছেলেদের লইয়া এক ঘরেই শুইলেন। বলিতে লাগিলেন, "হঠাৎ সর্দ্দি হ'য়ে দু'তিনদিনে যে এত বাড়াবাড়ি হবে, বাবা তা ডাক্তারও বুঝতে পারেনি।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এমনি হবে জানলে কি তোকে না জানাতাম বাবা।" এইরূপে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত মা তাহাকে অসুখের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজেন বুঝিল, 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' হইতে নিউমোনিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই নারায়ণী মারা গিয়াছে। স্ত্রীর কথা যতই সে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, ছয় মাস পূর্ব্বে যেদিন সে বাড়ী হইতে যায়, সেদিনও তাহার স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছিল; মুনিবের কাজের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া বার বার তাগাদা পত্র আসায় বাধ্য হইয়া তাহাকে রোগকাতর স্ত্রীকে ফেলিয়াই কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল।

পরদিন মা যখন স্নান করিতে গেলেন এবং ছেলেরা কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, সেই সময় রাজেন তাহার পুঁটুলিটি খুলিল এবং স্ত্রীর জন্য আনীত শাড়ীখানি ও তেলটী বাহির করিল। পরে একটা কাঠের সিন্দুকে—যাহাতে পুরাণো ছেঁড়া কাপড় চোপড় থাকে—তাহারই সব নীচে চোখের জলে ভিজাইয়া সেই সাড়ীখানি রাখিয়া দিল, তার উপর কতকগুলি পুরাণো কাপড় চোপড় চাপা দিল, যেন সহসা কাহারও তাহাতে চোখ না পড়ে। আর সেই তেলের শিশিটা খুব একটা উঁচু কুলুঙ্গিতে—যেখানে তাহার মা কোনদিন হাত দেন না, আর

ছেলেরাও নাগাল পায় না, সেই খানে তুলিয়া রাখিল। চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরের একপাশে একটা কুলুঙ্গিতে রাজেন দেখিল মাথা বাঁধা ফিতে, চুলের গুছি, আর মাথার কাঁটা রহিয়াছে, আর একটা কাঁচের বাটীতে খানিকটা নারিকেল তেল, তাহাতে সিঁদুর পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরের 'আড়ায়' একখানা হলুদের দাগটানা কাঁথা ঝুলিতেছে, বোধ হয় পাড়ায় কেহ তাহার ছেলের জন্য বুনিতে দিয়াছিল, নারায়ণী শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই। আর দেখিল, দেওয়ালের গায়ে গজালে একখানা আয়না ঝুলিতেছে, তাহার ফ্রেমটিও সিঁদুর মাখান। পিছনের একটা ছোট কুলুঙ্গীতে দেখিল, একটা চাবির রিং, আর কতকগুলো ভাঙ্গাচুড়ী রহিয়াছে। চোখের জলে তাহার চোখ ভরিয়া গেল। সে আর চাহিতে পারিল না বুকের ভিতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মনে করিল একবার খুব চীৎকার করিয়া কাঁদে। ঠিক এমনি সময় তাহার বাল্যবন্ধু যুগল আসিয়া ডাকিল, "রাজেন"। রাজেন বাহির হইয়া আসিল। তারপর যুগল বলিল, "আমি ভাই দু'দিন বাড়ীতে ছিলাম না, —এই মাত্র আসছি, এসেই শুনি তুই এসেছিস—উঃ চোখ দুটো তোর যে লাল জবাফুলের মত হ'য়ে উঠেছেরে, আয় আমাদের বাড়ী—" বলিয়া যুগল তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একদিন স্নানান্তে ঘরের পিড়েতে বসিয়া রাজেন তাহার মায়ের হরিনামের মালা গাছটী নূতন করিয়া গাঁথিতেছে, এমন সময়, তাহার মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা, ও ঘরটায় কি ইন্দুরের দৌরাত্মিই হয়েছে। ঘরের কপাটটা খুলেই একটা কিসের বাস পেলাম—ঢুকে দেখি, একটা বাস তেলের শিশি ভেঙে পড়ে রয়েছে, ঘরময় তেল ছড়াছড়ি। আহা—মা আমার কোন কুলুঙ্গীতে কখন তুলে রেখেছিল, বোধ হয় একদিনও মাখে নি। —ছেলে দু'টো আবার তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মাখছে—বললাম—কাঁচে হাত কেটে যাবে—তাই কি শোনে—! যাই দেখি গে।" বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। রাজেন বুঝিল, এ কোন্ তেলের শিশি! কয়েকদিন পূর্ব্বে কত সাধ করিয়াই না সে মুর্গিহাটায় এই তেলের শিশিটী কিনিয়াছিল!

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রাজেনের নামে একখানি চিঠি 'পিওন' দিয়া গেল। তাহার মনিব দিয়াছেন, লিখিয়াছেন—সাতদিনের, ছুটী লইয়া গিয়াছেন, আজ প্রায় দুই সপ্তাহের উপর হইয়া গেল, যত শীঘ্র পারেন, চলিয়া আসুন, কাজের বিষম ক্ষতি হইতেছে।'

চৈত্র, ১৩২৭

দ্বিদল কমল

বিভূতিভূষণ ভট্ট

এক রাজা ছিলেন; সেই রাজার দুয়ো সুয়ো কুয়ো প্রভৃতি ক'টী যে রাণী ছিলেন জানি না, কিন্তু একটী যে পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। কারণ এই গল্পটী (গল্প নয়) তারই বিষয়ে লিখিত। এবং যা লিখিত তা নিশ্চয়ই শ্রুত। আবার যা শ্রুতি তা নিশ্চয় ধ্রুব সত্য। অতএব প্রমাণ হল যে এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এ প্রমাণ যে অগ্রাহ্য করবে শ্রুতিকে বিশ্বাস না করার দরুণ এই আর্য্যের দেশ আর্য্যাবর্ত্তে তার স্থান নেই;—সে হয় কিষ্কিন্ধ্যায় যাক, না হয় সাগর ডিঙ্গিয়ে মরুক গে।

এখন, সেই রাজকন্যাটী যখন পরমাসুন্দরী তখন কাজে কাজেই সেই মেয়ের উপযুক্ত বর জোটান দায় হয়ে উঠ্‌ল—বাপের পক্ষে হোক্ না হোক্ গল্প লেখকের পক্ষে ত বটেই। কত দেশের কত রাজপুত্র এসে ঘুরে গেল, কত মন্ত্রিপুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্র, এসে কত ষড়যন্ত্র করে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস্ বেঙ্গমা বেঙ্গমী কত পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তালপত্র খাঁড়া রাজকন্যার দরজায় এসে ডিগবাজী খেলে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই পারলে না।

কেন? ঐ তো তোমাদের দোষ! 'কেন', জিজ্ঞাসা কর কেন বাপু—যারা 'কেন' জিজ্ঞাসা করে তারা গল্প শুনবার উপযুক্তই নয়। যারা গল্প শুনতে 'কেন', জিজ্ঞাসা করবে তাদের সব কলেজে পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ক্রমাগত কেন কেন করুক গে।'

যা হোক, রাজকন্যার বর তো আর জোটে না। কেন? আবার 'কেন'? দুর হোক, বাপু, তবে উত্তরই দিই,—কিন্তু খবরদার আর কাউকে বল না। শোনো, কাণে কাণে বলি—মেয়েটী একটী স্বপ্ন দেখেছিল।

হাসছ? ভাবছ এই বুঝি একটা ভারী গোপন কথা। স্বপ্ন তো সবাই দেখে, তা আবার এত কাণে কাণে বলতে হবে নাকি?

ওহে তোমরা ছেলেমানুষ জান না, এ এমন দেশ যেখানে এ সব কথা কাণে কাণে বল্‌তে হয় নইলে সব বিফল হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড় ফুক্ সমস্তই কাণে কাণে বল্‌তে হয়, নইলে কুকুর বেড়াল শুনতে পেলেও যে, সব বেফাঁস হয়ে যায়। যদি বলবার দরকার হয় 'ফুস্‌টী আর ফাস্‌টী ধানটীর মধ্যে তুষটী' তবু কাণে কাণে বলতে হবে, নইলে সব মাটী। স্বপ্ন যে ফলবে না, বুঝছ না?

শোনো না, মেয়েটী একটী স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এমন স্বপ্ন, যার জন্য ঐ অত বড় রাজার অত বড় রাজ্যটার ইয়া ইয়া টীকী থেকে আরম্ভ করে ধান গাছের শীষ, নৌকার হাল, বলদের ল্যাজ সমস্তই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু কি স্বপ্ন বল দেখি?

পারলে না? পারবে কেন? একি যে সে স্বপ্ন? একি যার তার দেখা স্বপ্ন? এ যে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার পরম সুন্দর মগজে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল। তোমাদের মগজে তা ধরা দেবে কেন?

তবে বলি শোনো, রাজকন্যা স্বপ্ন দেখলে,—একটী অদ্ভুত পদ্ম অসম্ভব জলে ভাসতে ভাসতে অকারণে তাঁর বুকে এসে ঠেক্‌ল! রাজকন্যা পদ্মটী হাতে নিয়ে দেখে তার মোটে

দু'টী পাপড়ী। সোনার বরণ পাপড়ী দু'টীর মধ্যিখানে একটিমাত্র অপরূপ কেশর ঊর্দ্ধদিকে উঠেছে। আর পদ্মটীর এমন গুণ যে পদ্মটী হাতে নেবা মাত্র রাজকন্যা যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সেই পদ্মটীর মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর সেই কেশরটীর মধ্য দিয়ে কোথায় যে কোন আলোকপথে চলে গেল, সে কথা আর জেগে উঠে সে মনেই করতে পারলে না।

তারপর, জেগে উঠে, এই যে কান্না জুড়ে দিলে তার আর বিরাম নেই। বালিস ভিজল, বিছানা ভিজল, এমন কি শেষে তার মা বাপের মনও ভিজে পাঁক হয়ে গেল। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মেয়ের এই স্বপ্নলব্ধ দুই পাঁপড়ীর পদ্ম যে এনে দেবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন—অবশ্য অর্দ্ধেক রাজত্ব তো যৌতুক আছেই।

এখন বল দেখি তোমরা সেই দুই পাপড়ীর পদ্ম কোথাও দেখেছ? এতক্ষণ যে হাসছিলে, হাস দেখি এইবার? চালাকী!—একি যে সে স্বপ্ন?

যাক আর ভেবে কাজ নেই, কারণ ভেবে কোনো ফল নেই। এতো আর ইস্কুল কলেজ ছাড়া নয় যে এক কথায় ঝুলি ঘাড়ে করে বেরিয়ে নন-কো-অপারেসনের সব মীমাংসা সমাধান করে ফেলবে? বাপু, এ হচ্চে দ্বিদল পদ্ম, এবং এক রাজকন্যার মগজে গজিয়ে উঠেছে। একে কি সহজে পাওয়া যায়?

একে সহজে পাওয়া যায় না, তাই সেই রাজার রাজ্যের মন্ত্রী হতে যন্ত্রী, সরকার হতে কর্ম্মকার সকলের মাথা গরম হয়ে উঠল, কিন্তু এর সন্ধান কেউ নির্ণয় করতে পারলে না। সারা রাজ্য ভরে একটা সন্দেহ একটা তর্ক একটা ভয়ের ঢেউ উঠলো—কিন্তু পদ্মটী কেউ মেলাতে পারলে না।

তখন রাজপুত্ররা বেরিয়ে গেলেন পক্ষিরাজে চড়ে, মন্ত্রি-পুত্ররা বসে গেলেন মনু যাজ্ঞ-বল্ক পেড়ে, সদাগরের পুত্ররা ভাসলেন ময়ূরপংক্ষী সাজিয়ে, আর কোটালের পুত্রটা তালঠুকতে লাগলেন তালপত্র খাঁড়া ঘষিয়ে মাজিয়ে। কত হাত চালান, নল চালান, কত ঊর্দ্ধঃপাতন, তির্য্যক পাতন, কত দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ, কিছুতেই সেই দ্বিদল পদ্মটীর আর খবর মেলেনা। কত রত্ন দ্বীপ মণিদ্বীপের খবর মিলল, মণি রত্নে রাজার ভাণ্ডার ভরে উঠল কিন্তু যার জন্যে সব বিফল সেইটাই মিললনা—তাই রাজকন্যার চোখের জল আর থামল না। কত রাজপুত্র কত সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত সোণার পাহাড় মুক্তোর ঝরণা রূপোর নদীর খবর নিয়ে এল, কিন্তু স্বপ্নের ফুলটী স্বপ্নতেই থেকে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস গন্ধর্ব্ব কিন্নরের খবর নিয়ে রাজকন্যার কাছে তারা এল কিন্তু রাজকন্যার চক্ষুদুটী জলে ভরেই রইল, কারু সঙ্গে চারচক্ষে আর মিলনই হল না। কত সদাগরের পুত্র পদ্ম মহাপদ্ম খর্ব্ব নিখর্ব্বের খবর দিলে, কিন্তু রাজকন্যা মুখই তুলে চাইলে না। কত মন্ত্রি-পুত্রেরা চতুর্দ্দল অষ্টদল সহস্রদলের বড় বড় শ্লোক শুনিয়ে গেল কিন্তু সেই পদ্মপত্রাক্ষীর নয়নপদ্মের দৃষ্টি কোন্ দুটী সোনার দলের আশায় যে মুদিত হয়ে রইল তা কেউ বলতেই পারলেনা। কোটালের পুত্ররা খাঁড়া ঢাল ঝাকালে 'ইয়া করেঙ্গা' 'উয়া করেঙ্গা' 'মারেঙ্গা' 'কাটেঙ্গা' কুকুর মেরে ফাঁসী যাঙ্গা' করলে কিন্তু স্বপ্নের পদ্ম স্বপ্নের আলোকেই রয়ে গেল। সে বুঝি আর বাইরে ধরা দেয় না! হায় হায় কি হবে? কে রাজকন্যার সেই স্বপ্নের ধন এনে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করবে? সেই অরুণ রাঙ্গা দ্বিদল কমলে একটী কেশর কে দেখাবি গো, কে দেখাবি?

রাজ্য ভরে এই শব্দ 'কে দেখাবি গো—কে আছিস!' সমস্ত রাজ্য মাথা নীচু করে বল্লে, কেউ না। লজ্জায় উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমস্ত দেশের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত রাঙ্গা হয়ে উঠল। এ দারুণ লজ্জা হতে কেউ কি এদের রক্ষা করতে পারবে না?

হেন কালে এক রাখাল এসে হাজির হল। শুনে হাসছ? হাসগে—রাখাল কিন্তু এল। সে চরাচ্ছিল গরু—তার গায়ে ছিল একটা উড়ুনি, পরনে ছিল ধড়া, হাতে ছিল একটা বাঁশের

বাঁশী। সে ছিল মাঠে—তার মুখে পড়ে ছিল প্রভাত সূর্য্যের আলো, তার বুকে এসে লেগেছিল দুরদূরান্তের হাওয়া। আর কাণে এসে বেজেছিল একটা শব্দ—তার বাঁশীর তাইরে নারের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছিল একটা শব্দ—আয়রে আয়। তাই সে এসেছে।

সে রাখাল, তাই সে অমনি ছুটে এসেছে, কোনো দ্বিধা করে নি—কোনো বাধা মানেনি। কোনো শাস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রের পরামর্শ নেয়নি। সে তার মাঠের হাওয়ার মত আলোর মত গানের মত স্বাধীন, তাই সে এসেছে। সে রাখাল তাই রাজার সিংদরজায় বাধা সে মানলে না, সিপাই সান্ত্রীদের দিকে সে চাইলে না, মন্ত্রী যন্ত্রীর শ্লোক সে শুনলে না—একেবারে রাজবাড়ীর সাত মহল সাত দরজা পার হয়ে সে রাজকন্যার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে 'আমি এনিছি গো এনিছি, পদ্মের খবর এনিছি।'

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলে, অমনি চার চক্ষে মিলে গেল—জল মুছে রাজকন্যা হেসে বল্লে, 'ও গো বীর এসেছ? এনেছ? কৈ দাও? কৈ আমার দ্বিদল কমল?'

রাখাল বল্লে—'একটী দল তুমি আর একটী দল আমি—তোমার আমার এই সত্যিকার মিলন হতে যে ইচ্ছা কেশর—একটী মাত্র ইচ্ছা কেশর দেখা দিল সেই ইচ্ছেকে ধরে কোন্ লোকে যে আমরা যাব তাত' কাউকে বলব না।'

আমার কথাটী—এ্যাঁ ফুরল না? আরো আছে নাকি? আচ্ছা তবে কি আছে তা তোমরাই বল? নটে গাছ মুড়ুল তবু আমার কথা ফুরবে না? তবে নাই ফুরোক, তবে যেন নাই ফুরোয়। তবে যেন এমন করে সাহস করে বীরের মত বনের রাখাল আমার রাজকন্যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে "আমি এসেছি গো এসেছি। আমি তোমায় ভাল বেসেছি সত্যি ভাল বেসেছি।" আর সেই সত্যলোকের মানুষটীর কথায় যেন আমায় রাজকন্যার দ্বিদল কমল ফুটে ওঠে। যেন সেই মন কমলের ইচ্ছে কেশর হেলে দুলে বেড়ে উঠে এ লোক হতে আলোক পথে আমার রাজকন্যাকে আলোকপানে নিয়ে যায়। ওগো তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমার রাজকুমারী যেন সেই রাখালকে পায় গো পায়—যার প্রেমের বাঁশীর পাঁচন ছুঁইয়ে দিতেই লোহার কপাট খুলে যায়, পাথরে দেয়াল পড়ে যায়, বাহির ভেতর এক হয়ে যায়, পাখী গায়, ফুল ফোটে, হাওয়া বয়, হাসি ছোটে, আনন্দে ভর পুর হয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম গেয়ে ওঠে মেতে ওঠে।

বাস্, আমার কথাটীও ফুরল না, নটে গাছটীও মুড়ুল না, হল তো?

চৈত্র, ১৩২৭

চিঠির গুচ্ছ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভাই নরেশ—

একই ডাকে দু'খানা চিঠি পেলুম—তোমার আর পিতৃদেবের। বাবা মা লিখেছেন, সেই কথাগুলিই অন্যভাবে সাজিয়ে তুমি পাঠিয়েচ। বোঝা গেল তাঁরই উপদেশ মত তুমি এরূপ করেচ।

সন্ন্যাসী হবার মতলব আমার কোনোদিনই ছিল না, সেটা তুমি জান। কাজেই পিতৃদেব তাঁর বংশ দুলালকে কোন ডানাকাটা পরীর রূপের ফাঁস পরিয়ে সংসারে টেনে রাখবার জন্য—যদি বা ব্যগ্র হয়ে থাকেন—তোমার কিন্তু তেমন কোন আশঙ্কা ছিল না। তুমি যদি তাঁকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে, তা'হলে আমার আজ এই সঙ্কটে পড়তে হোত না।

তুমি লিখেচ, যারা বিবাহ না করার ধূয়া তোলে, তাদের অন্তরে গোপন রয়েচে জীবনের দায়িত্বকে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। অন্য কারু মনের খবর আমি রাখিনে—তবে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুমি অসঙ্কোচে আনতে পার এবং সেটা যে মিথ্যা নয়, তাও স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত হব না।

সত্যিই আমি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে নারাজ। এর উত্তরে তুমি যা বলবে, তা আমি অনুমানে ঠিক করে নিয়েচি। তুমি বলবে, আমাকে দিয়ে তা'হলে দুনিয়ার কোনই কাজ হবে না। না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, দুনিয়াটা যত বড়, তার কাজও তেমনি বিরাট। সেই কাজে লেগে যাবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। তাতে বুকে যতটা বল থাকা দরকার, তার শতাংশের এক অংশও আমি কখনো অনুভব করিনি। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করলেই ও-কাজটা করা চলে না। ওর জন্য ভিন্ন শক্তি থাকা চাই। আমি জানি, এই নিয়ে তুমি দস্তুর মত তর্ক করতে প্রস্তুত। তুমি প্রতিপন্ন করবেই যে, মানুষের মাঝে যে শক্তি লুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তুল্লেই মানুষ সব কিছু করতে পারে। কারণ, তুমি বিশ্বাস কর, আমরা হচ্চি সব "অমৃতস্য পুত্রাঃ।" নেহাৎ যদি আমার মাঝে গোপন রয়েচে যে শক্তি, তাকে কথার জোরে জাগ্রত করতে তুমি অক্ষম হও, তা হলেও হিতো পদেশের তৃণগুচ্ছের সংহতি শক্তি আর ত্রেতা যুগে সমুদ্রবন্ধন ব্যাপারে কাঠ-বিড়ালীদের সাহায্যের নজীর খাড়া করতে তুমি বিরত হবে না। মনে মনে ও-সব আলোচনা করেও আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেচি, তোম'রা যাকে 'মহৎ-কাজ' বল আমাকে দিয়ে তার একটুকুও কিছু হবে না।

আমি লোকটি যে অলস তা তোমার অবিদিত নেই। ইজি চেয়ার চিৎ হয়ে পড়ে যখন চুরুটের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যেতে দেখি, তখন কেমন দিব্যি আরাম অনুভব করি, তেমনি রাত-দুপুরে, অ-কেজো-বাজে বলে যে পুঁথিগুলি তোমরা হাত দিয়ে ছুঁতেও নারাজ সেগুলি পড়তে পড়তে যখন দুনিয়ার অনেক কথাই ভুলে যাই, তখন এমন একটা আনন্দ অনুভব করি, যা ভাষা দিয়ে বোঝান না গেলেও দস্তুর মত আরাম জনক!

তুমি প্রশ্ন করবে, জীবনটা কি আমার চিরদিনই এমনি করে কেটে যাবে? এই ধরনের প্রশ্নকে আমি সত্যিই বড় ভয় করি। কারণ, ও-সব বিচারে খানিকটা এগিয়ে গেলে শেষটায়

এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বড়ই বিশ্রী সে।

আমি চাই পাবার মত করে জীবনকে পেতে একেবারে প্রাণময় হয়ে যেতে। কোনরূপ বন্ধনে কখনো আমার জীবনকে আড়ষ্ট করে ফেলতে আমি দেব না। আমার হৃদয়াকাশে আনন্দ-সবিতা চিরদিনই আলোয় আলোয় উষ্ণ করে রাখবে, পুলকিত করে তুলবে। চারিদিকে আঁধার করে কখনো যদি রাশি রাশি মেঘ জমে ওঠে, তা হলেও তার বুক-ভরা নিরানন্দের মাঝে পড়ে আমি 'হা হতোস্মি' বলে করুণ আর্তনাদ দিগন্তে না ছড়িয়ে মেঘ কেটে যাবার অপেক্ষা করেই বসে থাকব। তখন আমার অন্তরের অন্তর হতে যে সুর ফুটে বার হবে, তার মাঝেও থাকবে বিশেষ একটা মাধুর্য্য, নূতন ধরনের রাগিণী।

আগে একবার তোমায় লিখেছিলুম যে, তাহাতে আর আমাতে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েচে। উত্তরে তুমি জানিয়েচ যে, সে-টা ঠিক নয়; কারণ, তা'হলে আমরা এমন অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতুম না। বন্ধু তুমি আমার একমাত্র দুনিয়ার—একথা ভাবতেও আমি আরাম পাই, আরও আরাম পাই এই কথাই ভেবে যে, এই বন্ধুত্ব কখনো আমাদের নিজ নিজ চরিত্রে বৈশিষ্ট্য দাবী করে বসেনি। তা যদি করত, তুমি যদি আমাকে তোমারই ফটোগ্রাফ করে তুলতে চাইতে, অথবা আমি যদি চাইতুম তোমাকে একেবারে আমার ছাঁচেই ঢেলে নিতে, তা হলে আমাদের অন্তরের প্রীতি অ-প্রীতিতেই পরিণত হোত—সুধা শেষটায় গরল হয়েই উঠত।

যাক্ সে কথা। এখন তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমার প্রথম কথা হচ্চে এই যে, বিয়ে করাটা যে এখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েচে, তা আমি মোটেও বুঝতে পারচিনে। অভিভাবকদের পক্ষ হতে এত তাড়া হুড়োর মানে হচ্চে এই যে, এ বয়সেও আমার বিয়ে না দেওয়াটা তাঁরা ভালো দেখায় না বলে মনে করেন। বউদি অবশ্য একটি ছোট-খাট টুকটুকে বউ পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েচেন—আর সে আজ নতুন নয়। সাত বছর আগে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ছিলুম তখন হতেই। সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেব তখন সে কথা কাণেই তুলতেন না। স্পষ্ট বলে দিয়ে ছিলেন যে পড়া শেষ না হলে বিয়ে দেওয়া হবে না। বউদি অগত্যা বছর গুণে গুণে আশায় দিন কাটিয়ে ছিলেন। তারপর কলেজের ছাত্রত্ব ঘুচিয়ে যখন তার অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হলুম, তখন হতেই বউদি একেবারে ধৈর্য্য হারা হয়ে উঠলেন। বার বছর বয়সে মা'কে হারিয়েচি আর তারপর এই তের বছর সমস্ত দাবী দাওয়া, শতরকম মান-অভিমান অবাধে তাঁর উপর আমি চালিয়ে এসেচি। পেয়েচিও তাঁর বুকভরা স্নেহের সমস্তটাই অংশ। কাজেই তাঁর দাবী আজ অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বউ সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শ, তা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার যে স্ত্রী হবে, তার কাছে আমি কি প্রত্যাশা করব? নিজে বিয়ে করেও একথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তাদের কাছে প্রত্যাশা কি কিছু করা যায়?। অযাচিত ভাবে যা তারা দিয়ে আসচে, তার বেশী কিছু দেবার শক্তি কি তাদের মাঝে আমরা রেখেচি? তাদের কি কিছু আমরা শিখতে বা বুঝতে দিয়ে থাকি, যার ফলে তারা আমাদের দাসী না হয়ে সহধর্ম্মিণী হতে পারে?

আমরা কথায় কথায় মনুর দোহাই মেনে উঁচু গলায় ঘোষণা করি যে, আমাদের দেশে আবহমান কাল হতে নারীকে দেবীর আসনে বসিয়া রাখা হয়েছে। "নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" কথা নজীর স্বরূপ যখন তখনই আমরা বলে থাকি।

নারীকে আমরা পূজা না হয় নাই বা করলুম, কিন্তু মানুষের অধিকার যা, তা' হতে তাদের বঞ্চিত রাখবার পরোয়ানা আমাদের হাতে তুলে কে দিয়েচে? 'শক্তি মনের ধর্ম্ম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের এরূপ বিধান হতেই পারে না, আর সে বিধান যদি আমরা মেনে চলি তা হলে আমাদের অনেক দূরে পিছিয়ে যেতে হবে হয় ত একেবারে সেই আদিম যুগে। সেখানে ফিরে যেতে আমি চাই। কাজেই আমার মতে, সামনের পথে যত কিছু আগাছা, সব দূর করে ফেলা দরকার; নইলে চলবার ব্যাঘাত ঘটবে।

তুমি আরও লিখেচ যে, ইচ্ছে করলে যে কোন বাঙালী বধূকে স্বামী নিজের মনের মতটি করে গড়ে তুলতে পারে। তা হয়ত সম্ভব; কারণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তাদের যে মোটেই নেই। তুমি ওতেই তৃপ্ত—আমি কিন্তু মোটেই নই। যুগ-যুগান্ত তাচ্ছিল্যের ফলে মেয়েরা আপনাদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েচে। তাই আমরা তাদের পোষ মানাটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করচি। কিন্তু বাস্তব পক্ষে এর চাইতে অনিষ্টকর আর কোন ব্যাধি মানুষের এত ক্ষতি করতে পারে না।

তোমার আর একটা ধারণা এই যে, আমি একটা বিবি গোছের মেয়েকেই বিয়ে করব। ভয় নেই, বিয়ে করলে আমি কোন বঙ্গ-বালাকেই করব; তবে সে গাউণ পরবে কি বাইক চড়বে, অথবা তার শাড়ীর বহর আরো বাড়িয়ে নেবে, তা' স্থির হবে, তার শারীরিক সৌন্দর্য্য, শক্তি আর মানসিক প্রবৃত্তি বিবেচনা করে। তার বেশভূষা, তার চাল-চলন, শোভন হবে, সুন্দর হবে, আর তারই মনের মতটি হবে। সে সাহিত্যালোচনা করবে, না সেবাব্রত গ্রহণ করবে—কি কিছুই করবে না; কেবল হাসবে; গল্প করবে আর ঘুমুবে —তা নিশ্চতই আমি স্থির করে দেব না।

আমি শুধু দেখব সে যেন নিজেকে দাসী মনে করে সর্ব্বদাই খাট হয়ে না থাকে, আর আমিও যেন স্বামিত্বের দাবী করে তার ভিতরের নারীত্বকে গলা টিপে মেরে একটা জীবনকে একেবারে ব্যর্থ না করে ফেলি।

তোমার চিঠির জবাব স্বরূপ আমার যা বলবার ছিল, তা লিখে পাঠালুম। এই লম্বা চিঠি তোমার মূল্যবান সময় নিশ্চিতই খানিকটা নষ্ট করল একেবারে বাজে রকমে। এই সময়টা ব্রিফ্ ওল্টালে তোমার মক্কেলও তুষ্ট হোত, কোন কিছুর মিষ্টি আওয়াজও শুনতে পেতে।

ভাল কথা, কনক যে একেধারে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েচে। ইতি

তোমারই মোহিত।

[২]

স্নেহের ঠাকুর পো!

তোমার বন্ধু নরেশের নিকট তুমি যে চিঠিখানা লিখেচ, কনকের মারফত তা আমার হাতে এসে পৌঁছেচে। কনক হচ্চে আমার দূর সম্পর্কের মামাত বোন। তারই স্বামীই যে তোমার বন্ধু নরেশ, আর কনক যে তোমার কাছে রীতিমত নিয়মিত চিঠি, লেখে, তা তুমি আমায় কোন দিন বলনি। কনক আমায় লিখেচে যে, তুমি নাকি ছোট্ট বোনটির মতই স্নেহ কর আর সেও নাকি তোমার মত লোককে ভাই বলতে পেয়ে খুসী হয়েচে। তার চিঠিতে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না।

তোমার চিঠিতে দেখলুম যে, তুমি আমার দাবীটা উড়িয়ে দিতে পারচ না বিয়ে করতে কতকটা নিমরাজী গোছের হয়ে পড়েচ। কেবল আমার পছন্দ মত মেয়েকে তুমি সহধর্ম্মিণীর আসনে বসাতে ন'রাজ, অথচ, কেমনটি হলে তোমার পছন্দ হয়, তা না ব'লে, যা তা কিছু লিখে চিঠির কাগজ ভরেচ।

আমার অল্প বুদ্ধি নিয়ে তার কোন অর্থই বার করতে পারলুম না। তাই চিঠিখানা একেবারে তোমার দাদার কাছেই পেশ করলুম। পড়ে তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"বেশ লিখেচে।" আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম—আর তোমার নির্ব্বিকার অগ্রজ মশাই বেশ নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানতে লাগলেন। রাগে আমার সমস্তটা শরীর কাঁপ্‌তে লাগল।

আমি মনে মনে স্থির করলুম, যে, তোমার বিয়ের কথা আর কাউকে কোনদিন কিছু বলব না। বিবাগী হয়ে যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। আমার কি? তুমি ত আর আমার ভাই নও? যার ভাই, সেই যদি আগ্রহ না দেখালে, তা হলে আমারই বা এত মাথা ব্যাথা কেন?

শেষের কথাগুলো তোমার দাদাকে শুনিয়ে দিয়ে আমি অন্য ঘরে চলে গেলুম। খাবার সময় বাবা যখন তোমার বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন, তখন কাজের ছলে আমি সরে পড়লুম। সত্যই আমি শপথ করেছিলুম, এ সম্বন্ধে আমি একেবারে নীরব থাকব। কিন্তু, তারপর একা একা বসে থেকে আমার মনে হোল চোরের ওপর রাগ করে যে মাটীতে ভাত খায়, সে মস্ত বড় বোকা। আমি যদি তোমার দিকে না চাই, তা হলে কে আর চাইবে? কে আর আছে তোমার? যাঁর ভাবনার অবধি থাকত না তিনি স্বর্গের দেবী স্বর্গেই চলে গেছেন—যাঁরা রয়েচেন, তাঁরা ত সব পাথর দিয়ে গড়া। তোমার সুখ-দুঃখে তাদের প্রাণ নাচেও না কাঁদেও না।

বিদেশে কত কষ্টই পাচ্ছ। ঠাকুর চাকরের ওপর নির্ভর। মাইনে করা লোক দিয়ে কি সব কাজ চলে? তোমার দাদাটি কিন্তু মোটেই ভাল লোক নন। দুনিয়ার স্বার্থপর, আর বুদ্ধিতেও যে একটু খাট, এতদিনে তাও আমি আবিষ্কার করে ফেলেচি। আমি বেচারা যখনই তাঁকে তোমার অসুবিধার কথা বলি, তখনই তিনি উত্তর দেন—কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও! শুনে আমার গা যেন জ্বলে ওঠে। টাকা দিয়েই নাকি সব অসুবিধা দূর করা যায়!

বিদেশে বন্ধু-বান্ধব হীন যায়গায় থাকার যে কষ্ট তা তোমার দাদা কি করে বুঝবেন—চিরকাল তো বাড়ী থেকে আরামেই কাটিয়ে দিলেন। রোস, আমি তাঁকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আগে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর আমরা দু'বোন ছেলেমেয়েদের আর বাবাকে নিয়ে তোমার ওখানে গিয়ে থাকব। তখন তোমার দাদা বুঝতে পারবেন একা থাকার অসুবিধা কত।

বউ সম্বন্ধে আমার যা আদর্শ তা নাকি তুমি মোটেই বরদাস্ত করতে পার না। আমার মনে হয় কতকটা পার আর কতকটা পার না। লাল-টুকটুকে হলে নিশ্চিতই খুসী হও—ছোট-খাটটিই পছন্দ কর না, কেমন?

তোমার মনের মতটিই আমি খুঁজচি—সন্ধানও একটির পেয়েচি। কার্শিয়াং থেকে ইস্কুলে পড়ে—শুনচি খুব বিদ্যা। মেয়ের বাপ সেখানেই চাকরী করেন। বড়দিনের ছুটিতে সব কলকাতায় আসচেন—তুমিও এসো। দুজনে মিলে মেয়ে দেখা যাবে।

তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমাদের সংসারের ষোল আনা কাজ, তারপর আবার তুমি রয়েচ অত দূর দেশে; তার জন্য সকল সময়েই একটু চিন্তা। তোমার একটি বউ হলে, তার উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

ছেলে মেয়েরা তাদের কাকীমাকে দেখাবার জন্য যত রাজ্যের যা কিছু পাচ্ছে সব জমিয়ে রাখচে। তোমার থাকবার ঘরটা ঘসে মেজে একেবারে নতুন করে ফেলেচে। বাবা রোজ সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে বসে কাকীমা এলে কে কি করবে, কে বেশী ভালবাসবে অথবা

ভালবাসা পাবে, তারই আলোচনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর রামায়ণ মহাভারতের উপর দু-আঙ্গুল পুরু হয়ে ধূলো জমে উঠেচে। আমরা সকলেই যেন সমস্ত নিয়ম কানুন ভুলে গিয়েচি—কেবল তোমার দাদা সেই দশটায় আপিসে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যা সাতটায় পেঁচার মত মুখটি করে ঘরে ফিরচেন। বেচারা যে করে খাটে!

আজ পার্শেল করে তোমার জন্য কিছু খাবার পাঠালুম—খেতে কেমন হয়েচে জানিয়ো। তোমার খবর রোজই লিখো। ইতি।

আশীর্ব্বাদীকা
তোমার—বউদি!

স্নেহের মোহিত!

তুমি যে চিঠি খানা লিখেছিলে সেখানা কনক তোমার বউদির কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে—এ খবরটা এতদিন তুমি নিশ্চিতই পেয়েচ। এই দুষ্কৃতির জন্য কনকই সম্পূর্ণ দায়ী—আমি কিন্তু জান্তুম না যে চিঠি খানা চুরি গিয়েচে। জীবনের আদর্শ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কোন দিন ঝগড়া করিনি করবও না; তবে দুনিয়ার কাজ বলতে তুমি কি বুঝেচ, তা আমি জানিনে। মানুষ যে এই পৃথিবীর বুকে থেকে কেবল হাওয়ার উপরই ভেসে বেড়াবে, ফুলের মধু পান করবে অথচ কাঁটার খোঁচা খাবে না তা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

তুমি চাও পাবার মত করে প্রাণকে পেতে, আমিও তাই চাই। সকল মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীইতো তাই চায়। কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যায়? শারীরিক ব্যাধি মানসিক সুখ-দুঃখ, শত রকমের অভাব দৈন্য কি এই প্রাণের স্ফূর্তি লোপ করে দেয় না? যতক্ষণ না তুমি পারচ সেগুলোকে জয় করতে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করে তুমি পূর্ণ করে প্রাণকে পাবে না।

তুমি লিখেচ যে, বাইরের কোন কিছু তোমার ভিতরের আনন্দ নষ্ট করতে পারবে না—নিজের আনন্দে নিজেই তুমি বিভোর হয়ে থাকবে।

পার যদি বিশ্বের গরল-রাশি কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকতে, সেত খুবই ভাল কথা—কিন্তু মনে রেখো তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে ঐ একটি আনন্দময় প্রাণময় মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ যিনি রাজভোগ ও ভিক্ষান্নে সমানই তৃপ্ত, শ্মশানে ও প্রাসাদে সমানই অভ্যস্ত—প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠলেও যিনি আনন্দে নাচতে সক্ষম।

সামান্য রকমের দু'একটা বেদনার আঘাত উপেক্ষা করতেই এ অহঙ্কার কখনো যেন আমাদের মত্ত করে না তোলে যে, আমরা বাইরের আঘাত অগ্রাহ্য করবার শক্তিলাভ করেচি। যেখানে মানুষ তাকে পূর্ণ করে তুলতে চায় পরিবারের ভিতর দিয়ে, সমাজের আশ্রয়ে থেকে, দেশের ও দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, সেখানে বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করা যায় না।

তুমি অনেক সময় বলে থাক যে, দুনিয়ার কাজে লেগে যাবার মত শক্তি তোমার নেই। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে এর চাইতেও শতগুণে যা কঠিন, দুঃখ দৈন্য দূর করবার জন্য যে প্রবলতর শক্তির আবশ্যক, তা কি তুমি অর্জ্জন করতে পেরেচ? আমার মনে হয় দুনিয়ার কাজ করবার চাইতে—দিবানিশি দুনিয়ায় যে কাজ চলচে, তাই অগ্রাহ্য করা অনেক বেশি শক্ত।

তারপর দুনিয়ার কাজ কথাটা আমরা খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিনে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ যে ভাবে দুনিয়ার কাজ করেচেন, সে কাজ মানুষের নয় বলেই তো আমরা তাঁদের ভগবানের অবতার বলি। সেই ধরণের কাজ ছাড়া প্রতি মুহূর্তে কত ছোট বড় কার্য্য সমষ্টির ফলে আমাদের বিপুল এই পৃথিবী পলে পলে গড়ে উঠচে—তাতে যে পায়ে-দলা ধূলিকণা

হতে সুরু করে, উপরের ওই অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত যতকিছু আছে সবারই কিছু না কিছু দান রয়েচে। কেবল মানুষই কি কিছু দেয় নি? আমার মনে হয় দুনিয়া গঠন ব্যাপারে সবার চাইতে মানুষের দানই বেশি—আর সে মানুষের পৌনে-ষোল আনা ঠিক তোমার আমার মতই মানুষ।

তারপর, মেয়েদের প্রতি আমরা অবিচার করচি বলে তুমি ক্ষোভ প্রকাশ করেচ। তোমার মত হচ্চে, চলবার পথ হতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে দেওয়া। বেশ কথা। কিন্তু সে কাজ কে করবে? কল্পনার জাল বুনে গুটিপোকার মত কেবল নিজেকে ঘিরে ফেলে চুপটি করে বসে থাকলেই কি সামনেই পথ আপনা হতেই পরিষ্কৃত হয়ে যাবে?

হিন্দুরা মেয়েদের পূজা কোন দিন করেচেন কি করেননি সে বিচারে আমি প্রবৃত্ত হব না। তাঁরা যা করে গেছেন তার প্রমাণ ইতিহাসেই পাওয়া যাবে, যা করেন নি তাও করেছিলেন বলে কৃতিত্ব দেবার মত ভণ্ডামি আমার মাঝে নেই।

আমি আমাদের মেয়েদের দুর্দ্দশা যুক্তি তর্ক প্রয়োগে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার লোক নই। মর্ম্মে মর্ম্মে আমি অনুভব করচি আমাদের বিরাট দৈন্য যা দিন দিনই বেড়ে চলেচে তা দেশের নারী শক্তিকে অবহেলা করবার ফলে। যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর মত আমাদের এই সমাজ যে একেবারে অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সকল কাজেই তার পরিচয় পেয়ে তীব্র একটা বেদনা অনুভব করচি। সে ব্যথা, তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারচি, তোমার বুকেও বেজেচে। এই ব্যথা বুকে পুরে রেখে, চুপটি করে বসে থেকে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি গালি বর্ষণ করলে আমাদের মেয়েদের দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হবে না, ভাই।

মেয়েদের ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখবার মত এতবড় একটা অনিয়ম আমাদের সমাজে কেমন করে যে এসে পড়েচে, তা আমি ভেবে স্থির করতে পারিনে। এ সম্বন্ধে দেশে যা কিছু আলোচনা হচ্ছে, তাতে দেখচি দুটি দলে বিভিন্ন দুটি কারণ নির্দ্দেশ করচেন। এক দল বলেন, বিজেতা-জাতির অত্যাচার ভয়েই আমরা মেয়েদের নিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেচি, যেখানে আলো বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না—অর্থাৎ আমরা ইচ্ছে করে করিনি, জোর করে আমাদের দিয়ে করিয়েছে। অপর দলের উক্তি—অবরোধ প্রথা বিজেতা জাতির ভয়ে নয়, তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই সমাজে শিকড় গজিয়ে বসেছে।

এই দুই দলের মতের অ-মিলে বেশি কিছু এসে যায় না, কারণ, উভয়েই স্বীকার করচেন যে, এই প্রথাটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা মোহের বশে আমাদের পেয়ে বসেচে। ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে, ভাল বলে, ওটা আমরা গ্রহণ করিনি। মুস্কিল হচ্ছে আর একটি দলকে নিয়ে, যাঁরা বলেন, মেয়েদের সত্যিকার আসনই হচ্ছে ওই গৃহের কোণে—অসূর্য্যস্পশ্যা হলেই নারীর গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই দলের লোকেরা আবার চাণক্যের "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ" কথাটা যখন তখন বলে থাকেন; তবে রাজকুলকে অবিশ্বাস করা এবং তা ভাষায় প্রকাশ করা বিপজ্জনক জেনে স্ত্রীকুলকেই দুনোজোরে অবিশ্বাস করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। যাঁরা এ উপদেশ মত কাজ করতে নারাজ এ দলের মতে তাঁরা হচ্ছেন সমাজদ্রোহী। আমরা যে পারচিনে অবরোধ প্রথাকে সমুলে উৎপাটন করতে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই শেষোক্ত দল ভুক্ত।

ব্যক্তি বিশেষ যখন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন সমাজ তো চাইবেই ব্যক্তিবিশেষকে চেপে মারতে—কিন্তু বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি যখন সমষ্টির বন্ধন-গ্রন্থি শিথিল করে তার লোকদের স্বপক্ষে টেনে আন্‌বে তখন তাকে নিয়েই সমাজ গড়ে উঠবে; ক্রমে এক ঘরে হয়ে সেই থাকবে যে বিশিষ্ট এই ব্যক্তির আহ্বানে তার গড়া সমাজে এসে

যোগ না দেবে। এই জন্যই তো বলা হয়ে থাকে যে মানুষই সমাজ গড়ে,—সমাজ মানুষ গড়ে না।

ব্যাথা যদি পেয়ে থাক, বন্ধু, মেয়েদের অমর্য্যাদা বুঝতে পেরে, তবে সে বেদনা বুকে চেপে রেখে নিজেরই সর্ব্বনাশ করো না। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে চেষ্টা কর নারীশক্তিকে জাগ্রত করতে। তাদের শক্তিশালিনী করে তোল—তা হলেই পুরুষদের মিথ্যা পৌরুষ টিকবে না।

এই সমস্যার আর একটা দিক আছে। আমরা সবাই যে মেয়েদের তুচ্ছ করেই তাদের প্রতি অবিচার করি তা নয়। আর্থিক দুরবস্থায় বাধ্য হয়েই অনেক সময় আমাদের তা করতে হয়। দাসীর কাজ মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নেবার প্রয়োজন আমাদের কখনই থাকত না, যদি আমরা সকলেই দাস-দাসী রাখতে পারতাম।

বেলা দশটা হতে সুরু করে একপ্রহর রাত পর্য্যন্ত বিশ্রী রকমে খেটে পুরুষেরা যেখানে দুবেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা করতে পারে না, সেখানে মেয়েরাই বা কেমন করে মুক্ত আলো বায়ুর সন্ধানে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'চার ঘণ্টা বাইরের অবসর ভোগ করবেন!

আজ আর কিছু লিখব না। আমরা ভাল আছি। আগামীতে তোমার কুশল লিখো। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
নরেশ—

চৈত্র, ১৩২৭

সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব

নলিনীকান্ত সরকার

নিখিল বাবু বসন্তপুরের জমিদার। জমিদারী খুব বেশী না থাকিলেও সম্মানটা তাহার অনুপাতে খুব বেশীই ছিল। কারণ, পার্শ্ববর্তী গ্রামের রেশমকুঠীর সাহেবরা এবং রেলের গার্ড সাহেব প্রভৃতি গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণ প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত। তিনি এইরূপে কুঠিয়াল সাহেব ও রেলের গার্ড সাহেবের সিঁড়ি বাহিয়া অনেকটা উঁচুতেও উঠিয়াছিলেন। সাহেবদের কাছে তাঁহার একটা খুব বড় রকমের প্রত্যাশা ছিল যে, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া দিল্লীর দোকান হইতে একটা ভাল রকমের লাড্ডু আনিয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিখিল বাবুর রসনা আজি পর্য্যন্ত "সে রসে বঞ্চিত।" নিখিলবাবু আজি পর্য্যন্ত নিরুপাধি!

নিখিল বাবু খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পাছে দারিদ্র্যকে সম্মান করা হয় এই জন্য তিনি গরীব-দুঃখীকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। বহু গরীব ছাত্র, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা, অন্ধ খঞ্জ ভিখারী কখনও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাইতে পারে নাই। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহার কোন সদ্ব্যয় ছিল না।

তাঁহার বাড়ীতে কুকুর-প্রতিপালনে যাহা খরচ হইত, আমাদের দেশের বড় বড় জমিদারের সংসারে তাহার সিকি ভাগও খরচ হয় না। এই কুকুর ছিল দুই রকম। কতকগুলির লেজ ছিল, কতকগুলির ছিল না। যাহাদের লেজ ছিল, তাহাদিগকে সকলে কুকুর বলিয়াই ভাবিত; আর যাহাদের লেজ ছিল না, তাহাদিগকে সকলে বলিত সারমেয়। কুকুরগুলিকে তিনি লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখিতেন, আর সারমেয়গুলি সোণার ফ্রেমে আট্‌কানো ঠুলি চোখে পরিয়া, সোণার শিকলে বাঁধা থাকিত।

নিখিল বাবু কথায় কথায় আইনের দোহাই দিতেন। এক একটি আইনের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেন যে, বড় বড় উকিল-ব্যারিষ্টারকে তাক্ লাগাইয়া দিতেন। তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—এ যুগ, আইনের যুগ। এ যুগে যিনি আইন বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন, তিনিই জীবনে উন্নতি করিতে পারিবেন। তাই তিনি আইনের সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতে আদৌ আলস্য বোধ করিতেন না।

[২]

বসন্তপুরের জমিদার-বাটীতে প্রতি বৎসরেই মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে নিখিলবাবুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে এবারের পূজার ভার নিখিল বাবুর উপর। পূজা এবারে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে নিখিলবাবু একাগ্রমনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। নিকটে কতকগুলি সারমেয় বসিয়া তাঁহার পদলেহন ও চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় তাঁহার পুত্র শচীন্দ্র তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"হাঁ বাবা, এবার পূজোয় কি রকম কি হবে?"

'তাই তো ভাবছি। যে রকম দিন কাল, তা'তে পুজোটা বাদ দেওয়াই ভাল। বরং পৌষ মাসের কোন একটা ব্যাপারে সে খরচটা করা যুক্তি-সঙ্গত।"

বিস্ময় চিত্তে শচীন্দ্র বলিল—

"তা কি হয় বাবা? বছরের এই দিনটাই তো আমাদের দিন। দুর্গাপূজো কি উঠিয়ে দেওয়া চলে?"

নিখিলবাবু পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"ওরে বাবা, দেশ-কাল-পাত্র বুঝে সকল কাজ কর্‌তে হবে। দেশটা বাঙ্গলা, কাল তো বুঝতেই পাচ্চিস, আর পাত্র—আমরা জমিদার। দুর্গাপূজো আমাদের এখন না করাই ভাল।"

"তা'তে দোষ কি?"

নিখিলবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"পূজোটা রাজসিক—বুঝলি—পূজোটা রাজসিক।"

"দুর্গাপূজো তো চিরকালই রাজসিক। তা'তে হ'ল কি? না বাবা, পূজো বাদ দেওয়া হবে না।"

"ছেলেমানুষী করিস্‌নে শচীন, একটু ভেবে দেখ,—বুঝতে পারবি। ও সব মারামারি কাটাকাটি পূজোর মধ্যে না যাওয়াই ভাল।"

পিতার সহিত তর্কে পাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, এই ভাবিয়া শচীন্দ্র ক্ষুণ্ণ মনে তথা হইতে চলিয়া গেল। নিখিল বাবু পুত্রের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন। প্রায় সকলেই তাঁহার কথাতে সায় দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি, মহামহোপাধ্যায় মশায়, কি করা যায়?"

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় একটি কৌটা হইতে নস্য লইয়া নাসিকার উদরপূর্ত্তি করিতেছিলেন। বদ্ধ-নাস অবস্থায় উত্তর দিলেন—

"জগদব্বার অর্চ্চরাটা যখন সব্বচ্ছরই হ'য়ে থাকে, তখন এবারে বদ্দ দেওয়াটা সগ্‌গত হয় না। পূজোটা রাজসিক আকারে না করে' সাত্ত্বিক তো হ'তে পারে। বা আবার ব্রম্ভবয়ী।"

"মা আমার ব্রহ্মময়ী" নিখিল বাবু বলিলেন—"বাঃ বেড়ে বলেছেন পণ্ডিত মশায়, মা আমার ব্রহ্মময়ী। তবে তো মাকে নিরাকারেও পূজো করতে পারা যায়? কিন্তু তার চাইতে সাত্ত্বিক ভাবটাই যেন আমাদের পক্ষে বেশী খাপ খায়। আচ্ছা সাত্ত্বিক পূজোয় কি রকম কি হবে?"

পণ্ডিত মহাশয় নস্যভরা নাসিকা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন—

"পূজোর উপকরলের কোনো অগগই বাদ যাবে না। কেবল রক্ত চন্দর বাদ দিয়ে শ্বেত চন্দর আলতে হবে।"

নিখিল বাবু সম্মতি সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—

"তা ঠিকই। রক্ত-চন্দনটাতে বেশ একটু উত্তেজনার ভাব আসে বটে। আচ্ছা, আর আর?"

"আর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমিও আপনার সগ্গে সগ্গেই আছি।"

[৩]

নিখিল বাবু সাত্ত্বিক দুর্গোৎসবে সম্মত। প্রতিমা গড়িবার জন্য গোয়াড়ী হইতে কারিগর আসিয়াছে। নিখিল বাবুর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। নিখিল বাবু চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ওহে ও কারিগর!—শুনছ? ওহে ও! কথা শুন্‌তে পাচ্ছনা?—কালা নাকি? ওহে! তুমি তো ভারী ইয়ে দেখচি। ওহে ও কারিগর!"

অনতি বিলম্বেই কারিগর তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে উত্তর করিল—"আজ্ঞে, বাবু!"

"কোথায় গেছ্‌লে?—হাঁ দেখ কারিগর, তোমাকে দুটো কথা বলতে আমি এসেছি। তোমরা অবিশ্যি বড় জায়গার বড় কারিগর। কিন্তু শোন। দেখ—এই দুটো পুতুলকে খুলে ফেলে দাও।"

কারিগর বিনীত ভাবে বলিল—

"কেন হুজুর, কোন কিছু খুঁৎ হ'য়েছে নাকি?"

"না, বিশেষ কিছু খুঁৎ নয়। রাজসিক পূজোতে ওসব লাগে কিন্তু আমার এটা সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব কি না? বুঝলে?

"তা'তো বুঝলাম বাবু, কিন্তু এ রকমটা আর কখনো তৈরী করিনি।"

"করনি শিখ। আর দেখ—এই পাখীটাকেও খুলে ফেল। ফেলে, আমি যা, যা, বলি, —কর।"

"আজ্ঞা করুন।"

নিখিল বাবু প্রতিমার সম্মুখস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া কারিগরকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, দুখানা বাকারী নাও। নিয়ে এক একখানা বাকারীর দুই মুখ জুড়ে বেশ গোল গোল চাকার মত কর। তারপর একটা বাঁশের ডগার খানিকটা কেটে ঐ দুটোর সঙ্গে যোগ করে দাও। আর, বুঝলে—এই—

"আজ্ঞে হুজুর, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া নিখিল বাবু পকেট হইতে পেন্সিল ও কাগজ বাহির করিয়া জিনিষটা কি এবং কিরূপ হইবে, তাহার একটি নক্সা আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন—

এটা বেশ রং করে' ঐ পাখীটার যায়গায় বসিয়ে দিও।"

"যে এজ্ঞে।"

"আর দেখ কারিগর, তোমাদের একটা বড় ভুল হ'য়ে যায়, ঐ গণেশটা তৈরী করতে। গণেশটা বড়ই unnatural—বুঝলে?—বড়ই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তা'তে না হয় পশু, না হয় মানুষ, না হয় দেবতা। ওটাকে একটু স্বাভাবিক কোরো। আর দেখ, আমি ওবেলা আবার এসে যা যা করতে হয়, সব বুঝিয়ে দিব! তুমি এখন এবেলা এইগুলো সেরে ফেল।"

কারিগর নম্রভাবে বলিল—

"আজ্ঞে ওবেলা আমাকে বারোয়ারীর প্রতিমা খানা 'দোমেটে' করতে হবে।"

"বারোয়ারী!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোথায়?"

"আজ্ঞে, গ্রামেই।"

[৪]

অপরাহ্ন। নিখিল বাবুর বৈঠকখানায় তাঁহার পার্ষদগণ এক একটি চায়ের পেয়ালায় "সুবোধ বালকের" মত "মনোনিবেশ" করিয়াছেন এবং "যাহা পাইতেছেন, তাহাই খাইতেছেন।" আর, গ্রামের বারো জন ইয়ার মিলিয়া যে বারো-ইয়ারীর ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নানা ভঙ্গীতে তাল ফেরতা গানের মত তাহারই আলোচনা হইতেছে। নিখিলেশ্বর বাবু জনৈক পার্ষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই বারো জন ইয়ার কে কে বলতে পার, মনোরঞ্জন বাবু?"

কেহই ইহার যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। দেখা গেল—পার্ষদেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটু আড়নয়নে চাহিলেন মাত্র। অবশ্য এই নয়ন ভঙ্গিমা নিখিল বাবুর অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মনোরঞ্জনবাবু একটু তাল সামলাইয়া বলিলেন—

"ঐ সব ওপাড়ার চাষাদের ছেলেরা হবে বোধ হয়।"

"চাষাদের ছেলে বলছেন কেন, মনোরঞ্জন বাবু।" বলিতে বলিতে শচীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল। মনোরঞ্জনবাবু শচীন্দ্রকে দেখিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। শচীন্দ্র বলিতে লাগিল—

"হাঁ মনোরঞ্জন বাবু, অবিনাশ আপনার ছেলে না? নিজেকে চাষা বলে বেমালুম পরিচয় দিয়ে দিলেন?"

অবিনাশ শচীন্দ্রের বাল্যবন্ধু। সে বারোয়ারীর প্রতিমার কাছে সকল সময়েই উপস্থিত থাকিত।

বারোয়ারী পূজার প্রতি পুত্র শচীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নিখিল বাবু অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে শচীন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ শচীন, তুমি বুদ্ধিমান। কলেজে পড়ছ। ভেবে দেখ—বারো জন লোক একত্র হওয়াটা ভয়ঙ্কর বেআইনী! unlawful assemblyর সেই ধারাটা দেখাব কি?—যাক্‌, তুমি যেন ও সব বারোয়ারী টারোয়ারীর মধ্যে যেও না। বারো জন লোক এক মত হ'লে, তাদের উপর Conspiracyর Charge আনা যেতে পারে, তা জান?"

শচীন্দ্র বিনীতভাবে বলিল—

"অত আইন-কানুন জানিনে বাবা! তবে যারা বারোয়ারী পূজো করে, তাদের তো কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য—মায়ের পূজো আর তার সঙ্গে একটু আনন্দ করা।"

নিখিল বাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—

শোন, তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দুটো উদ্দেশ্যই যে খারাপ, তা' আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমতঃ, দেখ, দুর্গাপূজোটাই মারামারি কাটাকাটির পূজো; শান্তিভঙ্গ ও রক্তপাত কথায় কথায়। আর আনন্দ করা?—শুনছি নাকি কার যাত্রা আসছে। তা'তে 'পালা' হবে—রাবণ বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, আর দধিচীর অস্থিদান। যাত্রা হ'লে হাজার হাজার লোক এক জায়গায় জড় হবে। আর ঐ 'পালা'গুলো কি শান্তিপূর্ণ? যাত্রার দলের সৈন্যেরা তো যুদ্ধ করেই, অধিকন্তু বক্তৃতায় এতই উত্তেজনা এনে দেয় যে, জুড়িরা পর্য্যন্ত আপনা-আপনির ভিতর যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। যদি জীবনে উন্নতি কর্‌তে চাও—ও সবের মধ্যে যেয়ো না। এবার বি, এ পাস কর্‌তে পারলেই তোমাকে আমি ডেপুটী করে দিব। যাও, আমাদের প্রতিমাখানা একবার দেখগে। সাত্ত্বিক ভাবে দুর্গোৎসব করা যায় কি না, একবার দেখে এস। এতে শক্তিপূজোও হবে, অথচ কোন রকম উত্তেজনা আসবে না।"

শচীন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

[৫]

ষষ্ঠ্যাদিকল্প। নিখিল বাবুর অন্তঃপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্রের মাতা নিখিল বাবুকে বলিতেছেন—

"তোমার এ রকম মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল, বল দেখি? বাড়ীতে দুর্গোৎসব। মা আমাদের দুর্গতি দেখে বছর বছর দয়া করে' এসে থাকেন। তাঁকে অপমান করে' বসলে।"

নিখিল বাবু সসঙ্কোচে বলিলেন—

অপমানটা আবার কোথায় হ'ল?"

কুপিতা ফণিনীর মত শচীন্দ্রের মাতা শির উত্তোলন করিয়া উত্তর দিলেন—

"হ'ল না? দুর্গোৎসব করতে বসেছ। অথচ, প্রতিমা দেখে সকলের উত্তেজনা আসবে বলে' সিংহ-অসুরকে তুলে ফেলে দিয়েছ। আবার শুনলুম—ময়ূরটিকে তুলে দিয়ে কার্ত্তিককে বাইসাইকেলের উপরে বসিয়েছ, কার্ত্তিকের হাতের ধনু-শর ফেলে দিয়েছ।

"বুঝলে,—ও সব অস্ত্র শস্ত্র না থাকাই ভাল।"

"তবে তার ডান হাতে একটা চুরুট দিয়ে দাওগে না কেন? বাঁ হাতখানা তো সাইকেল ধরেই আছে। ছিঃ!"

নিখিল বাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন। শচীন্দ্রের মাতা বলিতে লাগিলেন—

"মায়ের দশ হাতের অস্ত্রগুলোও ফেলে দিয়েছ,—তাও শুনেছি, একটা কাজ করলে না কেন? তাঁর এক এক হাতে এক এক রঙের উল, কুর্শী, কাঁটা, কার্পেট দিলে না কেন? কেমন?"

এইবারে নিখিল বাবু ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

"দেখ, আমি সাত্ত্বিক ভাবে পুজোটা করতে গিয়েছিলাম কি না, তাইতে—

"ও সব ভিরকুটী আমি শুন্‌তে চাই না। পুজোর যাতে কোন রকম অঙ্গহানি না হয়, তাই কর। তুমি যেমন কতকগুলো কুকুর আর বাঁদর নিয়ে দিনরাত কাটাও; আর তাদের পরামর্শ মত চল, আমি তো আর তা পারিনে। আমার ঘর সংসার ছেলে মেয়ে আছে। মায়ের ইচ্ছার উপরে তাদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। দেখো, পূজোর যেন কোন রকমে ত্রুটি ক'রে আমার শচীনের অমঙ্গল ডেকে এনো না।"

বলিতে বলিতে শচীন্দ্রের মাতার নয়ন-কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু উভয় গণ্ড দিয়া বহিয়া গেল। মাত্র দুই বিন্দু অশ্রু, প্রবল বন্যার শক্তিতে নিখিল বাবুর আইন-কানুন সমুদায়ই ভাসাইয়া দিল। নিখিল বাবু সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন—

"কিন্তু আজ ষষ্ঠী। হঠাৎ প্রতিমা পাই কোথায়?"

শচীন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে নীরবে বসিয়াছিল। সে তাড়াতড়ি বলিয়া উঠিল—

"বারোয়ারীর সেই প্রতিমাখানা?"

নিখিল বাবু বলিলেন—

"তারা দেবে কেন?"

শচীন্দ্রের মাতা হাসিয়া শান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"বারোয়ারী নয় গো। তোমাদের পরামর্শ শুনে, আর তোমার প্রতিমা তৈরীর রকম বুঝে আমিই সেই প্রতিমাখানি তৈরী করিয়েছি। অনেকেই জানে বারোয়ারী। কিন্তু তা নয়।"

আশ্বিন, ১৩২৭

কেরাণীবাবু

হেমন্তকুমার সরকার

শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে আসিয়া অতুলচন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে বুড়ির জন্য বেদানা লওয়া হয় নাই তো। তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার বাজারে বেদানা কিনিতে ছুটিলেন। যা' দর বলিল সঙ্গে যে পয়সা আছে—তাতে একটার দামও হয়না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কন্যার শেষ ইচ্ছা বুঝি পিতা আর পূর্ণ করিতে পারিলেন না! তাড়াতাড়ি অফিস ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঔষধপত্র সবই লইয়াছিলেন—কেবল আসল কথাটাই ভুল হইয়া গেল! এ দিকে ৫.৩৮ এর গাড়ী তো চলিয়া গেল! ভাবিলেন—"একবার বড় বাজারের দিকে যাই যদি একটু সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু অতটা দেরী করিয়া বাড়ী পৌঁছিলে মায়ের আমার খাওয়ার অবস্থা থাকিবে কি?" সাত পাঁচ ভাবিয়া অতুলচন্দ্র এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতেই—বড়বাজারের দিকে চলিলেন—অল্প দামে বেদানা পাওয়া গেল—পকেটে লইয়া আবার ছুটিতে ছুটিতে শিয়ালদহ আসিয়া গাড়ী ধরিলেন।

[২]

"বুড়ী, কেমন আছিস্ মা, এই আমি তোর জন্যে বেদানা এনেছি, রস ক'রে দিই একটুখানি মুখে দে মা।" বুড়ীর তখন শেষ অবস্থা, কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। রস মুখে দেওয়া হইল; পিতার দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া, নিজের দশম বর্ষীয়া কন্যা উমাকে পিতার হাতে সমর্পণ করিয়া বুড়ী চিরদিনের মত অতুলের সংসার ছাড়িয়া চলিল। অতুলের গৃহলক্ষ্মী ইহ সংসার ত্যাগ করিবার পর হইতে তাঁহার এই বিধবা কন্যাটিই সংসার বজায় রাখিয়াছিল। যক্ষ্মা রোগে সেও আজ যমের সদনে চলিয়া গেল!

[৩]

বুড়ী তো গেল! বিজয়ের বিবাহ দিয়া একটি বৌ আনিতে পারিলে সংসারটা চলিতে পারে। তাহার বিবাহে কিছু টাকা পাইলে সেই টাকায় উমার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামনেই বিজয়ের পরীক্ষা, প্রত্যেক পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে বলিয়া অতুলচন্দ্রকে তাহার পড়ার খরচের জন্য ভাবিতে হয় নাই—উপরন্তু ছেলে পড়াইয়া টাকা আনিয়া সে সংসারে সাহায্য করিয়াছে। বি, এ, টা ভাল করিয়া পাশ করিতে হইবে—তাই পিতা তাহাকে ছেলে পড়াইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। কাল ফিএর টাকা চাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাওয়া যায়! পিতা পুত্রে এই ভাবনাতেই বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

[৪]

বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে—টাকা কোথাও যোগাড় হইল না। অতুল আসিয়া বিজয়কে বলিলেন "বাবা, টাকা তো পাওয়া গেল না, ভগবান্ আমাকে সব দিক দিয়েই মেরেছেন। তোমার মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছেন। ঘরে চাল কম পড়িলে তার মাথা ধরত, না হয় তো

পেটের অসুখ হত এই ক'রে সে নিজের গ্রাস তোদের দিয়ে তোদের মানুষ করে গিয়েছে; অসুখের উপর হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সে তোদের সেবা ক'রে গিয়েছে; সেই সতীলক্ষ্মী অনাহারে অনিদ্রায় অত্যাচারে তিলে তিলে মারা গিয়েছে। তার দেওয়া শেষ স্মৃতি একটা আঙ্‌টি আছে, সেইটা বেঁচে যদি টাকা আনতে পারি, দেখি।"

[৫]

বিজয় বলিল—"বাবা তা কিছুতেই হবে না, আমার পরীক্ষা দেওয়া না হোক সেও ভাল, কিন্তু মায়ের সেই স্মৃতিটা গেলে বড় কষ্ট হবে, ঘটি বাটি বাড়ী ঘর সবই তো গিয়েছে—এখন ভালবাসার স্মৃতিটুকু বিক্রী ক'রে সব ঘুচাতে চাই না। আমি ঠিক করেছি—বিলাসপুরের মঠে গিয়ে মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হব—বাবা, আপনি অনুমতি দিন্।"

[৬]

অতুলচন্দ্র ছেলের কথায় সুখও পাইলেন, দুঃখিতও হইলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন—"তাই যা বাবা, গৃহী হয়ে যে সুখ তোদের দিতে পেরেছি, তাতে আর কাকেও গৃহী হতে বলিনে। যা সেখানে গেলে, দুবেলা দুটো ভাল করেই খেতে পাবি, ভাতকাপড়ের অভাব কোনোদিনই হবে না। লোকে "মহারাজ" বলে সম্মান করবে, পায়ের ধুলো রাজাতেও মাথায় নেবে, তবে বাবা বি, এ, টা পাশ ক'রে সেখানে গেলে বোধহয় তারাও তোকে বেশী খাতির করতো, লোকেও বেশী মানতো। চাই কি পরে তোর আমেরিকা বা বিলাত যাওয়াও ঘটতে পারতো। নাঃ—ঐ আংটিটাই বেচে তোর টাকা আমি এনে দিচ্ছি।"

[৭]

স্যাকরার দোকানে গিয়ে সেই আঙটিটা দর করিতে করিতে অতুলের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। নীলু স্বর্ণকার অতুলের বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশী। সে এই আঙটির কথা জানিত। অতুলের চোখের জল তাহার চোখ এড়াইল না। সে বলিল—আমি তোমায় পঞ্চাশ টাকা ধার দিচ্ছি,—তুমি ভাই আংটি ফেরৎ নিয়ে যাও, ছেলে পাশ ক'রে রোজগার করলে শোধ দিও।" অতুলের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল—সে বলিল, ভাই নীলু, তুমিই আমার বন্ধুর কাজ করলে, আংটিটা তোমার কাছেই থাক, যখন টাকা দেবো ফেরৎ দিও—জান তো আমাদের অভাবের সংসার। যাই ভাই, বেলা হ'য়ে গিয়েছে, আপিস যেতে দেরী হ'য়ে যাবে, সাহেব না মেরে বসে। বুড়ীর শেষ দিনে এক ঘণ্টা আগে ছুটি চেয়েছিলাম, তাই মিথ্যাবাদী বলে গাল দিয়ে বেটা মারতে এসেছিল।"

[৮]

বিজয় বি, এ, পাশ করিয়াছে। গেরুয়া-রঙের সোণার চশমা, গিরিমাটিতে ছোপানো সোয়েটার, মশারি, পাঞ্জাবী ও মোজা, দু'বেলা রাজভোগ সদৃশ খাবার ও চা-বিস্কুট,—মোটর চড়া, তাকিয়া এবং গড়গড়ার স্বপ্নের মধ্যে সে অণুবীক্ষণের দ্বারাও ত্যাগ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া হতাশ মনে সন্ন্যাসী-ঘৃণিত সংসারীর জীবনই শ্রেয় মনে করিল। তিলে তিলে মরিয়া সারাজীবন ধরিয়া যাহারা তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে—সেই মাতা, পিতা ও ভগিনীর হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত গেরুয়ায় আজ তাহার সন্ন্যাসের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

কার্ত্তিক, ১৩২৭

অনন্তানন্দের পত্র

'অনন্তানন্দ'

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলাই চায়ের পেয়ালা কোলে করে পণ্ডিত হৃষীকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে রকম বেরকমের খোসগল্প করা যাচ্ছে, এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে গোপাল দা' এসে উপস্থিত।

গোপাল দা'কে তোমার মনে আছে তো? দাদার যা' বয়স তা'কে ঠিক যৌবন বলা চলে না, কিন্তু এখনও তেমনি নধর গোলগাল চুকচুকে চেহারা; আর দুপয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মেও মতিগতি হয়েছে। বার, ব্রত, উপবাস, হাঁচি টিকটিকি প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক লক্ষণের অনেকগুলিই দেখা দিয়াছে, টাকের পিছনে একটি ছোটখাট টিকিও গজিয়েছে। দাদা ফিরছেন এই পূজোর পর সস্ত্রীক গয়া দর্শন করে।

ঘরে ঢুকেই একখানা ঠ্যাং-ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বস্‌তে গিয়ে দাদা প্রায় ডিগবাজী খাব খাব হয়েছেন এমন সময় পণ্ডিত হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালায় গোঁফজোড়া জুবড়ে চোখদুটি উঁচু করে খুব সহানুভূতিসূচক স্বরে বল্‌লেন—"দেখো, দাদা, ভাঙ্গা চেয়ারখানায় যেন বসো না"। দাদার চোখের কোনে সাত্ত্বিক প্রকৃতির ঈষৎ বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল; কিন্তু দাদা সেটুকু সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—

"এবার গয়ায় গিয়ে দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত। সহজে কি মোহান্ত দেখাতে চায়; অনেক কাকুতি মিনতি করে তবে দর্শন পেয়েছি। অবতার পুরুষের অঙ্গ কি না—এই এত বড়! আর কি মহিমা, ভায়া! অমন হাজার হাজার লোক সেখানে পূজো মানস করে আঁধিব্যাধি থেকে মুক্ত হচ্ছে।"

পণ্ডিত হৃষীকেশ ততক্ষণ নিজের পেয়ালাটী নিঃশেষ করে দাদার জন্য এক পেয়ালা ঢেলে ভুল করে নিজের মুখের দিকে তুলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুদ্ধদেবের দাঁতের মহিমা শুনে সেটি আবার নামিয়ে রেখে বল্‌লেন—"তা, আর হবে না! আমাদের বিটলেরাম বাবাজী তো ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকায় লিখেই গেছেন—"হরির চেয়ে হরি নামের বেশী মাহাত্ম্য, তা' বুদ্ধদেবের চেয়ে তাঁর দাঁতের মহিমা যে বেশী হবে, এতো জানা কথা।"

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এ রকম বক্রোক্তি শুনে গোপাল দা' একটু ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মায় যে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল তা তাঁর অস্থি মজ্জা, মেদ, বসা, চর্ম্ম ফুঁড়ে বহিরঙ্গে প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী ফের বক্তৃতা সুরু করে দিলেন—

"শাস্ত্রে যে বলে অবতার পুরুষেরা আত্মভোলা, গোপালদা'র কথা শুনে সে সম্বন্ধে আজ আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আহা! দেখ একবার তামাসা! বুদ্ধদেব নিজেই সংসারের আঁধিব্যাধির দাওয়াই খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দাঁতের যে এত গুণ তা' যদি জানতেন, তো একটা কেন, বত্রিশটাই উপড়ে ফেলে গোপালদাকে বখসিস দিয়ে যেতেন। বৌদিদিকে আর তা' হলে ঢোলকের মত এতগুলো মাদুলি বয়ে বেড়াতে হতো না।"

বক্তৃতায় ঝাপ্‌টা লেগে চা'টা মাঝ থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে আমিই সেটার সদ্ব্যবহার করে নিজেকে একটু গরম করে নিলুম। কেন না দেখলুম যে, এই শনিবারের বারবেলায়

পণ্ডিতজীর জিহ্বাখানি বেশ একটু বিষিয়েছে। কাউকে না কাউকে না ছুবলে তিনি ছাড়বেন না।

রাগে গোপালদা'র শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে অন্ধকার বর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তক্তাপোষে একটা বিরাট চাপড় মেরে তিনি বল্লেন—

"কি সর্ব্বনেশে কথা! আমি দেখে এলাম বুদ্ধদেবের দাঁত, আর তুমি না বল্লেই হবে! অবতার পুরুষদের তুমি ঠাওরেছ কি? তাঁদের মহিমা যুগ-যুগান্তর ধরে থাকে!"

পণ্ডিত হৃষীকেশ বক্তৃতার পর গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্য এতক্ষণ আর এক পেয়ালা চা ঢালছিলেন। এক চুমুক খেয়ে জিহ্বাটা বেশ একটু শানিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—

"সে কথা আর বল্‌তে! মহিমার জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছে। এলেন ত্রেতাযুগে অবতার রামচন্দ্র, আর ছেড়ে দিয়ে গেলেন দেশের মধ্যে এক পাল হনুমান! গেরস্তর বাগানে কলাটা, মুলোটা, বার্ত্তাকুঁটা কিছুই আর থাকবার জো নেই! তারপর দ্বাপরে এলেন শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র, ঢলাঢলি রক্তারক্তি যা করে গেলেন, তার ছাপ এখনও দেশ থেকে মোছেনি। কলিতে নাকি এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—আর ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে নেড়ানেড়ী। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বাড়ীর ভিতর এসে—'জয় রাধে কৃষ্ট, দাও মা দুটি ভিক্ষে।" দিতেই হবে;—আর এদিকে চালের দর ১২ টাকা। আজকাল আবার গাঁয়ে গাঁয়ে অবতার গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে দেশময় ত্যাগধর্মের মহিমা ঘোষণা করতে লেগে গেছেন। পুরাণো অবতারদের তবু দুটো ফুল বিল্বপত্র দিয়েই তুষ্ট করা যায় ; কিন্তু এই হালফ্যাসানের অবতারদের বচনের ঠেলা সামলাতে পোড়া দেশের যে কত দিন লাগবে তা' ভগবানই জানেন।'

পণ্ডিত হৃষীকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি চা টুকু শেষ করে নিলেন। গোপাল দা' কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁর ভাবটা স্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হবার পূর্বেই মা সরস্বতী আবার পণ্ডিতজীর জিহ্বায় ভর করে বোসলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হয়ে শূন্যে একটা টুস্‌কি মেরে বল্লেন,—

"চুলোয় যাক্ ত্যাগের কথা। ঘরে সম্পত্তির মধ্যে তো একটা বুড়ী ব্রাহ্মণী আর একটা সিংভাঙ্গা গোরু; তাও আবার দু' বছর থেকে দুধ দেয় না। সেগুলো না হয় কামিনী কাঞ্চনের দোহাই দিয়ে ত্যাগই কল্লুম। আর এই দুর্ভিক্ষের দিনে অবতার পুরুষদের হুকুম মত কোন দিন বা উপবাস, কোনদিন বা পান্তাভাত ভক্ষণ, তাও না হয় চলতে পারে। কিন্তু অবতারেরা যদি পাঁজি পুঁথি দেখে একটা ভাল দিন স্থির করে হুকুম করেন যে আজ পাঁচটা দশ মিনিট থেকে সাতটা বাইশ মিনিট পর্য্যন্ত সবাই মিলে কাঁদ; কাল ন'টা সতের মিনিট থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সবাই মিলে গড়ের মাঠে গিয়ে ডিগবাজী খাও, তা' হলে যে পৈতৃক প্রাণটা নিতান্তই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এ সব যে দাঁত পূজো, খড়ম পূজো, কাঁথা পূজোরই উল্টা পিঠ।"

কথাগুলোর মধ্যে রাজনীতির একটু বোটকা গন্ধের আভাষ পেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য আমি বল্‌লাম—

"ও সব সে কালে চল্‌তো, পণ্ডিতজী; আজকালকার ছেলেরা অত সহজে ঘাড় নোয়ায় না।"

পণ্ডিতজী একটু হেসে বল্লেন—"ঐ তো তোমাদের রোগ, ভায়া; পুরাণো বন্ধু একটু বেশ বদ্‌লে এলে আর তোমরা চিনতে পার না। মানুষের ধাত কি আর অত সহজে বদলায়? ছাপান্ন পুরুষ ধরে যারা খড়ম পূজো কোরে এসেছে, তা'দের ঘাড়গুলি কা'রো না কা'রো পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। যেমন তেমন একটা হলেই হলো—হয়

গুরুঠাকুর, নয় প্রভুপাদ, নয় মহাত্মা, নয় লিডার। ওসব এক জিনিসেরই কালভেদে ভিন্নরূপ। এঁরাই প্রোমোশন পেয়ে ক্রমশঃ অবতার হয়ে দাঁড়ান। তখন তাঁদের হাড়ে ভেল্কি হয়, দাঁতে রোগ সারে, চটি জুতার শুকতলা ভিজিয়ে খেলে একবারে পরমপদ প্রাপ্তি হয়।"

চটিজুতার কথা শুনে গোপাল দাও হেসে ফেল্লেন, কিন্তু পণ্ডিতজীর তখন বক্তৃতাটা মাথায় চড়ে গেছে, তিনি বল্লেনঃ—

"না, না, দাদা এটা হেঁসে উড়াবার কথা নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এমন কি গার্হস্থ্যনীতিতে পর্য্যন্ত আমরা ঐ খড়মপুজোকেই সার সত্য বলে স্থির করে ফেলেছি। আমরা ফুল বিল্বপত্র হাতে করে বসে আছি, যেই একটি ছোট খাট মহাপুরুষের আবির্ভাব, অমনি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে, ঢাক ঢোল কাঁশি বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে, হেঁসে কেঁদে, নেচে গেয়ে এমনি একটা বীভৎস ব্যাপার করে তুলি যে মহাপুরুষটি যদি সাক্ষাৎ ভগবানও হন, তো তাঁর ভূত হয়ে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর দাঁত, নখ, চুল নিয়ে দলাদলি আর মারামারি। তিনি ফুস্ করলেন কি ফাস্ করলেন, টুক্ করলেন কি টাক্ করলেন—এই নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা। এ সব কি ধর্ম্ম রে বাপ!— এ শুধু জড়ভরতদের জটলা; বক-ধার্ম্মিক শেয়াল-কোম্পানীর আধ্যাত্মিক হক্কা-হুয়া।"

গোপাল দা এতক্ষণ চুপ করে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত বসে ছিলেন। এইবার পণ্ডিতজীকে থামতে দেখে একটু সাহস পেয়ে বল্লেন—"তা' বলে তো আর বাপ পিতাম'র ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়তে পারি নে।"

পণ্ডিতজী লাফিয়ে উঠে বল্লেন—"সে দোষত তোমার নয় দাদা, দোষ তোমার ভগবানের। মনটা যার এখনও চার পায়ে হাঁটে, তাকে মানুষের আকার দিয়ে তার শরীরটাকে দু'পায়ে হাঁটান—একটা অত্যাচার বৈ তো নয়। মনটা আমাদের ক্রমাগত খুঁজছে কোথায় কার পায়ের তলায় পড়ে নাক রগড়াবে; তাই আমরা সব কাজেই একজন না একজন মুরব্বীর দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। পরকালের ব্যবস্থা করতে হবে—তো টেনে আন দু'চারটা মহাত্মাকে না হয় অবতারকে ; দেশের স্বাধীনতা চাই তো আওড়াও মিল, বেনথামের বুলি ; সমাজ গড়তে হবে তো নিয়ে এস ধার করে বল্‌সেভিজ্‌ম, ঘরকন্না গড়তে হবে, তো ডাকো রাঙ্গা ঠানদিদিকে, না হয় তো পাদী পিসিকে। মোট কথা কারো না কারো আওতায় পড়লে তবে আমরা থাকি ভাল। আমাদের মনগুলি যে এক একটী বোরখাঢাকা পর্দ্দানসিন বিবি। ভগবানের খোলা হাওয়া গায়ে লাগলেই তা'দের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমাদের মনে মনে বেশ একটা ভয় আছে যে পাঁচজন মুরুব্বী মিলে ভগবানের এই সৃষ্টিটাকে ঠেকনা দিয়ে না রাখলে সৃষ্টিটা একদিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। তাই আমাদের কথায় কথায় পরের দোহাই, বাপ পিতাম'র নাম করে নিজেদের পঙ্গুত্ব লুকিয়ে রাখা। নমশূদ্রদের জল চল করতে হবে, তো দেখ পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলে গেছেন। —আর পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য যে এদিকে কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। যাঁরা জাত মানেন, তাঁরা দোহাই দেন পুঁথির, আর যারা মানেন না তাঁরা দোহাই দেন ফ্রেঞ্চ রিভিলিউসনের। দোহাই একটা দেওয়া চাই! নিজের বলতে আমাদের কিছু নেই। সমাজ আর ধর্ম্ম—বাপ ঠাকুরদার; দেশটা বিদেশীয়; আর মনটা—যিনি দয়া করে দুটী পায়ের ধূলা দেন তাঁর। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে খড়ম-পূজা আর কর্ম্মের মধ্যে পাদোদক পান! সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত, আর ইংরাজী-পড়া গ্রাজুয়েট —সবাইকার ঐ এক গতি ; তফাতের মধ্যে এই যে একজন গড়াগড়ি দেন পূর্ব্বমুখ হয়ে আর একজন পশ্চিম মুখ হয়ে ; একজন মন্ত্র আওড়ান সংস্কৃতে, আর একজন আওড়ান ইংরাজীতে। ধর্ম্মের বেলায় সত্যপীর আর রাজনীতির বেলায় মন্টেগু।"

বক্তৃতাটা বেশ জমে আসছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে পোঁ করে শাঁখ বেজে

উঠতেই পণ্ডিতজী থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। ও আজ যে পূর্ণিমা! আমরা বাহিরে বসে বক্তৃতা করছি আর ব্রাহ্মণী যে ঘরের মধ্যে সত্যপীরকে সিন্নি খাওয়াচ্ছেন। তার পরেই দরজায় শিকলি নেড়ে ডাক পড়্‌ল — ঠুন্, ঠুন্ ঠুন্, ঠুন্ ঠুন্ ঠান্। আমি একটু উস্‌খুস করছি দেখে পণ্ডিতজী বল্লেন, "যাও, ভায়া, সত্যপীরের কথা শোন গে। আজ তা' হলে এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।"

পণ্ডিতজী বেরিয়ে পড়লেন; আর আমি গোপাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সত্যপীরের কথা শুনতে চল্‌লুম। পুরুত ঠাকুর তখন গলা ছেড়ে পড়ছেন—

"একথা শ্রবণ কালে যেবা অন্য কথা বলে
আর যেবা করে উপহাস,
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই তাহার নিষ্কৃতি নাই
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ।

পণ্ডিত হৃষীকেশের যে হঠাৎ কি সর্ব্বনাশটাই ঘটবে তাই ভেবে আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

পৌষ, ১৩২৮

চোর

নারায়ণ ভট্টাচার্য

বিষ্ণু হাজরার ছেলে কেষ্ট হাজরাকে লোকে বোকারাম বলিয়া জানিত। বাপ বিষ্ণুচরণ যখন মারা যায়, তখন কেষ্টধনের বয়স আঠার বৎসর। মা যে কবে মারা গিয়াছিল, তাহা সে জানে না, বাপকেই সে মা-বাপ দুই বলিয়া জানিত এবং উভয়ের নিকট প্রাপ্য স্নেহযত্ন একজনের নিকটেই আদায় করিয়া লইত। মা বলিয়া কেহ না থাকিলে যে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এ ধারণাটা তাহার আদৌ ছিল না।

বাপও অনেক কষ্টে মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছিল, পাঠশালায় দিয়া একটু লিখিতে পড়িতেও শিখাইয়াছিল। তারপর একটি লক্ষ্মীমন্ত বৌ ঘরে আনিয়া ভাঙ্গা সংসারে হাট পত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাড়ারই নকুড় পালের মেয়ে সুবাসিনীকে পছন্দ হইল। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে যেমন, তেমনই শান্ত শিষ্ট। নকুড় পাল দুই শত টাকা পণ এবং তিনখান সোণার ও পাঁচখান রূপার গহনা চাহিয়া বসিল। অনেক দর কষাকষির পরে পণের পঁচিশ টাকা কমিল, গহনা আটখানাই বজায় রহিল। বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল।

মাঘ মাসে বিবাহ। পৌষের শেষে বিষ্ণুচরণ গুড় নারিকেল দিয়া পৌষ পার্ব্বণের তত্ত্ব করিল। সেই সঙ্গে রূপার একখানা জিনিষ মল এবং সোণার মুড়কি মাদুলি দিল। কিন্তু রঘুনাথপুরে গুড় কিনতে গিয়া বিষ্ণুচরণ সেই যে জ্বর লইয়া আসিল, সে জ্বর আর ছাড়িল না। সাত দিনের দিন ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিষ্ণুচরণ পরলোক যাত্রা করিল।

কেষ্ট বাপকে হারাইয়া সংসার শূন্য দেখিল। বাপের দাহকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া সেই যে শুইল, তিন দিন তিন রাত্রি আর উঠিল না। শেষে পাঁচ জনের উপদেশে ও সান্ত্বনায় উঠিয়া পিতার পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল।

পুরোহিত আসিয়া উপদেশ দিলেন, "বাপু, বিষ্ণুচরণ একটা লোকের মত লোক, ছেলে রেখে গিয়ে সে পরলোকে হা হা করে বেড়াবে, সেটা কি ভাল দেখায়? আহা, বেচারা তোমার মুখ চেয়েই আর বিয়ে পর্য্যন্ত করলে না।"

বাবা পরলোকে হা হা করিয়া বেড়াইবেন? যিনি বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে আঠার বৎসরের করিয়া গিয়াছেন, ছেলের জন্য সকল কষ্ট, সব দুঃখ মাথা পাড়িয়া লইয়াছেন, সেই স্নেহময় পিতা ইহলোকের পরপারে গিয়াও একটু শান্তি পাইবেন না? কেষ্টধনের বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন, কি করলে পরলোকে বাবা সুখে থাকেন।"

পুরোহিত বৃষোৎসর্গ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পাঁচজন বলিল, "সে অনেক টাকার ফের। তার চেয়ে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ আর একটা ভাল রকম ষোড়শ করুক।"

পাঁচ জনের কথাই স্থির হইল। তখন স্বজাতিরা বলিল, "কেষ্টধন বাপকে তো ফিরে পাবে না। এখন পাঁচ কুটুম্বের পায়ের ধুলো নিয়ে তাকে উদ্ধার করে দাও। কুটুম্ব নারায়ণ।

বিষ্ণুচরণ ছেলের বিবাহের জন্য কতক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, কতক এ হাত ও হাত

করিয়া জমাইয়াছিল। কেষ্টধন বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই শত দশ টাকা মজুত আছে। সুতরাং সে পিতার স্বর্গ কামনায় পাঁচ জনের উপদেশমত কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। সে যথাবিধি পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বগণ পাকা ফলারে পরিতৃপ্ত হইয়া সুদীর্ঘ উদ্গারের সহিত কেষ্টধনের পিতৃভক্তি ও তদীয় পিতার স্বর্গলাভের অবশ্যম্ভাবিতা নির্দ্দেশ করিতে করিতে যখন প্রস্থান করিলেন, তখন কেষ্টধন বাক্স খুলিয়া দেখিল, তাহাতে আর পাঁচ টাকা সাত আনা মাত্র মজুত আছে।

ভাবী শ্বশুর নকুড় পালকেই মাথা হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কার্য্যে শেষে তিনি হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া পথে বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "আমি ব'লেই দু'শো টাকায় কাজ সেরেছি। আর কেউ হ'লে তিনশো টাকার এক পয়সা কমে এ ব্যাপার সম্পন্ন হ'তো না। তার অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা নিজের পকেটে ফেলিত।"

কেষ্টধন ভাবী শ্বশুরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

কিন্তু শ্রাদ্ধান্তে কেষ্টধন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বামুন পিসি আসিয়া বলিলেন, "বাবা কেষ্টধন, তোমার বিয়ের তরে বিষ্টুদাদা আমার কাছ থেকে শুধু হাতে দশগণ্ডা টাকা এনেছিল। বিষ্টুদাদাকে তো অবিশ্বাস ছিল না, এমন কতবার নিয়েছে, দিয়েছে। তা বাবা, এই অনাথা বামুনের মেয়ের টাকাগুলির কি হবে? আমার অনেক কষ্টের টাকা।

কেষ্টধন বলিল, "না বামুন পিসী, আমি যেমন ক'রে পারি, তোমার টাকা ফেলে দেব।"

বামুন পিসী সহর্ষে বলিলেন, "তাই তো বলি, কেষ্টধন কি তেমন ছেলে। বাপের কাজে আঁজলাভরা টাকা খরচ করলে, আর বাপকে কি ঋণপাপে জড়িয়ে রাখবে?"

শুধু বামুন পিসী নয়, ক্রমে ঘোষ গিন্নী, গয়লা-বৌ, রামু সেকরার মা প্রভৃতি একে একে আসিয়া কেহ পাঁচ গণ্ডা, কেহ আট গণ্ডা, কেহ সাড়ে এগার গণ্ডা টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। কেষ্টধন হিসাব করিয়া দেখিল, মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড় শত টাকা। এত টাকা যে কি উপায়ে পরিশোধ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভাবী শ্বশুরকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, শ্বশুর পরামর্শ দিলেন, "যখন লেখাপড়া কিছু নাই, তখন ও সব দেনা দেনাই নয়। এখন ধানগুলো বেচে জমি-জায়গাগুলো বাঁধা ছাঁদা দিয়ে বিয়েটা ক'রে ফেল। আমি তো আর দু'বছর মেয়ে রাখতে পারব না।"

কেষ্টধন ধান বেচিল ; তিন বিঘা জিম ছিল, এক শত টাকায় বাঁধা দিল। কিন্তু সে টাকায় সে বিবাহ করিল না, পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। নকুড় পাল রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি কেষ্টধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় বাপের বাৎসরিক দিয়ে বোশেখ মাসের ভিতর বিয়ে কর, নয় পাঁচ জনের কাছে জবাব দাও, আমি দোসরা চেষ্টা দেখি।"

কেষ্টধন দেখিল, জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। দুই শত টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, বাঁধা রাখিয়া ধার করিবার মত কোন সম্পত্তি নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে পাঁচ জন স্বজাতির সম্মুখে জবাব দিয়া আসিল। পাল মহাশয় পাকা দেখার সময় পণ বাবদ চল্লিশ টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন,; তিনি বলিলেন, "টাকা আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। অন্যত্র পণের টাকা পেলে ফেলে দেব। কেষ্টধন তাহাতেই সম্মত হইল। গহনা দুই খানের কথার উত্থাপনা আর হইল না।

বৈশাখের শেষেই পাল মহাশয় মেয়ের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কেষ্টধন টাকা ফেরত পাইল না। সে কোন উচ্চাবাচ্যও করিল না, শুধু বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল।

কেষ্টধনকে অতঃপর উদরান্নের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে বাজারে বৃন্দাবন লাহার গোলদারি দোকানে আট টাকা মাহিনায় বেচা-কেনার চাকরী পাইল। চাকরী কিন্তু বেশী দিন টিকিল না। লাহা মহাশয় যে দিন খরিদ্দার বিশেষে দুই প্রকার

বাটখারার ব্যবহারের জন্য তাহাকে উপদেশ দিল, তখন সতেরো দিনের মাহিনা চুকাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল। লোকে—বিশেষতঃ পাল মহাশয় তাহার নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এরূপ বোকারামের হস্তে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

অনেকে কেষ্টধনকে পুনরায় চাকরীর চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিল। কেষ্টধনের কিন্তু আর চাকরী করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। ঘরে একটা গাই ছিল। গাইটা বেচিয়া সেই টাকায় মালা, ঘুনসী, চুড়ী, চিরুণী কিনিয়া মণিহারী জিনিসের ফেরী করিতে আরম্ভ করিল।

কেষ্টধন সকালে উঠিয়া ঘরে চাবী দিয়া ফেরী করিতে বাহির হইত। ফিরিতে কোন দিন অপরাহ্ন, কোন দিন বা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। ঘরে ফিরিয়ে রাঁধিয়া খাইয়া শুইয়া পড়িত। পাড়ার বা গ্রামের লোকের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি তাহার নামে পাড়ায় পাড়ায় যথেষ্ট আন্দোলন হইত এবং এইরূপে নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিত।

[২]

হাট হইতে ফিরিয়া কেষ্টধন রান্না চাপাইয়াছিল। শীতের সন্ধ্যাটা যেমন স্তব্ধ তেমনই অবসাদময় হইয়াছিল। আকাশ থমথমে মেঘে ভরা; উত্তরে বাতাস নৈরাশ্যের গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কেষ্টধন ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিল। আর গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"পার কর পার কর ব'লে ডাক্‌ছি বারে বারে।
মাঝি বেলা গেল সন্ধ্যে হলো যাব দেশান্তরে।
পার কর পার কর ব'লে—"

"কেষ্ট দাদা।"

গান বন্ধ করিয়া কেষ্টধন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কে সুবা?"

সুবা ওরফে সুবাসিনী উত্তর দিল, "হাঁ, তুমি কি রান্না চাপিয়েছ কেষ্টদাদা?"

কেষ্ট বলিল, "হাঁ, কেন রে?"

সুবা ঈষৎ কাতর অথচ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "একবার আমাদের বাড়ী যাবে?"

কেষ্ট। কেন?

সুবা। আমার ভায়ের বড্ড ব্যামো?

কেষ্ট হুঁকাটা ফেলিয়া উঠিয়া আসিল ; ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কার? ফকিরের?"

সুবা। হাঁ।

কেষ্ট। কি হয়েছে?

সুবা। দুপুরের পর হ'তে ভেদবমি হ'চ্ছে। বাবাও আজ বাড়ী নেই।

কেষ্ট ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "বলিস্ কি চল্, চল্।"

সুবা বলিল, "তোমার রান্না?"

ধমক দিয়া কেষ্ট বলিল, "চুলোয় যাক্ রান্না। চল্।"

সুবাকে পেছনে ফেলিয়া কেষ্ট ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সুবার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা রে, আমার ফকির বুঝি ফাঁকি দেয়।"

কেষ্ট তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। গ্রামে ডাক্তার ছিল না; প্রায় এক ক্রোশ দূরে রায়পুরে একজন ভাল ডাক্তার আছে, কেষ্টর গায়ের কাপড়খানা লইবারও অবকাশ হইল না; কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়াই অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। তখন

ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কেষ্ট সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ডাক্তারের বাড়ীতে পৌঁছিল।

ডাক্তার কিন্তু এমন দুর্যোগে বাহির হইতে সম্মত হইলেন না। কেষ্ট অনেক কাঁদাকাটি এবং দশ টাকা ভিজিট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রাজী করাইল। তখন ডাক্তার তাহার মাথায় ঔষধের বাক্স এবং হাতে হ্যারিকেনের আলো দিয়া গায়ে গরম কাপড় চাপাইয়া বাহির হইলেন।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবার জন্য কেষ্টধন আট আনা স্বীকার করিয়া একজন লোক ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম দিবার সময় বড় গোল বাধিল। সুবার মা বলিল, "কি হবে বাবা কেষ্ট, বাক্সের চাবী যে কত্তার কাছে?"

কেষ্টধন বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুবার মা নাকের নথ, কানের পাশা খুলিয়া দিয়া বলিল, "এই দু'টো কোথাও রেখে ডাক্তারের টাকা মিটিয়ে দাও।"

কিন্তু সে রাত্রে কে জিনিষ রাখিয়া টাকা দিবে? কেষ্টধন মাল গস্ত করিতে যাইবার জন্য ষোলটি টাকা রাখিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতেই বারটি টাকা আনিয়া ডাক্তারে ভিজিট ও ঔষধের দাম মিটাইয়া দিল। ডাক্তার চলিয়া গেলেন, কেষ্টধন রোগীর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সুবা একবার বলিল, "তোমার খাওয়া হ'লো না, কেষ্ট দাদা?"

কেষ্ট সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "শীগ্গীর একটু আগুন কর দেখি, সেঁক দিতে হবে।"

কেষ্টধন অনেক চেষ্টা করিল, রোগী কিন্তু বাঁচিল না। ভোরের সময় তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল।

পাল মহাশয় যখন বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন দাহকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে খানিকটা হা-হুতাশ করিলেন এবং জাগতিক যাবতীয় ঘটনাই কর্ম্মফল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। তারপর চিকিৎসাদির কথা শুনিয়া আক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ সব ব্যারামেও কি মানুষ বাঁচে? হতভাগা না-হোক কতকগুলা টাকা বরবাদ ক'রে দিলে। ও হতভাগা ছোঁড়াকে ডাক্‌লে কে?"

"হাঁ কেষ্ট দাদা?"

"কেন সুবা?"

"ক'দিন ঘরে ব'সে আছ যে?"

কেষ্টধন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "ঘরে? হাঁ ঘরে ব'সে আছি। বেরুনো হচ্চে না।"

সুবা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি, কেন, বেরুচ্চ না?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কেষ্ট বলিল, "বেরুচ্চি না, শরীরটাও ভাল নয়, মালপত্রও আনতে হবে।"

সু। আনতে হবে তা আনচো না কেন?

কে। আনবো বই কি, আনতেই হবে, তারই জোগাড়ে আছি।

সু। কিসের জোগাড়? টাকার?

কেষ্ট সে কথার কোন উত্তর দিল না। উনানটা তখন নিবিয়া গিয়াছিল, উপুড় হইয়া উনানে ফুঁ দিতে লাগিল। অনেকগুলা ফুৎকারেও উনান জ্বলিল না, শুধু কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। ধোঁয়ায় কেষ্টর চোখদুটো লাল হইয়া উঠিল, দুই চোখ দিয়া জল

গড়াইতে লাগিল। সুবা অগ্রসর হইয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "চল আমি দেখছি, এ সব কি বেটাছেলের কাজ!"

কেষ্ট সরিয়া আসিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। সুবা উনানের ভিতরকার ঘুঁটেগুলাকে বাহির করিয়া পুনরায় ভাল করিয়া সাজাইয়া দিল। তারপর দুই তিনটা ফুৎকার দিতেই জ্বলিয়া উঠিল। সুবা গর্ব্বপ্রফুল্লদৃষ্টিতে কেষ্টধনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখলে?"

কেষ্ট মৃদু হাসিল। তখনও তাহার চোখের জল শুখায় নাই।

কেষ্ট পুনরায় গিয়া উনানের পাশে বসিল; সুবা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, যে কথা বলছিলাম, ত টাকার জোগাড় হ'য়েছে?"

কেষ্টধন উত্তর করিল, "না।"

সু। কত টাকা জোগাড় করতে হবে?

কে। গোটা পনের ষোল।

সু। তা আমাদের কাছে তো বার টাকা পাবে?

কেষ্ট হাঁড়ীতে তেল ও লঙ্কা দিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সুবা নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে এক ছড়া মুড়কী-মাদুলী বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। কেষ্ট হাতে হাঁড়ীর কাণাটা ধরিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুবা বলিল, "ও কি, হাঁড়ীর তেলটা যে জ্বলে শেষ ওতে কি দেবে দাও না।"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি আলু বেগুনগুলা তাহাতে ফেলিয়া দিল। সুবা বলিল, "ও মা, বেগুনগুলো এখন দিলে কেন? ওগুলো যে সিদ্ধ হবে না।"

কেষ্ট নিরুত্তরে খুন্তি দিয়া সেগুলা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। সুবা বলিল, "তুমি বুঝি এই রকম করে রেঁধে খাও কেষ্ট দাদা? খাও কি ক'রে?"

কেষ্ট একটু ম্লান হাসি হাসিল। সুবা তখন মুড়কী মাদুলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "এইটা বাঁধা দিয়ে বা বেচে টাকার জোগাড় ক'রো।"

কেষ্ট বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "এটা বেচে? কেন সুবা?"

সুবা বলিল, "কেন কি, এটা তো তোমাদেরি, কেন দিয়েছিলে মনে পড়ে না?"

মনে খুবই ছিল। আজ আবার সে কথাটা নূতন করিয়া মনে হওয়ায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল। কেষ্ট সেটাকে বুকে চাপিয়া রাখিয়া হাত ধুইল এবং মাদুলীছড়াটা লইয়া সুবার পায়ের কছে রাখিয়া দিল। সুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কেষ্ট দাদা?"

কেষ্ট মুখ নীচু করিয়া বলিল, "তুই নিয়ে যা সুবা!"

সুবা তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি নেবে না?"

কেষ্ট বলিল, "ও তোকে দেওয়া হয়েছে।"

সুবা বলিল, "বেশ তো এখন আমিই আবার ফিরিয়ে দিচ্চি।"

কেষ্ট বলিল, "ছিঃ!"

কেষ্ট হাঁড়ীতে বাটনা গুলিয়া ঢালিয়া দিল। সুবা কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর গহনাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "নেবে না?"

কেষ্ট বলিল, "তুই নিয়ে যা।"

সুবা উঠানে নামিতে নামিতে ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নেব না তো ফেলে দেব? কিন্তু এই পর্য্যন্ত কেষ্ট দাদা, যে রকমে পারি, তোমার বারোটা টাকা যদি ফেলে না দিই—"

কেষ্ট ডাকিল, "শোন্ সুবা।"

সুবা দাঁড়াইল। কেষ্ট হাত পাতিয়া বলিল, "দে।"

সুবা তাহার হাতে মুড়কী-মাদুলী দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কেষ্ট তাহা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই দিন কেষ্টধন বৃন্দাবন লাহার হাতচিঠায় সহি দিয়া যোল টাকা কর্জ্জ লইয়া এবং পরদিন মাল গস্ত করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিল।

[৪]

বছর দুই হইতে পাল মহাশয় জগন্নাথ গাঙ্গুলীর গাঁজা ও আফিমের দোকানটা উচ্চ ডাকে ডাকিয়া লইয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন। হিসাব নিকাশে পাল মহাশয়ের তেমন দক্ষতা ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর তদারকে আসিয়া কয়েকবার খাতার ভুল শুধরাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু সেবারে ভুল শোধরান লইয়া ইনস্পেক্টরের সহিত পাল মহাশয়ের একটু বচসা হইল। ইহার ফলে শীঘ্রই কলেক্টরী আফিস হইতে খাতা তলব হইল।

পাল মহাশয় খাতাপত্র লইয়া কৃষ্ণনগরে কলেক্টরী কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। কলেক্টর সাহেব খাতায় কাটকূট দেখিয়া তাঁহার ২০ টাকা অর্থদণ্ডের হুকুম দিলেন। টাকাটা সেই দিনই জমা দিতে হইবে, নতুবা হাজতবাস অনিবার্য্য। পাল মহাশয় টাকা সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

পাল মহাশয় টাকার জন্য যখন উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন সহসা একটা দোকান হইতে কেষ্ট তাঁহাকে ডাকিল। কেষ্টকে দেখিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "কে, কেষ্টধন? এখানে কেন বাবা?"

কেষ্ট বলিল, "মাল কিনতে এসেছি।"

পাল মহাশয় অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাল কেনা হ'য়েছে কি?"

কেষ্ট বলিল, "না, এই দেখা শোনা হচ্চে।"

পাল মহাশয় সহর্ষে বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, আজ আর মাল কিনে কাজ নেই বাবা, টাকা ক'টা আমায় দাও। আমি বাড়ী পৌঁছেই টাকা দেব, কাল তখন মাল নিয়ে যাবে।"

কেষ্ট একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাল মহাশয় তখন তাহাকে আপনার বিপদের কথা জানাইলেন এবং অকূলের কাণ্ডারী ভগবানই এ সময়ে তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, ইহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। কেষ্ট কিন্তু পাল মহাশয়কে কতকটা চিনিয়াছিল, সুতরাং সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন পাল মহাশয় তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদতে বলিলেন, "বাবা কেষ্টধন, আমাকে রক্ষা কর বাবা, আমার মান ইজ্জত সব যায়। আমি বাড়ী পৌঁছে ঘরের ঘটী-বাটী বেচেও যদি তোর টাকা ফেলে না দিই, তবে আমি মুচির সন্তান!"

কেষ্ট পেটের কাপড় হইতে একখানা দশটাকার নোট এবং আটটি টাকা খুলিয়া পাল মহাশয়ের হাতে দিল। পাল মহাশয় তাহাকে ধন্যবাদ দিবার অবসর পাইলেন না, টাকা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাছারীর দিকে ছুটিলেন। কেষ্ট এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জল খাইয়া ঘরে ফিরিল।

পরদিন কেষ্ট টাকাটা চাহিতে গেলে পাল মহাশয় বলিলেন, "এই সারাটা দিন তোমার টাকার চেষ্টাতেই ঘুরে বেড়াচ্চি বাবা, তা কোথাও কিছু হ'লো না। লোকে চিৎহস্ত করলে সহজে কি উপুড় হাত করতে চায়? কালের দোষ! গণশা মাঝি সোমবার দেবে বলেছে, পাওয়া গেলেই তোমাকে দিয়ে আসব. তাগাদা করতে হবে না।

তারপর তিনি গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা বড় ভাল ছেলে, সে দিন আমার

বিপদের কথা শুনে তাড়াতাড়ি টাকা বার করে দিলে। বল্‌লে, তা পাল মশায়, আপনার বিপদ যা, আমার বিপদও তা। তাহা বড় ভাল ছেলে, বেঁচে থাক্, তবু বিষ্টুচরণের নামটা থাকবে।”

পাল মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কপাল! তা নৈলে আজ কি কেষ্ট আমাদের অপর পর হ'য়ে থাকতো! মেয়েটারও বরাত। কোথায় আজ সুখে ঘর-ঘরকন্না করবে, তা নয় বিধবা হ'য়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়লো।

সশব্দে আর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাল মহাশয় গামছার খুঁটে শুষ্ক চক্ষুটা একবার মুছিলেন। কেষ্ট আপ্যায়িত ও হতভম্ব হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেও কেষ্ট বুঝিল, পাল মহাশয়ের নির্দিষ্ট সোমবার দুই চারি মাসেও আসিবে কি না সন্দেহ। এ দিকে ঘরে মাল নাই, ব্যবসা বন্ধ। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কেষ্ট শেষে বাক্স হইতে মুড়কি-মাদুলী ছড়াটি বাহির করিল, এবং তাহা চৈতন্য পোদ্দারের দোকানে পনরো টাকায় বাঁধা দিয়া মাল গস্ত করিতে গেল।

[৫]

মাল গস্ত করিয়া কেষ্ট যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার দাবার উপর মোটটা নামাইয়া কেষ্ট সবেমাত্র ঘরের চাবী খুলিতেছে, এমন সময় চৈতন্য পোদ্দার লাঠি ধরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “কেষ্ট, কেষ্ট বাড়ীতে?”

কেষ্ট চাবী ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, “কে, পোদ্দার মশাই?”

পোদ্দার রুক্ষস্বরে বলিল, “হাঁ; আজ সমস্ত দিনে তোমার বাড়ী তিনবার এসেছি। বাপু, আমাদের বিশ্বাস নিয়ে কাজ কারবার। তুমি বিষ্ণুচরণের ছেলে, কিন্তু তোমার এই কাজ?”

কেষ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, “কেন পোদ্দার মশাই, আমি কি করেছি?”

পোদ্দার চড়া-গলায় বলিল, “কি করেছ? চুরী, জুচ্চুরী, দমবাজী, যা কিছু সবই করেছ। বাপু, দমবাজীর কি আর জায়গা পেলে না? আমার কাছে চোরাই মাল বাঁধা রাখতে গিয়েছ?”

কেষ্ট সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “চোরাই মাল!”

পোদ্দার বলিল, “আস্ত চোরাই মাল। বলি, মুড়কি-মাদুলীটা কার? এতক্ষণ যে আমার হাতে দড়ি পড়তো। শুধু পাল মহাশয় ভাল লোক বলেই আমাকে রেয়াৎ করেছেন। এখন পুলিশ ডেকে যদি তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হইলে কি হয় বল দেখি?”

কেষ্ট ভীত-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় পাল মহাশয় এবং গ্রামের পঞ্চায়েৎ তমিজউদ্দীন মুন্সী বাড়ীতে ঢুকিলেন। পোদ্দার বলিল, “এই যে পাল মশায়, এই নিন আপনার আসামী, এখন আমাকে রেহাই দেন।”

মুন্সীসাহেব কেষ্টর দিকে চাহিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “হাঁ হে কেষ্ট, ভদ্দরলোকের ছেলে তুমি, তোমার এই কাজ?”

কেষ্ট নীরব, নিস্পন্দ। মুন্সী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই গয়না তুমি পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়েছ?”

কেষ্ট উত্তর দিল, “হাঁ।”

মু। এ কার গয়না? তোমার?

কে। না।

মু। তুমি পেলে কোথায়?

কেষ্ট নিরুত্তর। মুন্সী সাহেব আরও দুই তিনবার প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি তাহাকে পুলিশে দিবার ভয় দেখাইলেন। পাল মহাশয় মাঝ হইতে বলিলেন,

"যেতে দিন মুন্সী সাহেব, পাবে আর কোথায়, চুরি করেছে, সেটা কি আর নিজের মুখে বলতে পারে। যাক, এবারকার মত ছেড়ে দিন, ছোঁড়াটা জন্মের মত দাগী হ'য়ে যাবে।"

মুন্সী সাহেব তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তখন পাল মহাশয় কেষ্টকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "হাঁ হে কেষ্ট, তোমার এমন স্বভাব হ'লো কেন? ভাল ছেলে বলে ঘরে দোরে যেতে দিই; ছি ছি, তোমার এই কাজ।"

কেষ্ট কোন উত্তর দিল না, একটুও নড়িল না, শক্ত কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পোদ্দার বলিল, "আপনার জিনিষ তো আপনি পেলেন, এখন আমার টাকা?"

পাল মহাশয় সদম্ভে বলিলেন, "আপনার টাকা যাবে কোথায়? ওর ঘর ভিটে বেচে আদায় করে দেব। ছোঁড়া দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে ধার ক'রেছে, বুঝলেন মুন্সী সাহেব। লাহাদের দোকানে কত টাকা, আর কার কার আছে—"

মুন্সী সাহেব বলিলেন, "অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু পাল মশায়, বারদিগর এমনতর হলে আমি ছেড়ে দেব না তা ব'লে রাখছি।"

[৬]

খানিক পরে সুবা আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "কেষ্টদাদা!"

কেষ্ট তখন ঘরে আলো জ্বালিয়া তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে। সে চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কে সুবা?"

সুবা বলিল, "হাঁ, আমি। তুমি শেষে চোর হ'লে?"

কেষ্ট সহাস্যে উত্তর দিল, "হ'লাম বা!"

সুবা বলিল, "আমার নাম কল্লে না কেন?"

কেষ্ট বলিল, "মনে ছিল না।"

সু। তোমার তো আচ্ছা মন দেখছি।

কে। আচ্ছা ব'লে আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, এখন তুই ঘরে যা দেখি।

সু। কেন?

কে। একবার তো চুরীর ফ্যাসাদে ফেলেছিলি, আবার কি ডাকাতীর মামলায় পড়বো। রাত হ'য়েছে, ঘরে যা।

সুবা কথাটার মর্ম্ম বুঝিল, বুঝিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল, কেষ্ট আপন মনে গাহিতছে,—

"পার করো পার করো ব'লে ডাক্‌চি বারে বারে।
(মাঝি) বেলা গেলো সন্ধ্যে হ'লো যাবো দেশান্তরে॥"

ফাল্গুন, ১৩৭৪

জেল-ফেরৎ

নারায়ণ ভট্টাচার্য

দুইবারের জেল-ফেরৎ চরণ মালিক লোক-সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন গ্রামের নিত্যানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করিতেছিল, এবং হরিনামের উপর নির্ভর করিয়া কলঙ্কিত জীবনটাকে সফল করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সহসা গরবী আসিয়া গোল বাধাইয়া দিল।

চারি বৎসর আগে এই গরবীর জন্যই চরণ জেলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিন বৎসর অজন্মা, দেশে হাহাকার উঠিয়াছিল। দুই দিন চরণের ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই, স্ত্রী গরবী ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, এক বছরের ছেলে সোনা এক ফোঁটা ফেনের জন্য কাঁদিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল। আর, চরণ ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত অবসন্ন দেহকে কোনক্রমে টানিয়া লইয়া আধসের চাউলের জন্য মহাজনের দ্বারা মাথা কুটিতেছিল। মহাজনের কিন্তু দয়া হইল না ; তিন তিন বৎসরের হিসাব টানিয়া চরণকে বুঝাইয়া দিলেন, এই তিন বৎসরে সে যে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা দেনা করিয়াছে, তাহা সুদে আসলে পৌনে আট গণ্ডা টাকায় দাঁড়াইয়াছে। চরণের ভিটাটার দাম জোর কুড়ি টাকা হইতে পারে ; বাকী পৌনে তিন গণ্ডা টাকা মহাজনের লোকসান। এরূপ স্থলে মহাজন লোকসানের উপর আর লোকসান করিতে পারে না।

একটা গভীর নিরাশা ও মর্ম্মদাহ লইয়া চরণ রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া আসিল। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতর একটা ব্যর্থ ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সে আগুনে তাহার পাপপুণ্য বোধ, হিতাহিতজ্ঞান পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তারপর গভীর নিশীথে পল্লী যখন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া গেল, তখন শুধু চরণের ভগ্ন কুটীরমধ্য হইতে সোনার আকুল চীৎকার উত্থিত হইয়া রজনীর সে গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। গরবী আকুল-দৃষ্টিতে ক্ষুধার তীব্র তাড়না নীরবে স্বামীকে জানাইয়া দিতে লাগিল। চরণ আর পারিল না ; সে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল।

তারপর চরণ কিরূপে যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, নকুড় দত্তের বাড়ীতে ঢুকিয়া, কি উপায়ে ভাঁড়ার ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া চাউলের হাঁড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং এক হাঁড়ী চাউল ও কয়েকটা ঘটীবাটি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। যেন কোথা হইতে একটা অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া এই নিতান্ত অনভ্যস্ত কার্য্যটা খুব সহজভাবেই সম্পন্ন করাইয়া দিল। কিন্তু যেমন নিঃশব্দে গিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিল না, প্রাচীরে উঠিবার সময় অপহৃত ঘটীবাটিগুলা হইতে শব্দ উত্থিত হইল। সে শব্দে বাড়ীর লোক জাগিয়া উঠিল, এবং চীৎকার করিতে করিতে চোরের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

চোর ধরা দিল না, কিন্তু তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত লোকে ধাওয়া করিল। চরণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে আসিল, এবং অপহৃত জিনিসগুলো ঘরের ভিতর ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠি লইয়া বাহির হইল। লাঠীর বহর দেখিয়া অনুসরণকারীরা পলায়ন করিল।

চরণ স্ত্রীকে তুলিয়া ভাত রাঁধাইল, এবং ছেলেকে ভাতের মাড় খাওয়াইয়া দুই দিনের

পর স্ত্রী পুরুষ পেটে ভরিয়া ভাত খাইল। যখন শেষ হইল; তখন পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন পুলিশ আসিয়া চরণকে গ্রেপ্তার করিল, তখন কৃতকার্য্যের পরিণাম-চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িল। তারপর তাহাকে চালান দিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যখন অপহৃত চাউল ও ঘটীবাটিগুলা পর্য্যন্ত লইয়া চলিল, তখন চরণ পাগলের মত চীৎকার করিয়া দারোগাকে বলিল, "দোহাই হুজুর, যেগুলোর তরে আমি জেলে যাচ্চি, সেগুলো রেখে যাও, ও অভাগী তবু খেয়ে দশটা দিন বাঁচবে।"

উত্তরে দারোগাবাবু এমন একটা অশ্রাব্য উত্তর দিলেন যে, তাহা শুনিয়া চরণের মনে হইল, হাতের হাতকড়ার আঘাতে দারোগার মাথাটা ফাটাইয়া দেয়, কি নিজের মাথায় মারিয়া নিজে মরে। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই কনেষ্টবল রুলের গুঁতা মারিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। যাইবার সময় সে গরবীকে একটুও আশ্বাস দিয়া যাইতে পারিল না।

মাস দুই পরে সংবাদ আসিল, চুরি-অপরাধে চরণের দেড় বৎসর জেলের হুকুম হইয়াছে। শুনিয়া গরবী কাঁদিয়া উঠানের ধূলায় লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

দেড় বৎসর পরে চরণ ঘরে ফিরিল। কিন্তু গরবী বা সোনা কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু ভগ্নপ্রায় কুটীরখানা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। অনুসন্ধানে চরণ জানিতে পারিল, তাহার জেলে যাইবার মাস কয়েক পরে গরবী কেশেপুকুরের ছিদাম মাজীকে সাঙ্গা করিয়া তাহার ঘর-ঘরকন্না করিতেছে। শুনিয়া চরণ অবসন্নভাবে উঠানের উপর বসিয়া পড়িল। সে জানিত না যে, তাহার জেলের সংবাদ-শ্রবণে গরবী একদিন ঠিক এই জায়গায়ই ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছিল।

পরদিন চরণ কেশেপুকুর অভিমুখে যাত্রা করিল, এবং ছিদাম মাজীর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাহিরে একটি বছর তিনেকের ছেলে খেলা করিতেছে। সোনাকে চিনিতে চরণের বিলম্ব হইল না ; সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সোনাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। সোনা কিন্তু তাহাকে চিনিল না, সহসা একজন অপরিচিত কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। ছেলের কান্না শুনিয়া গরবী বাহিরে আসিল। কিন্তু চরণকে দেখিয়া, লোকে সহসা সম্মুখে সাপ বাঘ দেখিলে যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া ছুটিয়া পলায়, তেমনই ভাবে ছুটিয়া পলাইল। চরণ স্কীয়-গম্ভীর-কণ্ঠে ডাকিল, "গরবী, গরবী!"

গরবী কিন্তু উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। চরণ কিয়ৎক্ষণ অচল প্রস্তরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে সোনাকে বুক হইতে নামাইয়া দিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চরণ কিন্তু আগে যে ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, ঠিক সে ভাবে জীবন কাটাইতে পারিল না। একে তো তাহার নিকট সংসারটা উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার অপবাদগ্রস্ত জেল-ফেরৎ। চরণকে কেহই আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। সকলেরই দৃষ্টি হইতে যেন ঘৃণা ও তিরস্কারের তীব্রতা আসিয়া শেলের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। চরণ মাথা নীচু করিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল।

একবার ক্ষুধার তাড়নায় যে কাজ করিয়াছে, স্ত্রী-পুত্রকে অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কলঙ্কের কালি গায়ে মাখিয়াছে, সে কালিমা এ জীবনে ধৌত হইবে না। কিন্তু হে অন্তর্য্যামী দেবতা, তুমি জান, স্নেহ-মমতার শাসন কি ভয়ঙ্কর! যাহাদের জন্য জীবন দিতে পারা যায়, তাহাদের জন্য কলঙ্কের ভার মাথায় লওয়া, সে কত সহজ। কিন্তু দেড় বৎসরের কঠোর প্রায়শ্চিত্তেও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না?

জীবনে একটা ভুল করিলেই যে সমগ্র জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই। চরণ অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া নূতন জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সমাজ তাহা হইতে দিল না, প্রতিপদে খোঁচা দিয়া তাহার বর্ত্তমানটাকে অতীতের ভিতর ঠেলিয়া দিতে লাগিল। চৌকীদার আসিয়া রাত্রিতে জাগাইত, থানার এলাকার মধ্যে চুরী হইলেই পুলিশ আসিয়া চরণের ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর চোরাই মালের সন্ধান করিত। এমনই সন্ধান করিতে করিতে পুলিশ আবার একদিন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। হরিশচকের বলাই নন্দীর বাড়ীর চুরীর অপরাধে মাজিস্ট্রেট তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইয়া দিলেন।

এবার জেল হইতে ফিরিয়া চরণ আর গ্রামের ভিতর বাস করিতে পারিল না ; গ্রামপ্রান্তে মাঠের ধারে—যেখানে বিস্তৃত প্রান্তরটা আপনার বিশাল শূন্যতা লইয়া গ্রামখানাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইখানে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু মানুষ সমাজের বাহিরে একা থাকিতে পারে না। লোকসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চরণ বন্ধনবিহীন বৈষ্ণব সমাজের দ্বারস্থ হইল, এবং নিত্যানন্দ বাবাজীর আড্ডায় যাতায়াত করিয়া বাবাজীর নিকট কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া বাবাজী রাগিয়া বলিলেন, "মর্ বেটা, একে জাতে চাঁড়াল, তার উপর জেল-ফেরতা, আমি তোকে মন্ত্র দেব?"

চরণ কাঁদিয়া বলিল, "মন্তর না দাও, আমার উদ্ধারের উপায় ব'লে দাও বাবাজি।"

বাবাজী বলিলেন. "উপায় আর কি, নিরুপায়ের উপায় হরি, হরিকে ডাক্।"

বাবাজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চরণ হরিনাম জপে প্রবৃত্ত হইল, এবং আপনার হৃদয়ের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হরির চরণে অর্পণ করিয়া মনটাকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গরবী একদিন ছেলের হাত ধরিয়া তাহার কুটীরদ্বারে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

[২]

"আমার কি হবে সোনার বাপ?"

চরণ অধোমুখে নিরুত্তর। গরবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই নাই?"

মুখ তুলিয়া চরণ বলিল, "আমার ঘরে থাক্‌বি?"

গরবী বলিল, "যদি তুমি রাখ।"

চরণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গরবী বলিল, "মনে কর, তোমার ছেলেটাও তো আছে। আমার যদি নেহাৎ—"

বাধা দিয়া চরণ বলিল, "তুই আর ছেলে আলাদা কি গরবী?"

মুখ নীচু করিয়া গরবী বলিল, "তা হ'লেও দোষ-ঘাট যা কিছু আমিই করেছি, ছেলেটার কোন দোষ নাই।"

বিষাদগম্ভীরস্বরে চরণ বলিল, "দোষ তোরও নাই গরবী, দোষ যদি কিছু থাকে, সে আমার কপালের।"

গরবী নীরবে বসিয়া মাটীতে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। চরণ বলিল, "তোর কিন্তু ছিদামের ঘর ছেড়ে আসা ঠিক হয় নি।"

মুখ তুলিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে গরবী বলিল, "প'ড়ে প'ড়ে তার মার খাব?"

"ঘর কত্তে গেলে অমন হয়ে থাকে।"

"কিন্তু সেখানে আমার কিসের ঘর?"

"তবে গিয়েছিলি কেন?"

"পেটের জ্বালায়।"

"পেটের জ্বালা কি এত বড়?"

"যার জ্বালায় চুরী পর্য্যন্ত করা যায়, সেটা খুব ছোট কি?"

এই কঠোর সত্য উত্তর শুনিয়া চরণ ভ্রূকুটী করিল। গরবী ঈষৎ রাগতভাবে বলিল, "তা আমি যা করেছি, করেছি, কিন্তু ছেলে তো তোমার।"

মৃদু হাসিয়া চরণ বলিল, "এ সংসারে কে কার গরবী? একমাত্র হরিনামই সার।"

পরিহাসের স্বরে গরবী বলিল, "জেলে গেলে দেখ্‌চি মানুষ বৈরাগী হয়।"

চরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। গরবী ছেলের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্?"

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে গরবী বলিল, "চুলোয়।"

গরবী চলিল, চরণ ডাকিল, "ফিরে আয় গরবী!"

গরবী ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং চরণের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন?"

চরণ বলিল, "এইখানেই থাক্।"

তীব্রস্বরে গরবী বলিল, "তাতে যদি তোর জপতপের ব্যাঘাত হয়?"

চরণ চুপ করিয়া রহিল। গরবী ফিরিয়া চলিল। যখন সে কুটীরের সীমানা ছাড়াইয়া মাঠে নামিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সহসা চরণ ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং উৎসুককণ্ঠে বলিল, "যা হয়, হবে গরবী, তুই ফিরে আয়।"

গরবী কিন্তু ফিরিয়া চাহিল না ; সে চরণের মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। চরণ হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে জনৈক কৃষক গাহিতেছিল ;—

"মোন তোমারে বারে বারে আর কত বুঝাব।
বুঝেও তো বুঝো না তুমি এ কি অসম্ভবো।"

চরণ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু চরণ সে দিন কিছুতেই মন দিতে পারিল না। নামগান করিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া নাম বাহির হইল না। সন্ধ্যা হইল, কুটিরে আলো জ্বালিল না। অন্ধকার কুটীরদ্বারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে গ্রাম, প্রান্তর সব স্তব্ধ হইয়া আসিল, অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া নৈশবায়ু শন্ শন্ শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল। চরণ বসিয়া শুধু শুনিতে লাগিল, যেন প্রান্তরের অপর পার হইতে গরবী আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "আমার যে আর দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই।" খানিক পরে চরণ কুটীরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন আর তাহার খাওয়া হইল না।

পরদিন সকালে উঠিয়াই চরণ কেশেপুকুরে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে গরবী নাই সোনাও নাই। চরণ বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

তিন দিন এ গ্রাম সে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া চরণ যখন গরবীর কোন উদ্দেশ পাইল না, তখন সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিত্যানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

[৩]

কালে সবই সহিয়া যায়। চরণেরও সহিয়া গেল। বছরখানেকের চেষ্টায় সে গরবীকে ভুলিল, সোনাকে ভুলিল ; শুধু প্রাণের ভিতর হরিনামটি জাগাইয়া রাখিল। আর একটা কথা

জাগিয়া রহিল, সেটা জেলের কথা। চরণ ভুলিতে চেষ্টা করিলেও পুলিশে তাহাকে সেটা ভুলিতে দিল না। মাঝে মাঝে খানাতল্লাসী করিতে আসিয়া, তাহাকে মারিয়া, ঘরের জিনিসপত্র তছনচ্ করিয়া তাহাকে শুধু উত্যক্ত করিল না, সে যে জেলফেরৎ, এ কথাটা স্পষ্টভাবে তাহার মনের ভিতর জাগাইয়া রাখিল। সে স্মৃতির দংশনে চরণ যখন আকুল হইয়া পড়িত, তখন সে নির্জ্জন কুটীরদ্বারে বসিয়া আপন মনে গাহিত—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে,
তোমা বিনে কে দয়ালু জগৎসংসারে।
পতিতপাবন হেতু তব অবতার,
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।"

আড়খায় যাতায়াত করিয়া চরণ কতকগুলি পদ শিখিয়াছিল। মনটা নিতান্ত আকুল হইলে সেই পদ গাহিয়া অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিত। লোকে তাহার সে প্রার্থনা শুনিয়া 'বক ধার্মিক' বলিয়া উপহাস করিত, এবং তাহার এই ভণ্ডামীর অন্তরালে যে কতকগুলা দুষ্কর্ম্মের তীব্র বাসনা লুক্কায়িত রহিয়াছে, অন্ধকারে ইঙ্গিতে এমন কথাও প্রকাশ করিতে ছাড়িত না। সে কথাগুলা বুকে শেলের মত বিঁধিলেও চরণ ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের কোন উপায়ই দেখিতে পাইত না ; শুধু অন্তর্যামী দেবতার চরণে আপনার অন্তরের নিদারুণ ব্যথা জানাইয়া চুপ করিয়া থাকিত।

এইরূপে যখন কতক যন্ত্রণায়, কতক শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল, তখন বাবাজী শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। শুনিয়া চরণও তাঁহার অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হইল। বাবাজীর ইহাতে আপত্তি ছিল না। গ্রামের অনেক লোকই যাইবে, তাহার সহিত চরণ গেলে ক্ষতি কি? চরণের আনন্দের সীমা নাই। সে ঔৎসুক্য সহকারে গাহিতে লাগিল—

"হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি।।"

লোকে শুনিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল। তার পর চরণকে দেখিলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "কি হে চরণ, এখানে আর সুবিধা হলো না না কি?"

চরণ সবিনয়ে উত্তর করিত, "মহাপাপী আমি, উদ্ধারের উপায় করা তো চাই।"

গোপাল চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় কথাটা উঠিলে বুড়া চক্রবর্ত্তী ঘাড় নাড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"ওহে, আমরা বুড়ো হয়ে মর্‌তে যাচ্চি, আমাদের উদ্ধারের ভাবনা হ'লো না, আর যত ভাবনা হ'লো ঐ যমের মত পালোয়ান বেটা চাঁড়ালের। ওর উদ্দেশ্যটা কি জান, বেটা কোথাও দাঁও মার্‌বার চেষ্টায় আছে, আর সাধুর দলে ঢুকে গেলে পুলিশেরও সন্দেহ হবে না। থাম না, বেটার বৃন্দাবন যাওয়া বের ক'রে দিচ্চি।

বাস্তবিক গ্রামে এত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভাল ভাল লোক থাকিতে এক বেটা জেল-ফেরৎ চাঁড়াল বৃন্দাবনে যাইবে, ইহা অনেকেরই নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল।

[৪]

যাত্রার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, চরণের ততই উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। একবৎসরে খাইয়া পরিয়া সে বাইশ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। একদিন সে বসিয়া টাকাগুলি গুণিতেছিল, আর গরবীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল, এমন সময়ে গোপাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া ডাকিলেন, "চরণ ঘরে আছিস্?"

চরণ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিল, "বাবাঠাকুর যে?"
চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আজ আমার মজুর দিতে পার্‌বি?"
চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ তো হবে না বাবাঠাকুর, আজ যে রায়েদের ধান কাটতে যাচ্চি।"
চক্রবর্ত্তী ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাই তো।"
চরণ বলিল, "কাল হলে চলবে না, বাবাঠাকুর?"
একটু ভাবিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কাজেই। তুই আমার কাছে একটা মজুরের দাম পাবি। নোট ভাঙ্গাতে পারি না ; তোর টাকা আছে?"
দরজার সাম্‌নে ঘরের ভিতর টাকাগুলা তখনও চক্‌চক্ করিতেছিল, এবং চক্রবর্ত্তীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিটা তাহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। চরণের নগদ টাকা ছিল, বলিল, "তা পারি বাবাঠাকুর।"
"তবে দে তো বাবা, বাঁচলাম, বাজারে ছুট্‌তে হ'লো না।"
বলিয়া চক্রবর্ত্তী ছোট হাতকাটা জামার বুকের পকেটের ভিতর হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া চরণের হাতে দিলেন এবং চরণ টাকা-দশটি আনিয়া দিলে তাহা বাজাইয়া লইয়া পকেটে রাখিলেন। তারপর চরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খুচরা তো নাই ; তোর পাওনাটা—"
চরণ বলিল, "তা দেবেন এখন।"
চক্রবর্ত্তী প্রস্থানোদ্যত হইয়া সহসা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে চরণ, তুই নাকি বৃন্দাবনে যাচ্চিস?"
চরণ মৃদু হাসিয়া হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে উত্তর করিল, "সে কথা পাপ মুখে কেমন করে বল্‌তে পারি বাবাঠাকুর।"
চক্রবর্ত্তী গম্ভীরভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তা হলে যাচ্চিস্?"
চরণ বলিল, "তিনি যদি নিয়ে যান।"
চক্রবর্ত্তী আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন। চরণ ঘরে ঢুকিয়া টাকা ও নোট নেকড়ায় বাঁধিয়া চাউলের হাঁড়ীতে রাখিল।

[৫]

ইহার দুই দিন পরে একদিন চক্রবর্ত্তী পথে চরণকে দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "হাঁ রে বাবা চরণ, সে দিন সন্ধ্যার পর কেশেপুকুর হতে ফিরবার সময় তোর ঘরের সাম্‌নে বললে হয়, এক বেটা আমার কুড়িটা টাকা কেড়ে নিলে। তোকে এত চেঁচিয়ে ডাক্‌লাম, একটা সাড়াও দিলি না বাবা!"
বিস্ময়ের সহিত চরণ বলিল "কৈ বাবাঠাকুর, আমি কিছু শুনতে পাইনি।"
অনুযোগের সুরে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আর বাবা, কাজের সময় শুনতে পাবি কেন? হরি হে মধুসূদন, তোমারই ইচ্ছা।"
বলিয়া তিনি চরণের মুখের উপর কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। চরণ বিস্মিতভাবে ঘরে ফিরিল।
পরদিন প্রভাতে পুলিশ আসিয়া যখন চরণকে রাহাজানীর অপরাধে গ্রেপ্তার করিল, তখন চরণ তাহাতে একটুও বিস্মিত হইল না। কেন না, ইহা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশের সহিত গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক ছিলেন, চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের অন্যতম। খানাতল্লাসীর পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী দারোগাকে বলিলেন, "দেখুন দারোগাবাবু,

দশটি টাকা, আর একটি একখানি দশ টাকার নোট। নোটের পীঠে আমি নিজের হাতে শ্রীশ্রীদুর্গা লিখেছিলাম।"

সামান্য অনুসন্ধানেই চাউলের হাঁড়ীর ভিতর হইতে শ্রীশ্রীদুর্গা স্বাক্ষরিত নোট এবং টাকা বাহির হইল। তবে দুইটা টাকা বেশী মাত্র। দারোগা বলিলেন, "এ কোন চুরীর বামাল নিশ্চয়।"

বামাল বাহির হইতে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, চরণের এই কাজ! হাঁ রে বাবা চরণ, আমি বুড়ো বামুন—"

চরণ উত্তরে চক্রবর্ত্তীর মুখের উপর স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

দারোগা বামাল সহ আসামীকে চালান দিলেন। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় গ্রামের লোকে কত টিট্‌কারী দিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুজ্যে বলিলেন, "কোথায় যাচ্চিস্ চরণ, বৃন্দাবন নাকি?"

চরণ হাতকড়ি-শুদ্ধ হাত কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল, "পেন্নাম, তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, সেইখানেই যাচ্চি দা'ঠাকুর।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "উঃ, বেটা কি বদমায়েস! চোর, ডাকাত, বেটার ফাঁসী হওয়া উচিত। ইঃ, বেটা আবার হরিনাম করে। চোরের আবার হরিনাম!"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী লাঠী ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আখড়ার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শুনিলেন, বাবার জনৈক শিষ্য পাষণ্ডদলনের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছে—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
ব্রাহ্মণ হয়ে চণ্ডাল হয় যদি হরি ত্যজে।।"

দিন দুই পরে চক্রবর্ত্তী একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠ হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, একজন মেয়েমানুষ একটা ছেলের হাত ধরিয়া চরণের কুটীরসম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"সোনার বাপ, সোনার বাপ!"

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "বৃন্দাবনে গেছে গো, শ্রীবৃন্দাবনে গেছে। অধম পাতকী আমরা এই আমড়াগঞ্জে প'ড়ে আছি।"

তাঁহার সঙ্গের কৃষকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরবী উঠানের ধূলার উপর বসিয়া পড়িল।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

গদা চাঁড়াল

নারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রাম্য দলাদলির প্রবল উত্তেজনা, ২ নং দেওয়ানী ও ১ নং ফৌজদারী মোকদ্দমা ফেলিয়া এবং দশ বৎসরের ছেলে জগবন্ধুকে সাড়ে সাতশত টাকা ঋণের উত্তরাধিকারী করিয়া দলের প্রধান মুরুব্বি শিবু হালদার যে দিন মহাবিচারকের উচ্চ আদালতে জবাবদিহি করিবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন, সে দিন তাঁহার নাবালক পুত্র ও বিধবা পত্নীকে দেখিবার জন্য উপরে রহিলেন ভগবান্, আর নীচে রহিল গদাই মাঝি।

হালদার মহাশয়ের মৃত্যুতে গ্রামের সমাজ-বক্ষে হর্ষ-বিষাদ উভয়বিধ তরঙ্গই প্রবাহিত হইল। কেহ কেহ আলোচনা করিয়া বলিল, "আহা, গাঁয়ের একটা চূড়া খসে গেল।" কেহ বা আশা করিল, এত কাল পরে বোধ হয় গাঁয়ের দলাদলিটার অবসান হইল। হইলও তাহাই। দলের কর্ত্তা ও প্রধান উৎসাহদাতা যখন চক্ষু মুদিলেন, তখন আর দল চালায় কে? সুতরাং একাদিক্রমে ঊনিশ বৎসরের স্থায়ী দলাদলিটা রামজয় ঘোষের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে এক কথায় মিটিয়া গেল। ঝড়ে বড় গাছটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহার শাখাশ্রয়ী বিহঙ্গকুল যেমন বৃক্ষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনই হালদার মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার দলের লোকগুলি একে একে প্রতিপক্ষ গোবিন্দ রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের কাজের লোক যাহারা, তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল আর নিষ্কর্ম্মা লোকেরা অতঃপর কি উপায়ে দিন গুজরাণ করিবে তাহারই চিন্তায় বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

ফরিয়াদীর মৃত্যুতে ফৌজদারী মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। দেওয়ানী মোকদ্দমায় গোবিন্দ রায় জয়লাভ করিলেন, কিন্তু ঢাক ঢোল বাজাইয়া বুড়াশিবের পূজা দিয়া বিপক্ষ শিবু হালদারের মাথাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিবার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি জয়ের আনন্দটা সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিলেন না।

মহাজন দেনার দায়ে জমি জায়গা বেচিয়া সুদ-আসল বুঝিয়া লইয়া গোবিন্দ রায় নীলামে উঁচু ডাকে শিবু হালদারের খিড়কীর পুকুরটা কিনিয়া লইলেন। বাকী রহিল কেবল ভিটাটা, আর কয়েক কাঠা ডাঙ্গা জমি এবং তিন চারি বিঘা ধান-জমি। এগুলা গৃহিণীর নামে বেনামী করা ছিল, বলিয়াই মহাজনের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া হালদার মহাশয়ের গৃহিণীর এবং নাবালক পুত্রের দিনপাতের উপায় করিয়া দিল।

জমি জায়গা গেল, গরু বাছুর গেল, কিন্তু চাকর গদাই গেল না। সে খুঁটি গাড়িয়া বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে আপনার কাজ করিতে লাগিল। গৃহিণী একদিন তাহাকে যাইবার কথা বলায় গদাই এমন কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল, গৃহিণী আর কখনও গদায়ের নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "হ্যাঁরে গদা, গরু বাছুর সব গেল, কিন্তু তুই গেলি না যে?"

গদাই চড়া গলায় উত্তর করিত, "আমি কি তোদের মত, গরু বাছুরের সামিল?"

"চাষবাস নাই, তুই আর থেকে করবি কি?"

"মনিব বাড়ী ত আছে ; বাড়ীর কাজ করব।"

লোকে ভাবিত, গদাই একটা প্রকাণ্ড নির্ব্বোধ। গদাই মনে করিত, লোকগুলো কি পাজী! হায় রে কলি!

আর সকলে গদাইকে নির্ব্বোধ স্থির করিলেও গোবিন্দ রায় তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন। এজন্য তিনি গদাইকে হাত করিবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। বড় মাকে এবং জগাকে ছাড়িয়া গদাই কোথাও যাইতে রাজি রইল না। রায় মহাশয় তখন গদায়ের স্ত্রী ভগীকে ধরিয়া বসিলেন। মেয়েমানুষ, সহজেই তাঁহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইল। সে রায় মহাশয়ের বাড়ী চাকরী করিবার জন্য গদাইকে জেদাজেদি করিতে লাগিল। গদাই কিন্তু কোন প্রলোভনেই ভুলিল না। তখন স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বাধিয়া গেল। ভগী বলিল, "চাকরী করবি না তো কর্‌বি কি? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি?"

গদাই বলিল, "আমার খুসী। তোর ভেয়ের খাই?"

ভগী বলিল, "আমি কিন্তু ধান ভেনে এনে তোকে খাওয়াতে পার্‌ব না।"

"না পারিস পথ দেখ।"

"আমি যেন পথ দেখব ; তোর ব্যা—টা—?"

গদাই বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ; বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া বজ্রকঠোর স্বরে বলিল, "ধ্যেৎ তোর ব্যাটা। ব্যাটা আগে না সাক্ষাৎ ধর্ম্ম মুনিব আগে? তুই তখন কোথা রে মাগী, আর তোর ছেলেই বা কোথা, য্যাখন পাঁচ বছরের বেলায় মা মরে গেল, বড় মা—ঐ বামুনের মেয়ে—মুখের খাবার দিয়ে এই চাঁড়ালের ছেলেটাকে মানুষ করলে? আর আজ কি না তুই মাগী পয়সা দেখাস! সেই বড় মাকে ছেড়ে যেতে বলিস্? পাজী মাগী—নচ্ছার।"

বলিতে বলিতে গদায়ের বড় বড় চোখ দু'টা রাগে জ্বলিয়া ও জলে ভরিয়া উঠিল। গদাই বসিয়া পড়িয়া, দুই হাতে রগ চাপিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

স্বামীকে কাঁদিতে দেখিয়া ভগী ভ্যাবাচাকা লাগিয়া নরম হইয়া গেল। বলিল, "আমি কি তাই বলচি ; আমি বলি ওখানেও কাজ কর, আর এনাদেরও দেখ শোন।"

গদাই কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে ভগীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তা পারব না ভগী, আমি গেলে জগা ছোঁড়ার লেখা-পড়ার দফা রফা। ছোঁড়া, যদি টেনে বুনে দু'কলম লিখতে পারে, তবু বাপের নামটা রাখবে। আমি চলে গেলে কি সে লেখা-পড়া কর্‌বে! আর তুই কি রায় মোশায়ের মতলব বুঝতে পারিস নে?"

ভগী বলিল, "কিন্তু চলবে কি ক'রে?"

গদাই মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "দূর হ মাগী, এতটা বয়সে এই বুঝি তোর আক্কেল হ'ল! কে কার চালায়? যে চালাবার সেই চালাবে, তোর আমার বাবারও সাদ্দি নেই যে, একটা বেলা চালাই ; বুঝলি? রায় মোশায়ের অত পয়সা ক'টা লোকের চালিয়ে দিচ্চে?"

বুঝুক না বুঝুক, ভগী আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

ইহার পর একদিন সে রায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, "না বাবু, আমরা চাষা নোক, অধম্ম কত্তে পারবুনি!"

চাষের কাজ না থাকিলেও গদাই যে বসিয়া থাকিত, তাহা নহে। সংসারের সামান্য খুঁটিনাটি কাজ লইয়া সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, তাহার আহার-নিদ্রারও সময় থাকিত না। সে কোথাও মাটী খুঁড়িয়া শাক বুনিত, কোথাও কুমড়ার চারা বসাইত, কোথাও বা লাউগাছের মাচা বাঁধিত। যে কয়েক কাঠা ডাঙ্গা জমি ছিল, তাহাতে বেগুণ গাছ বসাইত, কলাই বুনিয়া দিত। লাঙ্গলের প্রয়োজন ছিল না। গদায়ের হাতে কোদালই কার্য্য করিত।

গদায়ের এই বিরামবিহীন পরিশ্রমের ফলে এত অভাবের মধ্যেও গৃহিণীকে বড় একটা কষ্ট অনুভব করিতে হইত না। দিন একরূপ সুখে দুঃখে গুজরাণ হইত।

গদায়ের মনে কিন্তু বড় একটা কষ্ট ছিল। তাহা জমি জায়গা যাওয়ার জন্য নয়, খিড়কী পুকুরটা রায় মহাশয়ের হাতে যাওয়ার জন্য। পুকুরটা যাওয়া অবধি জগাকে মাছ কিনিয়া খাইতে হইত, আর রায় মহাশয়ের লোক আসিয়া পুকুর হইতে রাশি রাশি মাছ ধরিয়া লইয়া যাইত। কাজের একটু ফুরসৎ পাইলেই গদাই জাল হাতে বাহির হইত, এবং খাল বিল হইতেই কোঁচড় ভরিয়া মাছ ধরিয়া আনিত। তার পর কোন মাছটা কিরূপে রাঁধিতে হইবে, কোন মাছের কোন্ অংশটা জগা বেশী ভালবাসে, তাহা বড় মাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিত। জগা খাইতে বসিলে সে একটু তফাতে বসিয়া জগাকে মাছ খাওয়াইত এবং খুড়োঠাকুরের আমলে প্রভু ভৃত্যে বাহির হইয়া কিরূপে বড় মাছগুলা শীকার করিয়া আনিত, হাট পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়া সেবার ভূতের হাতে কিরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল, বড় মাকে সেই সকল গল্প শুনাইত। আর মধ্যে মধ্যে জগাকে আরও মাছ দিবার জন্য অনুরোধ করিত। জগা বেশী মাছ খাইতে আপত্তি প্রকাশ করিলে সে দাদাভাই বলিয়া আদর করিয়া, ধমক দিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, ইচ্ছামত মাছ খাওয়াইত। গদা দাদার ভয়ে জগাকে মাথা গুঁজিয়া দাদার ইচ্ছা পালন করিতে হইত। প্রভুপুত্র এবং ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও জগাকে মধ্যে মধ্যে গদাদা'র চড় চাপড়ের আস্বাদ অনুভব করিতে হইত।

জগার মাছ খাইতে আপত্তি দেখিয়া, গৃহিণী যদি বিরক্তভাবে বলিতেন, "না খেতে পারে থাক, বাদলার জন্য নিয়ে যা।" তাহা হইলে গদাই মাথা নাড়িয়া বলিত, "এতো আর তোমার বাবার পুকুরের মাছ নয় যে যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিবে।"

চাঁড়ালের ছেলের মুখে এইরূপ পিতৃ-উচ্চারণ শুনিয়াও গৃহিণী হাসিয়াই ফেলিতেন। সেকাল আর একাল!

গদাই যে জগাকে কেবল আদর যত্নই করিত, তাহা নহে। কঠোর প্রকৃতি অভিভাবকের ন্যায় তাহাকে শাসনও করিত। পিতৃহীন হইয়াও জগা যে স্কুলে যাইত, তাহা কেবল গদা দাদার ভয়ে। কোন দিন যদি জগা স্কুলে যাইতে আপত্তি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে গদাই তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। একে চাকর তায় চাঁড়ালের ছেলের এতদূর স্পর্দ্ধা দেখিয়া কোন কোন প্রতিবেশিনীর গাত্রদাহ উপস্থিত হইত। তাঁহারা গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন, "হ্যাঁগা জগার মা, চাঁড়াল হ'য়ে বামুনের ছেলের কান ধরে, আর তুমি কিছু বল না?"

গৃহিণী হাসিয়া উত্তর করিতেন, "কি করব মা, ওর ওপর কি কথা কবার যো আছে।"

গৃহিণীর মুখে হাসি দেখিয়া উপদেশদাত্রীরা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া যাইতেন, কিন্তু নিজের ছাগশিশুকে লাঙ্গুলের দিকে ছেদন করিলে অপরের তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই ভাবিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইতেন।

এক দিন গৃহিণী এ সম্বন্ধে গদাইকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। শুনিয়া গদাই রাগে হাত মুখ নাড়িয়া উত্তর করিয়াছিল, "আরে মোর বামুনের ছেলে! বামুনের ছেলে নেখা পড়া করবে না, আর আমি চুপ করে তাই দেখব।"

গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "কিন্তু ওতে যে তোর পাপ হয়।"

গদাই বলিল, "পাপ হয় আমার হবে, আমিই না হয় নরকে যাব, কিন্তু ও ছোঁড়া তো মানুষ হবে। আর আমি চাঁড়ালের ছেলে কিসে? আমায় মানুষ করেছে কে? জগার কি আমি মিথ্যে দাদা?"

"কিন্তু লোকে যে দোষ দেয়।"

"দোষ দেয় দেবে। গদাই মাজি কারও পরচালায় ঘর করে না। তোমার মনে আজ কাল বুঝি ঐ সব হচ্চে?"

এ কথার পর গৃহিণী মূক হইয়া গেলেন।

রায় মহাশয় কেবল যে গদাইকে হাত করিতে পারিলেন না, এমন নহে, তাহার নিকট এমন একটু আধটু অসম্মানজনক ব্যবহার পাইলেন, যাহাতে গদাকে দমন করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি এই নীচ জাতীয়ের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না ; কৌশলে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে স্থির করিলেন।

রায় মহাশয় অনুমান করিতেন, তাঁহার নব-ক্রীত পুষ্করিণীর মাছ কেহ গোপনে ধরিয়া খায়। এজন্য তিনি মাঝে মাঝে পুকুর দেখিতে আসিতেন, এবং পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রাব্য ভাষায় কাল্পনিক চোরের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতেন। সে গালাগালির প্রত্যেক কথাটাই গৃহিণীর কানে যাইত। তিনি বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া আর বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। গদাইও সে গালাগালি দুই একদিন শুনিল, বড় মাকে কাঁদিতে দেখিল। তাহার আর সহ্য হইল না। সে রায় মহাশয়ের সমুখে উপস্থিত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া অবিলম্বে বলিল, "দেখুন রায় মোশাই, আপনকারা ভদ্দর নোক, আপনকারদের মুখের জোর বেশী ; কিন্তু আমরা ছোটনোক, আমাদের মুখের চেয়ে হাতটাই বেশী চলে, এই বলে রাখলাম কিন্তু।"

সেই দিন হইতে রায় মহাশয়ের গালাগালি আর শুনা গেল না বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁহার চাকর আসিয়া পুকুরের চারি ধারে এমন কাঁটা গাছ ফেলিয়া গেল যে, পুকুরের ঘাট-সরা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। নিকটে আর পুকুর ছিল না, সুতরাং গৃহিণী গদাইকে বলিলেন, "কি হবে রে গদা?"

গদাই গিয়া আস্তে আস্তে কাঁটা গাছগুলিকে একত্র করিয়া বোঝা বাঁধিল ; তার পর সেই বোঝা মাথায় তুলিয়া রায় মহাশয়ের বাড়ীর দরজায় ফেলিয়া দিয়া আসিল। রায় মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া ইহা দেখিলেন, কিন্তু একটা কথাও বলিতে সাহস করিলেন না। গলায় গামছা দিয়া গদাই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

ঘাটের ধারে একটা আম গাছ ছিল। গাছটা পুকুরের সামিল কি ভিটার সামিল, তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। সেই গাছের আম পাড়িয়া আনিবার জন্য রায় মহাশয় চাকরকে পাঠাইয়া দিলেন। চাকর আম পাড়িতে আসিল, কিন্তু গদাই তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল, এবং গাছের সব আম পাড়িয়া আনিয়া উঠানে ঢালিল।

পরদিন সকালে রায় মহাশয় আট দশজন লোক লইয়া গাছটা কাটিতে আসিলেন। গদাই তখন বেগুন বাড়ী কোপাইতে গিয়াছিল। জগা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া তাহাকে এ সংবাদ দিল। গদাই শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, এবং বড় ঘরের দরজার আড়া হইতে পাকা বাঁশের লাঠিখানা পাড়িয়া লইয়া উঠানে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু সে বাহির হইতে পারিল না ; গৃহিণী ছুটিয়া গিয়া খিড়কী দরজা বন্ধ করিয়া দরজার পাশে আড় হইয়া পড়িলেন। গদাই তাঁহাকে সরিয়া যাইবার জন্য মিনতি করিল, ধকম দিল, কিন্তু তিনি উঠিলেন না ; উচ্চস্বরে বলিলেন, "চুলোয় যাক্ আম গাছ, আমার জগাকে ওখানে কেটে ফেল্লেও আমি দরজা খুলব না।"

ওদিকে আম গাছের উপর কুড়ালির চোট ধপাধপ্ শব্দে পড়িতে লাগিল। গদাই সে চোটগুলো যেন আপনার বুকের উপর পড়িতেছে অনুভব করিল। ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে করিতে সে উঠানময় পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ; তীব্র-ভাষায় বড় মার পিতৃকুলের কাপুরুষতা সম্বন্ধে সুতীব্র মন্তব্য ব্যক্ত করিতে থাকিল ; কিন্তু বড় মা তাহাতে কাণ দিলেন না, দরজা ছাড়িয়া উঠিলেন না।

তারপর গাছটা যখন ছিন্নমূল হইয়া মড় মড় শব্দে পড়িয়া গেল, তখন গদাই উঠানের

মাঝখানে বসিয়া পড়িয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "খুড়োঠাকুর নিজের হাতে গাছটা রুয়েছিল গো!"

পরদিন গদাই যখন মাঠে যাইতেছিল, তখন রায় মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর বাবার গাছটাকে কাটলে কে রে গদা?"

গদাই রোষকষায়িত দৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের দিকে চাহিল। রায় মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোর মা বেরিয়ে গাছটা রাখতে পারলে না?"

গদাই দাঁতে দাঁতে করিয়া বলিল, "আপনি বামুন, না চামার?"

"তবে রে হারামজাদা" বলিয়া মহাশয় গদায়ের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। গদাই আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং এক হাতে রায় মহাশয়ের গলাটা, অপর হাতে তাঁহার পা দুইটা ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া পাশের জমিতে ফেলিয়া দিল। আশে পাশে অনেক কৃষাণ কাজ করিতেছিল ; তাহাদের কেহ বা হাসিয়া উঠিল, কেহ কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া রায় মহাশয়কে তুলিয়া ঘোলাজলে তাঁহার গায়ের কাদা ধুইয়া দিতে লাগিল। গদাই দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "অপরাধ নিও না রায় মোশাই, রাগের মাথায় গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছি। চাঁড়ালের রাগ কি না!"

গদাই চলিয়া গেল। রায় মহাশয় সম্মুখবর্ত্তী কৃষাণদের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দূর বেটারা নেমকহারামের দল।"

ইহার দুই তিন মাস পরে রাইপুরের ডাকাতি মোকদ্দমার সংস্রবে যে দিন পুলিশ আসিয়া গদাই মাঝির হাতে হাতকড়ি লাগাইল, সে দিন গ্রামের অনেকেই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। গদায়ের কুঁড়ের ভিতর খানাতল্লাসী ত হইলই, শিবু হালদারের বাড়ীও ফাঁক গেল না। বাক্স পেঁটরা ভাঙ্গিয়া, চাল-ডাল ছড়াইয়া যখন মহা উৎসাহে খানাতল্লাসী চলিতেছিল, গৃহিণী তখন রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া যুক্তকরে আকুল হৃদয়ে ডাকিতেছিলেন, "হে বাবা হরি, হে মা কালি, গদাকে রক্ষা কর ঠাকুর!"

ঠাকুরের মনে কি ছিল ঠাকুরই জানেন ; গদাই রক্ষা পাইল না ; খানাতল্লাসী শেষ করিয়া পুলিস তাহাকে চালান দিল। যাইবার সময় গদাই ক্রন্দনপরায়ণা ভগীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় মা রইল ভগী, জগা রইল, তাদের দেখিস্।"

যথাসময়ে দায়রার বিচারে গদাই অন্যান্য ডাকাতদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য কারাগারে গমন করিল। দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গদাই যখন জেলে যায়, তখন জনৈক উকীল দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকটা বিনা দোষে জেলে গেল। আমার হাতে যদি কেসটা পড়ত?"

গদাই তাঁহার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিয়াছিল, "না হুজুর, ভগবান্ বিনি দোষে কাউকে সাজা দেন না। আমার পাপ আছে, আমি বামুনের গায়ে হাত দিয়েছিলাম। ঘোর কলি, তবু এখনো দেবতা বামুন আছেন।"

গদাই আপনার শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেবতা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিল।

পাঁচ বৎসর—আজকালকার কালে সে কত দীর্ঘ সময়! এই দীর্ঘকাল পরে একদিন শীতের স্তব্ধ সন্ধ্যায় আপনার ছিন্ন-মলিন বাসে অঙ্গ ঢাকিয়া গদাই শীতে কাঁপিতে শিবু হালদারের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল ; চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বড় মা" বড় মা!" তাহার কাপড়ের এক খোঁটে বাঁধা নেবু ও নূতন গুড়ের সন্দেশ এবং বামহস্তে থোড়ের শুঁটাতে ঝোলান সের পাঁচেক এক রোহিত। তাহার মাথার চুলে জটা বাঁধিয়া গিয়াছে ; এবং কাঁচায় পাকায় দাড়ি আবক্ষলম্বিত।

গণশা বাগ্দী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"কে রে?"

"আমি গদাই।"

"এখানে কেন?"

"বড় মা কোথায়?"

"মারা গেছেন।"

গদাই সেইখানে বসিয়া পড়িল। গন্‌শা বলিল, "আ মর্, বসে পড়লি যে?"

গদাই কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল, "জগা—জগা?"

গণশা বলিল, "জগবাবু? তিনি বাইরে গেছেন, দু'টো পাশ করেছেন। আজ একমাস হ'ল তাঁর বিয়ে হয়েছে।"

গদাই উঠিয়া দাঁড়ালই ; উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয়েছে? কোথায় বিয়ে হ'ল?"

"রায় মশায়ের মেয়ের সঙ্গে!"

গদাই দুই হাত দিয়া মাথাটা চুলকাইতে লাগিল। একটু পরে বলিল, "ভগীর খবর—আমার বাদলার খবর? জানিস্?"

গণশা বলিল, "তোর বাদলা নেই।"

গদাই শূন্যদৃষ্টিতে গণেশের মুখের দিকে চাহিল। গণেশ বলিল, "দুই বছর আগে জগবাবুর ওপর মায়ের কৃপা হয়। ভগী বুক দিয়ে প'ড়ে বাবুকে চাঁচায়। তারপরই তোর বাদলার ওঠা-নামার ব্যারাম হ'ল। বাদলা বাঁচল না, মা ঠাকরোন তার সেবা করে ঐ রোগেই গেলেন। তোর ভগী মাগীও পাগল হ'য়ে কোথায় চলে গেল।"

গদাই দুই হাত দিয়া আপনার শীতবায়ুকম্পিত বুকটা চাপিয়া ধরিল।

এক নবোদগত শ্মশ্রূ যুবক দ্বারপ্রান্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে গণশা?" গণশা বলিল, "ও গদাই।"

গদাই সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে একবার যুবকের মুখের দিকে চাহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, "জগা জগা"—জগবাবু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মর বেটা, স্পর্দ্ধা দেখ। বেটা ছোটলোক, ডাকাত! দূর হ! বেরো বেটা! আমার কান মলে দিত!"

জগবাবু দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। বাম হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যে চিবুক ধারণ করিয়া সন্ধ্যার স্তব্ধ স্তম্ভিত অন্ধকারে গদাই নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক ফকির গাইতে গাইতে গেল—

মানী লোকের রাখবা মন
গরীব লোককে করবো দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।

গণেশ আর গোটাকতক চড়া কথা শুনাইয়া গদার মুখের উপর ঝনাৎ করিয়া সদর দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল এমন সময় সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমার মত এক তরুণী তুলসী-তলায় সন্ধ্যা দিতে আসিয়াছিল, "গদাই দাদা" বলিয়া গদায়ের হাত দুখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ;—গণেশ দেখিল, তাহার প্রভুপত্নী গোবিন্দ রায়ের কন্যা—সতী!

ঠিক সেই মুহূর্তে অদূরে সান্ধ্যা-গগনে তরঙ্গ তুলিয়া এক কৃষক গাইয়া যাইতেছিল,—

"দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল হরি পার কর আমারে"

পৌষ, ১৩২৩

পাগলের কাণ্ড

নারায়ণ ভট্টাচার্য

[১]

তারণ ভট্‌চাজ্যির ভাই সারদা ভট্‌চাজ্যি মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল. এম. এস. উপাধি লইয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন সাপ্তাহিক পাশার আড্ডাটা দৈনিক ভাবে জমিবে বলিয়া যজ্ঞেশ্বর দত্ত এক জোড়া নূতন ছক্ কিনিয়া আনিল। তারণ ভট্‌চাজ্যি কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি এবং ডেলী প্যাসেঞ্জারির মায়া ত্যাগ করিয়া দৈহিক পাশার আড্ডার দিকে আদৌ মনোযোগ দিল না।

বন্ধুবান্ধবেরা বলিল, "আর কেন ভট্‌চাজ, কষ্ট ক'রে ভাইকে মানুষ কর্‌লে, এখন দিনকতক ব'সে তার রোজগার খাও।"

তারণ হাসিয়া উত্তর করিল, "খাব বৈকি ভায়া, খাব বৈকি ; তবে যে কয়টা দিন চলে চলুক।"

লোকে তারণ ভট্‌চাজ্যিকে শুধু একটু মাথা-পাগলা বলিয়াই জানিত, এখন তাহাকে কৃপণ স্বভাব বলিয়াও জানিতে পারিল।

কেবল বাহিরের লোকে নয়, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীও সাতটায় ভাত তৈরী করিয়া দিতে অসমর্থ জানাইয়া তিরস্কারের ছলে স্বামীকে বলিল, "ভাল চিরকালটাই কি সাতটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজে গাড়ী ধত্তে ছুটবে? ঠাকুরপো যখন দু'পয়সা আন্‌বে, তখন তোমার আর এই ক'টা টাকার তরে ছুটাছুটি কেন?"

তারণ ইহাতে উত্তর দিল, "কি জান বড় বৌ, ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া আর কেরাণী ছুট্‌লেই ভাল থাকে।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি কর, আমি কিন্তু আর সাতটায় ভাত দিতে পার্‌বো না। কেন, আমার কি বেঁচে সুখ নাই।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করা যাক. এই টাকা দিয়ে একজন রাঁধুনি আর একটা ঝি রাখা যাক্। এতকাল রেঁধে খাওয়াচ্চ, দিনকতক রান্না ভাত খাও।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বড় বৌ বলিল, "ইস্, আমার উপর আর এত দরদ দেখাতে হবে না। তার অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে নিজের জামা কাপড়গুলো পাল্‌টাও দেখি।"

তারণ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এইবার পাল্‌টাব বড়বৌ, এইবার পাল্‌টাব। দিনকতক যাক্, তারপর সক্কলকে দেখাব, বাবুয়ানি কি রকমে কত্তে হয়।"

বড় বৌ হাসি চাপিয়া বলিল, "কে বাবুয়ানি কর্‌বে, তুমি? বাবুয়ানির কপাল!"

তারণ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখবে—দেখবে।"

পঁচিশ টাকা মাহিনার রেলভাড়া পাঁচ টাকা বাদে বাকী কুড়ি টাকায় সংসার চালাইয়া তারণ যে কিরূপে ছোট ভাই সারদার পড়ার খরচ যোগাইত, তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সাধারণের বিবেচনায় এই অসাধ্য কাজটাকে সুসাধ্য করিয়া আনিতে তারণকে কতটা কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বড় বৌ ছাড়া আর কেহ জানিত না। কেন না স্বামীর আফিসের জামা কাপড়ে তালি দেওয়া তাহার নিত্যকার্য্য মধ্যে পরিগণিত

ছিল। বাড়ী হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত জুতাটা পায়ের পরিবর্ত্তে হাতে যাইত বলিয়া মধ্যে মধ্যে তারণের পায়ে যে কাঁটা ফুটিত, প্রতি রবিবারে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিতে হইত। আফিসে জলখাবারের পাঠ ছিল না ; সুতরাং সকাল সাতটার পর রাত্রি নয়টায় খাইতে বসিয়া তারণ যখন হাঁড়ীর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিত, এবং হাঁড়িতে অন্নের অভাব দেখিয়া বড়বৌয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আপনার ক্ষুধায় অল্পতা জানাইয়া পাতে কতক ভাত রাখিয়া উঠিয়া পড়িত, তখন বড় বৌ চোখের জল রাখিতে পারিত না। হায়, এ কষ্ট কবে ঘুচিবে? ভগবান্, মুখ তুলিয়া চাও।

মাহিনা পাঁচ টাকা বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সারদা এফ এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল। কলেজের বেতন এবং বই-এর খরচ এত বাড়িল যে, তাহার নিকট বর্দ্ধিত বেতনের পাঁচটা টাকা কিছুই নয়। তাহার কষ্ট দেখিয়া লোকে পরামর্শ দিল, কলেজের পরিবর্ত্তে সারদাকে একটা আফিসে ঢুকাইয়া দিলে খুব ভাল হয়। তারণ কিন্তু লোকের এই সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। লোকে বলিল, বামুনটা মাথা পাগলা।

এত কষ্টের মধ্যেও তারণ রবিবারে যখন যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডায় যোগ দিত, তখন তাহার 'ছ'তিন নয়' পোয়া বার'র জন্য উৎসাহপূর্ণ চীৎকার শুনিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না, এই লোকটাকে মাসের অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। তারণ প্রায়ই যজ্ঞেশ্বর দত্তকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "থাম না দত্তজা, আর তিনটে বছর। সেরো ছোঁড়া একবার পাশটা কত্তে পারলে রোজ সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছ'তিন নয় চালাব।"

সারদা আসিয়া দেশে বসিল, দত্তজা নূতন পাশার ছক আনাইল, তারণ কিন্তু রবিবার ব্যতীত আর কোন দিনই পাশার আড্ডায় যোগ দিল না। সে তালি দেওয়া জুতা, ছেঁড়া জামা,ময়লা কাপড়ের ভিতর দিয়া কেরাণী-জীবনের দৈন্য প্রকাশ করিতে করিতে সপ্তাহের অবশিষ্ট ছয়টা দিন নিয়মিতরূপে ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে লাগিল। মাহিনা তখন আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়াছিল, সারদা শ্বশুরের প্রদত্ত দুই হাজার টাকায় ডাক্তারখানা খুলিয়া বেশ দু'পয়সা ঘরে আনিতেছিল, এবং সে পয়সার শেষ আধলাটী পর্য্যন্ত দাদার হাতে তুলিয়া দিতেছিল। তথাপি কিন্তু তারণ ভট্‌চাজ্যির কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। কাজেই লোকে ভাবিল, লোকটা হাড় কৃপণ।

দাদার কার্য্যে সারদারও যে আপত্তি ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু তারণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিত "ওরে ভাই, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর কি বাবুয়ানি সাজে? চাকরী ছেড়ে যখন ডাক্তারবাবুর দাদা হ'য়ে ঘরে বস্‌বো, তখন দেখবি তারণ ভট্‌চাজ্যি, কি রকম বাবুগিরি কত্তে পারে।"

বড় বৌ বলিত, "দেখ, তুমি ও রকম চালে চল্‌লে, ঠাকুরপোর মাথা হেঁট হয়। হাজার হোক, ও হ'লো একজন বড় ডাক্তার।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমি যে তারণ ভট্‌চাজ্যি, তা সকলেই জানে।"

কনিষ্ঠের সম্মান রক্ষার জন্য বড়বৌয়ের নিতান্ত অনুরোধে সেই মাসকাবারে তারণ একখানা জামা এবং এক যোড়া জুতা কিনিয়া আনিল।

[২]

সে দিন খাইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরিয়া তারণ বাটীর বাহির হইতেই দেখিল, রসিক মোড়লের ছেলে গৌর ডাক্তারখানা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তারণ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে গৌর, কোথায় গিয়েছিলি?"

গৌর বলিল, "ডাক্তারবাবুর কাছে।"

"কার অসুখ।"

"বাবার।"

"কি অসুখ রে?"

"জ্বর, সর্দ্দি, বুকে বেদনা।"

একটু চিন্তিতভাবে তারণ বলিল, "তাইতো, সারু কি বল্‌লে?"

গৌর ম্লানমুখে বলিল, "বললেন, এখন ফুরসৎ নাই।"

"আচ্ছা, তুই দাঁড়া" বলিয়া তারণ দ্রুতপদে ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল এবং সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁরে সারু, রসিক মোড়লের অসুখ, একবার দেখতে যেতে পারবি না?"

সারদা গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখে হবে কি? ভিজিট তো দিতেই পার্‌বে না ; তার উপর ওষুধের দাম দেবারও ক্ষমতা নাই।"

তারণ বলিল, "ক্ষমতা নাই ব'লে লোকটা বেঘোরে মারা যাবে রে?"

সারদা বলিল, "তা আমি কি কর্‌বো। ওষুধ তো আমার ঘরের নয়।"

তারণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হোক্, তুই দেখে আয়, ওষুধ দে। আহা, গরীব লোক!"

সারদা বিরক্তির সহিত বলিল, "অমন গরীব দেশে লক্ষ লক্ষ আছে। তা হ'লে তো ব্যবসা কত্তে হয় না।"

বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া তারণ বলিল, "ব্যবসা কত্তে হবে ব'লে গরীবে এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না? না না, তুই ওষুধ দে, রসিক এরপর খেটে দাম শোধ দেবে। তুই জানিস্ না সারু, পাঠশালে ক্ষিদে হ'লে রসিকের মায়ের কাছে যেতাম, বুড়ী কোঁচড় পুরে মুড়ী দিত। সে কি চমৎকার মুড়ী। তেমন মুড়ী আজকাল আর দেখতেই পাই না।"

মুড়ীর চমৎকারিত্ব স্মরণেই হউক বা বুড়ীর দয়ার কথা মনে করিয়াই হউক, তারণের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হওয়ায় আর বলা হইল না। "যাঃ, আটটার গাড়ী বুঝি ধত্তে পারলাম না।" বলিয়াই তারণ ঊর্দ্ধশ্বাস ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর অফিস হইতে ফিরিবার পথে রসিক মোড়লের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তারণ ডাকিল, "রসিক কোথায় হে, কেমন আছ?"

বলিতে বলিতে তারণ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ঘরের দাবায় উঠিল। রসিক ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে স্ত্রীকে আসন আনিতে বলিল, তারণ বলিল, "আসন থাক্, পায়ে এক হাঁটু কাদা। কেমন আছ? সারু এসেছিল? ওষুধ দিয়েছে?"

রসিক কষ্টে বিছানার উপর বসিয়া বলিল, "দু'কুর বেলা এসেছিলেন। ওষুধ আন্‌তে ব'লে গেছেন, কিন্তু দামের—"

বাধা দিয়া তারণ একটু জোর-গলায় বলিল, "দামের জন্যে কি আটকাচ্চে? পাগল আর কি! ওষুধটা আনালেই তো হ'তো।"

রসিক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারণ পকেট হইতে চারিটা টাকা বাহির করিয়া তাহার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দাম নিয়ে ওষুধটা আনতে পাঠিয়ে দাও। গৌর কোথায় গেল? দেরী ক'রো না। হাতে ছিল না, আফিসে দরোয়ানের কাছ হ'তে ধার করে নিয়ে এলাম।"

রসিক হাঁ করিয়া দাদাঠাকুরের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর সজল-কণ্ঠে বলিল, "আমার তরে টাকা ধার ক'রে আন্‌লে দাদাঠাকুর?"

তারণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাতে আর হ'য়েচে কি? একেই বলে পাগল। এ টাকা তো আমারই বাক্সে যাবে। শুধু হাত-ফেরতা বৈ তো না।"

কথা শেষ করিয়াই তারণ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ঘরে আসিয়া তারণ বড়বৌকে চুপি চুপি বলিল, "সেরোটার একটুও চক্ষুলজ্জা নাই বড় বৌ, রসিক মোড়লের ব্যারাম, তা ব'লে, দাম না দি'লে ওষুধ দিতে পারবো না!"

বড় বৌ বলিল, "ঠিক কথাই তো ব'লেছে। তোমার মত চক্ষুলজ্জা রাখতে হ'লে ব্যবসা চলে না।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "দেখছি, তুমি শুদ্ধ ব্যবসাদার হ'য়ে উঠেছ। ওগো, ব্যবসা কত্তে হ'লেই দয়া-ধর্ম্মগুলো পুড়িয়ে খেতে হয় না।"

ঈষৎ রাগত ভাবে বড় বৌ বলিল, "না, দানছত্র বসাতে হয়।"

তারণ বলিল, "এই দেখ এক পাগল! আমি কি দানছত্র বসাতেই বলছি। তবে গরীব দুঃখী যাদের উপায় নাই, তাদের এক আধ ফোঁটা ওষুধ দিলে তেমন ক্ষতি হয় না। আর ওষুধই বা কত, এক শিশি ওষুধে দু-দশ ফোঁটা ওষুধ, বাকী জল।"

বড় বৌ বলিল, "কিন্তু সে দু'দশ ফোঁটা ওষুধেরই দাম কত জান?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তারণ বলিল, "জানি গো জানি, দু'দশ হাজার টাকা। বেশ, এক এক শিশি ওষুধ বেচে তোমরা কোঠা বালাখানা কর।"

বড় বৌও হাসিয়া বলিল, "আর তুমি চক্ষু-লজ্জা নিয়ে চিরকাল তালি-দেওয়া জুতো আর ছেঁড়া কাপড় জামা নিয়ে বেড়াও।"

তারণ হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল ; হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেই ভাল, আমি পাগল মানুষ, শেষে কোন্ দিন তোমাদের কোটা বালাখানা ভেঙ্গেচুরে দেবো?"

[৩]

মাস দুই পরে তারণ যখন পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া ঘরে ফিরিল, তখন বড় বৌ সে সংবাদে কিছুমাত্র আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া বরং একটু বিষণ্ণ ভাবেই বলিল, "তা হলে দেখছি, যদিও দু'মাস ছ'মাস পরে চাকরী ছাড়তে, এখন আর তাও ছাড়বে না।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "এই দেখ, মাইনে বেড়েচে, কোথায় হরির লুট দেবে, তা নয় আক্ষেপ কর্ত্তে বস্‌লে। ভাল, আমার চাকরী বেচারীর উপর তোমাদের এত রাগ কেন বল দেখি?"

বড় বৌ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "রাগ হয় সাধে! বার মাস তিরিশ দিন শীত নাই, বর্ষা বাদল নাই, সকালে সাতটায় একমুঠো খেয়ে ছুট্ ছুট্। আচ্ছা, তোমার ব্যাজারও হয় না?"

ঘাড় নাড়িয়া তারণ বলিল, "ব্যাজার হোলে, দরজায় ডাক্তার এস, সি, ভট্‌চার্য্য এল্, এম্, এস্ সাইনবোর্ডটা উঠতো কি রকমে বল তো?"

বড় বৌ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "সে কথা একশোবার স্বীকার করি। কিন্তু এখন ঠাকুর পো শত্রুর মুছে ছাই দিয়ে যখন দশ টাকা ঘরে আন্‌চে তখন আর তোমার এ ছুটাছুটি কেন? বয়সও তো চল্লিশ পার হ'য়েচে, এখন পূজো আহ্নিক তপ জপ—"

বাধা দিয়া মৃদু মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সহাস্যে তারণ বলিল, "সে সব ঠিক করে রেখেছি বড় বৌ, আর একটা বছর যেতে দাও। তার পর দেখবে, তারণ ভট্‌চাজ্যি সকালে উঠে যে পূজোয় বসবে, এগারটার আগে আর উঠচে না। তার পর আহার, একটা কি দেড়টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। দেড়টার পর থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্য্যন্ত দত্তজার বৈঠকখানায়—"

একটা অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া বড় বৌ প্রস্থানোদ্যত হইল। তারণ ব্যস্তভাবে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও কি, চ'লে যাও যে, শোন শোন।"

বড় বৌ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার এই গাঁজাখুরি গল্প শুনলে তো চলবে না। আমার কাজ আছে।"

তারণ বলিল, "কাজ তো বার মাস তিরিশ দিনই আছে। ভাল, একদিন না হয় দু'দণ্ড বসলে।"

ঈষৎ হাসিয়া বড় বৌ বলিল, "বারমাস তিরিশ দিনের মধ্যে খাওয়াটা যদি দু' একদিন

বন্ধ দেবার হতো, তা হ'লে না হয় দু'দণ্ড বস্‌তাম। কিন্তু তা যে হবার যো নাই। ঐ জিনিসটি রোজ চাই।"

সহাস্যে তারণ বলিল, "রোজ কেন, দিনে দু'বেলা। আর আজ বিশ বছর তো সেই দু'বেলা হেঁসেল ঠেলে আসচো। ভাল, দশটা দিন না হয় জিরেন নাও না।"

বড় বৌ বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলিল, "কও কথা, আমি জিরেন নেব? কর্‌বে কে?

তারণ বলিল, "কেন, ছোট বৌমা তো আছেন। দিনকতক রান্নার ভার তাঁর হাতেই দাও না।"

বড় বৌ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "অবাক্ করলে তুমি। ছোট বৌ রাঁধবে? সে এক ঘটি জল গড়িয়ে খেতে পারে না, আর রেঁধে তোমাদের ভাত দেবে!"

হঠাৎ তারণের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লে, তিনি এক ঘটি জল গড়িয়ে খেতে পারেন না? কেন, তাঁর কি কোন অসুখ আছে?"

বড় বৌ আরও একটু জোরে হাসিয়া বলিল, "এইতেই লোকে তোমাকে পাগল বলে। অসুখ থাকতে যাবে কেন, বালাই! তবে পারে না, এই আর কি।"

উগ্রস্বরে তারণ বলিল, "কেন পারে না, তাই আমি শুনতে চাই। তুমি মেয়েমানুষ, তিনিও মেয়েমানুষ। তুমি যা পার, তিনি তা পারেন না কেন?"

স্বামীর ক্রোধের আবির্ভাব দেখিয়া বড় বৌ একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বার বার পশ্চাতে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল, "সব্বাই কি সব পারে। বিশেষ ছেলেমানুষ।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তারণ বলিল, "কিসের ছেলেমানুষ? আঠার উনিশ বছরের মেয়ে, ছেলেমানুষ? তুমি তেরো বছরে এসে আমাকে আফিসের ভাত দিয়েছিলে, তা জান?"

বড় বৌ কি বলিতে গেল ; কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়াই তারণ চীৎকার করিয়া বলিল, "সেটি হচ্চে না বড় বৌ, এই আমি বলে দিচ্চি, আমার সংসারে সক্কলকে সমান খাট্‌তে হবে। তুমি কেরাণীর স্ত্রী, আর তাঁর স্বামী বড় ডাক্তার, এ তফাৎটুকু যেন আর না দেখতে পাই।"

রাগে পান না লইয়াই তারণ বাহির হইয়া গেল। বড় বৌ শঙ্কিতচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই সারদা উঠান হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে বৌঠান, দাদা এত চীৎকার কচ্ছিলেন কেন?"

ব্যস্তভাবে বড় বৌ বলিল, "ওর কথা ছেড়ে দাও, কখন কি মেজাজে থাকে, তা তো বলা যায় না। একটুতেও আগুন, আবার একটুতেই জল।"

সারদা জুতার আগাটা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "কি বলছিলেন না, কেরাণীর স্ত্রী—ডাক্তারের স্ত্রী?"

বড় বৌ হাসিয়া বলিল, "কে জানে কত কথাই বকে গেল, আমার কি সব কথায় কান দেবার সময় আছে? যাই, উনুনটা ধরিয়ে দিই।"

বলিয়া বড় বৌ তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় ঢুকিয়া পড়িল। সারদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

[৪]

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই বড় বৌ দেখিল, রন্ধনশালা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। সে কতকটা শঙ্কিত এবং কতকটা বিস্মিত ভাবে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজায় গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। দেখিল, ছোট বৌ উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছে। দেখিয়া সে কতকক্ষণ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তার পর ছোট বৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ও মা, তুই এরি মধ্যে উঠে রান্না চাপিয়েছিস্ ছোট বৌ?"

ছোট বৌ শিল পাতিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া মশলা পিষিতেছিল ; সে মুখ না ফিরাইয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "কাজেই ; এতটা বেলা হয়ে গেল—"

বাধা দিয়া বড় বৌ বলিল, "হ'লেই বা বেলা। আজ রবিবার, আপিসের ভাতের তো তাড়া নাই।"

ছোট বৌ মৃদু অথচ পরুষকণ্ঠে বলিল, "আপিসের তাড়া নাই ব'লে কি কাউকে খেতে হবে না?"

বড় বৌ দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে বলিল, "তাই বুঝি তুই তাড়াতাড়ি রাঁধতে গিয়েছিস্? আচ্ছা, আজ তুই রেঁধে খাওয়া দেখি, কেমন রাঁধুনি।

বলিয়া বড় বৌ হাসিয়া উঠিল। ছোট বৌ কিন্তু হাসিল না ; সে স্বরটা একটু চড়াইয়া বলিল, "এর আবার দেখাদেখি কি? যে যেমন পারবে রাঁধবে। দুজনের ঘর যখন, তখন পারি না পারি, আমাকে কত্তেই হবে।"

বড় বৌয়ের মুখের হাসি সহসা নিবিয়া গেল ; সে ম্লানদৃষ্টিতে ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ তো, মেয়েমানুষের এই তো কাজ। আর আমার গতরই কি চিরদিন বইবে? তবে আগে সব দেখে শুনে নে, নয় তো সদ্যসদ্য পাকা রাঁধুনী হতে গেলে পারবি কেন?"

বড় বৌ চেষ্টা করিয়া আর একটু হাসিল। ছোট বৌ যেন ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমি অত পাকা কাঁচা জানি না। উনি বল্লেন, শঙ্করপুরে ডাক আছে, এক মুঠো খেয়ে যাবেন। এ দিকে তোমারও ঘুম ভাঙ্গেনি, কাজেই—"

বড় বৌয়ের মুখখানা যেন কালি হইয়া, গেল। ক্ষুব্ধস্বরে বলল, "ঠাকুরপো সে কথা কই আমাকে কিছু বলেনি তো?"

ছোট বৌ উত্তর না দিয়া দ্রুতহস্তে মশলা পিষিতে আরম্ভ করিল। বড় বৌ একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে মুখ হাত ধুইতে গেল। মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া সে স্নানে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ শেষ করিতে লাগিল। ছোট বৌ রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিলেও কিরূপে যে তাহার উপসংহার করিবে, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না ; সুতরাং সে খুব ব্যস্ত ভাবেই কাজ শেষ করিয়া স্নানে চলিল। তাহার বুকের যে একটা রুদ্ধ অভিমান ফুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, এই ব্যস্ততার মধ্যে সেটাকে যেন সে সম্পূর্ণ চাপা দিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া বড় বৌ বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, উপসংহারটা বাস্তবিকই খুব করুণরসাত্মক হইয়াছে। ভাতের হাঁড়ির ফেনসমেত ভাতগুলা কতক ছোট বৌয়ের পায়ের উপর পড়িয়াছে, কতক উনানের ভিতর গিয়াছে, কতক উনানের আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাঁড়িটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আর ছোট বৌয়ের চীৎকারে পাড়ার যত মেয়ে উঠানে আসিয়া জড় হইয়াছে। বড় বৌ তাড়াতাড়ি কলসীটা নামাইয়া ভিজা কাপড়েই ছুটিয়া গেল এবং জ্বালা নিবারণের জন্য প্রতিবেশিনীদিগের কথিত বিভিন্ন প্রকার ঔষধের মধ্যে কোন্‌টা দিবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

তাহাকে বেশী ভাবিত হইল না ; সংবাদ পাইয়া সারদা অবিলম্বে আসিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিল, জ্বালা কতকটা কমিল। তখন প্রতিবেশিনীরা এই কচি মেয়েটাকে গুরুতর রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য আক্ষেপ প্রকাশের সহিত ইঙ্গিতে বড় বৌয়ের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। বড় বৌ বলিতে গেল, "ওগো, ও আবাগী নিজে ইচ্ছা করেই রাঁধতে এসেছে।" কিন্তু হিতৈষিণীদিগের সহানুভূতির স্রোতে তাহার প্রতিবাদ কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহারা প্রস্থানকালে সারদাকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিয়া গেল, যদি ভাগের কাজই করিতে হয় তবে সারদার উচিত একটা রাঁধুনী রাখা। তাহার অর্থের অভাব কি? আর রাঁধিতে গিয়া স্ত্রী যদি পুড়িয়া মরিল, তবে তাহার অর্থেই বা কি হইবে?

তারণ স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ছোট বৌমাকে রাঁধতে বলেছিলে?"

বড় বৌ বলিল, "আমি কোন কথাই বলি নাই।"

"তবে উনি রাঁধতে গেলেন কেন?"

"তা কেমন করে জানবো। তবে ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার কালকার কথাগুলো শুনেছিল, সেই বোধ হয় ব'লে থাক্‌বে। তোমার তো রাগলে জ্ঞান থাকে না।"

"কিন্তু আমি কি.মন্দ কথা বলেছিলাম বড় বৌ?"

বড় বৌ বলিল, "লোকে অনেক সময় ভাল কথাতেও আঁচে মন্দ ধ'রে নেয়।"

তারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আয় যথেষ্ট বাড়িলেও বাজার-হাটের ব্যবস্থা ঠিক পূর্ব্বের হিসাবেই চলিতেছিল। সেটা সারদা বা ছোট বৌ উভয়েরই মনোনীত না হইলেও আগে এ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না, কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠিতে লাগিল। স্নানের ঘাটে, বোসেদের বাড়ীতে, দাসেদের খিড়কী ঘাটে ইহা লইয়া যে সকল জল্পনা চলিত, তাহার অনেক কথাই বড় বৌয়ের কানে আসিত, এবং তারণ ভটচাজ্যি যে ভায়ের উপায়ের টাকাগুলো হস্তগত করিয়া তাহা আপনার স্ত্রীর পরিণামের উপায়ের জন্য রাখিয়া দিতেছে, আর ভাই ভাদ্রবধূকে আধপেটা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতেছে, এমন সব কথাও শোনা যাইত। বড় বৌ আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া ভাবিত, ঘরের হাঁড়ির খবর কিরূপে বাহিরে যায়।

কিন্তু ছোট বৌ যখন ইদানীং প্রায় তরকারীর জন্য আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, এবং সারদাও এক এক দিন তরকারীগুলাকে ছাই-পাঁশ নামে অভিহিত করিয়া অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া যাইত, তখন ঘরের খবর কোথা হইতে বাহিরে যায়, তাহা বুঝিতে বড় বৌয়ের বিলম্ব হইল না। বুঝিলেও সে স্বামীকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিল না ; শুধু বাজার-হাট সম্বন্ধে একটু মুক্তহস্ততা দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তারণ কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। শেষে একদিন বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, "গরীব গেরস্ত ঘরে এর চেয়ে ভাল খায় না। যার ভাল খেতে ইচ্ছা হবে, সে নিজের পয়সা ভেঙ্গে খাবে। আমার এর বেশী যোগাবার শক্তি নাই।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "তুমি, যদি লোকের রোজগারের সব পয়সা হাত কর, তবে সে নিজের পয়সায় খায় কি ক'রে?"

উগ্রস্বরে তারণ বলিল, "কি ক'রে, তার আমি কি জানি? আমি কারো কাছে ভিক্ষা নিতে যাই? না খেয়ে না দেয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তার পয়সা আমি একশো বার নেব।"

[৫]

যজ্ঞেশ্বর দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে ভট্‌চাজ, চাকরী ছাড়চো কবে?"

তারণ বলিল, "আর দু'টো মাস দত্তজা।"

দত্তজা বলিল, "তোমার এ দু'টো মাস বোধ হয় বার মাসের ভিতর নাই?"

তারণ নীরবে মৃদু হাসিল। দত্তজা বলিল, "তোমার কৃপণ স্বভাবটা একটু ছাড় ভট্‌চাজ।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "স্বভাব যায় মলে।"

দত্তজা বলিল, "কিন্তু গাঁয়ে তোমার নিন্দায় যে কান পাতা যায় না।"

তারণ বলিল, "সেটা নিন্দুকদেরই দোষ।"

দত্তজা গম্ভীরভাবে বলিল, "দোষ কি তোমারও নাই? যে ভাই এত টাকা রোজগার কচ্চে, সেই ভাইকে ভাইয়ের স্ত্রীকে খেতে দেবে না, এটা কি ভাল কাজ হোচ্ছে?"

তারণ বিস্মিত ভাবে দত্তজার মুখের দিকে চাহিল। দত্তজা বলিল, "তা ছাড়া ছোট বৌটাকে খাটিয়ে মেরে ফেল্‌চো।"

তারণ বলিল, "মেয়েমানুষ খাটবে না তো ব'সে থাকবে?"

দত্তজা বলিল, "যার স্বামী মাসে দু'শো টাকা রোজগার করে, সে খাটতে যাবে কেন?"

এ কথার উত্তর তারণ দিতে পারিল না। দত্তজা বলিল, "সাবধান ভট্টচাজ, কাল বড় খারাপ। ঘর না ভাঙ্গে।"

বিস্ময়ের সহিত তারণ বলিল, "ঘর ভাঙ্গবে?"

দত্তজা বলিল, "শুনছি ত সেই রকম। ভাই হ'লেও তোমার পেট ভরাবার জন্য তো সে লেখাপড়া শেখেনি, আর রোজগারও কচ্চে না।"

তারণ শুনিয়া এমনই জোরে হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে দত্তজা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

তারণ এটাকে খুব মজার সংবাদ মনে করিয়া বড় বৌকে শুনাইবার জন্য উৎসুক ভাবে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ীর ভিতর পা দিবামাত্র তাহার এই কৌতুকজনক সংবাদটা যেন একটা ভীষণ দুঃসংবাদে পরিণত হইল। বাড়ী ঢুকিতেই শুনিতে পাইল, ছোট বৌ গলা ফুকারিয়া বলিতেছে, "কেন বল তো আমি তোমার কথা শুনবো? আমার সোয়ামীর রোজগারের পয়সা খাচ্চ, আমাকে বল্‌তে লজ্জা করে না। আমি মনে করলে তোমার মত দশটা মাগীকে দাসী-বাঁদী করে রাখতে পারি, তা জান। আসুক আজ হাঁড়ী আলাদা না করলে যদি আমি জলগ্রহণ করি, তবে আমি বামুনের মেয়েই নই।"

হায়, যে হতভাগিনী আজ বিশ বৎসর দাসীর অধম হইয়া এই সংসারে খাটিয়া আসিতেছে, নিজে না খাইয়া সকলকে খাওয়াইয়াছে, তাহার কৃতকর্ম্মের এই পুরস্কার! ক্রোধে ক্ষোভে তারণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করিতে লাগিল। সে অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই কর ছোট বৌমা, তুমি যদি পৃথক্ না হয়ে জলগ্রহণ কর, তবে তোমার বাপের মুখে—।"

বড় বৌ ছুটিয়া সম্মুখে আসিল ; তিরস্কারের স্বরে বলিল, "মেয়েতে মেয়েতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তুমি তার মাঝে কথা কইতে এলে কেন? ছি ছি, কি কর্‌লে?"

গম্ভীর স্বরে তারণ বলিল, "স্ত্রীর উপর স্বামীর যেটুকু কর্ত্তব্য, তার বেশী একটুও করি নাই।"

সারদা বাড়ী আসিলে ছোট বৌ তাহাকে সকল জানাইল। শুনিয়া সারদা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একেই সে ভ্রাতার স্বার্থপরতায় যার পর নাই বিরক্ত হইয়াছিল, তাহার উপর স্ত্রীর প্রতি এই অভদ্র ব্যবহারে সে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না ; তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোকের নিকট ভ্রাতার আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করিল এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে অথবা ভায়ের সঙ্গে পৃথক্ হইবে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়স্কর, তাহার পরামর্শ চাহিল। পাঁচজনে পৃথক্ হইবার পরামর্শই দিল।

[৬]

পরদিন পাঁচজন মধ্যস্থ আসিয়া ভাগ-বাঁটরা করিয়া দিল। ভাগ করিবারও বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু বাড়ীখানা, আর তৈজসপত্র। ডাক্তারখানা সারদার শ্বশুরের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত, সুতরাং তাহার ভাগ হইল না।

এ দিকের ভাগ শেষ হইলে ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী তারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এবার নগদ টাকার বিভাগ। নগদ কত আছে।"

তারণ হিসাব করিয়া বলিল, "তিন টাকা সাড়ে তের আনা।"

সকলেই বিস্ময়ে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী সারদার মুখের দিকে চাহিলেন। দাদার স্বার্থপর ব্যবহারে সারদা রাগিয়া উঠিয়াছিল ; চক্রবর্ত্তীর ইঙ্গিতে সে বলিল, "তা হলে এই চার বছরের হিসাবটা ওঁকে দেখাতে বলুন।"

ক্রুদ্ধভাবে তারণ বলিল, "নিজে রোজগার করেছি, নিজে খরচ করেছি, তার হিসাব নিকাশ আমি দিতে পারবো না।"

এই উত্তরে সারদা আরও রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। দত্তজা তখন মাঝে পড়িয়া তারণকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হিসাবটা তোমার দেওয়া দরকার ভট্‌চাজ। শুধু তোমার নিজের রোজগার হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু সারদার রোজগারও তো আছে।"

সপ্রতিভভাবে তারণ বলিল, "সারদার রোজগার! তার আবার হিসাব নিকাশ কি? ও কত টাকা আমাকে দিয়েছে?"

সারদা নোটবুক বাহির করিয়া চারি বৎসরে কোন্ মাসে কত দিয়াছে, তাহা পড়িয়া সকলকে শুনাইল। মোট হিসাব করিয়া হইল, চারি হাজার সাত শত তেত্রিশ টাকা। দত্তজা তারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি বল তুমি?"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া তারণ উঠিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা আনিয়া সারদার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই দেখে নে, ব্যাঙ্ক তোর নামে ঠিক ঐ টাকাটা জমা আছে কি না?"

চক্রবর্ত্তী খাতা দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক তাই আছে বটে। তা হ'লে ধর, এই টাকাটার অর্দ্ধেক—"

বাধা দিয়া তারণ উগ্রস্বরে বলিল, "ও টাকার আবার ভাগ কি? আমি সেরোর দাদা, আমি ওর রোজগারের টাকার ভাগ নিতে যাব?"

সকলেই হাঁ করিয়া তারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারদা মাথা নীচু করিল। মধ্যস্থগণের বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তারণ দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, এবং বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে বড় বৌ, তোমরা সক্কলে আমায় চাকরী ছাড়তে বলেছিলে ; কিন্তু ভাগ্যে তোমাদের কথায় চাকরী ছাড়ি নাই? কেমন নাকের উপর টাকাগুলো ফেলে দিয়ে এলাম!"

বিস্ময়ের সহিত বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা?"

জোরে মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "কত কি, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। আবার মজার কথা শোন, আমায় এই টাকার ভাগ নিতে বলে। আমি তারণ ভট্‌চাজ্যি, সেরোর দাদা, আমি তার টাকার ভাগ নিতে যাব? গলায় দড়ি! আমাকেই আবার তোমরা বল পাগল। আচ্ছা সব পাগল যা হোক্।"

বলিয়া তারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বড় বৌ শ্রদ্ধাপূর্ণ সজল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরের লোকে কিন্তু বলিতে লাগিল, "পাগলের কাণ্ডই আলাদা। তারণ ভট্‌চাজ্যি আস্ত পাগল।"

তারণ ভট্‌চাজ্যি কিন্তু এ কথায় একটুও দুঃখ বা ক্রোধ অনুভব করিল না। তবে সময়ে সময়ে সে বড় বৌয়ের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিত, "তাই তো বড় বৌ, দত্তজা মিছে পাশার ছকটা কিন্‌লে। আর আমারও এ জন্মে জপ আহ্নিকটা আর করা হ'লো না!"

জৈষ্ঠ, ১৩২৬

মৃণালের কথা

বিপিনচন্দ্র পাল

ভগিনীর পত্র

মেজ দাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম তুমি ভাবিও না। আমি তারে বেশীই চিনি, তোমার চাইতে বোধ হয় বেশীই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফিরে আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ ক'রো না, তার বিদ্যা কত, আমরা তো জানি। দেখ্ছো না কি, যে সব বইএর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমি ভাব্ছি সে অমন চিঠিটা তোমায় পাঠালে কেন? তা না করে', কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার লেখার তারিফ বেরোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে লোকে তাকে জান্ত। আমার দুঃখু হয়, আমরা দুই ভাই-বোন আর উনি ছাড়া অমন একটা বড় লেখা বাংলার সমজদার পাঠকের কেউ পড়্লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিট্া সত্যি সত্যি মেজ'বউর লেখা কি না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে তো তুমি বেশ জান। শুন্ছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠ্ছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবিদের মতন বাব্রী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তার নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাক্সে আছে, বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সে'ই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিয়েছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক রবি ঠাকুরের মতন। তুমি জান কি? মেজ' বউই আমায় লিখেছিল যে "সঞ্জীবনীতে" স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছে। আমাদেরো পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখ্তে পারে না।

দেখ্ছো না, মেজ'বউএর চিঠিও এই ছাঁচেই ঢালা। আমরাও তো তোমাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা তো কৈ জুটাতে পারি না! আর অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা! উনি বল্লেন আগা গোড়া যেন ইংরেজির তর্জ্জমা। মৃণাল কবিতাই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও যায় নি। সে অমন ইংরেজি ঝাঁঝের বাংলা লিখ্তে শিখ্লে কেমন করে, উনি কিছুতেই ঠাওর কর্ত্তে পাল্লেন না। আমি মুখ্খু মানুষ, কি আর ব'ল্ব?

তুমি বল্'বে, ইংরেজি হো'ক, বাংলা হো'ক, লেখাটা তো মৃণালের ; ভাষাটা যারই হো'ক না কেন, মনের ভাবটা তো তার নিজের! আমি বলি, তাও নয়। ভাষা, ভাব, সব ধার করা, নাটুকে জিনিষ। দেখ্ছ না, ও কোথায়, কোন্ নাটকে, কি কোন্ গানে, মীরাবাই'-এর কথা পড়েছে, আর অম্নি ভাব্ছে যে, সে মীরাবাই হয়েছে। উনি বল্লেন, ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংস্করণ হবে, তখন মেজ'বউ-এর কোনও কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরাবাই-এর কথার পরে, তার কথাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। তামাসা কচ্ছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবে, ওঁর ঐ যা ভয়।

উনি বল্লেন, এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিষ্টিরিয়া। ওঁদের ডাক্তারী কেতাবে না কি

লেখে হিষ্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন কি, অমন যে রক্তমাংসের মানুষের পীঠটা, তাও নাকি একেবারে কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বইএতে নাকি এ ধরনের একটা মেয়ের কথা আছে ; তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, তার পীঠটা কাচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পীঠে চাপড় মারাতে, "পীঠ গুঁড়ো হয়ে গেল" বলে চীৎকার করে সে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিস্টিরিয়াতে এতটা নাকি হয়। মেজ'বউএর এও এক রকমের হিস্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়েছে যে, সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়ীটা একটা জঘন্য জেলখানা, তোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা তো নেহাৎ ছোট নয়,—আমার শ্বাশুড়ী তোমার বে'র সময় গিয়ে ঐ উঠান দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন,—পাড়াগাঁয়েও অমন দৌড়দার উঠান কম, কলকাতার তো কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ'বউএর চোখে কত ছোট ঠেক্‌ছে! আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় বড়, উত্তর দক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন অমন সাজান না হলেও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজে গুলো আয়নার মতন চক্ চক্ ক'চ্ছে। আর বড় বৌএর যে শুচি বাই, রাতদিনই তো কেবল জল ঢাল্‌ছেন, আর দুটো ঝির পেছনে পেছনে ঘুরে ঘষাচ্ছেন ও মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুফু ঘরদোর সকলের বাড়ীতে দেখা যায় না। কিন্তু অমন ঘরেও মেজ'বউএর মন উঠে না। কিন্তু মেজ'বউএর কোনও দোষ নাই। মেজ'বউ তো আর চোখ দিয়ে কোনও জিনিষ দেখে না। তার খেয়ালে যখন যেটা যেমন ঠেকে সেটাকে তেম্নি দেখে। উনি বলেছিলেন যে, সব কবি আর ঋষিদেরও নাকি ঐ রকম স্বভাব।

একদিনের কথা তোমায় বলি ; এ কথাটা নিয়ে আমরা কত দিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজার সময় তোমাদের ওখানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধ হয় মেজ'বউএর বে' হয়েছে। আমি মেজ'বউএর ঘরেই শুতাম। একদিন, ঘোর আঁধার রাত, আকাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। অনেক রাত অবধি আমি বড়'বউএর কাছে বসে গল্পগাছা কচ্ছিলাম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশে বসে ঐ অন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বল্লাম "রাত অনেক হয়েছে, মেজ'বউ শু'তে এসো।" মেজ'বউ আমায় বল্লে কি জান?—"ঠাকুর ঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে যেন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে, আকাশে যেন রূপালী রং মাখিয়ে তাল নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি, কি সুন্দর!"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্লাম "বলিস্ কি মেজ'বউ? এ যে ঘোর আঁধার রাত। কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায়? তোর অত রসের ঢেউ আজ উঠ্‌ল কিসে?"

মেজ'বউ একেবারে চটে উঠে বল্লে, "ঠাকুর ঝি, তোমার আক্কেল কেমন? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছো? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ?"

আলোটা একটু উস্কিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম মেজ'বউএর চোখের ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল। তবে কি শেষে পাগল হ'লো! হঠাৎ তার বিছানায় দিকে চেয়ে দেখি, মেজ'বউ এক নতুন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও-লো সজনি,
চাহলো নয়ান মেলি।
আম্র কানন, মর্ম্ম মন্থন
নর্ম্ম পরাণ কেলি।
শুভ্র উজল, অভ্র কাজল
উছল ভুবন ভরি।
মঞ্জীর মুকুরে, শিঞ্জিত নূপুরে
রঞ্জল কিবা মরি!

তখন আমার ঐ ডাক্তরী বইএর কথা মনে পড়্‌লো। ভাব্‌লাম এ খেয়ালটা তার যেমন আছে থা'ক। জোর করে ভাঙাতে গেলে হয় তো উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বল্লাম—

"তাই তো মেজ'বউ, আমার কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যই তো বড় সুন্দর চাঁদনি রাত। তবে জানই তো, উনি কালীপূজার সময় আমায় নিয়ে যেতে আস্‌বেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্যা তাই মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছনা রাতও চোখে আঁধার ঠেক্‌ছিল।"

মেজ'বউএর মুখখানি অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—

"ঠাকুর-ঝি, তুমি তবে প্রেম তা' কি জান? আমি ভাবতাম তুমি কেবল রান্নাবান্নাই কর, আর স্বামিপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে এ দাসীত্বেই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছো। বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁচার পাখী, তারা কি বনের পাখীর সুর কখনও ভাঁজতে পারে? কেবল বাঁধাবুলিই তো কপ্‌চায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে। হায়! বনের পাখী হলাম না কেন?"

আমি কি আর বলব? তামাসা করে বল্লাম—

"তোর চকা তো এখন আকাশে উড়ছে ; বাসায় ফিরে এলে বলিস্‌, তোরে উড়িয়ে নিয়ে বনে যাবে।"

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়্‌ল। এও তার খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছে? ও জিনিষ পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথাও রেখে গেছে কি না? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ, ঐ কৃষ্ণপক্ষের জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দির সম্বন্ধেও অবশ্য দু-দশটা কবিতা পাবে।

তুমি তো তাকে জান। পনর বছর তাকে নিয়ে ঘর কর্‌ছ। সে যে তোমায় ছেড়ে বেশি দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ নিয়ে থাক্‌তে পারবে তা ভেব'না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না। ছেলেবেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড় আর বড় যা তাকেই ছোট করে ভেবেছে। তোমার বাড়ী থেকে তোমার শ্বশুরবাড়ী কত দূর তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা দু-দশ দিনের পথ নয়। সেকেন-ক্লাস গাড়ীতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী অত কাছাকাছি এটা ভাব্‌তে মেজ'বউএর ভাল লাগ্‌ত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজা সুজি বাপের বাড়ী যাতায়াত করে নি। শিয়ালদ'এ রেলে চেপে দমদমা গিয়ে নেমেছে ; সেখান হ'তে ছ্যাকড়া গাড়ীতে টালায় গিয়েছে। একবার—তোমার মনে আছে কি?—সেবারে বর্ষাকালে আমি তোমাদের দেখ্‌তে যাই। মে'জ বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়ীতে বাপের বাড়ী যাবে না। শিয়ালদ'এ রেলে চেপেও যাবে না। বলে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ী যায়, সব কেতাবে লেখে। গাড়ীতে বরষার অভিসার কোন, কালে কেউ লেখে নাই। যদি যাই, তো নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব। চড়ায় নৌকা লাগিয়ে ভাত রেঁধে খাব। মাঝিগুলো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দাঁড় টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। কোট করে বস্‌ল। কি কর, তুমিও তা'তেই রাজী হলে। শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যা বেলা নৌকায় উঠলে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না কল্লে, পরের দিন প্রাতে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পাল্‌কী করে তাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গেলে! এ সকল জেনে শুনেও তুমি অমন অস্থির হয়েছ কেন?

আমাকে পুরী যেতে বল্‌ছ, আমি এক্ষণি যেতাম। কটক থেকে পুরী তেমন দূরেও নয় ; কিন্তু গেলে উল্টা ফল হবে। আমি আমার ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি, সে মেজ'বউকে চোখে চোখে রাখ্‌বে আর প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা খাতা করে দিয়েছেন। বল্লেন, "তুই সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্‌বি আর এই খাতায় ডায়রী রাখ্‌বি। আর রাত্রে ডায়রীটার নকল পাঠাবি।

মেজদাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাক্‌তে মেজ'বউএর কোনও বিপদ ঘট্‌বে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঠাকুর পো'র পত্র

[১]

বউ দিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই ; খবর দিবার কিছু ছিল না। তোমার মেজ'বউ যে বাড়ীতে ছিলেন, আমি এসে দেখ'লাম সেখানে নাই। সে এক পাণ্ডার বাড়ী। কোথায় যে উঠে গেছেন, তাও সে কথা বল্‌তে পারলে না।

তোমার যে খুড়িমার সঙ্গে তোমার মেজ'বউ পুরী এসেছিলেন, এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমার মেজ'বউকে যাবার জন্য শুন্‌লাম অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন নি। ওদিকে তাঁর পৌত্রটীর বড় অসুখ, খবর পেয়ে বেচারী আর থাক্‌তে পাল্লেন না। তোমার মেজবউ তাঁর ভাইকে নিয়ে সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বল্লেন যখন জগন্নাথ এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমার খুড়িমা চলে গেলে, পরের দিনই তোমার মেজ'বউ সে পাণ্ডার বাড়ী থেকে কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে বল্লে, স্বর্গদ্বারে নাকি একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ'বউকে যদি আমি জান্‌তাম বা তার ভাইএর নামটাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা কিছুতেই কঠিন হ'ত না। কিন্তু আমি তো তাঁকেও দেখিনি, তাঁর ভাইএর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ কর্‌তে পারতাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হত, তোমরা আমাকে যে গোয়েন্দাগিরি কত্তে পাঠিয়েছ তাহা হ'ত না। কাজেই সেটা করি নাই। ঘটনাক্রমে কোনও সন্ধান কর্‌তে পারি কি না, তাই দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার আশীর্ব্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই এটী ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটী পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। কল্‌কাতায় যখন আমি Y, M, C, A. এর বোর্ডিংএ ছিলাম, তখন আমরা দুজনে একই ঘরে থাক্‌তাম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে এখানে দেখ্‌তে পেলাম। বল্লে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে আছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার ঘরে ঢুকে দেখি একটা বিলাতী ট্রাঙ্কের উপরে তোমার দাদার নাম লেখা। বুঝ্‌লাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজছিলাম, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে আমায় কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা হল, সে'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি এরা কেউ জানে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে তোমরা যে প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ, 'তা কি দরকার? যে দিন কিছু বিশেষ বলবার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ্‌ব। আর পুরীতে যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের ডায়েরী কিরূপ হবে, তা তুমিই জান। প্রাতে চা' পান। তারপর সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন। নয়টার সময় নুনিয়ার আগমন। সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও নুনিয়ার হাত ধরিয়া ঢেউ খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভান করা। ১১টায় আহার। ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চা পান বা জলখাবার। ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তারপর শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়রীও ঠিক এই। এটা আমি তাঁর ভাইএর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। সুতরাং প্রতিদিন এইরূপেই কাট্‌ছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে পুরাতন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে,

লিখিও, হুকুম তামিল কর্‌ব। এখন ধর্ম্মাবতারকে সেলাম করিয়া এ অধীনের তবে শয্যাশায়ী হইতে আজ্ঞা হয়।

[২]

বউ দিদি,

আজ একটা নূতন খবর আছে। শুনে তুমি খুসী হবে। তোমাদের খরচ বাঁচ্‌ল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। শরৎ (তোমার মেজ'বউএর ভাইএর নাম শরৎ) ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে পীড়াপীড়ি কচ্ছিল। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্ব্বদা এই কথা বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা কর্‌তে চাই নি। যা হউক কাল রাত্রে, তোমার মেজবউও বড় ধরে বস্‌লেন। তিনি আমাকে নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বল্‌তে আরম্ভ করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না। তোমাদের কাজের অনুরোধেও এ আতিথ্যগ্রহণ করাই ভাল মনে কল্লাম। তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহারা দিচ্ছি। গোয়েন্দাগিরিটা জম্‌ছে ভাল।

আচ্ছা, বউ দিদি, তোমরা তোমাদের মেজ'বউএর উপরে অমন নারাজ কেন? আমার তো তাঁকে বেশ ভালই লাগে। ভাল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে ঢল ঢল, নিজেকে সাজাবার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা যেন আপনি জোর করে এসে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা অতি মিষ্টি। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক এক বার কেমন উদাস পারা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন,—দেখে আমার সেই কীর্ত্তনের পদ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়!

তোমাদের কত ভাগ্যি, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই লিখ্‌ছেন আর পড়ছেন। আর তাঁর পড়বার ধরণটা বড় সুন্দর। সর্ব্বদাই পেন্‌সিল ও খাতা নিয়ে পড়তে বসেন; আর যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম্‌, "কি করে সুবিধা হয়, দিদি?" বল্লেন্‌ "জান কি, বড় বড় কবিরা যেন এক এক জন ভারি রাজমিস্ত্রি। আর এই যে সুন্দর কথাগুলি এগুলি তাদের পঙ্খিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলো চুনে চুনে, "মোর," "হায়," "সখী," "সখা," "বঁধু" প্রভৃতি মিষ্টি কথার বুক্‌নী দিয়া সাজা'লেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।"

আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি, তোমার মেজ'বউয়ের কল্যাণে হয় তো তোমার এই ঠাকুরপোও ক্রমে একটা কবি হয়ে উঠ্‌বে। বাঙ্গলা মাসিকে ছাপাবার মতন ভারি ভারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে ভাগ্যি জিনিষটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে নাইক কোন ছন্দ, আমার কপাল নহে নেহাৎ মন্দ; কর কি এখনও তুমি সন্ধ; তবে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব; করিলাম এখানেই চিঠি বন্ধ।

[৩]

বউ দিদি!

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি। তুমি যদি মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম। তোমার কল্যাণে এই গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে এসে কি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। তোমার ফরমায়েস খাট্‌তে হয় না, ছেলেদের পড়া বল্‌তে হয়

না, আপিসে কলম পিসতে হয় না, ঘরে গিন্নির মুখ ঝামটা খেতে হয় না ; দিনে শুতে পাই, ঝিমুতে হয় না ; রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয় না ; আর দিন রাত কবিতা শুন্‌তে পাই, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বকাবকি কর্‌তে হয় না। আমার মনে হয়, স্বর্গে যারা যায়, তারা বুঝি এই ভাবেই দিন কাটায়। বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া যত সবই কেবল কায়া নয়, প্রাণী হয়ে উঠে, চারিদিকে ছুটোছুটি কচ্ছে। বিজ্ঞান পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধ্‌রে যাচ্ছে। চোখ কাণ গুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ কর্‌তে শিখ্‌ছি। এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমার গুরু হয়েছেন। সত্যি বল্‌ছি বউ দিদি, মানুষের মনটা যে কত বড় জিনিষ, এতদিন বুঝি নি। এই মনই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা। তোমার মেজ'বউএর মন ঠিক তাই।

সে দিন আমরা নরেন্দ্রসরোবরের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটী অতি সুন্দর মন্দির হয়েছে। তোমরা দেখ নি। মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে। একটা আমগাছে এই অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে। তোমার মেজ'বউ আমায় গাছটা দেখিয়ে বল্লে, "দেখেছ নরেন, ঐ গাবগাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে।"

আমি বল্লাম—"গাবগাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ!"

দিদি বল্লেন—"আমগাছ, কখনই নয় ; তুমিও এত বড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছো? আমাদের বাড়ীর দেয়ালের আড়ালে এরই মতন একটা গাবগাছ আছে, তার এই যৌবনের সাজ দেখে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আর তাকেই কি না তুমি বল্‌তে চাও, আমগাছ?"

আমি তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বল্লাম, "একটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আমগাছ তা বুঝতে পার্‌বেন।"

তোমার মেজ'বউ আরো গরম হয়ে উঠে বল্লেন—"কাছে গেলেই কি সত্য দেখা যায়? অন্ধেরা তো হাতিটাকে গিয়ে হাতড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সত্যিই দেখ্‌তে পেয়েছিল কি? দেখে চোখ নয়—মন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আর দূরে কি? তুমি কি দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌লে, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না। ওটা যদি আমগাছ হবে তবে তার ডালে ডালে কোকিল কৈ? ডগায় ডগায় ভৃঙ্গ কৈ? আকাশে আকাশে কুহু কুহু কৈ? ঘরে ঘরে উহু উহু কৈ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌ছ, লালপাতা যে গাবগাছেও হয়।"

বেগতিক দেখে বল্লাম "তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা হবে।"

"গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়ই। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?"

আমি বল্লাম—"কখনওই হতে পারে না। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগৎকে দেখেন। তিনিও তো কবি।"

এতগুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে তোমার মেজ'বউ যখন যা বল্‌বে, তা'তেই হুঁ দিয়ে যাব।

[৪]

বউ দিদি,

আমার ছুটি তো ফুরিয়ে আস্‌ছে, আর কত দিন তোমার মেজ'বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না হয় পাঠিয়ে দাও, গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবিতার ঢেউ উঠ্‌ছে, তাতে তোমার মেজবউকে কোথায় নিয়ে যাবে, বলা যায় না। আর আমাকে পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পাঠিয়ে তোমার ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও তো সম্ভব নয়। তবে একবার নাকি আমি আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার ফন্দিটা শিখেছিলাম, ঐ যা তোমাদের ভরসা।

সত্যি বল্‌ছি আমার ভাব্‌না হয়েছে। তোমার মেজ'বউকে এই একমাসকাল দিনরাত দেখে দেখে, এতটাই চিনেছি বলে মনে হয় যে, বাহিরে তাঁর যতই কবিতা গজা'ক না কেন, ভিতরটা ঠিক্ আছে। সে ভাবনা আমার হয় না! তবে জান কি, ভিতর শুদ্ধ থাক্‌লেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়তে পারে না, তা নয়। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশী হচ্ছে। অথচ কেমন করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য তোমাকে লিখ্‌ছি। নহিলে তোমাকেও লিখ্‌তাম না ;—এ সব কথা কাউকেই বলা ভাল নয়। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আরো বেশী বিপদ হয়েছে এই জন্য যে, শরৎ হঠাৎ কল্‌কাতায় চলে গেছে। বাড়ীতে তোমার মেজ'বউ, একটী বুড়ী চাকরাণী আর আমি, আমরা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তার জন্যও আমি ভাব্‌তাম না। কিন্তু শরৎটা নাকি নেহাৎ গাধা, যাবার সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত ছোক্‌রা নয়, বয়স তোমার মেজদাদারই মতন। বল্‌ছে তো যে বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছে, কিন্তু ইংরেজি শুনে কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের নাম হামেষাই মুখে লেগে আছে।

ইনি তোমার মেজ'বউকে, ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংরেজ কবি আছেন, তাঁর কবিতার তর্জ্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতি দিন বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন, আর এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিয়ে বসে বসে ঝিমোয়। আমি মুখ্‌খু লোক,—কেরাণীগিরি করে খাই, তার উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়ি নি। কাজেই এই সাহিত্যিকবরের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার মেজ'বউএর একটা বড় বাহাদুরী দেখতে পেলাম। আমি যে তাঁর সোদর ভাই নই, তিনি ঘুণাক্ষরেও একথাটা এ ব্যক্তিকে জান্‌তে বা বুঝ্‌তে দেন নি। একদিন ও জিজ্ঞেস কচ্ছিল—"শরৎবাবু, আর নরেনবাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?" তোমার মেজ'বউ বল্লেন—"নরেনই বড় বটে, তবে পিঠোপিঠি বলে শরৎ ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন একে দাদা বলে ডাকে নি।" কথাটা শুনে অবধি তোমার মেজ'বউএর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন। কবিতাই লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ আছে।

[৫]

তুমি বউ দিদি,

ও লোকটার পরিচয় জানতে চেয়েছ। এ সব লোকের পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজকাল বড় সাহিত্যিক যে কি করে গজিয়ে উঠে, ভগবান্‌ও তার ঠিক কর্‌তে পারেন কি না সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে ঝুর ঝুর করে পড়ে, এদের জন্মকর্ম্মটাও তেন্নি দিব্য ব্যাপার বলে মনে হয়। এঁকে আমরা কেবল মিষ্টার মৈত্র বলেই জানি। শরৎকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে কে, করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পার্‌লে না! বল্লে—"ও সব খবর সংসারের লোকেই রাখে। সাহিত্যজগৎ মনোজগৎ, ভাবরাজ্য ; এখানে জন্মকর্ম্মের পরিচয় কেউ নেয় না, রসসৃষ্টির শক্তির প্রমাণ পরিচয়ই যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের লেখাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এর উপরে তো আর কোনও কথা চলে না। কাজেই ইঁহার কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই, পাবার আশাও রাখি না।

তবে নামগোত্রের পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতার পরিচয় প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি। কাল বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে যেতে পারি নাই। মিষ্টার মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ'বউএর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা

কচ্ছিলেন। ইনি ব্রাউনীংএর একটা বাংলা অনুবাদ কচ্ছেন, তোমার মেজ'বউকে তাই পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন। ভুলক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন, তার খানিকটা তোমায় পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দর মোর!
ও বয়ানে তব, এ নয়ান মম
পিয়ে পিয়ে হলো ভোর।
ওগো সুন্দর মোর!
চোরের মতন কতই চাতুরী,
গুপ্ত প্রেমের কিবা এ লহরী,
নাচত আঁখিতে উঠত শিহরী
সুখের নাহিক ওর!
ওগো সুন্দর মোর!
ঘরের ভিতরে বসে যারা ঐ,
ভাবিছে কাতরে গেল ওরা কৈ,
কৌতুকে কপোল করে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।
ওগো সুন্দর মোর!
আমরা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এই, কিবা নিশি দিনে,
বাঁধা আছি, নতু আঁধোয়া তু বিনে,
কে ভাঙ্গে মোদের জোড়?
ওগো সুন্দর মোর!
তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা,
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পূরবী সাহানা,
কাটিছে রজনী ঘোর,
ওগো সুন্দর মোর!
এ সুখ তেয়াগি, কোন্ সুখ লাগি,
কোন্ মন্ত্র পড়ি, কি সিন্দুর দাগি'
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা, থোড়!
ওগো সুন্দর মোর!
আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার,
ভৈরব ঐ নৃত্য বরিষার,
মর্ম্ম বিদারি এ ঘরের ধার,
চর্ম্মে ঝুরিছে ঝোর!
ওগো সুন্দর মোর!
ছাড়িয়া এ সব বিভব ছন্দে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবের ধন্দে,
কোন্ রূপে রসে, গরাশে গন্ধে
আনিবে আনন্দে তোর?

ওগো সুন্দর মোর!
থাক্ তারা নিজ জগৎ লইয়া
রান্ধিয়া বাড়িয়া, খাইয়া, শুইয়া,
জীবনে মরিয়া মরমে মারিয়া
কেবলি ঘাঁটিয়া হোড়!
ওগো সুন্দর মোর!
জান নাকি তুমি উহাদের রীতি,
যশমান দিয়া কষয়ে পিরিতি
ঝগড়া-ঝাটি হয় নিতি নিতি
ভাঙ্গাতে ভামিনী ভোর
ওগো সুন্দর মোর!
নাহি সুতা হাতে, হলো কিবা তায়
ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায়?
দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর।
ওগো সুন্দর মোর!

দাদাকে বলো, এর মূলটা ব্রাউনীংএর In a Balconyতে কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে। আর সব চাইতে এর বাহাদুরী এই যে তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি বারবার এসে আমায় বলছেন "দেখ নরেন, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর—

লেখার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ অমন লিখ্‌তে পারে না। তুমি তো ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি?" এর উত্তর আমি কি আর দিব। আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টার মৈত্রটাকে আমার এই জিমন্যাষ্টিকপটু মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই দেখিয়ে দি। সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্‌গির সরে না পড়ে, তবে কোন্ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদারী বেধে যাবে জানি না।

[৬]

বউ দিদি!

যা ভয় কচ্ছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জুতিয়ে ঐ লোকটার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধ হয় সে আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না। আজকের এই জুতাপেটাটা কেউ জানে না, কেবল আমার হাত জানে, আর জুতা জানে, আর ওর পীঠ জানে, আর কেউ জানে না ; তোমার মেজ'বউও ভাল করে জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ফের যদি পুরীর সমুদ্রের ধারে দেখ্‌তে পাই, তবে সবার সাম্‌নে জুতাপেটা করে ছাড়্‌ব। সে পায়ে ধরে দিব্যি করে গেছে, আজ রাত্রেই পুরী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস তাই করবে।

কেন হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তার আলোচনা কর্‌তে ইচ্ছা হয় না ; ভয় হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও তোমার মেজ'বউএর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে না বল্লে নয়। তোমার মেজ'বউ-এর প্রাণে যে আঘাত লেগেছে, তার

ফল কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না। এই আঁধার রাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনরাত আমায় এখন তাঁকে খাড়া পাহারা দিতে হ'বে দেখ্ছি।

ঘটনাটা তোমায় লিখ্তেই হচ্ছে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষমানুষ, স্ত্রী-চরিত্র যে কিছুই বুঝি না, বউদিদি! তাই ভয় হয় দাদাও তোমার মেজ'বউ সম্বন্ধে সুবিচার কর্তে পারবেন না। যদি পার, তবে তাঁকেও দেখিও না, তোমার মেজদাদার তো কথাই নাই। এই পত্রখানা পড়িয়াই পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমার একটু সামান্য জ্বর হয়েছিল ; তাই আজ সন্ধ্যার সময় আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই নি। মিষ্টার মৈত্র অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তোমার মেজ'বউ তাঁর সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে গেলেন যে বেশী দূরে যাবেন না, বাড়ীর সাম্নেই বেড়াবেন। তখন সবে রোদ পড়েছে। আমি দরজায় বসে দুজনায় বেড়াচ্ছেন দেখ্তে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। কাজেই আমি আর স্থির থাক্তে পারলাম না। তোমার মেজ'বউএর খোঁজে বেরুলাম। সমুদ্রতীরে গিয়া দেখ্লাম তিনি সেখানে নাই। ভারি মুস্কিলে পড়্লাম। কোন্দিকে গেলেন ঠাওর করতে পার্লাম না। কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বল্লেন—"আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন, আপনার ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছেন দেখলাম।" শুনে কি জানি কেন আমার বুকটা ধড়াশ করে উঠল। চক্রতীর্থ তো দোরের কাছে নয়। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশের পথ। আর সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐ দিকেই বালি ভেঙ্গে ছুট্লাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়্তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট্ হাউস ছাড়িয়ে দেখ্লাম, আর কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখলাম, ঐ লোকটা তোমার মেজ'বউকে অপমান কর্বার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এক লাফে তার উপরে পড়ে তোমার মেজ'বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলায় চাদর কষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ কর্লাম। যখন ও একেবারে মাটিতে পড়ে গোঁগাতে লাগ্ল তখন ছাড়্লাম। তোমার মেজ'বউ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখ্ছিলেন। আমি কাছে যাবা মাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তোমার মেজ'বউ একটু সুস্থ হলে, তাঁকে নিয়ে বাড়ী এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, তাঁর দশা যে কি হয়েছে বল্তে পারি না। এই আধ ঘণ্টা কালের মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে, মনে হয় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারার অমন পরিবর্ত্তন হয়, ইহা জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ী আসিয়া তোমার মেজ'বউ ঘরে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন। আমি কি কর্ব, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। যে ঝিটী আছে, তাকে কোন কথা বল্তেও পারি না, নিজে যাইয়াও তাঁর সেবাশুশ্রূষা কর্তে পাচ্ছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই তুমি এখানে আসবার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

[৭]

বউ দিদি,'

ভগবান্ বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তা'কে কালকার ব্যাপারের কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাবছে তার দিদির অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথার খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি ঠাকুর কি করেন। দাদাকে তোমার মেজ'বউএর অসুখের কথাটা বলে রেখো। বাড়াবাড়ি হলে আস্তেই হ'বে। তারে খবর দিব।

[৮]

বউ দিদি,

ঠাকুরের প্রসাদে আজ সাতদিন পরে তোমার মেজ'বউএর জ্বর ছেড়েছে। চেহারাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, সে রং নাই, সে কোনও কিছুই নাই। চোখের ভিতরে কি যেন একটা কাতরতা জেগে উঠেছে। আজ বিকাল বেলা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"শরৎ কোথায়?" আমি বল্লাম—"কিছু আঙ্গুর আর ডালিমের জন্য বাজারে গেছে ; আর কলকাতা থেকে কিছু ফল আস্‌বার কথা, তাও এসেছে কিনা, দেখ্‌তে ষ্টেসনে যাবে।" তখন আমাকে কাছে ডেকে, বিছানায় বসিয়ে, আমার হাতখানা ধরে বল্লেন—"নরেন, তুমি আমার সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাক্‌লে সেদিন আমার কি হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শরৎকে দেখ্‌তাম, সেই চক্ষে তোমায় দেখেছি। তাই শরৎ যখন কলকাতায় যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার জন্য যা কর্‌তে পার্‌ত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পারব না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে নিজকে একটু সামলে নিয়ে বল্লেন—"শরৎ সব শুনেছে?"

আমি বল্লাম "না। কিছুই শুনে নি। ওকি বলবার কথা? শরৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।"

"শরৎ তো আমায় 'আপনি' বলে না, তুমি বল কেন?"

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহের জন্য ঐ প্রাণটা যে কতই তৃষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণটাও কেমন করে উঠ্‌ল।

বল্লাম "আচ্ছা আমি এখন থেকে তুমিই বল্‌ব। আর তুমিও শরৎকে যেমন কখন 'তুমি' কখন 'তুই' বল, আমাকেও তেমনি বল্‌বে?"

"আমার অসুখ বাড়্‌লে তোমরা কি কর্‌তে বল তো?"

"কর্‌ব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতাম।"

"এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে?"

"এখানে নাই, কটকে আছে।"

"সেখানে থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে?"

"আনালেই আসে।"

"আমার তো অত টাকা নাই?"

"যে ডাক্তার আস্‌ত সে টাকার জন্য আস্‌ত না।"

"তবে কিসের জন্য?"

"তুমি আমার দিদি, তারই জন্য আস্‌ত।"

"সে ডাক্তার তোর কে হয় নরেন?"

"তিনি আমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন।"

"তোমার দাদা কটকের সিভিল সার্জ্জন! তোমার দাদার নাম কি?"

আমি দাদার নাম বল্লাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চম্‌কে উঠে বল্লে, "উনি তোর দাদা!" এই বলে চোখ দুটো আবার কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠ্‌ল। এবার আমার পালা ; বল্লাম—"আমার দাদাকে কি তবে তুমি চেন?"—একটু তামাসা করে বল্লাম—"তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল।" তোমার মেজ'বউ বড় বিষণ্ণ ভাবে বল্লে—"উনি আমার নন্দাই ছিলেন।"

"ছিলেন মানে কি, দিদি? দাদার তো দুটো বিয়ে হয় নি, আর আমার বউ দিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"তোর বউ-দিদিই আমার ননদ।"

"তবে তুমি আমার দাদার শালাজ, আর এতদিন এই কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলে!"

"তুই যে ওঁর ভাই, আমি জান্‌ব কি করে?"

"তা তো বটেই। যা হোক, এখন তো জানা শুনা হলো। আজই আমি বউদিদিকে আস্‌তে লিখ্‌ব। কটক থেকে পুরী দু'তিন ঘণ্টার পথ বই তো নয়।"

"না, না, তাকে লিখিস্ না। সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে না? তাঁর ভা'জ এখানে বেয়ারাম হয়ে পড়ে আছেন, আর উনি আস্‌বেন না, অসম্ভব কথা। আমার বউদিদি তেমন লোক নন। আর বউদিদিকে লিখ্‌ব, তাঁর দাদাকেও যেন তারে খবর দিয়ে আনিয়ে নেন।"

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পাল্লেন না। একেবারে আমার দু হাত ধরে বল্লে—"না ভাই নরেন, তোর পায়ে পড়ি। অমন কৰ্ম্ম করিস্ না। আমি রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাদের আর এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।"

"শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়শ্বাশুড়ীর সঙ্গে জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বল্লে?"

"কেউ বলে নি, আমি তো জানি।"

"তোমার মনের কথা তো আর কেউ জানে না। লোকে জানে তুমি জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে। এখন বাড়ী ফিরে যাবে। তাতে হলো কি?"

"উনি জানেন।"

"তা হলে এতদিন উনি তোমায় নিতে আসেন নি, তার জন্য মিষ্টার মৈত্রের যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তাঁরও সেই ব্যবস্থাই কর্‌ব।"

"নরেন, তুই আমায় ভালবাসিস্ বলে ওসব বল্‌ছিস। তুই জানিস্ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি।"

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম। "ত্যাগ করেছ কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না?"

"ডাইভোর্স কি রে?"

"মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজেরা তাকেই ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।"

"কিন্তু আমি তো করেছি তাই।"

"করেছ কি, খুলেই বল না, দেখি।"

"ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।"

"ঐ কথা! সব স্ত্রীই তো রাগ করে ওকথা বলে।"

"ঝগড়ায় মুখে ওকথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।"

"তবে কি করেছ?"

"আমি তাঁকে, শান্তভাবে ঠাণ্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।"

"আবার একটা বে কর্‌তে বল নি তো?"

"তা বল্‌তে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি কর্‌বেন। সে দায় আমার নয়।"

"ঐ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড়নি ; ছাড়্‌লে তাঁর বিয়ের কথায় অমন হয়ে ওঠ কেন?"

"না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।"

"তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?"

"তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা তো আমি রাখি নি।"

"তবে তিনি যদি না ছাড়েন?"

"তায় কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।"

"স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মাজিষ্টরের কাছে রেজিষ্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিষ্টরের কাছে গিয়ে রেজিষ্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ কর্‌তেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।"

"আমি যে তাঁকে ছাড়লাম বলে লিখেছি।"

"লিখেচ তাতে হলো কি? ছেলেটা বেশী বিরক্ত কর্‌লে, মা যে কতবার বলে মর, মর ; তাতে কি আবার সেই ছেলেকে বুকে টেনে রাখে না! আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাগের মাথায় মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হয় না।"

"আমি যে কি করেছি তুই জানিস্‌নে নরেন, নইলে অমন কথা ভাব্‌তে পার্‌তিস্‌ না।"

"কি করেছ? ঝগড়াঝাটি করনি ; মারধর করনি ; একখানা চিঠি লিখেছ বই তো নয়?"

"সে চিঠি দেখলেও কথা কইতিস্‌ না। চিঠিখানা দেখ্‌বি? ঐ বাক্সের ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।"

চিঠিখানা পড়ে বল্লাম, "এই ত, অমন চিঠি আমরাও কত পাই। তাতে হয়েছে কি?"

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউএর আর জ্বর আসে নি। এখানকার ডাক্তার বল্লেন, আর জ্বর হবে না। এখন ওঁকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

[৯]

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে মেয়েটা আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমার মেজ'বউএর এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ কলকাতা থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'বউকে চিঠি দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড় ট্র্যাজেডির (মাপ কর বউদিদি, ট্র্যাজেডির বাঙ্গ্‌লা আমি জানি না) সৃষ্টি হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝ্‌লাম। বিন্দু মরে নি। শরৎ বিন্দুর শ্বশুর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই গলিতেই আর একটা বাড়ীতে খোঁজ কর্‌তে গিয়ে জানে, সে বাড়ীর নতুন বউ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে। ঐ খবর নিয়ে এসেই তো যত গোল বাধিয়েছে। বিন্দু কেবল মরে নি তা' নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দেখ। রাগ করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে তুলেছিল, তা তোমার মেজ'বউএর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-দোষে নয়। তোমার মেজ'বউ নিজে এখন এটা বুঝেছেন, নইলে আমি ওকথা কইতাম না। বিন্দু সর্ব্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত মনে কর্‌ত। তোমার মেজ'বউই এভাবটা তার প্রাণে বেশী করে জাগিয়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত ও নিষ্পীড়িত ভাবে, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী। সব বিদ্রোহীর ভিতরকার কথাই এই। বিন্দুর কথাও তাই। তোমার মেজ'বউএর কথাও তাই। বিন্দু এখন এরোগমুক্ত হয়েছে ; তোমার মেজ'বউও ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্যর পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়
বিন্দুর পত্র

শ্রীশ্রীচরণেষু,

দিদি আমি মরি নাই। তোমরা যে খবর পেয়েছিলে সেটা মিছে কথা। আমি যে দিন আবার আমার শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসি, তার দুদিন পরে, আমাদের পাশের বাড়ীতে একটী বউ কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তারও নাম বিন্দু ছিল। ওরা আমাদেরই জ্ঞাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে বে হয়। এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি, আমি মরি নি। আর এমন সুখে আছি যে মর্‌বার কোন সাধ আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ। তখন রাত দুপোর হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে, দৌড়ে বাহিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটার চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, আর সে "বাবা গো, আমি মরবো না, আমি মরবো না"—বলে বিকট চীৎকার কচ্ছে। তার মুখের সে ছবি আমার প্রাণের ভিতরে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে। যখনই মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত বাতাস করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা তাড়াতে চেষ্টা করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম ; আর উনি, ছেলে ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঘুমাতে দেয়, তেমনি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে, আমার মাথায় বাতাস করে, পাহারা দেন। ভোর বেলা চোখ মেলে দেখি, এইভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কেঁদেছ, আমাকে মা'র পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছ। জন্মে আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই। আর তুমি অমন করে ভালবাস্‌তে বলেই আমার বিয়ে কর্‌তে এত অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বাড়ী যেতে একেবারেই মন চাইল না। তাই তোমার পায়ে ধরে কত কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম আমার বিয়ে দিও না, দাসী করে নিজের কাছে রাখ। আমার রূপ নাই জান্‌তাম। সবাই বল্‌ত অমন কাল মেয়ের কি আবার ভাল বে হয়? আমার বাপ মা নাই। টাকা কড়ি নাই। শুন্‌তাম একরাশ টাকা নইলে কোনও মেয়ের বে হয় না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাব্‌লাম যে এর ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে ; নইলে অমন কাল মেয়েকে, অমন মাবাপখেগো গরিব মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় কে? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছি। মনে মনে ভাব্‌লাম অমন কাল মেয়েকে যে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়, না জানি সে কত কুৎসিত। আমার মনের কথা কেউ জানে না, দিদি, কেবল এই আজ তোমায় বল্‌ছি। তোমায়ও এসব কথা কোনও দিন কইতাম না, যদি ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিখ্‌তেন। সুখ পেয়েছি বলেই আজ দুঃখের কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বল্‌ছিলুম? হাঁ, ঐ আমার বের রাতের কথা। মনে মনে আমার স্বামী অতিশয় কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টির সময় আমি জোর করে চোখ দুটাকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা আঁধার রাতে ঘরের বাহিরে গেলে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বুজে থাকতাম, তেমনি করে চোখ বুজে রইলাম। তার পর বাসর ঘরে গিয়ে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুন্‌তাম বাসর ঘরে কত লোক থাকে, কত রং তামাসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই হলো না। একজন বুড়ী আমার হাত ধরে নিয়ে বিছানায়

বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরে উনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। একবার আমার হাত খানা এসে ধরলেন, তার পরেই ছুড়ে ফেলে গর্‌গর্‌ কর্‌তে কর্‌তে উঠে গেলেন, আর সারা রাত ঐরূপ গর্‌গর্‌ করে করে পাইচারি করে কাটালেন। মাঝে একবার মনে হল যেন, অনেকগুলি কাচের বাসন ছাতে ছুড়ে ফেলে চুরমার করে ফেল্লেন। আমি বুঝ্‌লাম এ ব্যক্তি পাগল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ; আর ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে, উনুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেন্নুন সব জুতা শুদ্ধ পায় লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন। আমি দেখে শুনে ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম। তার পর কি হলো তুমি জান। তুমি আমার রাখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার ভাশুর যখন নিতে এলেন, তখন দেখ্‌লাম তোমাদের বিপদ হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম। এবারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। আমি চলে এসেছি শুনে উনিও বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তার পর যখন শুনলাম, আবার ফিরে এসেছেন, তখন আমার পিত্তি শুকিয়ে গেল। তাই আবার পালিয়ে আমার খুড়ভাত ভাইদের ওখানে যাই। ওরা যখন কিছুতেই স্থান দিলে না, তখন কাজেই আবার ফিরে আস্‌তে হলো। আমার গাড়ী যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখ্‌লাম একটী নতুন লোক আমাকে গাড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন। আমি ভাব্‌ছিলাম আমার শ্বাশুড়ী বা বাড়ীর ঝি-চাকরাণী বুঝি কেউ এসে দরজা খুল্‌ল ; তাই নিঃসঙ্কোচে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দিদি, দেখলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ। যেমন মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি বড় বড় টান্না চোখ, যেমন নাক তেমনি সব। পুরুষের অমন রূপ জন্মে দেখিনি। মিথ্যা বল্‌ব না, দিদি, দেখেই মনে হলো হা রে কপাল! অমন স্বামী যদি আমার হ'ত! আমি তাঁর পিছু পিছু অন্দর মহলে ঢুক্‌লাম। তখন ইনি ডেকে বল্লেন—"মা, তোমার বউ এসেছে, আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।" গলার স্বরে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। পা যেন আর চলে না। শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়্‌ল। মনে হলো যেন আমি ভেঙে পড়্‌ছি। তখন তিনি আমার হাত ধরে একেবারে দুতালায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্ন করে বিছানায় বসালেন। পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস কর্‌তে লাগলেন। তার পর বল্লেন—অমন মিষ্টিভাবে জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি, অভিমান করো না, তুমিও কইতে পারনি—"একবার এদিকে এস।" আমি যেন পুতুলবাজির পুতুল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে উঠে তাঁর সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল, আমায় সেখানে বসালেন। তার পর নিজে একঘড়া জল এনে আমায় পা ধু'তে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌লাম, কিন্তু বাধা দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে বল্লেন, নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তার পরে আবার ঘরে এসে, নতুন বাণারসী শাড়ী বের করে বল্লেন, "কাপড় ছাড়, তোমার ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার ফুলশয্যা।" এই বলে বারান্দায় গেলেন। আমি সেই শাড়ীখানি কোনও মতে পল্লাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের বশে নাই। আমার কাপড় ছাড়া হলে, এক বাক্স গহনা বের করে,—তোমার দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে বালা, বাজু, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্য্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ যে এই গহনা পরাতে লাগল্‌, বল্‌তে পারি না। এক এক খানি গহনা পরাচ্ছেন, আর অনিমেষে খানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে দেখ্‌ছেন। এক এক বার মনে হতে লাগ্‌ল বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি সত্যি পাগল। আবার মনে হতে লাগ্‌ল, দুনিয়ায় সব ভাল লোকের চাইতে আমার এ পাগলই ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই আমি মর্‌ব। সব গহনা পরান শেষ হলে আমার মুখখানি তুলে ধল্লেন,—আমার তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দিদি, পোড়া চোখ তা কল্লে না, চার চক্ষে মিলন হলো। এই

আমাদের শুভদৃষ্টি। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে, আমি যে কাল, আমি নাকি কুৎসিত, তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও বড় সুন্দর। নইলে ও চোখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি, ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবার বড় মদ গাঁজা থেকে আরম্ভ করেন, তারই জন্য মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উঠেছিলেন সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশ বার বছরের কথা। এখন তামাক পর্য্যন্ত ছোঁন না। তবে বড় বদ্‌রাগী লোক। রাগলে জ্ঞান থাকে না। আর, দিদি, যে রাগতে জানে না, সে তো পাথর, সে কি ভালবাসতে জানে? জান কি, আমায় বে কল্লেন কেন? স্নেহলতা মেয়েটা যখন আত্মহত্যা কল্লে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্বল নাই, তেমন বাপের মেয়ে না পেলে বে করবেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আমায় বের কল্লে। এ বিয়েতে তাঁর বাপমায়ের আপত্তি ছিল। তাঁরা প্রথমে টাকা খুঁজছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে কর্‌বেই না কোট করে বস্‌লো, তখন আর কিছু না হউক যার দুপয়সা আছে, বারমাসে তের পার্ব্বণে তত্ত্ব পাঠাতে পার্‌বে, এমন ঘরের মেয়ে বে করুন, তাঁরা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ হলেন। তাতেই বাপ বেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে থাকবেন না বলে কাশী চলে যান। আমার শ্বাশুড়ী বাড়ী ছেড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু আমি যে কুলীনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুল্‌তে পাল্লেন না। তারই জন্য আমাকে হাড়ীবাগ্দীর মেয়ের মতন পিতলের থালাতে ভাত দিয়েছিলেন। হয় তো ভেবেছিলেন, অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বাপ মা নাই, এরূপেই বুঝি আমি লালিতপালিত হয়েছি ; তারই জন্য উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাকে তো আর কিছু মুখে বল্‌তে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, আর কতকটা থালাবাসন ও হাঁড়ী-কুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চালিয়ে দিলেন। আর উনি যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমায় সেগুলি পরিয়ে দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলেন।

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি সত্যি রাখ্‌তে, আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমায় স্থান দিত, আর একমুঠা ভাত যেখানেই হউক আমার মিল্‌তই—তাতে আমার কি সর্ব্বনাশই হতো। অমন দেবতার মতন স্বামীকে পেতাম না। আর স্বামীকে পেয়েছি বলে, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী সবাইকে পেয়েছি। ভাশুর, জা, ভাশুর-পো, ভাশুর-ঝী, সকলে আমার কতই আপনার হয়ে গেছে। দিদি, আমি নিজেকে ওদের সেবায় নিযুক্ত করে, ওদের মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজের কোনও দুঃখ নাই। সুখ আমার উপ্‌চে পড়্‌ছে। দিদি, অনেক দিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার ছোট্ট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ বড় সাধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না কাঁদি। আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখ পেয়েছ, এবার আমার সুখ দেখে সুখী হও।

শুন্‌লাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছে। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর বাড়ী ছেড়ে থাক্‌বে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ, তা তো তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির ফিরে এস। তোমায় বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। লক্ষ্মী দিদি আমার, শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা
বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়
মেজ'বউএর পত্র

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা কি আর লিখ্‌ব, আমার জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা কর্‌তে পার্‌ত না। ভগবান্ তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ এখনও বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ছ। আমি কি করেছি তা জান্‌লে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখ্‌তে চাইতে না! অমন দেবতার মতন স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি। শাস্ত্রমতে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর্‌বে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায় ছাড়েন নি, আমিই ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ করতে আসি নি, ওটা একটা ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখ্‌ব না বলে এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হলে আজকাল তারা নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নিয়ে বাড়ী ছেড়ে আসি। মর্‌তে সাহস হয় নি বলে মরি নি। সতী স্ত্রী আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটাকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অস্পৃশ্যা। আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়
ঠাকুর-পোর পত্র

বউ দিদি,

আমি তো কিছুতেই তোমার মেজ'বউকে বাড়ী ফিরে যেতে রাজি করাতে পাল্লাম না। তোমাকেই আস্‌তে হবে। তোমার দাদা যদি আসেন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঠাকুর-ঝীর পত্র

মেজ'বউ,

তুমি যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও লিখেছি, তিনি রবিবারে এখানে আস্‌বেন। উনিও শালাজকে দেখ্‌তে যাবেন। তিন দিনের ছুটী নিয়েছেন। আমরা তিন জনে সোমবার প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

সপ্তম অধ্যায়
আবার স্ত্রীর পত্র

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

ঠাকুর-ঝীর পত্রে জান্‌লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আস্‌বে। তোমার পায়ে পড়ি,

এস না—আমিই যাচ্ছি—আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করে, এ হতভাগিনীকে আর নতুন করে অপরাধিনী করো না।

তুমি এস না বল্‌ছি ; কিন্তু তোমার কাছে কোনও কথা গোপন কর্‌ব না। তুমি আস্‌বে শুনে আমার প্রাণটা যে কি করে উঠ্‌ল, তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। তুমি আস্‌বে বলেই আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকি জীবন হয় তো এমনি করে এই তুঁষের আগুনে পুড়ে মর্‌তে হতো। তুমি আস্‌ছ শুনে বুঝ্‌লাম তুমি তোমার এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর নি। আজ ঈশ্বরের দয়াতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লোকে যতই পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না, তোমার এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝ্‌লাম।

আর, সত্যি বল্‌ছি, ঈশ্বর কে, তা তো আমি জানি না। এক জন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখদুঃখের কথা বলেছি, কিন্তু এত দিন পরে আমার সত্য ঠাকুরকে আমি পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই তো তোমায় এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। পনর বছর কাল তোমার ঘর কল্লাম, কিন্তু এক দিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞানের দিকে তাকাই নাই ; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই ; কেবল পাবার জন্যই ছটফট্ করেছি, কোনও দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝ্‌লাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয় ; ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই ছোট হয়ে যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে উঠে। আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে তোমাকেও ধর্‌তে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখ্‌তে পাল্লাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধূলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি। আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের এত বড় পরিবারের মধ্যে এসে পড়্‌লাম। কিন্তু তোমাদের বিশালত্বের ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে হারাতে পাল্লাম না। লোকে বল্‌ত আমার রূপের কথা, অমন রূপ বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—আমি তারই গর্ব্বে ফেঁপে উঠ্‌লাম। মা বাবা বল্‌তেন আমার বুদ্ধির কথা, আমি সেই অহঙ্কারেই ঘট হয়ে বস্‌লাম। তুমি শিখালে আমায় লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান্ ভেবে একেবারে টঙ্গে চড়িলাম। অন্য লোকে হলে কত ঝগড়াঝাটি হতো। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বল নি। যখন বড় অন্যায় করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে তোমায় কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তাই দিয়েছ। কোনও দিন কিছুতে 'না' করনি। 'না' কথাটা বিধাতা তোমায় শিখান নি। বাড়ীর যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন কারও ইচ্ছার প্রতিরোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরুষত্ব নাই। ভেবে দেখি নি যে, এই দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিও তো অমনি ভাবেই চুপ করে বসে আছেন। তুমি ভাইদের মধ্যে সকলের চাইতে বেশী রোজগার কর ; তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা কও, পরিবারে শান্তি থাক্‌বে না। যার যত শক্তি বেশী, যে যত কর্ম্মী বড়, সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি তখন বুঝি নি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা করে দেখ্‌তাম বলে, তোমার মহত্ত্ব যে কত ও কোথায় তা বুঝ্‌তে পারি নি। তাই আমার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিষকে বড় করে তুল্‌তাম, তাই তুমি যে অত বড় তা বুঝি নি, তোমাকেও ছোট বলে ভেবেছি। এই করে জীবনের এই পনর বছর খুইয়েছি। সব জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলাম।

আমার সকল অপরাধের কথা তো শুন নি। তোমাকে ছেড়ে এসে আমায় কি অপমান সহিতে হয়েছে, তুমি জান না। সে দিন যদি তোমার বোনের দেবর নরেন আমার খোঁজে এসে ঐ অপমান থেকে আমায় না বাঁচাত, তাহলে এই সমুদ্রেই চিরদিনের মতন মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ কল্লে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আর গ্রহণ করে না। অপরের কথা কি, স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত কর্‌তে চান নি। আমায় কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া—সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট কর্‌তে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা।

মৃণাল।

অগ্রহায়ণ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা]

কল্যাণী

হরিদাস ভারতী

[১]

এবারে পূজার সময় পুরুলীয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা ধরিয়া পড়িল, একদিন রাঁচি যাইতে হইবে। রাঁচির পথ নাকি বড় সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের আশে-পাশে অমন ঘন নিবিড় জঙ্গল আর কোথাও নাই। রাঁচি রওয়ানা হইলাম বটে, কিন্তু রাঁচি দেখা হইল না। মাঝ-পথে এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গাড়ী আট্‌কাইয়া রহিল। আমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এটি না হইলে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইত না।

যাত্রিরা অনেকেই নামিয়া পড়িল। আমরাও নামিলাম। সেখানটাতে কোনও ষ্টেশন ছিল না। কাছে জনমানবের বসতি নাই। রেলের দুধারে কেবল পাহাড়, খাদ, আর শালবন। লাইনের ধারে ধারে বেড়াইয়া আমরা বনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গৃহিণী বলিলেন—দেখ, দেখ, ঐ গাছতলায় যেন চাঁদের হাট মিলিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। কল্যাণীকে পঁচিশ বৎসর পরে দেখিলাম। আমি আমার কাজে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কল্যাণীও কলিকাতায় ক্বচিৎ কখনও যায়। চাইবাসাতে বাড়ী করিয়াছে, সেখানেই থাকে, পঁচিশ বছর পরে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে হইল কাশীতে পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। তার সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তির কিছুই কমে নাই, কেবল যাহা অপরিস্ফুট ছিল তাহা যেন আরো ফুটিয়াছে, যাহা অপরিপক্ক ছিল, তাহা পাকিয়াছে, যাহা একটু চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হইয়াছে। তার আশে-পাশে আটটি সন্তান। বড়টির বয়স ছাব্বিশ, ইহা জানিতাম। ছোটটিকে দেখিয়া মনে হইল, চারি পাঁচ বৎসরের। ছেলেরা কেউ বা দাঁড়াইয়া আছে, কেউ বা ঘাসের উপরে বসিয়াছে, আর বড়টী মা'এর পার কাছে, আপনার বাহুতে ভর করিয়া একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদের হাট দেখিয়া মনে মনে আনন্দ-স্বামীকে প্রণাম করিলাম।

[২]

কল্যাণীকে তার বাল্যকাল হইতেই আমি চিনি। কল্যাণীর পিতা, রাধামাধববাবু আমাদের কালেজের ইংরাজি অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ বিদ্যা যে জানিতেন না, বলিতে পারি না। কালেজে আমরা তাঁর নিকটে ইংরাজিই পড়িতাম, কিন্তু বাড়ীতে যাইয়া দর্শন, ইতিহাস, গণিত, এমন কি সংস্কৃত কাব্য এবং জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত রীতিমত পড়িতাম। পড়ান'তে তাঁর কোনও দিন ক্লান্তিবোধ হইত না। কালেজের অধ্যাপকেরা কেবল নোট লিখাইয়া দিতেন। অনেকেই এগুলি মুখস্থ করিয়া পাশ হইয়া যাইত। রাধামাধববাবুর কাছে যারা পড়িতে যাইত, তাদের নোট মুখস্থ করিতে হইত না, তারা প্রত্যেক বিষয়ে মুলতত্ত্বগুলি নিজের জ্ঞানে ধরিতে পারিত। আর তাঁর পড়াইবার ধরণটা এমন ছিল যে, তাহাতে সকল বিষয়ই বড় মিষ্ট হইয়া উঠিত। রাধামাধববাবুর একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ছেলেবেলায় কল্যাণী অনেক সময় বাবার কাছে বসিয়া তাঁর এ সকল অধ্যাপনা শুনিত।

সেই সূত্রেই কল্যাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে প্রথম পরিচয়ের কথাটা এখনও মনে আছে। আমি সবে এন্ট্রেস পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। রাধামাধববাবু একদিন আমার একটা ইংরাজী রচনা বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাকেও সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ী যাইতে বলিলেন। তখন তিনি শান্‌কিভাঙ্গায় থাকিতেন। একটা ছোট দুতালা বাড়ী। আমি গিয়া দরজার কড়া নাড়িলাম। "কে ও" বলিয়া একটি আট-নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। "ভিতরে আসুন" বলিয়া সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া রাধামাধববাবুর বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—"বাবা বাড়ী নাই।" কল্যাণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সেই অবধি আমি একরূপ রাধামাধববাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইতাম। অর্দ্ধেক দিন সেইখানেই খাইতাম। কল্যাণী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সত্যসত্যই আমাকে তার নিজের সহোদরের মতন দেখিত। বড় হইলেও এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমারও নিজের ছোট বোন কেউ ছিল না ; কল্যাণীকে পাইয়া আমার সে অভাব দূর হইল।

আমি ক্রমে এম্, এ পাশ করিয়া বছরখানেক কলিকাতাতেই শিক্ষকতা করি। তার পর, ডিপুটী হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। কল্যাণীর বয়স তখন ষোল সতর হইবে। কিন্তু রাধামাধববাবুকে সে জন্য কোনও দিন চিন্তিত দেখি নাই। প্রথম প্রথম কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ছেলের পঁচিশ ও মেয়ের ষোল বছরের কমে কিছুতেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়। লোকে বলিত সমাজে এ নিয়ম চলিবে না। রাধামাধববাবু বলিতেন, সমাজে যাই বলুক শাস্ত্রে এই কথাই বলে। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বলিতেন—আজকালকার হিন্দুসমাজে অত বড় আইবুড়া মেয়ে রাখা অসম্ভব। রাধামাধব বলিতেন—আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে চিরদিনই আইবুড়া মেয়ে থাকিত। যাট বৎসর বয়সে আমার নিজের পিসীমার গঙ্গালাভ হয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। এ সকল কথা শুনিয়া লোকে রাধামাধববাবুকে কেউ বা খৃষ্টীয়ান, কেউ বা ব্রাহ্ম ভাবিত। তাঁর নিজের লোকেরাও ভাবিতেন তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চা'র বৎসর পরে আমি পূজার সময় কলিকাতায় যাইয়া দেখি, কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে। বরটী আমার বিশেষ পরিচিত। কালেজে সে আমার নীচে পড়িত, কিন্তু আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সেও কুলীন ব্রাহ্মণ ; এম, এ পাশ করিয়াছে। দেশে বিষয়-আশয় বেশ আছে, সংসারে তার আর কেউ নাই। অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়। বিধবা পিসী তাকে মানুষ করেন, পিসাত ভাই তার বিষয় দেখিতেন। অল্প দিন হইল দুজনাই মারা গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধ যখন আসে, আমি তখন রাধামাধববাবুর কাছেই বসিয়াছিলাম। তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে দিলেন। পড়া শেষ হইলে চোখ তুলিয়া দেখিলাম—রাধামাধববাবুর চোখ ছল ছল করিয়া আসিয়াছে।

পাত্রের নাম ললিত। ললিত সদ্বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজ, সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল। রাধামাধববাবু কল্যাণীর বিবাহের আশাই একরূপ ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। বিধাতা এমন বর আনিয়া দিবেন, ইহা তিনি কোনও দিন ভাবেন নাই।

চিঠিখানা লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। কল্যাণীর মা ললিতকে বেশ জানিতেন। ললিত এক সময় তাঁর বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইত। কল্যাণীও নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে মিশিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ললিত যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেয়। ডাকিলেও ওজর আপত্তি

তুলিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিত। ললিতের কি হইয়াছে, বলিয়া রাধামাধববাবুর গৃহিণী মাঝে মাঝে দুঃখ করিতেন। কল্যাণীর মা এই প্রস্তাবে খুবই খুশি হইলেন। কেবল "কিন্তু" দিয়া বলিলেন, "আর সবই খুব ভাল, ওর সংসারে যে আর কেউ নাই আমি তাই ভাবছি।"

একটু পরেই কল্যাণী মায়ের কাছে আসিল। রাধামাধববাবু তার হাতে চিঠিখানা দিলেন। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মাথা হেট করিয়া সে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। রাধামাধববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর মত আছে তো?

কল্যাণীর মা বলিলেন—তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। তোমার আমার মত হলে 'ও' কি আর 'না' বল্‌বে?

রাধামাধববাবু বলিলেন—কচি বয়সে বিয়ে দিলে অন্য কথা ছিল ; আমার মেয়ে বড় হয়েছে। লেখাপড়াও শিখেছে। ভালমন্দ বুঝবার শক্তি জন্মেছে। আগেকার কাল থাকিলে সে স্বয়ম্বরা হইতে পারিত। তার মত না লইয়া কি আমি কিছু ঠিক করিতে পারি?

কল্যাণীর মা বলিলেন—পুরুষগুলো কি একেবারে দিনকাণা? ওর মুখ দেখে কি বুঝছ না, ওর অমত নাই!

মায়ের কথা শুনিয়া কল্যাণী সেখানে হইতে সরিয়া পড়িল।

রাধামাধববাবু তখন তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। প্রতিদিন প্রাতে বৃদ্ধা গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলে। রাধামাধববাবু যাইয়া তাঁর পদধূলি লইয়া আসিতেন। এটিই তাঁর একমাত্র প্রকাশ্য সন্ধ্যা-বন্দনা ছিল। আজিও মায়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা, কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে।

বৃদ্ধা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ বিষণ্ণ হইল। কল্যাণীর বিবাহ হইবে, এ আশা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিতেন, যদি কোনও দিন হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজেই হইবে। আর তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষাতেই রাধামাধববাবু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়েন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের খাতিরে বুঝি বা সে দেরিটুকুও আর সহিল না।

রাধামাধববাবু মায়ের মনোভাব বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—মা তোমার জাত যাবার ভয় নাই। বর বাম্নান, আমাদের পাল্‌টি ঘর, তুমি তাকে জান।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, আমি চিনি? সে কে?

রাধামাধববাবু বলিলেন—ললিত।

বৃদ্ধা বলিলেন—আমাদের ললিত!

তাঁর মুখ অপূর্ব্ব-উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—কল্যাণীর জন্য মনে মনে এই বরটি চাহিয়া আমি এ দুবছর কাল প্রতিদিন শিবের মাথায় বেলপাতা দিয়াছি। ঠাকুর দুঃখিনীর মান রাখলেন।

[৩]

কল্যাণীর বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাধামাধববাবুর গুরুদেব এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। আনন্দস্বামী রাধামাধববাবুর কুলগুরু নহেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার গয়াধামে রাধামাধববাবু তাঁর দর্শন লাভ করেন। আনন্দস্বামী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁর নিকটে স্বামীস্ত্রীতে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, সেই

অবধি রাধামাধববাবু নামব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। কল্যাণীর বিবাহ ঠিক হইলে, তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। শিষ্যের আগ্রহে আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিলেন। রাধামাধব তাঁহাকেই কল্যাণীর বিবাহ দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বাবা, দেশে যে আর ব্রাহ্মণ নাই, আপনার মুখেই একথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ নহিলে কল্যাণীর বিবাহ দেয় কে? আনন্দ স্বামী বলিলেন, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দিবেন। রাধামাধব বলিলেন—বেদজ্ঞ হইলে কি বাবা মন্ত্রজ্ঞ হয়? বেদ তো আজকাল যে সে পড়ে ; কিন্তু তার অর্থ জানে কয় জন? আর যারা অর্থ জানে, তারাও তো এ সকলের মর্ম্ম বুঝে না। যদি ক্বচিৎ কেউ মর্ম্মও বুঝে, তারাও তো মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে না। এটী কেবল আপনিই পারেন। আপনি কল্যাণীর বিয়ে না দিলে তার বিয়ে হয় না। আনন্দস্বামী শিষ্যের আব্দার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই কল্যাণীর বিবাহে পৌরোহিত্য করিলেন। আর বিবাহের পূর্ব্বে সাত দিন ধরিয়া কল্যাণীকে বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক মন্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

রাধামাধববাবু কল্যাণীকে বেশ ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সাহিত্য, দর্শন, এমন কি, মোটামোটি জড়বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সে শিখিয়াছে। গুরুদেবের মুখে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ যে কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু জীববিজ্ঞান ; শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান এমন কি আধুনিক ইউজেনিক্স্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির উপরে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। এ সকল কথা বিবাহের মন্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া আছে। এতদিনে বিবাহ ব্যাপারটা যে কি কল্যাণী বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া তাহার প্রাণ দমিয়া গেল।

যথা সময়ে আনন্দস্বামী কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। যাঁরা এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়াছেন, জন্মে কখনও এমন বিবাহ দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ যখন ললিতকে মন্ত্রগুলি পড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেকটী মন্ত্র যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সকল মন্ত্র-প্রভাবে কল্যাণীর ফুল্ল-যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি অলৌকিক লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন দেখাইয়াছিল।

কল্যাণীর বিবাহে সকলের চাইতে বেশী আনন্দ হইল তার পিতামহীর। এই জন্যই যেন তিনি এতকাল পুত্রের সংসারে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। কল্যাণী স্বামীর ঘর করিতে গেলে, তার ঠাকুরমাও কাশী চলিয়া গেলেন।

[৪]

কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেলে আমি আমার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলাম। ললিত বয়সে আমার ছোট হইলেও, সখ্যের হিসাবে একই বন্ধুদলভুক্ত ছিল। একটী বন্ধু লিখিলেন—ললিতের—উদ্বাহ শেষে উদ্বন্ধনে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তার টিকি পর্য্যন্ত আর এখন দেখিতে পাই না। তার এখন—

উঠিতে কল্যাণী বসিতে কল্যাণী
কল্যাণী হইল সারা,
কল্যাণী ভজন, কল্যাণী পূজন
কল্যাণী নয়ন-তারা।

আমি লিখিলাম, শৈশবে যেমন দাঁত ওঠা, যৌবনে সেইরূপ বিয়েটাও কারও কারও হয়। টিদিং আর বিয়ে—দুয়েতেই ভারি কন্‌ষ্টিটিউষন্যাল্ ডিষ্টার্‌বেন্স্ হয়। ললিতেরও দেখছি তাই হয়েছে। ললিতকে লিখিলাম—লোকে বলে তোমার নাকি বিয়ে হয় নাই,

মৃত্যু হয়েছে। কল্যাণী কি তোমাকে গিলিয়া বসিয়াছে, না তুমিই তাকে গিলিয়া এখন অজগর হইয়াছ, আর নড়িতে চড়িতে পার না। যেই যাকে গিলিয়া থাক্, হজম করা শক্ত হবে। কল্যাণী কথাগুলি পড়ুক, এই জন্য পোষ্ট কার্ডে লিখিলাম। তাহাই হইল। কল্যাণী আমাকে লিখিল—

"আপনার পোষ্টকার্ডখানা আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি কি বলিব, সত্যি আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমি ওঁকে কত বলি—তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ একেবারে ছাড়লেন, তাঁরা আমাকে কি যে ভাবছেন, তা তুমি দেখ না। উনি বলেন—ওদের হালকা কথাবার্ত্তায় তাঁর মাথা ধরে। আমি জমিদারীতে যেতে বলি। তিনি বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে জেলে পুরে দিবে, তার জন্য যান না। আমি বলি, আর কিছু না করুন, প্রতিদিন ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন—হাঁটলে তাঁর প্যালপিটেশন্ হয়। আমি মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাই, কিন্তু গিয়ে দু'দণ্ড থাকতে পারি না—তাগিদের উপর তাগিদ যায়। আমি কি করি বলুন? আমি তো হার মেনেছি। আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তারই জন্য আপনাকে লিখছি।"

[৫]

বৈশাখ মাসে ঈষ্টারের ছুটিতে কল্যাণীর বিবাহ হয়। আবার বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। তখন আমি মৈমনসিংহে ছিলাম। তিন মাসের ছুটি লইয়াছি। মৈমনসিংহে সেবারে আমরা একটা সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করি। আমি ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। সম্মিলনের পরে কলিকাতায় যাইয়া তার বাড়ীতে কিছুকাল থাকিব, লিখিলাম। ললিত মৈমনসিং আসিল। পাঁচ সাত দিন আমার বাড়ীতেই ছিল। পরে দুইজনে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দেখিলাম, কল্যাণী বাড়ী নাই। ললিতের চাকর আসিয়া বলিল—পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী বিছানাপত্র লইয়া কোথায় গিয়াছেন, সে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, সঙ্গে নেন নাই। এই বলিয়া সে ললিতের হাতে একখানা চিঠি দিল। নিজে পড়িয়া ললিত চিখিখানা আমার হাতে দিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

"প্রাণপ্রতিমেষু,

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি অনেক দূরে, কত দূরে তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, জানি। আমারও যে ক্লেশ কম হইতেছে, ইহা ভাবিও না। কিন্তু আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এটাকে এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এড়াইতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি বলিলাম না, মা বাবাও জানেন না। কেন যাইতেছি, তোমাকে বলিতে পারি না, তাঁদেরও পারিব না। তোমাদের সকলের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার খোঁজ করিও না, করিলেও পাইবে না। তোমারই—কল্যাণী।"

দু'জনে রাধামাধববাবুর বাড়ী গেলাম। রাধামাধববাবুকেও কল্যাণী একখানা চিঠি লিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সেখানা ডাকে আসিয়াছে। রাধামাধববাবু চিঠিখানা হাতে লইয়াই বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ললিতের হাতে চিঠিখানা দিলেন। কল্যাণী বাবাকে লিখিয়াছে—

"শ্রীশ্রীচরণেষু,

বাবা, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি বলিতে পারিব না। কি হইবে

ভগবান জানেন। মা'র প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার জীবন আর আমার নয়। স্বপ্নে কোনও দিন ভাবি নাই, তোমাদের এমন কষ্ট দিব। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। তোমরা আমার ভক্তি-প্রণাম লইবে। ঠাকুরমাকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইও। সেবিকাধম সেবিকা—কল্যাণী।"

আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর মা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ললিতের চিঠিখানাও দেখিলেন, তাহাতেও বিষয়টার কোনও কূল কিনারা হইল না।

আমি ছুটীর অধিকাংশটাই কলিকাতায় কাটাইব মনে করিয়াছিলাম। ললিতের অবস্থা দেখিয়া সে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ললিতের বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, আমার ছেলে-পিলেদের আসিতে লিখিলাম। কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। তিন দিন পরে, গৃহিণীর জ্বরাতিসার হইয়াছে, তারে খবর পাইলাম। আমাকে তখনি মৈমনসিং ফিরিতে হইল।

[৬]

পারিবারিক অসুখ ও অস্বোয়াস্তির ভিতরে মাসেক কাল আমি ললিতের কোনও খবর লইতে পারি নাই। তারপর যখন তাহার খবর লইলাম, তখন সে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। কেবল লিখিল,—তুমি যার খবর জানিতে চাহিয়াছ, তার কোনও খবর লই নাই, পাই নাই, লইবও না, পাইতেও চাই না। পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। বুঝিলাম ললিত একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহা কি, পরে শুনিয়াছি।

আমি চলিয়া আসিলে ললিত প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া কল্যাণীর বাক্স, আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি তল্লাস করিয়া দেখে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর হঠাৎ, তার শোবার ঘরের কোণে একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইল। গ্রাম সম্পর্কে রাধামাধববাবুর একটী ভাগিনেয় ছিল। সে প্রথমে আমাদের কালেজেই পড়িত। আমি যখন এম. এ. দেই, তখন সে এফ. এ. পড়ে। তারপর মেডিকেল কালেজে যায়। এক সময় মনে হইয়াছিল বুঝিবা তারই সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইবে। ললিত সে কথা জানিত। কল্যাণীর বিবাহের পরে সে একদিন মাত্র কল্যাণীকে দেখিতে আইসে। কিন্তু কল্যাণী সর্ব্বদাই তার কথা কহিত, আর সে কেন যে তাকে দেখিতে আসে না, এজন্য দুঃখ করিত। চিঠিখানা তারই লেখা। সে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছে, শীঘ্রই বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে। বর্ম্মা তখনও ভাল করিয়া ইংরেজের দখলে আসে নাই। হামেসাই মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ইংরাজের কর্ম্মচারীদের অবস্থা বড় নিরাপদ ছিল না। তাই সে লিখিয়াছে, তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন বাঁচিব, যেখানেই থাকি, তোমাদের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না। সে বিজন বিদেশের মর্ম্মান্তিক একাকিত্বের মধ্যে তোমাদের স্মৃতি আমার এক মাত্র সঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই চিঠিখানা পড়িয়া ললিত ভাবিল, সব বোঝা গিয়াছে। বাড়ীর চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, আবার দিন দুই আগে একটী বাবু সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জাহাজের সন্ধান লইয়া জানিল, যে রাত্রিতে কল্যাণী চলিয়া যায় সেই রাত্রেই বর্ম্মার জাহাজও কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। ললিত তারপর আর কল্যাণীর কোনও খোঁজ করিল না। মুখেও আর তার নাম লইত না।

গৃহিণীকে লইয়া যমের সঙ্গে টানাটানি করিতেই আমার ছুটী ফুরাইয়া গেল। তাঁর হাওয়া

বদলান আবশ্যক। আবার ছুটি চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ললিতের সঙ্গে দেখা করিবার বা কল্যাণীর খোঁজ লইবার আর সুযোগ জুটিল না। তারপর বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম রাধামাধববাবু পেন্‌শন্ লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। আর বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

শুনিয়া বড় একটা বিস্মিত হইলাম না। ললিতের হৃদয়টা যে বেশী দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবে, এ কল্পনা আমি করি নাই। সে প্রকৃতি তার নয়। ললিতের পিতা চারিবার বিবাহ করেন, ললিত তাঁর চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ভেরেণ্ডা গাছে যেদিন তেঁতুল ফলিবে, সেদিন ললিতের রক্তে ব্রহ্মচর্য্য ফুটিতে পারে, তার আগে নয়। কল্যাণীকে হারাইয়া, ললিত প্রথমে প্রথমে মনে মনে বিবিধ রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে নিরাশ্রয় প্রাণের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। এ আশ্রয় তার মিলিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিল। উপন্যাস খানিতে সাহিত্যজগতে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। ললিত বেনামী করিয়া বইখানা ছাপাইল। আমি মৈমনসিং'এ থাকিয়াই বইখানি পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থে এক নূতন যুগ আনিয়াছে, সকলেই বলিতে লাগিল, আমারও তাহাই মনে হইল। ক্রমে থিয়েটারের কর্ত্তারা বইখানি অভিনয় করিতে চাহিলেন। ললিত নিজেই তাহা নাটকাকারে পরিণত করিল। নাটকখানি তাদের খুব পছন্দ হইল। ললিত তখন লিখিল— এ'খানির অভিনয় করিতে হইলে রিহিয়ার্শেলটা তার মনোমত করিতে হইবে। সে যেরূপ চায়, সেইরূপ অভিনয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে তার নাটক খানিকে সে কোনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে দিবে না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার উপরেই রিহিয়ার্শেলের ভার দিলেন। ললিত নিজেই রিহিয়ার্শেল করাইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ঐ পথেই সে গোল্লায় গিয়াছে।

[৭]

কিন্তু ললিতের সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'তিন দিন তার বাড়ী গেলাম,—সকালে গেলাম, দুপোরে গেলাম, সন্ধ্যায় গেলাম, রাত্রে গেলাম—দেখা হইল না। বেহারা বলিল, কখন আসে কখন যায়, ঠিকানা নাই। তারপর থিয়েটারে গেলাম। প্রথম দিন সে সেখানে আছে, শুনিলাম ; কিন্তু দেখা পাইলাম না। পরের দিন থিয়েটার ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তারপর দেখিলাম ললিত একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। আমার ছুটীর আর দু'দিন মাত্র আছে, সে রাত্রে ললিতের সঙ্গে দেখা না হইলে এ যাত্রায় আর হয় না। আমিও একখানা গাড়ী লইয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবিলম্বেই আমার গাড়ীও সেই বাড়ীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। ললিত ও সেই স্ত্রীলোকটী সবে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাদের পিছনে পিছনে বাড়ী ঢুকিলাম। ললিত স্ত্রীলোকটীর পশ্চাতে যাইতেছিল, দুতালার সিঁড়িতে উঠিবার জন্য যেই সে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—ললিত!

ললিত চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"আমায় চিনতে পারছ না? এই পাঁচদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েছি। আমার ছুটী ফুরাইয়াছে, কালই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি না। তাই এখানে এসে এ বেয়াদবি করলাম।"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"আপনারা উপরে আসুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন?" ললিত নিঃশব্দে

উপরে উঠিতে লাগিল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম, স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া, আমাদিগকে সেখানে বসিতে বলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তাতে যেন একটা সংযমের ও ভদ্রতার হাওয়া বহিতেছে। আসবাব্‌গুলি সামান্য মূল্যের, কিন্তু বড় নিপুণতা সহকারে সাজান। আমি একখানা কৌচে বসিলাম, ললিত আমার পাশেই বসিল। আমি কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষটা কেবল কথা না কহিলে নয় বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ তো?" ললিত বলিল "আছি।"

আবার কথা বন্ধ। এবারে আমার সুবুদ্ধি জুটিল। বলিলাম, "সুরমা বইখানা যে তোমার তা' এই সেদিন শুনেছি। আগেই পড়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অমন উপন্যাস বাঙ্গলায় আর হয় নাই। কোনও কোনও দিক্ দিয়া মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যা করতে পারেনি, তুমি এখানে তাই করেছ। তোমার চরিত্রগুলি কল্পিত বলে আদৌ বোধ হয় না। দিনরাত যাদের সঙ্গে ঘরকন্না করি, তারাই যেন তোমার বই এর ভিতর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নাটকখানাও অতি চমৎকার হয়েছে। আজ অভিনয় দেখলাম। অমন অভিনয় এদেশে হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।" ললিতের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। কি করিয়া প্রথমে উপন্যাসটী লিখিয়াছিল, এই খানি লিখিতে গিয়া তার ভিতরে কি যুগন্তের উপস্থিত হয়, তারপর কি করিয়া এখানিতে নাটকাকারে পরিণত করে, সব বলিতে লাগিল। তারপর অভিনয়ের কথা বলিতে যাইয়া, আর বলিতে পারিল না। কি যেন বুকের ভিতর হইতে তার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম—"ইনিই না তোমার নাটকের নায়িকা সাজেন? এরই নাম কি রসমঞ্জরী? বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে এমন করিয়া কেউ কখনও কোন চরিত্রকে ফুটাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

ললিত বলিল—"এখন ইহাকে দেখিলে এ কথা তোমার বিশ্বাস হ'বে না। অমন সামান্য স্ত্রীলোকের ভিতর অমন অসামান্য অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা কোথাও দেখি নাই, থাক্‌তে পারে বলিয়াও আগে কল্পনা কর্‌তে পারতাম না। দেখা কর্‌বে?

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "এখন থাক্" ; কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় বটে।"

ললিত তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। দেখিলাম সত্যই এ মানুষ সে মানুষ নয়। সে তেজ, সে দীপ্তি, সে কিছুই নাই। সেখানে একটা বিশ্বগ্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনীর শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম অনুপম কোমল-প্রকৃতির একটী হ্রীমতী বাঙ্গালীর মেয়ে। কিন্তু একটী বস্তু সেখানে ঐ রঙ্গমঞ্চেও ছিল, এখানে এই ঘরের মাঝেও আছে, তাহা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুটিকেই ইংরাজিতে Character বলে। দেখিলাম মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু ফুটিয়া আছে, যাহা আপনা হইতে চিত্তে সম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়। দেখিয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়িল—"ললিত গোল্লায় গিয়াছে।"

রূপ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ ব্যক্তি যে রাজ্যের লোক এ রূপ সে রাজ্যের নহে। এ রূপ দেহগঠনের পারিপাট্যে ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভাতে উদ্ভাসিত। ইহার কান্তি লাবণ্যের। ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা আছে, জ্বালা নাই। এ রূপ আত্মসম্ভাবিত নহে, ইহাতে আত্মবিস্মৃতি আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যত দেখিতে লাগিলাম, ততই কানে বন্ধুদের কথা বাজিতে লাগিল—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

কি কথা কহিব, খুজিয়া পাইলাম না। অভিনয়ের কথাটাই তুলিলাম, কথা খুলিল না। মনে হইল এ যেন কলাজগতের কোন কিছুই জানে না। ভাবিলাম এ মানুষের ভিতরে কি দুটা ব্যক্তিত্ব আছে? এরই নাম কি—Dual Personality?

তার মুখে দু'চারিটী কথার বেশী শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ দুচারিটী কথাতেই বুঝিলাম, এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়। জাত, কুল, ব্যবসা তার যাই হউক না কেন, দেবতা ইহার মধ্যে এখনও সজাগ আছেন। উঠিবার সময় সে আমাকে অতিশয় নত হইয়া নমস্কার করিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিলাম।

আমি ললিতকে গোল্লায় হইতে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলাম, এই রমণী আমার সে শক্তি হরণ করিল।

[৮]

ললিতের সঙ্গে তার বাড়ীতেই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীতে দু'জনার কাহারও মুখেই কোনও কথা ফুটিল না। সেই নীরবতা লইয়াই দুজনায় ললিতের শোবার ঘরে যাইয়া একখানা কৌচে বসিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম—তারপর।—কি ভাবিয়া, কোন্ স্বপ্নঘোরে যে বলিলাম মনে নাই। কিসের পর কি জানিতে চাহিয়াছিলাম, বস্তুতঃ পূর্ব্বাপর কিছুই ছিল কি না, তাহাও জানি না। কেবল ঐ প্রথম কথাটাই এখনও মনে আছে।

ললিত আগে বাড়ির দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, এবারে মাথা হেট করিয়া আনত চক্ষু দুটী মেজের উপরে রাখিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে কোঁচার খুঁট জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি ইহাকে বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে মুখে কল্যাণীর নাম বাহির হইয়া পড়িল।

ললিত বলিল—"মানুষকে ভূতপ্রেতে পাইলে দেবতার নামেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।"

আমার মুখে কথা সরিল না। খানিক পরে ললিত আমার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া কহিল—"তুমি যে বড় আমায় দেখ্‌তে এলে? এ সংসারে কেহই তো আমার খোঁজ করে না।"

বহু বহুদিন যা করি নাই, আজ তাহাই করিলাম—ললিতকে টানিয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলাম। চোখ বুজিয়া আসিল। সেই নিমীলিত নেত্রে কল্যাণীর ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিল। ললিত আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া শীতার্ত্ত বালকের মতন কাঁপিতে লাগিল। কতক্ষণ যে দু'জনায় এ ভাবে ছিলাম, জানি না। তারপর ললিত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—"তোমায় পেয়েছি ভালই হয়েছে। তোমার সাম্‌নে আজ হিসাব নিকাষ কর্‌ব।"

বলিয়াই উঠিয়া তার বসিবার ঘরে গেল। সেখান হইতে একতাড়া চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। চিঠির তাড়াটা খুলিতে খুলিতে বলিল—

"তুমি আমার কথা সবই জান। একরূপ বাল্যকাল হইতেই জান। তারপরও সব জান। সে কথা তুলিব না। তুমি সেবারে আমাকে কি অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলে, তাও জান। তারপর—"

ললিতের কথা আট্‌কাইয়া গেল। একটু পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল—"জানিলাম সে বর্ম্মায় চলিয়া গিয়াছে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"কি?"

ললিত আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"এই দেখ, তুমি চলিয়া গেলে, এখানা শোবার ঘরের কোণে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

আমি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলাম—"তুমি পাগল।"

ললিত বলিল—"পাগল হই আর ছাগল হই, আমার জীবনের সে অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। তার স্মৃতি প্রেতিনীর মতন আমাকে তিন মাস কাল দিন রাত তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছিল। ক্রমে "সুরমার স্বপ্ন রচনা করিতে যাইয়া, সে জ্বালা কমিয়া গেল। কিন্তু দুধের সাধ কি জলে মিটে? না, স্বপ্নে পাঁচ তরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাইলে জাগ্রতের ক্ষুধার যাতনা নষ্ট হয়। প্রাণের শূন্যতা গেল না। যতক্ষণ ভাব্‌তাম ও লিখ্‌তাম ততক্ষণ বেশ থাক্‌তাম, তারপর—তারপর তুমি তো সবই দেখলে। যা ভাবতে ইচ্ছা হয়, তাই ভাব। আমার কোনও ভয় ভাবনা নাই।"

খানিক পরে বলিল—আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাই ; কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমি বলিলাম্—না হইবারই কথা।

ললিত একটু গরম হইয়া বলিল—তুমি তাকে জান না বলেই অমন কথা বল্‌ছ।

আমি বলিলাম—যা দেখেছি ও জেনেছি তাতেই একথা বল্‌ছি।

ললিত বলিল—তুমি কি মনে কর যে ও রাজ্যে কখনও কোন ভাল লোক থাক্‌তে পারে না?

আমি বলিলাম—ভাল মন্দের বিচার করিবার আমি কে?

ললিত বলিল—তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, ওকে না দেখলে আর ওর সকল কথা ভাল করে না জান্‌লে আমিও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তাম না। এ ভদ্রলোকের মেয়ে—

আমি বলিলাম তা বিশ্বাস করার বাধা কি? অনেকেই তো তাই।

ললিত বলিল—সে ভাবে নয়। সে অর্থে ভদ্রঘরে তার জন্ম হয় নাই। কিন্তু কুল মন্দ হইলেও, রক্তটা ভাল। আর কেবল আর্টের আকর্ষণেই থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, নতুবা জীবিকার ব্যবস্থা বেশই ছিল। মা মরিয়া গেলে, কথা কইবার লোক ছিল না। তখন দুই পথ তার সম্মুখে খোলা ছিল। এক, যে পথে সবাই যায়, আর যে পথ সে ধরিয়াছে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, থিয়েটারের আলাপ পরিচয়টা তার থিয়েটারের চতুঃসীমানার ভিতরেই আবদ্ধ। আমিই প্রথম এ লক্ষ্মণের গণ্ডী পার হইবার অধিকার পাইয়াছি। আর এইটুকু না পাইলে, আজ আমি কোথায় যাইতাম জানি না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ললিত আবার বলিল—ও যে কিছুতেই বিয়ে কর্‌তে রাজি হয় না, না হইলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকিত না। আর যে ভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তার উপরে আমার কোনও কথাও যে চলে না।

ললিত নীরবে হাতের চিঠির তাড়া হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা বড় নয়, কিন্তু ললিতের পড়া যেন শেষ হইতে চাহে না। অনেকক্ষণ পরে অতি মৃদুভাবে সেখানা আমার হাতে দিল। বোধ হইল আমার হাতে দিতে যেন তার প্রাণে কি একটা ভয় জাগিতেছে। আমি পড়িলাম—

"সুহৃদ্বরেষু,—

তোমাকে এই আমি প্রথম পত্র লিখিতে বসিলাম। বাবার মৃত্যুর পরে, একবার কেবল যে থিয়েটারে আমি এখন আছি তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আর জন্মে কাউকে লিখি নাই। মুখে আর কথা ভাল ফোটে না, তুমি জান। মুখে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, ভয় হয়। তাই লিখিতে বসিলাম। আমার পূর্ব্ব-জীবনের কথা কেউ বড় জানে না, তোমাকেও এতদিন সে কথা বলি নাই। যে সমাজ হইতে বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেত্রী আসিয়া থাকেন, আমি ঠিক সেই সমাজে জন্মি নাই। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই এদেশের শ্রেষ্ঠ কুলীন-সমাজ-ভুক্ত ছিলেন। মা বাল-বিধবা

ছিলেন। বাবা বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। ব্রাহ্ম-মতেও বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না ; সে জন্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও একেবারে মিশিয়া গেলেন না। বাবা সর্ব্বদাই হিন্দু-সমাজে চলিতেন, কিন্তু আমরা সমাজের বাহিরে রহিয়া গেলাম। বাবা খুব বড় ডাক্তার ছিলেন, বিস্তর উপার্জ্জন করিতেন ; আর ততোধিক খরচও করিতেন। সমাজে তাঁর প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি খুব ভাল ইংরাজিও জানিতেন। সে-কালে বাঙ্গালীদের মত কেউ নাকি তাঁর মতন অত ভাল শেক্সপীয়ার জানিত না। বাবার কাছেই আমি ইংরাজি শিখি। বার তের বছর বয়সে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। বাবা আমাকে দাঁড় করাইয়া শেক্সপীয়ারের ভাল ভাল অংশগুলি আবৃত্তি করাইতেন। কলিকাতায় যখন যে ইংরাজ থিয়েটারে শেক্সপীয়ারের অভিনয় হইত, বাবা আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেন। শেক্সপীয়ারের নায়িকাদের সম্বন্ধে একখানা ভাল ইংরাজি বই আছে। বইখানা সচিত্র, তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। বড় বড় বিলাতী অভিনেত্রীগণ কি বেশে, কিভাবে, কোন্ চরিত্রের অভিনয় করিয়াছেন, তার চিত্রগুলি আমি সর্ব্বদা নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন করিতাম। বাবা কখন কখন ঐ রকম সাজ তৈয়ার করাইয়া, আমাকে সাজাইয়া, সে সকল চরিত্রের ঘরাণা অভিনয় দেখিতেন।

বাবা আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন না। আমার ঠাকুরমা তখন বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁর প্রতি বাবার অগাধ ভক্তি ছিল। বাবা ঠাকুর দেবতা মানিতেন না ; পূজা-অর্চ্চা করিতেন না। জাত-টাত মানিতেন না। অর্দ্ধেক দিন গলার পৈতা কোথায় থাকিত, ঠিকানা নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মার পায়ের ধূলি না লইয়া কোনও বিষয়-কর্ম্ম করিতেন না ; আর যত রাত্রিই হউক না কেন, মাকে প্রণাম না করিয়া শুইতে যাইতেন না। তিনি ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু মাকে ঈশ্বরের মতন ভক্তি করিতেন। মার মনে বড় লাগিবে বলিয়াই তিনি প্রকাশ্য ভাবে সমাজ ছাড়েন নাই। ঠাকুর মার যখন গঙ্গালাভ হইল, তার পূর্ব্বেই আমি জন্মিয়াছি। মার জীবদ্দশায় বাবা আমাদিগকে নিজের বাড়ীতে নিতে পারেন নাই, মার মৃত্যুর পরেও নিলেন না। আমরা যেরূপ ছিলাম সেই ভাবেই রহিয়া গেলাম।

আমরা ভদ্রপল্লীর মাঝ-খানে, অতি সম্ভ্রান্ত ভাবেই বাস করিতাম। তথাপি আমাদের অবস্থাটা গোপন রহিল না। ক্রমে আমি বড় হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি মাষ্টারের কাছে নিয়মিত মত সাধারণ ইংরাজি শিক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিতের নিকটে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। একজন ওস্তাদ গান-বাজানা শিখাইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজে এসব চলিয়া গিয়াছে, হিন্দু সমাজে তখনও চলে নাই। পাড়ার লোক প্রথমে কটাক্ষ করিতে লাগিল। ক্রমে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিল। শেষে একদল বদমায়েস ছোক্‌রা পেছনে লাগিল। প্রথম প্রথম ডাকে বেনামি চিঠি দিতে আরম্ভ করিল। তার পর ঢিলে জড়াইয়া সে সব কদর্য্য চিঠি বাড়ীর ছাতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। আমার ছাতে ওঠা বন্ধ হইল। গান বাজানা বন্ধ হইল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। ঘরের মধ্যে বন্দিনীর মতন বাস করিতে লাগিলাম। তাতেও শান্তি পাইলাম না। একদিন সন্ধ্যার পরে দুটি লোক ছাত ডিঙ্গাইয়া আমাদের ছাতে পড়িয়া, বাড়ী ঢুকিল। আমি তখন দোতালায়, আমার শোবার ঘরে, একেলা বসিয়া পড়িতেছিলাম, মা নীচে ছিলেন। বেহারা বাহিরে গিয়াছে। দরওয়ান বাড়ী নাই। ঝিও বাড়ী ছিল না। আমার দরজার সামনে আসিয়া তারা দাঁড়াইল। আমি তাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তারা আমার ঘরে আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিতে গেল। এমন সময় মা দৌড়িয়া আসিলেন, মাকে দেখিয়া তারা আমার নিকট হইতে সরিয়া

দাঁড়াইল। মা তাদের বেয়াদবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাদের একজন পাড়ারই এক বড় জমিদারের ছেলে। মা তাদের অন্য ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বসিতে বলিলেন। মার ভাব দেখিয়া তারা ভুলিয়া গেল। তার পর মাকে তারা যে সকল কথা বলিল, তাহা তোমাকেও বলিতে পারিব না। মা সব চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তারা দর বাড়াইতে লাগিল, মা তবুও কথা কহিলেন না। শেষে বলিল, আমাকে বাড়ী করিয়া দিবে, রাজরাণী করিয়া রাখিবে, হীরামতি দিয়া মুড়িয়া দিবে, আর চির জন্মের মতন মার বাঁধা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তখন বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। মা অমনি "তবে রে, হারামজাদা!" বলিয়া সিংহিনীর মতন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্বৃত্তেরা বিপদ গণিয়া ছুটিয়া ভিতর বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া সরিয়া পড়িল।

এ ঘটনার পর আমি যে পুরুষের মুখ দেখা তো দূরের কথা গান পর্য্যন্ত গাহিতে পারিতাম না, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? টাকা দিয়া তারা মানুষের প্রাণটা কিনিতে চায়, একথাটা সেই দিন প্রথম জানিলাম, আমার বয়স তখন চৌদ্দ পোনর। জীবনের স্বপন-ঘর কেবল তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই দিনকার এই ঘটনায় আমার সে-ঘর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। আর সেদিন যা যা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত তাহাই আমার জীবনের রক্ষা-কবচ হইয়া আছে।

পরের দিনই আমরা সেই পাড়া ছাড়িয়া পালাইলাম। বিছানাপত্র, আসবাব, ঘরকন্নার কোনও কিছু সঙ্গে নিলাম না। কেবল মার ও আমার কাপড়-চোপড় আর আমার বইগুলি গোপনে গোপনে বাবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। আর সব এই বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। আমরা রাত্রের বেলা চলিয়া গেলাম। একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। পাঁচ সাত দিন পরে, আর এক পল্লীতে নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে আসিয়া উঠিলাম। এই নূতন বাড়ীতে নূতন ঝি চাকর আসিল। মা বলিলেন, আমরা নূতন পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছি। এখানে আমরা একেবারে প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দু পরিবারের মতন বাস করিতে লাগিলাম। লোকে কথা বলিবে ভয়ে, মা আমাকে লোহা ও রুলী পরাইয়া দিলেন। সিঁথিতে সিন্দূর পরিতে লাগিলাম। বাবারও নিয়মিত মত আসা বন্ধ হইল। যখন আসিতেন, বৈকালে ডাক্তারীর ছলেই যেন আসিতেন ; বেশীক্ষণ থাকিতেন না। আমার লেখাপড়া বন্ধ হইল না বটে, কিন্তু গান বাজানা বন্ধ হইয়া গেল। এমন করিয়া কতকাল থাকা যায়, আমার শরীর মন দুই শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বাবা একদিন আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"তোমাদের বাড়ীর গান বাজানাতো বন্ধ হইয়াছে। তবে দিন কাটে কি করে? মাঝে মাঝে মা-মেয়েতে থিয়েটারে যেতে আরম্ভ কর। তাতেও মনে কতকটা ফূর্ত্তি হবে। তখন হইতে আমি মার সঙ্গে থিয়েটারে যাইতে লাগিলাম। এর আগে বাঙ্গালা থিয়েটারে আমি আর কোনও দিন যাই নাই।

এসব অভিনয় আমার ভাল লাগিত না। যারা বাজাইতে জানে, কেউ খারাপ বেসুরা বাজাইতেছে দেখিলে তাদের হাত ইষপিষ্ করে, আমার শরীর মন এ সকল অভিনয় দেখিয়া সেইরূপ ইষপিষ্ করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি ওখানে ঐ স্টেজে বসিয়া ঐ ভূমিকাগুলি করিয়া দেখাই। ক্রমে আমি সে সকল বই আনিয়া নিজে নিজে বাড়ীতে বসিয়া তার অভিনয় করিতে লাগিলাম। বাবা শুনিয়া চারিখানা খুব বড় আয়না কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই আয়নাগুলো আমার ঘরের দেয়ালের চারিদিকে টাঙ্গাইয়া তারই সামনে তখন হইতে এ সকল ভূমিকার অভিনয় করিয়া আপনা আপনি দেখিতে লাগিলাম। কখনও মা আসিয়া দেখিতেন, কোনও দিন বা সুবিধা হইলে বাবাও

দেখিতেন। এইরূপে আক্টিং করার একটা নেশা চড়িয়া গেল। সপ্তাহে যে কদিন থিয়েটার হইত সেই কদিনই দেখিতে যাইতাম। আর বাকি দিন নিজে নিজে ঐ গুলির অভিনয় করিতাম।

বাবা একদিন বলিলেন—সকল বিদ্যারই একটা সাধনা আছে, আর সংযম ছাড়া কোনও সাধনাই সম্ভব হয় না। কেবল নাট্যকলারই কি কোনও সাধনা ও কোনও সংযম নাই?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবা, সে সাধনাটা কি?

বাবা বলিলেন—সে সাধনাকে আমাদের দেশে আগে রসতত্ত্ব বলিত। আজিকালিকার দিনে সে সাধনাটা কি, বুঝিতে হইলে প্রধানভাবে Physiology of the Emotionsটা বুঝিতে হয়। ইমোষনকেই আমাদের দেশে রস বলে। এই রসের একটা Psychology আছে, আর সেই Psychologyর একটা physiology আছে। এই দুইটী জিনিষ বুঝিলে তবে নাট্যকলার সত্য সাধনাটা কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমি বলিলাম—বাবা আমাকে এ সাধনাটা শিখাইয়া দিতে হইবে। বাবা মোটামুটি আমাকে জিনিষটা বুঝাইয়া দিলেন। তখন বুঝিলাম আমাদের দেশে অভিনয় এমন খারাপ হয় কেন?

ইহার কিছুকাল পরে, এক মাসের ভিতরে আগে মা ও পরে বাবা মারা গেলেন। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মোটামোটি খাওয়া পরার ভাবনা কিছুই ছিল না। কিন্তু দিন কাটে কিসে? আমি থিয়েটারে ঢুকিতে চাহিলাম।

যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার অধ্যক্ষের নিকটে চিঠি লিখিলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—"আমি অসহায় ব্রাহ্মণ কন্যা, আপনার শরণাপন্ন হইলাম।"

তিনি দাঁড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"ব্রাহ্মণের রক্তে আমার জন্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিকার আমার নাই। আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না।" তিনি বলিলেন—"ব্রাহ্মণের রক্তই আমার নমস্য—তার ভাল-মন্দের বিচারে আমার অধিকার নাই।"

আমি তাঁহাকে আমার জীবনের ইতিহাসটা বলিয়া, বলিলাম—আমি থিয়েটারে যাইতে চাই। জীবনে আমার অন্য কর্ম্ম তো নাই।

তিনি বলিলেন—কর্ম্মটাও সোজা নয়। সংসর্গও নিরাপদ নহে।

আমি বলিলাম—"আমি কতকটা অভিনয় শিখিয়াছি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায়?"

আমি বলিলাম—"এই বাড়ীতে। এখানেই আমার নিজের একটা ষ্টেজ আছে।"

কথাটায় তাঁর কুতূহল বাড়িল। সে কেমন ষ্টেজ? আমি তখন আমার সেই আয়না-ঘেরা ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি দরজায় গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাবার মৃত্যুর পরে আমি সেই ঘরেই তাঁর ছবিখানা আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি সেখানা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ—আর বল্‌তে হবে না, বুঝিয়াছি তুমি কে? তোমার বাবার মুখেই তোমার কথা শুনিয়াছি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাতো তুমি জান না। তিনি আমার বয়সে বড় ভাই-এর মতন ছিলেন। আমি তাঁকে বাবার মতন ভক্তি করিতাম। তিনি আমাকে ছোট ভাই-এর মতন স্নেহ করিতেন। তাঁরই দৌলতে আমি মানুষ হইয়াছি। আমি বলিলাম—এই ঘরে বাবার কাছে আমি ইংরেজি বাংলা অনেক নাটকের অভিনয় করিয়াছি।

তাঁর নিকটেও দুই তিনটা চরিত্রের অভিনয় করিলাম। তিনি বলিলেন—অভিনয় তুমি খুবই পার্ব্বে। কিন্তু ভাব্‌ছি সংসর্গের কথা।

আমি বলিলাম—আপনি যদি আমার বাপ হয়ে রক্ষা করেন, আমাকে কিছুতে স্পর্শ করিতে পারিবে না, আমি যে ঘরপোড়া গরু।

তিনি বলিলেন, তাই হউক। ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি কোন পথে আমার জীবনে আসিয়াছ, তাহা জান। আমার জীবনের ঐ একটী পথই বাল্যাবধি খোলা ছিল, আর পথ ছিল না, এখনও নাই। আমি জীবনে যা কিছু পাইয়াছি ঐ পথেই আসিয়াছে সেই পথেই তোমাকেও আমার জীবনের সহায় রূপে বরণ করিয়াছি, সেই পথেই তোমার জীবনের সহচরী হইয়া তোমার সেবা করিবার অধিকার লইয়াছি। অন্য পথে আমার অধিকার নাই। এই জন্যই তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ আমি তাহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না। তুমি আমার জীবনে আসিবার আগে, আমি অপরের রস-মূর্ত্তিকেই রঙ্গমঞ্চে ফুটাইতাম, নিজে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে দিয়া এইটি করাইয়াছ। আমিও তোমার নিত্য নূতন রস-সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সন্তানের জননী হইবার অধিকার আমার নাই। তুমি পুরুষ, আমি যে স্ত্রীলোক। পুরুষের পিতৃত্ব বুদ্বুদের মতন উপরে ভাসিয়া থাকে, রমণীর মাতৃত্ব তার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যায়। আমি বাবাকেও দেখিয়াছি, মাকেও দেখিয়াছি। আর মার কথা ভুলিতে পারি না বলিয়াই তোমার প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। তুমি আমার জন্মকথা অগ্রাহ্য করিতে পার, আমি যে পারি না। আর আমি ভুলিয়া গেলেই, আমার সন্তানও কি তাহা ভুলিতে পারিবে? আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্যও, যারা এখনও জন্মায় নাই, তাদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা আগে হইতে জন্মের মতন নষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। আমার প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝিবে না? মুখে সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, তাই এই দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। এই কথা তুলিয়া আর আমাকে যাতনা দিও না।"

কতক্ষণ যে এই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল, জানি না। পড়া শেষ হইলেও কতক্ষণ যে এ খানিকে হাতে লইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। চিঠিখানা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আনমনে বলিলাম—এখন?

ললিত বলিল—এখন, যা দেখলে যা জানলে তাই। তুমি যে আমার বাড়ী, আমাকে খোঁজ করতে এসেছিল, তা আমি জানতাম। প্রতিদিনই আমি বাড়ী ছিলাম। তোমাকে বাড়ী ঢুকতেও দেখিয়াছি। দেখা করতে ইচ্ছা হয় নাই, করি নাই। আর আমার বেহারা জানে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। সবাইকে ঐকথা বলে বাবু বাড়ী নাই। তুমি তো জানই, আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলে—আমি গোল্লায় গিয়াছি। সত্যি করে বল দেখি, তুমিও কি তাই ভাব?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আকুল হইলাম। বিধাতা বাঁচাইলেন। চাকর চা লইয়া আসিয়া, দরজা জানালা খুলিয়া দিল। সূর্য্য উঠিয়াছে। ললিত বলিল—তাই তো, সারা রাত তোমায় ঘুমুতে দেই নাই।

[৯]

এই বৎসর পূজার সময় আবার এক মাসের ছুটি লইলাম। রাধামাধববাবু, কোন্ সূত্রে বলিতে পারি না, এ খবর পাইয়া একবার কাশীতে যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লিখিলেন। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। পরিবারবর্গকে বৈদ্যনাথে রাখিয়া আমি কাশী চলিয়া গেলাম। রাধামাধববাবু তাঁর গুরুদেবের ঠিকানা দিয়া, সেই খানেই যাইয়া আমায় উঠিতে লিখিয়াছিলেন। আমি সেইখানেই গেলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি,

কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া ; কোলে নয় দশ মাসের একটী ফুট ফুটে ছেলে ; মুখে যেন ললিতের মুখখানি আবার কচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। কল্যাণী ছেলে কোলে লইয়াই আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, তোমার একি অন্যায় কাজ, মামাকে যে সোনা দিয়া ভাগিনার মুখ দেখতে হয়, আমি এখন সোনা পাই কোথায়?

বিকালবেলা আনন্দস্বামী আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া, কল্যাণী এই দেড় বৎসর কাল যে তাঁর কাছেই ছিল, সে কেন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসে, কেন ললিতকে বলিয়া আইসে নাই। কেন পরেও কোন সংবাদ দেয় নাই, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম—সবই বুঝিলাম, কিন্তু ললিতের কথা তো আপনারা ভাবিলেন না, আর কল্যাণীর ভবিষ্যতের দিকেও তো চাহিয়া দেখিলেন না।

আনন্দস্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন—সবই ভাবিয়াছি।

আমি বলিলাম—ললিতের খবর—

আনন্দস্বামী বলিলেন—সবই রাখি, সবই জানি।

আমি বলিলাম—ললিতের জীবনটা যে নষ্ট হইল, আর কল্যাণীর সংসারও উৎসন্নে গেল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—আপনি জ্ঞানী হইয়া অমন কথা বলিবেন ভাবি নাই। সত্য কি কাউকে নষ্ট করে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রাণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন কথাগুলিতে নাড়িয়া চাড়িয়া দিল। তবু বলিলাম—আপনি সত্য কাকে বলেন?

"প্রত্যেকের প্রকৃতিই তার একমাত্র সত্য।" "প্রকৃতির কি ভাল মন্দ নাই?" "প্রকৃতি যা নয়, তাই মন্দ, তা ছাড়া আর মন্দ কোথায়?" "তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম?" "স্ব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। কল্যাণী আপনার ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ললিতকে ছাড়িয়া আসে।" "বুঝিলাম না।"

"বোঝা সহজ। কল্যাণী যতদিন কেবল রমণী ছিল, ততদিন ললিতের সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল, যে দিন সে মা হইতেছে বুঝিল, সেদিন এই নূতন মাতৃ-ধর্ম্ম তার পূর্ব্বকার সকল ধর্ম্মাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া, তাহাকে এক নূতন নিয়মে বাঁধিল। এরই খাতিরে সে ললিতকে ছাড়িয়া আসিয়াছে।"

"এখন?" "ছেলে বড় হইয়াছে, স্তন ছাড়িলেই কল্যাণী আবার ললিতের কাছে যাইবে।" "আপনি কল্যাণীর ধর্ম্মটাই কেবল দেখিলেন, ললিতের কথাটা তো ভাবিলেন না?"

"ভাবিয়াছি। ললিত ধর্ম্মমতে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াও ধর্ম্মপত্নীত্বে কোন দিন বরণ করে নাই। কামপত্নী করিয়াই রাখিতে লাগিল, ললিত রস চাহিয়াছে, ভোগ চাহিয়াছে, সখ ও সুখ চাহিয়াছে, আপনাকে বহু করিয়া আত্মার যে পরম সার্থকতালাভ হয়, তাহা চাহে নাই। যে যা চায়, সংসারে সে তাই পায়। ললিত যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে।"

"কল্যাণীকে সে কি আর গ্রহণ করিবে? কল্যাণীই কি আর ললিতের জীবনের আধখানা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে?"

"না পারিলে কল্যাণী এখনও মা হইবার অধিকার পায় নাই। কল্যাণীই কি আর ললিতকে তার জীবনের সবটা দিতে পারে? এই ছেলে যে তার বড় আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।"

আমার বড় খটকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কল্যাণী সব জানে?" "সব জানে। আপনি যে কলিকাতায় এসেছিলেন, তাও জানে।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম—"আপনাদের কোনও অতিলৌকিক শক্তি আছে, নতুবা বহুতর গুপ্তচর নিশ্চয়ই আছে ; নহিলে এসব কথা আপনারা জানিলেন কেমন করিয়া?" "উত্তর বড় সহজ। মঞ্জরীর মা আমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। মঞ্জরী আজ এখানেই আছে। কল্যাণীর কথা সে বিশেষ কিছুই জানিত না। এখন সকল রহস্য ভেদ হইয়াছে, আর তার প্রাণের যে দিকটা খালি ছিল, কল্যাণীর সন্তানকে বুকে ধরিয়া তাহা পূর্ণ হইতেছে।"

আমি আনন্দস্বামীর পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। তিনি "নমো নারায়ণায়" বলিয়া আমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া, বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর কি যে হইল জানি না!

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—কল্যাণীর পাশে, তার ছেলেটীকে কোলে লইয়া মঞ্জরী দাঁড়াইয়া। আমি চোখ খুলিবামাত্র কল্যাণীর কোলে ছেলেটীকে দিয়া সে আমাকে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—বিশ্বের পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ দুই। এই দুই এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুইরূপ, একরূপ জগদম্বা আর একরূপ শ্রীরাধিকা, একরূপের আশ্রয়ে সৃষ্টির, অপরের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন।

চাহিয়া দেখিলাম একদিকে কল্যাণী, আর একদিকে মঞ্জরী, আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর সন্তানটা।

আমি এই অভিনব বিশ্বরূপ দেখিয়া, প্রণাম করিলাম।

আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরূপ প্রকট কোথায়?

তিনি ভাববিষ্ট হইয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে।

মাঘ, ১৩২১

সমাপ্ত